योगरहस्यम्

वा

पातञ्जल-योगदर्शनम्

वराहनगर साधनसमर आश्रमात् मातृचरणाश्रित-सन्तान

श्रीगदाधर वगड़िया

कर्तृक-प्रकाशितम्।

যোগরহস্যম্

বা

পাতঞ্জল-যোগদর্শন।

সাধন-সমর আশ্রম হইতে মাতৃচরণাশ্রিত-সন্তান

শ্রীগদাধর বগড়িয়া

কর্তৃক প্রকাশিত।

বরাহনগর, কলিকাতা।

মূল্য তিন টাকা মাত্র।

প্রিণ্টার—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস [illegible]
বিদ্যোদয়-প্রেস
১৬।১।এ, বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, ১৩৩১ সাল
আষাঢ়ী পূর্ণিমা।

অবতরণিকা।

যোগায় যোগেশ্বরায় যোগপতয়ে যোগসম্ভবায়
গুরবে নমোনমঃ ॥

বিজ্ঞানময় গুরো! মহেশ্বর! এ যোগরহস্য তোমারই মূর্ত্তিমতী করুণা। তোমার অহৈতুক করুণারাশি সর্ব্বত্র সমভাবে বিকীর্ণ থাকিলেও তাহা সম্ভোগ করিবার সামর্থ্য নাই বলিয়াই আমরা ত্রিবিধ দুঃখে পুনঃ পুনঃ উৎপীড়িত। এই উৎপীড়ন হইতে আমাদিগকে চির পরিত্রাণ করিবার জন্য—অব্যয়-কৈবল্যপদে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দুরধিগম্য যোগরহস্যের উদ্‌ঘাটনরূপ তোমার এই অভিনব উদ্যম নিশ্চয়ই সফলতা মণ্ডিত হইবে। এবার আমরা নিশ্চয়ই তোমার করুণা সম্ভোগে সমর্থ হইব। এবার আমরা নিশ্চয়ই ধন্য হইব—জন্ম জীবন সার্থক করিব। এই আশা—এই প্রতীক্ষাই দীন মলিন অবসন্ন হৃদয় আমাদের পক্ষে মৃতসঞ্জীবনী।

এক্ষণে আমাদের সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট সানুনয় নিবেদন—পাতঞ্জল-যোগদর্শনের যে সকল ভাষ্য টীকা প্রভৃতি প্রচলিত আছে এবং অতি প্রাচীনকাল হইতে সমুন্নত সাধক সমাজে ইহার মর্ম্মার্থ যেরূপ ভাবে পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে, তদনুসারে এই শাস্ত্রের অনুশীলন করিতে গিয়া বিজ্ঞানময়-গুরু-কৃপায় যে অপূর্ব্ব রহস্য সমূহ উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই পিপাসিত-হৃদয় সাধকবৃন্দের সমীপে আজ "যোগরহস্য" নামক পুস্তক আকারে প্রকাশিত হইল। বিবাদ বা পরমত

খণ্ডনের প্রয়াসশূন্য এই পুস্তকে ভ্রমপ্রমাদশূন্য ঋষি-প্রণীত-সূত্র সমূহের অনুভবসিদ্ধ সরল মর্ম্মার্থই বিবৃত হইয়াছে। যদিও লিপি-প্রমাদ এবং মুদ্রাকরগণের অনবধানতা বহুস্থানেই পাঠকবৃন্দের অপ্রীতিকর হইবে, তথাপি আশা আছে—আমাদের এই দোষরাশি তাঁহারা ক্ষমার দৃষ্টিতেই সহ্য করিবেন। পরবর্ত্তি-সংস্করণে পুনঃ সংশোধনের চেষ্টায় ত্রুটি হইবে না। ইতি ২৬শে আষাঢ়, ১৩৩৭ সাল, শুক্রবাসর।

সাধন সমর আশ্রম
বরাহনগর, কলিকাতা
শ্রীগুরু পূর্ণিমা
১৮৫২ শকাব্দা।

বিনয়াবনত-
প্রকাশক

ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्त्तिं
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि-लक्ष्यम् ।
एकं नित्यं विमलमचलं सर्व्वधी-साक्षिभूतं
भावातीतं त्रिगुण-रहितं सद्गुरुं तं नमामि ॥

হে বহুরূপধারি নারায়ণ-মূর্ত্তি গুরো! তোমার সেবার জন্য এ আয়োজন তোমারই, তোমার সেবায় তুমি পরিতৃপ্ত হও, বিয়োগের ভান পরিত্যাগ করিয়া একবার যোগস্বরূপে দাঁড়াও, বিরহবেদনা চিরতরে অবসিত হউক, সেবা সফল হউক! সেবক ধন্য হউক।

योग-रहस्यम्।

समाधि-पादः

—:०:—

अथ योगानुशासनम् ॥१॥

——:0:——

शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः ॥

अथेति मङ्गलादि-रसार्थकमव्ययम्। प्रत्यूह-प्रतिरोधाय शास्त्रादौ मङ्गलं प्रयुज्यते। दृष्टानुश्रविक-विषयैर्योगो वियोग-विपाक एवेत्यनुभववतां भवति हि पर्य्यनुयोगो विप्रयोगाननुविद्ध-योगानुशासन-विषयको वा। अथारभ्यते वा शास्त्रं योगानुशासनं नाम। अथानन्तरं वा यथोक्ताधिकारलाभात्! तथाहि यथोचिताश्रमधर्म्मानुष्ठाने तत्परस्य पुरुषार्थ-सिसाधयिषोः अत्रावत एव योगे प्रवेशाधिकारः सिद्धः। योगरहस्यमतिगहनमनधिकारि-पतित-मरण्यरोदनमिवानर्थक्यमापद्येत। योगानुशासनं शास्त्रमधिकृतं वा। सूच्यते विशेषः शेषषष्ठी-समासेन। पुरुषार्थसाधनं योगस्तदङ्गानि योगजिज्ञासूना मवश्यज्ञातव्यान्यन्यानि चात्रानुशिष्यन्त इति वा प्रतिजानीते।

योगो मिलनं स च वक्ष्यमाणद्रष्टृदृश्ययोरेकत्वरूपः। ननु प्रकाश-तमसोरिव विरुद्धस्वभावयोर्द्रष्टृदृश्ययो रेकत्वं कल्पशतेनापि नैव सम्भाव्यत इति। नैवमेतयोर्विरुद्धताऽपाततः प्रतीयमानापि न पारमार्थिकी। तथाहि तमो न प्रकाशविरोधि यत्किञ्चित् किन्तु स्वल्पप्रकाश एव। एवमविद्यया जड़त्वेन प्रतीयमानाऽविक्रीयमाणा चिदेव जड़ाख्यामाप्नोतीत्यनयो र्मिलनं सिन्धुबिन्द्वोरिव सुकरं स्वाभाविकञ्चेति। अतएव योगाङ्गेषु परिपठितः समाधिर्न योगाभिधानमर्हतीति।

———•———

যোগেশ্বরী মা আমার, একদিন তুমি মহর্ষি পতঞ্জলি দেবকে এমনি করিয়া তোমার স্নেহময় অঙ্কে ধারণ করিয়া বসিয়াছিলে ; তাই সেদিন পূজ্যপাদ ঋষির হৃদয়ে অপূর্ব্ব যোগরহস্যসমূহ উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। জানি না তারপর কতসহস্র বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, জানিনা তোমারই অনুপ্রেরণায় উদ্‌ভাসিত সে যোগ রহস্যের উপর দিয়া কত রকমের বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে ; কিন্তু অদ্য পর্য্যন্ত তোমার কৃপায় সে সত্যময় অভিব্যক্তি সম্যক অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। মাগো, তাই আজ আমরা তোমারই বড় স্নেহের সন্তান তোমারই বড় আদরের পুত্র বলিয়া সেই ঋষিগণ-সেবিত সত্য পদবীতে অগ্রসর হইতে উদ্যত হইয়াছি। যোগমায়া মা, তুমি আমাদের হৃদয়ে নির্ম্মল বুদ্ধিরূপে উদ্‌ভাসিত হও, আমাদিগকে যোগ-রহস্য অবধারণের সামর্থ্য প্রদান কর, যোগাধিকার প্রদান কর। "তুমি আর আমি যে সর্ব্বতোভাবেই এক—অভিন্ন—ইহা বুঝিতে দাও, আমরা যোগী হই। তুমি আমাদের নিত্য সিদ্ধা যোগরাণী জননী, আর আমরা তোমার মাতৃবিয়োগবিধুর দীন সন্তান, এ অপূর্ব্ব লীলাভিনয় তোমার পক্ষে মধুময় হইলেও আমাদের পক্ষে তীব্র বিষময় বলিয়াই মনে হয়। তাই বলি মা, আমাদের নিকট হইতে তোমার এই বিয়োগের অভিনয় এবার অপসারিত কর, তোমারই কল্পিত এই "আমি" গুলিকে চিরতরে তোমাতে মিলাইয়া লও ; তোমার নিত্যসিদ্ধ যোগস্বরূপটি পূর্ণভাবে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠুক।

হে অমৃতের পুত্রগণ! যদি তোমরা শ্রদ্ধারূপিণী স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে উপবেশন করিয়া থাক, যদি তোমরা পুরুষার্থ লাভে মানব জীবনের সম্যক চরিতার্থতা সম্পাদনে উদ্যত হইয়া থাক, যদি তোমরা যথাযোগ্য স্ব স্ব আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ না হইয়া থাক, যদি তোমরা সচ্চিদানন্দময় শ্রীগুরুর অভয়পদে আত্মনিবেদন করিবার জন্য প্রাণপণ প্রযত্নে অগ্রসর হইয়া থাক, তবে এস

যোগাধিকার গ্রহণ কর, যোগরহস্য শ্রবণ করিয়া যোগী হও, অমৃত লাভ কর, জন্ম জীবন সার্থক হউক !

মহর্ষি পতঞ্জলিপ্রোক্ত যোগশাস্ত্রের প্রথম সূত্র "অথ যোগানুশাসনম্" এই সূত্রস্থ "অথ" শব্দটী অব্যয়। ইহার ছয় প্রকার অর্থ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—মঙ্গল, প্রশ্ন, কার্য্যারম্ভ, অনন্তর, অধিকার এবং প্রতিজ্ঞা। এ স্থলে উক্ত ছয় প্রকার অর্থই পরিগৃহীত হইতে পারে। ক্রমে তাহাই বলা হইতেছে। নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি কামনায় গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা পূর্ব্বাচার্য্য-প্রসিদ্ধ নিয়ম, সেই নিয়ম অনুসারেই এই যোগশাস্ত্রের প্রথমে মঙ্গলার্থক' অথ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। যোগরহস্যকারও ভাষ্যের আরম্ভে "রসার্থকমব্যয়ম্" পদ প্রয়োগে একটী গূঢ় অভিপ্রায় ধ্বনিত করিয়াছেন—যিনি রসস্বরূপ ব্রহ্ম, যিনি আনন্দময় প্রেমময় আত্মা, যিনি অব্যয—নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়, সেই মঙ্গলময় পরম পুরুষই এই যোগরহস্যে সম্যক্ উদ্ভাসিত রহিয়াছেন।

প্রিয়তম পুত্র ভার্য্যাদি, অতিপ্রিয় দেহাদি কিংবা একান্ত বাঞ্ছনীয় রূপরসাদি দৃষ্ট-বিষয় সমূহের সহিত যে যোগ, অথবা চির-সুখময় স্বর্গাদিরূপ আনুশ্রবিক অর্থাৎ অদৃষ্ট বিষয় সমূহের সহিত যে যোগ, এই উভয়বিধ যোগেরই পরিণাম অতি দুঃখময় বিয়োগ। অনাত্মবস্তুর সহিত যে যোগ, তাহা কখনও একান্ত বা অত্যন্ত হইতেই পারে না ; এই তত্ত্বটী যাহারা সত্যসত্যই অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তাহাদের মর্ম্মস্থল হইতে বিয়োগের দ্বারা সম্যক্ অস্পৃষ্ট কোন নিত্যশুদ্ধ যোগ বিষয়ক প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠিবে। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া মানুষ পুনঃ পুনঃ এই বিয়োগান্ত যোগের পরিচয় পাইয়া, পুনঃ পুনঃ ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হৃদয় লইয়া এমন একটী যোগের সন্ধান করে, যাহা কখনও বিয়োগের দ্বারা অনুবিদ্ধ নহে—যে যোগ যথার্থই একান্ত এবং অত্যন্ত। এইরূপে সূত্রে অথশব্দটী যোগজিজ্ঞাসা রূপ প্রশ্ন বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে,

ইহাও বলা যাইতে পারে। এ পক্ষে প্রথম সূত্রটী প্রশ্নরূপে পরিকল্পনা করিয়া দ্বিতীয় সূত্র হইতে গ্রন্থ সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাহার উত্তররূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। অথবা পূর্ব্বোক্তরূপ যোগজিজ্ঞাসুগণের জিজ্ঞাসা-নিবৃত্তির জন্য এই যোগানুশাসন নামক শাস্ত্রের আরম্ভ করা হইতেছে, এইরূপ আরম্ভার্থ বুঝাইবার জন্যও অথ শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। আবার, কেবল শাস্ত্রারম্ভ হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, যথাযোগ্য অধিকার লাভ করিয়া তারপর যোগানুশাসন পরিগ্রহ করিতে হয়; এইরূপ অনন্তরার্থ বুঝাইতেও অথ শব্দটী প্রযুক্ত হইতে পারে। যাঁহারা যথাযোগ্য আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালনে তৎপর, যাঁহারা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপায়ে পুরুষার্থলাভের অভিলাষী, যাঁহারা গুরুবাক্যে শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়প্রত্যয়রূপ শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন, এইরূপ সাধকগণই এই যোগশাস্ত্রে প্রবেশ করিবার যোগ্য অধিকারী, ইহা আবহমান কাল হইতে প্রসিদ্ধ আছে। পক্ষান্তরে এই দুর্জ্জেয় যোগরহস্য অনধিকারীর হস্তে পড়িলে অরণ্যরোদনের ন্যায় নিষ্ফল হওয়াই একান্ত সম্ভব; সুতরাং যথোক্ত অধিকারিগণের জন্যই এই যোগানুশাসন নামক শাস্ত্র অধিকৃত হইল। প্রাচীন ভাষ্যকারগণ অথ শব্দের এই অধিকার অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। যোগানুশাসন শব্দটীতে শেষে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হইয়া তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে। ইহাদ্বারা একটী বিশেষ অভিপ্রায় সূচনা করা হইয়াছে—পুরুষার্থ-সাধন যোগ, তাহার অঙ্গসমূহ এবং যোগজিজ্ঞাসুগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য অন্যান্য বহুবিষয় এই শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইবে; এইরূপ প্রতিজ্ঞা অর্থ বুঝাইতেও অথ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। সহৃদয় পাঠকগণ অবধারণ করিবেন—এই পাতঞ্জলযোগসূত্র সমূহের প্রথমেই যে অথ শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত মঙ্গলাদি ছয়প্রকার অর্থই পাওয়া যাইতে পারে।

যোগ শব্দের অর্থ মিলন, অনুশাসন শব্দের অর্থ উপদেশ। দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের একাত্মপ্রত্যয়রূপ যে মিলন, তাহাই যোগ। পরে যথাস্থানে দ্রষ্টা দৃশ্যের স্বরূপ সূত্রকার ঋষি নিজেই বর্ণনা করিবেন। একটী আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে—আলোক এবং অন্ধকার যেরূপ পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ, দ্রষ্টা এবং দৃশ্য অর্থাৎ চৈতন্য এবং জড়, এই দুইটিও ঠিক সেইরূপই অত্যন্ত বিরুদ্ধ পদার্থ। ইহাদের মিলনস্বরূপ যোগ ত শতকল্পকালেও সম্ভব হইতে পারে না। না, এরূপ আশঙ্কা অমূলক; যেহেতু দ্রষ্টা ও দৃশ্যের যে পরস্পর বিরুদ্ধতা তাহা আপাত-দৃষ্টিতেই প্রতীয়মান হয়। বুদ্ধি যতদিন নির্ম্মল না হয়, তত দিনই চৈতন্য এবং জড় অত্যন্ত বিরুদ্ধ পদার্থরূপে প্রতীতি গোচর হইয়া থাকে। গুরুকৃপায় সৌভাগ্যবশে যখন বুদ্ধিসত্ত্ব সম্যক্ নির্ম্মল হয়, তখন ঐরূপ বিরুদ্ধতাবিষয়ক প্রতীতি সমূলে তিরোহিত হইয়া যায়। আচ্ছা, প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত স্থলটীই ভালরূপ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক্। সাধারণ দৃষ্টিতে অন্ধকার যেন আলোক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিরুদ্ধ-পদার্থ রূপেই পরিলক্ষিত হয়; বাস্তবিক কিন্তু অন্ধকার আলোকবিরোধী কিছু নহে, অল্প আলোকই। অতিশয় অল্প আলোকই অন্ধকার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সূচীভেদ্য অন্ধকারেও মানুষ অতি সন্নিহিত পদার্থ লক্ষ্য করিতে পারে। মার্জ্জারপ্রভৃতি প্রাণিগণ গাঢ় অন্ধকারেও আলোকের ক্ষীণরেখাগুলিকেও স্বকীয় চক্ষুতারকায় কেন্দ্রীভূত করিয়া দিবালোকের ন্যায় অনায়াসে দর্শনব্যাপার সম্পন্ন করিয়া থাকে। উদ্ভূত আলোকের সম্বন্ধ ব্যতীত কর্ম্মক্ষম-চক্ষুও যে দর্শন ক্রিয়া করিতে পারে না, ইহা দর্শনশাস্ত্রসিদ্ধ সত্য। সুতরাং অন্ধকার আলোক-বিরোধী কোনও স্বতন্ত্র-পদার্থ নহে, পরন্তু অন্ধকারও আলোক ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যেস্থলে আলোক অতি ক্ষীণ, সেইখানেই উহার নাম হয়—অন্ধকার। ঠিক এইরূপই যিনি দ্রষ্টা, যিনি চৈতন্যস্বরূপ বস্তু, যাঁহার কোনরূপ বিকার বা সজাতীয় বিজাতীয় কিংবা

স্বগতভেদ নাই, তিনিই অবিদ্যাপ্রভাবে জড়পদার্থরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন। এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে—যে অবিদ্যাবশে চৈতন্যের এই জড়াকারীয় অভিব্যক্তি, সেই অবিদ্যাও বিদ্যা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। "জানিনা" রূপ যে অজ্ঞান, তাহাও জ্ঞানই, জ্ঞানবিরোধী কিছু নহে। তবে বিশেষত্ব এই যে, চিদ্‌বস্তু যখন লীলাবশে অচিৎ আকার গ্রহণ করে, তখন এ অচিৎ যেন চিৎ-স্বরূপের আবরণ রূপেই অবস্থান করে। ছায়া আলোকের সত্তায় এবং প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াও আবার সেই আলোকেরই আবরণ হয়; এইরূপ যাহা জড়রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা চৈতন্যের একান্ত বিরুদ্ধ পদার্থরূপেই প্রতীয়মান হইলেও, উহারা বাস্তবিক বিরুদ্ধ পদার্থ নহে। একই পদার্থের প্রকাশ তারতম্য মাত্র। অতএব দ্রষ্টা এবং দৃশ্য বস্তুতঃ দুইটী বিরুদ্ধ পদার্থ নহে। যিনি দ্রষ্টা, তিনিই লীলাবশে দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। সুতরাং দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মিলন-রূপ যোগ, বিন্দু ও সিন্ধুর মিলনের ন্যায় একান্ত সহজ এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইহাতে কোনরূপ সংশয় বা আশঙ্কার স্থান নাই, থাকিতে পারে না। শ্রুতিও "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যে জীবব্রহ্মের অভিন্নত্ব খ্যাপন করিয়া এই দ্রষ্টা দৃশ্যের মিলনরূপ যোগের কথাই বলিয়া গিয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্রসমূহ ভক্ত এবং ভগবানের মিলনব্যপদেশে এই যোগের মহিমাই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রচলিত ভাষ্য টীকা প্রভৃতিতে এ স্থলে যোগ শব্দের সমাধি অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। সমাধি যোগের অবিনাভাবী হইলেও ঠিক যোগস্বরূপ নহে। সূত্রকার ঋষি স্বয়ং অষ্টবিধ যোগাঙ্গ নিরূপণ করিতে গিয়া যম নিয়মাদির ন্যায় সমাধিকেও অন্যতম অঙ্গরূপেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা অঙ্গমাত্র, তাহা কখনও অঙ্গীরূপে পরিচিত হইতে পারে না। পরবর্ত্তি-সূত্রের ব্যাখ্যায় এ সকল বিষয় আরও পরিস্ফুট হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—যাহারা শাস্ত্রীয় পন্থায় পুরুষার্থ-প্রয়াসী, তাহারাই এই যোগশাস্ত্রের যোগ্য অধিকারী; সুতরাং বুঝা যাইতেছে এই যোগশাস্ত্র পুরুষার্থ-প্রতিপাদক। পুরুষের অর্থাৎ মানুষ মাত্রেরই যাহা অর্থ—অভীষ্ট, তাহারই নাম পুরুষার্থ। নিরবচ্ছিন্ন অভয় আনন্দই মানুষের অভীষ্ট। জ্ঞানে অজ্ঞানে সকলে উহাই চায়। পূজ্যপাদ ঋষিগণ এই পুরুষার্থকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাই ইহার অন্য নাম চতুর্ব্বর্গ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চারিটী পুরুষার্থ। এই চতুর্ব্বর্গের মধ্য দিয়াই মানব-জীবনের সম্যক চরিতার্থতা লাভ হয়। যে কোন মানুষ আপনাকে যথার্থ সুখী করিতে ইচ্ছা করিলে নিজেকে অভয়ানন্দে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহাকে এই ঋষিপ্রদর্শিত পথেই গমন করিত হইবে,"নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে" আর কোনও পথ নাই। কোনও কালে কোনও দেশে ইহার অন্যথা হয় নাই—হইতে পারে না। সে যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাই—এই পাতঞ্জল যোগদর্শনে পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বর্গ লাভের যে উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বথা অপরিবর্ত্তনীয় এবং যথার্থই অমোঘ। যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, যে কোন সম্প্রদায় ভুক্ত হউন না কেন,যাঁহারা পুরুষার্থলাভের পথে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা জ্ঞানতঃ অথবা অজ্ঞানতঃ এই যোগশাস্ত্র-প্রবর্ত্তিত পথেই চলিতেছেন। মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা প্রভৃতি শীল অর্থাৎ শিষ্টাচার, অহিংসা সত্য অস্তেয় প্রভৃতি সংযম অর্থাৎ ধর্ম্ম, সর্ব্বরত্ন উপস্থানরূপ অর্থ, ঈশিত্ব পর্য্যন্ত বিভূতি অর্থাৎ কাম এবং কৈবল্য অর্থাৎ মুক্তি, এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ বা পুরুষার্থই যাহাদের জীবনের লক্ষ্য, তাহারাই এই যোগশাস্ত্রে অবগাহন করিতে অধিকারী। ক্রমে যথাস্থানে এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। যদি কেহ চতুর্ব্বর্গলিপ্সু না হইয়া মাত্র মুক্তিকামী হন, অর্থাৎ মাত্র পরম-পুরুষার্থ লাভের প্রয়াসী হন, তাঁহার পক্ষে এই শাস্ত্র যেরূপ একান্ত

উপাদেয়, ঠিক তেমনই যাহারা মাত্র ত্রিবর্গলিপ্সু, অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ কামরূপ অপর পুরুষার্থসেবী, তাহাদের পক্ষেও ইহা কল্পতরুর ন্যায় অভিলষিত দানে সমর্থ। ইহা স্তুতিবাদ নহে, ধীমান সাধকগণ ইহাতে ধীরভাবে অবগাহন করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কেবল এই যোগশাস্ত্র নহে, ঋষিপ্রণীত যে কোন শাস্ত্রই এইরূপ সর্ব্বতোমুখী ও পুরুষার্থ-প্রতিপাদকরূপেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। অধ্যেতৃগণের প্রতিভার তারতম্য নিবন্ধন শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বিভিন্নরূপে পরিগৃহীত হইতে দেখা যায় বটে, তাহা হউক, চিরকালই হইবে এবং হইয়াছে, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই। ঋষি প্রণীত শাস্ত্র সমূহ এত সুদৃঢ় সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত যে, বিভিন্ন প্রকৃতির পাঠকগণের হাতে পড়িয়াও ইহা বিন্দুমাত্র মর্য্যাদাহীন হয় নাই। কেবল শাস্ত্র নহে, ঋষিপ্রযুক্ত যে কোন একটীমাত্র সংস্কৃত শব্দের সম্যক্ তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারিলেও ঐহিক এবং পারত্রিক সর্ব্ববিধ মঙ্গল লাভ হয়। ইহা কেবল আমাদের কথা নহে, ভূয়োদর্শী প্রাচীন আচার্য্যগণের মুখোচ্চারিত বাণীরই অনুবাদ মাত্র।

শাস্ত্র সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মবিদ্যা। ইহা কতকগুলি অক্ষরসমষ্টি বা শব্দসমষ্টি নহে, অর্থাৎ জড় পুস্তকমাত্র নহে। শাস্ত্র ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী জননীরই স্থূলতম অভিব্যক্তি। প্রত্যক্ষ মাতৃমূর্ত্তিজ্ঞানে সেবা করিলে ইহার প্রসন্নতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়, এবং তখনই—কেবল তখনই—শাস্ত্রের যথার্থ রহস্যসমূহ সাধকহৃদয়ে উদ্ভাসিত হইতে থাকে। একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে, আত্মকৃপা, গুরুকৃপা এবং শাস্ত্রকৃপা এই ত্রিবিধ কৃপা লাভ হইলেই জীব সত্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। যদিও গুরুকৃপা হইলেই শাস্ত্রকৃপা অনায়াসলভ্য হইতে দেখা যায়, তথাপি শাস্ত্রেরও যে একটা বিশিষ্ট কৃপা আছে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আপাত-দৃষ্টিতে শাস্ত্রসমূহ যেন পরস্পর বিরুদ্ধার্থবাদী ও একদেশদর্শী, এইরূপই মনে হইতে

থাকে; যতদিন পাঠকের নিকট শাস্ত্রসমূহের এই মূর্ত্তিটাই প্রকাশিত থাকে, ততদিন বুঝিতে হইবে—ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী মায়ের প্রসন্নতা লাভ হয় নাই। যতদিন প্রকৃত শাস্ত্রকৃপা লাভ না হয়, ততদিন বারংবার অধিকতর শ্রদ্ধার সহিত, অধিকতর বিনম্রভাবে শাস্ত্রের অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিতে হয়। শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য অহংবোধকে প্রণিপাতের সাহায্যে সম্যক্ অবনত করিয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে হয়, এইরূপ কিছুদিন করিলেই শাস্ত্রের প্রসন্নতা লাভ হইয়া থাকে। প্রিয়তম সাধক! যখন তুমি দেখিতে পাইবে—সকল শাস্ত্রই যেন এক অমৃতময় সুরে গাঁথা, কাহারও সহিত কাহারও বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই, সকল শাস্ত্রই তোমার প্রাণের কথা—তোমার অন্তরতম কথাটিই বলিতেছেন, নানাভাবে নানা ভঙ্গীতে, বিভিন্ন প্রকারে যেন তোমারই প্রাণের কথাগুলি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তখনই বুঝিতে পারিবে—শাস্ত্ররূপিণী মা আমার তোমার প্রতি প্রসন্নতার পরিচয় দিতেছেন। ওগো, বেদসমূহ ভিন্ন নহে, স্মৃতি সমূহ ভিন্ন নহে, মুনি ঋষিগণ বিরুদ্ধবাদী নহেন, সকলে এক কথাই বলিয়াছেন ও বলিতেছেন, ধর্ম্মের তত্ত্ব বুদ্ধিগুহাতে নিহিত, মহাজনগণ যে হৃদয়পথে গমন করিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছেন, তাহাই একমাত্র পন্থা। কিন্তু এ সকল অন্যকথা;—

এস প্রিয়তম সাধক, আমরা সর্ব্বতোভাবে প্রণিপাতের সাহয্যেই এই দুর্জ্ঞেয় যোগরহস্য অবধারণ করিতে প্রয়াস পাই, শ্রীগুরুকৃপায় মহর্ষি পতঞ্জলিপ্রোক্ত যোগানুশাসন আমাদের হৃদয়ে সম্যক প্রতিভাত হউক। যদিও আমাদের ধারণাবতী মেধা না থাকে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি না থাকে, তথাপি আশা আছে—কেবল প্রণিপাতের দ্বারাই, কেবল শরণাগত ভাবের দ্বারাই, এই দুর্গম শাস্ত্ররহস্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইব। শাস্ত্ররূপিণী মা, ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী মাই আমাদিগকে তাঁহার নিজের স্বরূপটি দেখাইয়া দিবেন। জয় মা জয় মা জয় মা। জয় গুরু, জয় গুরু জয় গুরু!

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥२॥

प्रतिज्ञातमादौ ताटस्थ्येनावतारयति योग इति। यत श्चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः स योग इत्यर्थः। वृत्तिनिरोधस्य चित्तपरिणामरूपत्वान्नयोगत्वम्। तत्र तु योगशब्दप्रयोगो मन्त्रयोगादिवदौपचारिकः। युज्यते एकत्वमापद्यते इति योगो नित्यसिद्ध एकात्मप्रत्ययरूपः। स चाविद्याजन्य-द्रष्टृदृश्यादिरूपभेदप्रत्ययावसानकरः, अद्वयबोधानन्दस्वरूप इति परत्र विशद्यते। ततश्च योगोदयेऽविद्याया निवृत्तौ तत्कार्याणां चित्तवृत्तीनां सुतरां निरोधः। बाधितानुवृत्तिदर्शनाज्जीवन्मुक्तस्य नैकान्ततः, कैवल्यं गतस्य तु पुनरुत्थानासम्भावादैकान्तेनैव निरोधः। नच विनापि योगमेकात्मप्रत्ययरूपं प्रत्याहारादिप्रक्रियाविशेषेणापि वृत्तिनिरोधः सम्भवतीति वाच्यं, तत्राभावप्रत्ययालम्बना अज्ञानप्रत्ययालम्बना वा वृत्तिर्वर्त्तत एवेत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामस्य तटस्थता सिद्धा।

প্রথমে তটস্থ লক্ষণদ্বারা পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত যোগের অবতারণা করা হইয়াছে। প্রাচীন আচার্য্যগণের ইহাই রীতি যে, কোন প্রসিদ্ধ বস্তুর পরিচয় করাইতে হইলে, প্রথমে তটস্থ লক্ষণই বলিয়া থাকেন। জিজ্ঞাসুগণের বুঝিবার পক্ষেও ইহাই অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থা। ধর্ম্ম-মীমাংসাসূত্রে মহর্ষি জৈমিনি এবং ব্রহ্ম-মীমাংসাসূত্রে মহর্ষি বেদব্যাসও যথাক্রমে ধর্ম্ম ও ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ উল্লেখ করিয়া পরে স্বরূপলক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহর্ষি-পতঞ্জলিপ্রণীত এই যোগসূত্রেও সে নিয়মের অন্যথা হয় নাই। যোগজিজ্ঞাসুগণের নিকট মহর্ষি প্রথমেই যোগের এমন

একটী লক্ষণ উপস্থিত করিলেন, যাহা অন্বয় এবং ব্যতিরেক দ্বারা যোগের যথার্থ পরিচয় দিতে একান্ত সমর্থ। সে লক্ষণটী এই "চিত্তবৃত্তিনিরোধ"। যাহা হইতে চিত্তবৃত্তি সমূহের নিরোধ হয়, তাহাই যোগ। যাহার আবির্ভাবে চিত্তের বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ হইয়া যায়, আর যাহার প্রকাশ না হওয়াতেই চিত্তবৃত্তি সকল অনবরত উপস্থিত হইতে থাকে, তাহার নাম যোগ। যোগ এবং বৃত্তিনিরোধ এইরূপ অবিনাভাবী হইলেও অভিন্নবস্তু নহে; যেহেতু বৃত্তিনিরোধও চিত্তেরই একপ্রকার অবস্থা মাত্র। যাহা চিত্তেরই এক প্রকার অবস্থা, তাহা কখনও যোগ হইতে পারে না। তবে বৃত্তিনিরোধাদি স্থলেও যোগ শব্দের বহুল প্রয়োগ হইয়া থাকে বটে, সে প্রয়োগ মুখ্য নহে গৌণ। যেরূপ হঠযোগ মন্ত্রযোগ লয়যোগ কর্ম্মযোগ প্রভৃতি স্থলে যোগশব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ বৃত্তিনিরোধরূপ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াও "রাজযোগ" বা শুধু যোগ শব্দের প্রয়োগ হয়, আর এইরূপ প্রয়োগে কোন দোষও হয় না। অতি প্রাচীনকাল হইতেই "ঘৃতই আয়ু" "অন্নই প্রাণ" এইরূপ ঔপচারিক প্রয়োগ প্রচলিত আছে। যাহা দ্বারা যোগ লাভ হয়, অর্থাৎ যে উপায় অবলম্বন করিয়া নিত্যসিদ্ধ যোগে উপনীত হওয়া যায়, তাহাকেও যোগ বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে হঠযোগ, মন্ত্রযোগ লয়যোগ প্রভৃতির তাৎপর্য্যও যে এইরূপই, তাহাতে আর কোন সংশয়ই হইতে পারে না। যেরূপ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে মানুষ এক দিন যোগলাভ করিতে অর্থাৎ যোগস্বরূপে উপনীত হইতে পারে বলিয়া কর্ম্মকেও যোগ বলা হয়, ঠিক সেইরূপই চিত্তবৃত্তি নিরোধের পথেও মানুষ যোগ লাভ করিতে পারে, তাই বৃত্তিনিরোধকেও যোগ বলা যায়। অথবা যোগলাভ হইলে চিত্তবৃত্তি সমূহ স্বতই রুদ্ধ হইয়া যায়, এজন্যও উহাতে যোগশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে; কিন্তু বুঝিতে হইবে—এইরূপ প্রয়োগ মুখ্য নহে, ঔপচারিক।

সে যাহা হউক, সূত্রকার যে চিত্তবৃত্তি নিরোধকে যোগের তটস্থ-লক্ষণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তিসূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

মিলনার্থবোধক যুজ্ ধাতু হইতে যোগশব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস সাধক, এস্থলে আমরা যোগ শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের দ্বারা যতদূর বুঝা যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করি। দুই বা ততোঽধিক বস্তুর যে মিলন বা একীভাব, তাহাই যোগ। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অনন্ত বৈচিত্র্যময় হইলেও ইহার মূল নিরূপণ করিতে গিয়া প্রথমতঃ আমরা দুইটী তত্ত্বেরই সন্ধান পাই। একটী দ্রষ্টা, অপরটী দৃশ্য। ইহা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, গ্রহীতা ও গ্রাহ্য প্রভৃতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। "অহমিদং জানামি" "আমি ইহা জানিতেছি" ইহাই হইল যাবতীয় জগদ্ ব্যাপারের চরম অবস্থা। "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" কি দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপার, কি স্মৃতি কল্পনা প্রভৃতি মানস ব্যাপার, সকল কর্ম্মেরই পরিসমাপ্তি হয় ঐখানে—"আমি ইহা জানিতেছি" এই জ্ঞানে। ইহার মধ্যে ঐযে আমি অংশটী অর্থাৎ অহং প্রত্যয়গোচর বস্তুটী তাঁহারই নাম দ্রষ্টা। তিনি চেতন, সর্ব্বভাব তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত; তাই ইহাঁর নাম দ্রষ্টা। বিষয়ী পুরুষ আত্মা জ্ঞাতা ভোক্তা প্রভৃতি বহু নামে ইহাঁর পরিচয় হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আর একটি অংশ আছে "ইহা জানিতেছি"। এই অংশটীর নাম দৃশ্য। ইদং রূপে যাহা কিছু প্রতীতি গোচর হয়, তাহা ঐ দ্রষ্টার দর্শনেই অবস্থিত; তাই ইহার নাম দৃশ্য। ইহা অচেতন বা জড় রূপেই প্রতিভাত হয়। বিষয় জ্ঞেয় ভোগ্য প্রভৃতি শব্দেও এই দৃশ্যের পরিচয় হইয়া থাকে। মনে রাখিও সাধক, 'জানামি'—'জানিতেছি' এই যে জ্ঞানক্রিয়াটী, ইহাও কিন্তু দৃশ্যবর্গেরই অন্তর্গত; কারণ জ্ঞানক্রিয়াটীও জ্ঞাতার জ্ঞেয়রূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, এই যে দ্রষ্টা এবং দৃশ্য, এই

উভয়ের যে মিলন, তাহাই যোগ শব্দের অর্থ। প্রচলিত ভাষায় ইহাই জীব ও পরমাত্মার মিলন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দ্রষ্টা কি, দৃশ্য কি, তাহা পরে সূত্রকার স্বয়ংই স্পষ্টরূপে বলিবেন। এস্থলে যোগশব্দের অর্থ বুঝিতে গিয়া আমরা যে দুইটী পদার্থের মিলন সন্ধান করিতেছিলাম, তাহারই প্রথম পরিচয় মাত্র পাইলাম।

এই মিলন সম্বন্ধে একটী বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অর্থাৎ জীব ও পরমের যে ভেদ, ইহা যদি পারমার্থিক হইত—সত্য হইত, তবে এতদুভয়ের যোগ বা মিলন কদাপি সম্ভব হইত না; কারণ একান্ত বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের কোনরূপেই একত্ব-ভাবরূপ মিলন হয় না; কিন্তু আশ্বাসের বিষয় এই যে, এই ভেদ পারমার্থিক নহে, ব্যবহারিকমাত্র—কাল্পনিকমাত্র। অনাদি অবিদ্যা বশতঃ অর্থাৎ অজ্ঞান বশতঃই এইরূপ ভেদপ্রতীতি হইয়া থাকে। অবিদ্যার নাশ হইলে অবিদ্যাজন্য যে ভেদজ্ঞান, তাহা সুতরাং বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন দৃশ্য বলিতে কিছুই থাকে না, কেবল বোধময় আনন্দময় একমাত্র আত্মপ্রত্যয়ই হইতে থাকে। এই অদ্বয় বোধানন্দস্বরূপ দ্রষ্টায় যাবতীয় দ্বৈত অর্থাৎ দৃশ্যবর্গ সম্যক-প্রকারে মিলাইয়া যায় বলিয়াই ইহার নাম যোগ। অন্ধকার বা অল্প আলোক যেরূপ উজ্জ্বল সূর্য্যের আলোকে মিলাইয়া যায়, অবিদ্যা এবং তৎকার্য্য স্বরূপ এই জগৎ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিসমূহও ঠিক তেমনই স্বপ্রকাশ-ব্রহ্মে মিলাইয়া যায়। এবং এইরূপ মিলন একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই হইয়া থাকে।

চিত্তের বৃত্তিসমূহ অবিদ্যাজনিত আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক এক প্রকার অবস্থামাত্র। অদ্বয়-বোধানন্দস্বরূপে একাত্মপ্রত্যয়রূপ যোগে উপনীত হইলে, অবিদ্যা সম্যক বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং দ্বৈত প্রতীতিরূপ বা দৃশ্যরূপ যে চিত্তবৃত্তিসমূহ, তাহাও সম্যক নিরুদ্ধ হইয়া যায়, অতএব যোগের আবির্ভাব হইলে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইবেই। ইহার অন্যথা কখনও হয় না, হইতে

পারে না। তাই মহর্ষি পতঞ্জলিদেব চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই যোগের তটস্থ লক্ষণরূপে নির্দ্দেশ করিলেন।

একটা আশঙ্কা হইতে পারে—বৃত্তিলয় না বলিয়া বৃত্তি-নিরোধ বলা হইল কেন, যোগের আবির্ভাবে অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং তজ্জন্য বৃত্তিগুলিরও একেবারেই লয় হওয়া সঙ্গত। এ আশঙ্কার সমাধান এই যে, যোগ লাভ হইলে অবিদ্যার বিলয় হয় বটে, কিন্তু তৎকার্য্যরূপ চিত্তবৃত্তির বাধিতানুবৃত্তি হয়, অর্থাৎ ব্যুত্থানে পুনরায় উহার আবির্ভাব দেখা যায়। যাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, তাহা অস্বীকার করা চলে না। ব্যুত্থানকালে আবির্ভাব দেখিয়াই সূত্রে বৃত্তিলয় না বলিয়া "বৃত্তিনিরোধ" বলা হইয়াছে। নিরোধ শব্দের অর্থ এস্থলে দুই প্রকার বুঝিতে হইবে—যাঁহারা যোগস্বরূপে উপনীত হইয়া উহার পরিপাক অবস্থায় বিদেহকৈবল্য লাভ করেন, তাঁহাদের আর পুনরুত্থান হয় না বলিয়া সেরূপস্থলে নিরোধ শব্দের অর্থ একান্ত নিরোধ। আর যাঁহারা জীবন্মুক্ত যোগী, তাঁহাদের যে নিরোধ, তাহা সাময়িক, একান্ত নহে। মাত্র যোগসমকালেই বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ থাকে, ব্যুত্থানে পুনরায় আবির্ভূত হয়।

এই সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়াই মহর্ষি এস্থলে বৃত্তিবিলয় না বলিয়া "বৃত্তিনিরোধঃ" কথাটী বলিয়াছেন। অবিদ্যার কিন্তু চিরতরেই বিলয় হয়। অবিদ্যার কার্য্যস্বরূপ চিত্তবৃত্তিগুলিকে কিছুদিন দেখিতে পাওয়া যায়—যাবৎ দেহপাত না হয়। অবিদ্যারূপ কারণের নাশ হইলেও তৎকার্য্যরূপ চিত্তবৃত্তিসমূহ থাকিতে পারে। ঐ সুদূর গগনে অবস্থিত একটী নক্ষত্র, যাহার কিরণরেখাটী পৃথিবীতে আসিতে বহুবর্ষ অতীত হইয়া যায়, এমন একটী নক্ষত্র যেদিন সম্যক্ বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই দিন হইতে বহুবর্ষ পর্য্যন্ত ঐ বিনষ্ট নক্ষত্রের কিরণ রেখাও পৃথিবীস্থ জীবগণ দেখিতে পায়। ঠিক এই প্রকার অবিদ্যারূপ কারণের বিনাশ হইলেও তৎকার্য্যরূপ চিত্তবৃত্তি

সমূহ কিছুকাল বিদ্যমান থাকিতে পারে ভ্রান্তিনাশ হইলেও ভ্রমজন্য ফল কিছুকাল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে পরে এ সকল বিষয় আরও পরিস্ফুট হইবে।

যাহারা মনে করেন প্রত্যাহারাদি কোনরূপ কৌশলের সাহায্যে চিত্তের বৃত্তিগুলিকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই যোগলাভ হইল, তাঁহাদের সহিত আমরা কিছুতেই একমত হইতে পারি না ; কারণ প্রত্যাহার বা খেচরীমুদ্রা প্রভৃতি এমন কোন উপায়ই নাই, যাহা দ্বারা চিত্তবৃত্তি সম্যক্ নিরুদ্ধ হইতে পারে। একমাত্র অদ্বয় আত্মস্বরূপে অর্থাৎ দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হইলেই উহা সম্ভব হয়। তদ্ভিন্ন যাহা সাধারণতঃ বৃত্তিনিরোধরূপে পরিলক্ষিত হয়, তাহা বাস্তবিক নিরোধ নহে ; উহা সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছা অবস্থার ন্যায় চিত্তেরই একটী অবস্থা বিশেষ। ঐ সকল অবস্থায় যেরূপ অভাব-বিষয়ক বা অজ্ঞান-বিষয়ক বৃত্তি থাকে, প্রত্যাহার বা খেচরীমুদ্রা প্রভৃতির দ্বারা চিত্তকে স্থির করিলেও ঠিক সেইরূপই অভাব বা অজ্ঞানবিষয়ক চিত্তবৃত্তি বিদ্যমান থাকে। ইহা শাস্ত্র যুক্তি ও অনুভবসিদ্ধ সত্য। একমাত্র স্বরূপ-স্থিতিরূপ যোগই বৃত্তি-নিরোধের অবিনাভাবী হেতু। সেইজন্যই বলিতে হয়, অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা একমাত্র বৃত্তিনিরোধকেই যোগের তটস্থ লক্ষণ-রূপে পাওয়া যায়।

সাধক, তুমি নিত্যসিদ্ধ যোগস্বরূপে উপনীত হও, দেখিতে পাইবে—তোমার বৃত্তিসমূহ আপনা হইতে অনায়াসে নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। চিত্তের বৃত্তিসমূহকে নিরুদ্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর না হইয়া–কঠোর উপায় সমূহকে অবলম্বন না করিয়া নিয়ত প্রত্যক্ষ একান্ত স্বাভাবিক স্বকীয়-স্বরূপে উপনীত হইতে চেষ্টা কর, তাহারই ফলে বৃত্তিনিরোধ হইয়া যাইবে। কিরূপ চেষ্টার ফলে তুমি নিত্যসিদ্ধ যোগস্বরূপে উপনীত হইতে পারিবে, তাহা পরে অতি বিস্তৃতভাবেই আলোচিত হইবে। এ স্থলে এইমাত্র

বলিয়া রাখিতেছি, যে সত্য সত্যই যদি তুমি যোগী হইতে চাও, তবে প্রথমে আপনাকে বিয়োগ-বিধুর বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর, বাস্তবিক পক্ষে যোগের জন্য চেষ্টা করিতে হয় না ; যোগ ত স্বতঃ সিদ্ধ বস্তু, তাহাকে আবার লাভ কি করিবে ? তুমি যে বিয়োগী ইহাই ভালরূপে বুঝিতে চেষ্টা কর।

तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ॥३॥

तटस्थमुक्त्वा स्वरूपं निर्दिशति तदेति। तदा योगसमकाले, यद्यपि योगो नाम देशकालाद्यतीतश्चिन्मात्रप्रत्ययरूप स्तथापि बुभुत्सु-प्रतिपत्तये तदेति कालवाचकशब्दप्रयोगः। द्रष्टुर्दृश्यानुभव-कर्त्तुरहंप्रत्ययगोचरस्य चिदात्मनः स्वरूपे स्वं स्वकीयं रूपं सत्य-ज्ञानादिलक्षणं तस्मिन्नवस्थानं स्थितिः। पर्व्वतस्तिष्ठतीतिवन्न तु गतिनिवृत्तिरूपमविकारित्वात्। योगस्वरूपस्य सर्व्वथाऽवाङ्मनो-गम्यत्वेनैवात्र भङ्ग्यास्वरूपनिर्द्देशः। दृश्यानामपगमे द्रष्टृत्वव्यप-देशोऽप्यस्य न सम्भवति "यदा सर्व्वमात्मैवाभूत् तदा केन किं पश्येत्"।

अत्रेदमाकूतं—दृश्याना मिदन्तया प्रतीयमानानां चित्तवृत्तीना-मविद्याविलसितत्वादेवानयो र्द्रष्टृदृश्ययोरैकत्वरूपो योगः सम्भवति। अन्यथा भेदस्य पारमार्थिकत्वे वाङ्मात्रेणैव पर्य्यवस्यते योगो मुक्तिर्वा। ततश्च न योगे कारणं वृत्तिनिरोधः किन्तु योग एव वृत्ति निरोध हेतुरविद्यानिवर्हणद्वारेण।

अत्रेयं जिज्ञासा—किमविद्या निवृत्तितः स्वरूपाभ्युपगम उत स्वरूपाधिगमेऽविद्यानिवृत्तिरिति। यद्यप्यत्र दुर्निरूपणीयः कार्य्य-कारणभावो बीजाङ्कुरवत् तथापि "यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणुते तनुं स्वामिति," "यं कामये तन्तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं

तमृषिं तं सुमेधामिति मातेवहितकारिश्रुतिप्रोक्तोपदेशबलेन द्वितीय एव पक्षः श्रेयान्। उग्रं सर्व्वेभ्य उत्तमं। श्रीभगवानप्याह शरणागतान् "अहं त्वां सर्व्वपापेभ्यो मोचयिष्यामि माशुचः"। ततश्च योह्यात्मानं वृणुते प्रार्थयति वरयति कन्येव वरं तस्मिन्नेव जने आत्मा स्वां तनूं स्वस्वरूपं वृणुते प्रकाशयति। अतएव योगो नाम केवलात्मकृपालभ्यः। कृपायाश्च पूर्व्वरूपं वृणुत इति पदबोध्यं प्रार्थनं वरणमात्मसमर्पणमिति यावत्। श्रूयते दृश्यते च यथोक्ताधिकारिणामहङ्कारनिष्कासनपूर्व्वकमात्मसमर्पणमेव स्वरूपावस्थानरूपस्य योगस्याविनाभाविपूर्व्वरूपमिति। न तु केवलेन बहिःप्रक्रियाविशेषेण वृत्तिनिरोधबलेन कदापि योगसिद्धिरित्येतदीश्वरप्रणिधानाद् वेत्यादिषु स्फुटीभविष्यति।

যোগের তটস্থলক্ষণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সূত্রকার এইবার স্বরূপ-লক্ষণ বলিলেন—"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" তখন দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয়। তদা শব্দের অর্থ তখন—যোগাবস্থায় অর্থাৎ যোগ—সমকালে। যদিও যোগাবস্থায় উপনীত হইলে দেশ কিংবা কালের কোন সত্তা প্রতীতি-গোচর হয় না, তথাপি যোগজিজ্ঞাসুগণের বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে বলিয়াই ঋষি "তদা" এই কালবাচক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বাক্য ও মনের অতীত বস্তুকে ভাষার মধ্যে লইয়া আসিলেই কিছু বিকৃত হয়। কিন্তু এরূপ না করিয়াও উপায় নাই, জিজ্ঞাসুগণের সুবিধার জন্য বেদাদি শাস্ত্র এইরূপ নানাভাবে ভাবাতীত বস্তুকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

দ্রষ্টা শব্দের অর্থ—যিনি দৃশ্যসমূহকে প্রকাশ করেন—অনুভব করেন। অহং-প্রত্যয়গোচর যে চিদাত্মা তিনিই দ্রষ্টা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—এই দ্রষ্টৃত্বই তাঁহার স্বরূপ নহে। যতক্ষণ দৃশ্য আছে, ততক্ষণই ইনি দ্রষ্টারূপে পরিচিত হইয়া থাকেন। ইহাঁর বাস্তবিক স্বরূপ যাহা, তাহা ভাষায় বা চিন্তায়, কোনরূপেই পরিব্যক্ত হয় না। "বিজ্ঞাতারমরে

কেন বিজানীয়াৎ” যিনি সর্ব্বভাবের বিজ্ঞাতা অর্থাৎ দ্রষ্টা তাঁহাকে কিরূপে বা কিসের দ্বারা জানা যাইবে? তিনি ত আর জ্ঞেয় বস্তু নহেন। যাহা দ্রষ্টার স্বরূপ, তাহা কখনও জ্ঞান ক্রিয়ার বিষয়ীভূত পদার্থ হইতে পারে না। তিনি স্বয়ং জ্ঞ স্বরূপ, সুতরাং চিরদিনই তাঁহার স্বরূপ অবর্ণনীয় থাকিবে। তথাপি বেদসমূহ সত্য জ্ঞান অনন্ত আনন্দ প্রভৃতি শব্দে তাঁহার স্বরূপের পরিচয় দিতে বহু চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা শ্রুতির ভাষায় দ্রষ্টার স্বরূপ বলিতে সচ্চিদানন্দই বুঝিয়া লইব। তদ্‌ভিন্ন আর যাহা অর্থাৎ দ্রষ্টৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি, সে সকলই দ্রষ্টার বিরূপ—বিকৃতরূপ। তিনি “স্বে মহিম্নি” স্বকীয় মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত। এই অদ্বয় বোধানন্দই যোগের স্বরূপ। যাহা দ্রষ্টার স্বরূপ তাহাই যে যোগেরও স্বরূপ, এই কথাটী যোগশাস্ত্রে প্রবেশকামি-সাধকগণকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। যোগের স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া ঋষি সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকেই দেখাইয়া দিলেন।

যদিও সূত্রে “অবস্থান” শব্দটীতে গতিনিবৃত্তি-বোধক স্থা ধাতুর প্রয়োগ হইয়াছে. তথাপি বুঝিতে হইবে—দ্রষ্টার যাহা স্বরূপ তাহা কখনও গতিশীল ছিল না, অথবা যোগাবস্থায়ও গতিনিবৃত্তি-রূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় না। আত্মা নিত্য নির্ব্বিকার। “পর্ব্বত স্তিষ্ঠতি” প্রভৃতি স্থলে যেরূপ স্থাধাতুর গতিনিবৃত্তিরূপ অর্থ বুঝায় না, ঠিক সেইরূপই এস্থলেও বুঝিতে হইবে। দ্রষ্টার যাহা স্বরূপ তাহা নিত্যই স্থিত। কোন অবস্থায়ই তাহা গতিমান্ নহে। যতক্ষণ দৃশ্য আছে, ততক্ষণই ইনি দ্রষ্টা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, দৃশ্য সমূহের বিলয় হইলে দ্রষ্টা অদ্বৈতরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকেন। সে অবস্থায় কোনরূপ দ্বৈত ভান হয় না। উপনিষদ্ বলেন—“যদা সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তদা কেন কিং পশ্যেৎ” যখন সর্ব্ব অর্থাৎ দৃশ্যসমূহ আত্মাই হইয়া যায়—আত্মায় মিলাইয়া যায়, তখন আর দ্রষ্টৃ দৃশ্যাদিরূপ

কোন ভেদই থাকে না। নিত্যস্থিত স্বরূপটীই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। মহর্ষি পতঞ্জলিদেব এইরূপ ভঙ্গিক্রমে বাক্য ও মনের অতীত যোগের স্বরূপলক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন।

পুনরুক্তি হইলেও পূর্ব্বকথিত বিষয়টী বিশেষভাবে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইদংরূপে জ্ঞেয়রূপে যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, তাহা দৃশ্য এবং এই দৃশ্যের যিনি প্রকাশক অর্থাৎ অহংপ্রত্যয়গোচর-বস্তু তাহার নাম দ্রষ্টা। এই যে দ্রষ্টা এবং দৃশ্যরূপভেদ, ইহা স্বরূপের অজ্ঞানরূপ অবিদ্যাদ্বারাই পরিকল্পিত। এই ভেদ কখনও পারমার্থিক হইতে পারে না। দ্রষ্টা ও দৃশ্য যদি সত্য সত্যই বিভিন্ন বস্তুদ্বয় হইত, তাহা হইলে এতদ্ উভয়ের যোগ বা মুক্তি কোন কালেই সম্ভবপর হইত না। দুইটী সত্য বস্তুর একত্বরূপ মিলন একেবারেই অসম্ভব। আর একটী বিশেষ কথা এই যে, বৃত্তিনিরোধরূপ দৃশ্যবিলয় কখনও যোগের কারণ হইতে পারে না; যেহেতু যোগ নিত্যসিদ্ধ। তাহা কোন কারণ জন্য হয় না। বিক্ষেপ যেরূপ চিত্তের অবস্থা বিশেষ, নিরোধও সেই প্রকার চিত্তেরই একপ্রকার অবস্থা বিশেষ। যাহা চিত্তের পরিণাম মাত্র, তাহা কিছুতেই যোগের হেতু হইতে পারে না। পক্ষান্তরে যোগই অবিদ্যা নিবৃত্তিকে দ্বার করিয়া বৃত্তি-নিরোধের হেতু হইয়া থাকে। স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগ সম্যক্ অধিগত হইলে স্বকীয় স্বরূপের জ্ঞান লাভ হয়। স্ব স্বরূপের জ্ঞান লাভ হইলে, স্বরূপের অজ্ঞানরূপ যে অবিদ্যা, তাহার সম্যক্ বিলয় হয়; সুতরাং অবিদ্যাজনিত চিত্তের বৃত্তি সমূহ সম্যক্ নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

এস্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, অবিদ্যা-নিবৃত্তি হইলেই কি স্বরূপে স্থিতিলাভ হয়? অথবা স্বরূপে স্থিতিলাভ হইলেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া যায়? যদিও এস্থলে কার্য্যকারণভাব সম্যক্ নিরূপণ করা বীজাঙ্কুরবৎ দুরূহ, তথাপি আমরা দ্বিতীয় পক্ষটীই

অর্থাৎ স্বরূপে স্থিতিলাভ হইলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, এই পক্ষটীই স্বারসিক বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছি। যেহেতু, মাতার ন্যায় হিতকারিণী শ্রুতি আমাদিগকে শিখাইয়াছেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুম্ স্বাম্"। আত্মা যাহাকে বরণ করেন—স্বীকার করেন, তাহার নিকটই তিনি স্বকীয় স্বরূপটী প্রকাশিত করিয়া থাকেন, দেবীসূক্তও উদ্‌ঘোষিত করিয়াছেন—"আমি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে তাহাকেই সকল অপেক্ষা উন্নত করি, তাহাকে ব্রহ্মত্বে উপনীত করি, ঋষিত্বে উপনীত করি সুমেধা করি।" শ্রীভগবান্‌ও শরণাগত ভক্তকে বলিয়াছেন—"আমি তোমাকে সর্ব্বরূপ পাপ হইতে মুক্ত করিব।" এই সকল বাক্যদ্বারা বেশ সহজ ভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মস্বরূপের প্রকাশ হইলেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে পারে। শঙ্কা হইবে—তবে কি তিনি পক্ষপাত দোষগ্রস্ত, নচেৎ সকলকেই বা কেন অবিদ্যার হাত হইতে পরিত্রাণ করেন না? ইহার উত্তরও ঐ সকল শ্রুতিবাক্যের মধ্যেই নিহিত আছে—যে ব্যক্তি আত্মাকে বরণ করে, প্রার্থনা করে, আত্মদান করে; যেরূপ কন্যা পতিকে আত্মদান করে, ঠিক তেমনই যে ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, মাত্র তাহারই নিকট তিনি স্বকীয় স্বরূপ প্রকাশিত করেন। তিনি যে কল্পতরু, যে যাহা চায় সে তাঁহার নিকট হইতে ঠিক তাহাই পায়। তাঁহার দানের বিচার নাই। যাহারা অবিদ্যার খেলাই চায়, তাহাদের নিকট তিনি সেইরূপেই আত্মপ্রকাশ করেন, এবং ঐ খেলার মধ্য দিয়াই উহার প্রতি একটা বিতৃষ্ণা জন্মাইবার চেষ্টা করেন। যখন কোন জীব সত্য সত্যই এই খেলার প্রতি সম্যক্ বীতরাগ হইয়া প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ উভয় হাত তুলিয়া বলে "আমি তোমাকেই চাই, আমি তোমারই শরণাগত, তুমি আমাকে লইয়া চল, আমার নিকট তুমি প্রকাশিত হও", ঠিক তখনই—ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আত্মা স্বকীয়-

স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া ঐ শরণাগত সন্তানের অবিদ্যাজনিত মোহ বিদূরিত করিয়া দেন। আজ পর্য্যন্ত যাঁহারা যোগের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই কথা স্বীকার করিবেন। কেহই একথা বলিতে পারেন না, আমি সাধনা দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিয়াছি। তাঁহাকে লাভ, তাঁহার কৃপা ব্যতীত হয় না। ইহা দ্বারা বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যোগ মাত্র আত্মারই কৃপায় লাভ হয়। তবে সেই কৃপা কেবল তাহারাই অনুভব করিতে পারে, যাহারা কাতর প্রাণে কৃপা চায়। স্থূল কথা এই যে যাহারা আত্মাকেই বরণ করে, প্রার্থনা করে, স্বীকার করে, আত্মনিবেদন করে, তাহারাই দ্রষ্টার স্বরূপে উপনীত হইতে পারে। সুতরাং কৃপার পূর্ব্বরূপ যে বরণ বা আত্মসমর্পণ ইহাতেও কোন সংশয় নাই। অতএব যাঁহারা যথার্থ অধিকারী, তাঁহারা অহঙ্কারত্যাগপূর্ব্বক শরণাগত হইতে পারিলেই অর্থাৎ আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলেই যোগী হইতে পারেন। আত্মসমর্পণই যে কৃপালভ্য-যোগের একান্ত পূর্ব্বরূপ, ইহাই সর্ব্বত্র দেখা যায় এবং শাস্ত্রবাক্যহইতে শোনাও যায়। যত কিছু সাধন ভজন, যত কিছু যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান, তাহা ঐ অহঙ্কার নিষ্কাসনরূপ অশুদ্ধিক্ষয় পূর্ব্বক আত্মসমর্পণের যোগ্য হইবার জন্যই। সুতরাং কেবল যম নিয়মাদি কিংবা কেবল খেচরী মুদ্রা প্রভৃতি বাহ্য প্রক্রিয়াদ্বারা কখনও যোগ সিদ্ধি হইতে পারে না। এ কথা সূত্রকার নিজেই ঈশ্বরপ্রণিধান সূত্রে স্পষ্টরূপে বলিবেন।

এস আত্মহারা সাধক! এস বিষয়বিমূঢ় দুর্ব্বলচিত্ত সাধক! এস আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী সাধক! তুমি ঈশ্বর প্রণিধানের পথে অগ্রসর হও, যোগেশ্বরের চরণে আত্মনিবেদন কর, তাঁহারই কৃপায় নিশ্চয় যোগ লাভ করিতে পারিবে। তুমি অতি চঞ্চল অতি মলিন ও দুর্ব্বল চিত্ত বলিয়া দুর্জ্ঞেয় যোগতত্ত্ব লাভ করা তোমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব বলিয়া ভয়ে পশ্চাৎপদ হইও না। বৃত্তি

নিরোধের অতিশয় দুর্গমপথে তোমাকে যোগারূঢ় হইতে হইবে না, একমাত্র যোগেশ্বরের কৃপায়ই তোমার সকল দুর্ব্বলতা চঞ্চলতা দূরীভূত হইয়া যাইবে। ঐ যে দুর্ব্বলতা ও চঞ্চলতা, উহা তোমার যথার্থ স্বরূপ নহে, উহা তোমারই অজ্ঞানের কল্পনা মাত্র। ছায়াকে ভূত বলিয়া ভয় পাইতেছ, সাহস করিয়া ঐ ছায়াভূতের সম্মুখে দাঁড়াও, উহা আপনি অপসৃত হইবে, তুমি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সচ্চিদানন্দই তোমার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ, উহাই যোগেরও স্বরূপ, তুমি স্বকীয় স্বরূপ হইতে কখনও বিচ্যুত হও নাই, হইতে পার না, হইবার উপায় নাই। তুমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা। যোগই তোমার নিত্য সিদ্ধস্বরূপ, বিয়োগ বিধুরতা তোমার স্বেচ্ছাকল্পিত অজ্ঞানের খেলামাত্র। তুমি ইচ্ছা করিলেই উহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পার। সত্যই কি তুমি যোগ লাভের জন্য লালায়িত ?

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র ।।৪।।

যোগী দ্রষ্টুঃ স্বরূপস্থিতিরন্যত্র কিং স্যাদিত্যাহ বৃত্তিসারূপ্যমিতি। ইতরত্র যোগাদন্যত্র বৃত্তীনাং সারূপ্যং সমানরূপত্বমভিন্নরূপত্বমিব ভবতীত্যর্থঃ। অদ্বয়াবিকারী চিদেকরস আত্মা "যদা দ্বৈতমিব ভবতি তদা ইতর ইতরং পশ্যতি"। লীলাকৈবল্যতোঽবিদ্যোপাধিকল্পিতান্ বৃত্তিস্বরূপান্ স্বগতভেদান্ স্বয়মেব পশ্যতীতি দ্রষ্টুরেব দৃশ্যরূপতা। পরমার্থতস্ত্বহমিদন্তাভ্যাং প্রতীয়মানয়োর্দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োর্নাস্তি ভেদলেশোঽপি।

বৃত্তির্বর্ত্তনং বিদ্যমানতা দেশকালাবচ্ছিন্নতয়া প্রতীয়মানতেতি যাবৎ। সা চ দ্রষ্টুরেব ব্যাপাররূপা ব্যবহাররূপা বা ; অতো নাস্যা বস্তুত্বং। বোধমাত্রস্বরূপোঽয়মাত্মা যদা দেশকালাবচ্ছিন্নতয়া

वर्त्तते, तदा स वृत्तिरित्याख्यायते। यदुक्तं चित्तवृत्तिरिति तद्योगजिज्ञासूना मनायास-प्रतिपत्तये। चित्तमेव वृत्तिरिति न वृत्तितश्चित्तं भिद्यते। वृत्तिरूपतयानुभातं चिद्वस्तु चित्तमित्युच्यते।

अपि चात्रावगन्तव्यं तस्यैतस्य द्रष्टृत्वं वृत्तिसारूप्यं वा। योऽपि नाम द्रष्टा पुरुषः सा एव चितिशक्तिरित्युपरिष्टाद् वक्ष्यते चिति-शक्तिरपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शितविषया चेति। अतएव वृत्तिरूपेण तदाविर्भावः। उक्तञ्च—या देवी सर्व्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थितेति।

इति योगरहस्ये चतुःसूत्री।

যোগে দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান বলা হইয়াছে, অন্যত্র অর্থাৎ যোগ-ব্যতিরিক্ত স্থলে দ্রষ্টা কিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তাহা বুঝাইবার জন্যই চতুর্থ সূত্রের অবতারণা। "বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র" ঋষি বলিলেন—ইতরত্র অর্থাৎ যোগ ব্যতিরিক্ত স্থলে দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্য হয়। দ্রষ্টা যেন তখন বৃত্তির সমানরূপ প্রাপ্ত হন। "বৃত্তিসারূপ্য" এই গম্ভীরার্থক সংক্ষিপ্ত বাক্যটীর মধ্যে যে মহান্ তত্ত্ব নিহিত আছে, এস্থলে আমরা তাহা যথাসাধ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। উপনিষদ্ বলেন—"যদাদ্বৈতমিব ভবতি তদা ইতর ইতরং পশ্যতি"। যখন তিনি—সেই অদ্বয় অবিকারী চিদেকরস আত্মা যেন দ্বৈতের মতন হয়েন, তখন তিনি—সেই অদ্বয় আত্মাই দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপভেদ-ভাবাপন্ন হইয়া একে অন্যকে দর্শন করেন। একদিকে তিনি বৃত্তিসারূপ্য লইয়া অর্থাৎ দৃশ্য সাজিয়া ভোগ্যরূপে উপনীত হন, অন্যদিকে আবার তিনিই সেই স্বগত ভেদরূপ দৃশ্যবর্গকে দ্রষ্টারূপে প্রকাশ করেন, ভোগ করেন। এই যে ব্যাপার—অদ্বয় অবিকারী আত্মার এই যে দ্রষ্টা ও দৃশ্যাদিরূপ ভেদব্যবহার, ইহারই নাম লীলা। লীলা বশতঃই যে অদ্বয়

আত্মার দ্বৈতভাব এই তত্ত্বটী অতি স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্যই পূর্ব্বোক্ত উপনিষদ্‌বাক্যে "দ্বৈতমিব" এই 'ইব' শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে। যদিও তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং বস্তু, যদিও তাঁহাতে সজাতীয় বিজাতীয় এবং স্বগতভেদ নাই, তথাপি তিনি যেন দ্বৈতের মতন হন, যেন বৃত্তিসারূপ্য প্রাপ্ত হন। এই লীলার বিষয় পরে "তস্য হেতুরবিদ্যা" এই সূত্রে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। এস্থলে আমরা প্রস্তাবিত বৃত্তিসারূপ্য কথাটীই ভাল রূপে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

যাহারা যথার্থ বিয়োগবিধুর হইয়াছে, যাহারা সত্যসত্যই যোগ লাভের জন্য লালায়িত, যাহাদের গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে সংশয়রহিত শ্রদ্ধা আসিয়াছে, তাহাদিগকে যোগের স্বরূপটী বুঝাইয়া দিতে হইলে—অদ্বয় আত্মার সন্ধান দিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে দ্রষ্টার স্বগত ভেদটীই ভালরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে হয়। যদি সুকৃতিবশে গুরুকৃপায় কোন সাধক অদ্বয় আত্মার এই স্বগতভেদ—এই বৃত্তিসারূপ্য দৃঢ়ভাবে অবধারণ করিতে সমর্থ হয়, তবে একদিক দিয়া যেমন তাহার ভেদদৃষ্টি অর্থাৎ সজাতীয় বিজাতীয় ভেদজ্ঞান চিরতরে বিদূরিত হইয়া যায়, অন্যদিকে তেমনই সর্ব্ব-ভেদাতীত দ্রষ্টার স্বরূপের দিকে লক্ষ্য ফিরাইবার যোগ্যতা লাভ হয়। স্বগতভেদ বুঝিতে না পারিলে—অনুভব করিতে না পারিলে অদ্বয় যোগস্বরূপটী কিছুতেই অধিগত হয় না। অদ্য পর্য্যন্ত যে সকল সাধক অদ্বয় যোগস্বরূপে উপনীত হইয়া জন্ম জীবন সার্থক করিয়া গিয়াছেন, তাহারা সকলেই এই স্বগতভেদের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইয়াছেন। স্বগতভেদে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে অর্থাৎ অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাতযোগে উপনীত হইতে না পারিলে, কোনপ্রকারেই অসম্প্রজ্ঞাত যোগের—অদ্বয়স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহা লক্ষ্য করিয়াই মহর্ষি পতঞ্জলিদেব সাধককে বৃত্তিসারূপ্য বুঝাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। সমগ্র উপনিষদের

ঋষিগণ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, আত্মৈবেদং সর্ব্বং, স এব সর্ব্বং" ইত্যাদি বাক্যদ্বারাও এই স্বগতভেদটীর অবধারণ করাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রয়াস পাইয়াছেন।

বৃত্তি কি? বৃত্তি—বর্ত্তন বিদ্যমানতা, দেশ-কালাবচ্ছিন্নরূপে প্রতীয়মানতা। দেশকালাতীত আত্মা যখন দেশ ও কালরূপ আধার বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হন, তখন তাঁহার নাম হয় বৃত্তি। যিনি নামরূপের অতীত, তিনি যখন নাম রূপ বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হন, তখন তাঁহার নাম হয় বৃত্তি। যিনি অপ্রতিসংক্রমা অপরিণামিনী চিতিশক্তিস্বরূপ বস্তু, তিনি যখন লীলাবশতঃ প্রাক্তন সংস্কারের মধ্যে পড়িয়া তদাকারে আকারিত হন, তখন তাঁহার নাম হয় বৃত্তি। যিনি অখণ্ড অবিকারী সত্তাস্বরূপ বস্তু, তিনি যখন খণ্ড খণ্ড বিকারী সত্তাময় বস্তুরূপে প্রতিভাত হন, তখন তাঁহার নাম হয় বৃত্তি। বৃত্তি সেই দ্রষ্টাই। দ্রষ্টা ব্যতীত বৃত্তি নামক পৃথক্ কোন সত্তা নাই। অবিদ্যাবশতঃ দ্রষ্টাই যোগব্যতিরিক্ত স্থলে বৃত্তির আকারে আকারিত হইয়া বহুরূপে প্রকাশিত হন।

সারূপ্য শব্দের অর্থ সমানরূপতা। বৃত্তির রূপের মতন রূপ লওয়াকেই সারূপ্য কহে। মূষানিষিক্ত ধাতুদ্রবের দৃষ্টান্ত দ্বারা বেদান্তশাস্ত্র এই বৃত্তি সারূপ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তরলীকৃত পিত্তলাদি ধাতু যখন যেরূপ ছাঁচের মধ্যে নিপতিত হয়, তখন সেইরূপ আকার ধারণ করে, ঠিক এইরূপ বিশুদ্ধ বোধময় আত্মা বিভিন্ন সংস্কাররূপ ছাঁচের মধ্যে পড়িয়া তদাকারে আকারিত হইয়া থাকেন। যদিও এ সকল দৃষ্টান্তদ্বারা চৈতন্যস্বরূপ বস্তুর বিষয় সম্যক্ পরিস্ফুট হয় না, তথাপি আত্মার বৃত্তিসারূপ্য বুঝিবার পক্ষে, এই দৃষ্টান্তটী যে অনেক সাহায্য করে, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

দেখ সাধক, যাহাকে এতদিন বৃত্তি বলিয়া দৃশ্য বলিয়া বুঝিয়া আসিয়াছ, যাহার নিরোধ করিতে পার না বলিয়া কতই দুঃখ করিয়াছ হতাশ হইয়াছ, আজ দেখ—যোগসূত্রের ঋষি তোমাকে কি দেখাইলেন।

ঐ যে চিত্তবৃত্তি ঐ যে দৃশ্য, উহা আর কিছু নহে—দ্রষ্টাই। যাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছ, যাঁহাকে পাইবার জন্য জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া লালায়িত রহিয়াছ, যাঁহাকে পাইলেনা বলিয়া কতই উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়াছ, আজ দেখ, সেই তিনিই—তোমার অভীষ্ট দেবতাই বৃত্তিরূপে তোমার অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি লুক্কায়িত হইয়া রহেন নাই, অতি প্রকট রূপেই বিরাজ করিতেছেন। এতদিন দেখ নাই, বুঝিতে পার নাই, তাই কোন সপ্তস্বর্গের পরপারে আত্মাকে সন্ধান করিতে ছুটিয়াছিলে। সম্মুখের বস্তুকে উপেক্ষা করিয়া দূরে দূরে ধাবিত হইয়াছিলে বলিয়াই বিফল মনোরথ হইয়াছ। কিন্তু আজ দৃষ্টি পরিবর্ত্তন কর, ঋষিবাক্যে বিশ্বাস কর, দেখ—দ্রষ্টাই দৃশ্য সাজিয়া ভোগ্য সাজিয়া তোমার দেহ মন প্রাণ বুদ্ধি সাজিয়া নিয়তই প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন। ইহাই আর্যদর্শন, বহুদিন যাবৎ দেশ এই দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, তাই নানারূপ ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। আর কতদিন বঞ্চিত হইবে, আর কতদিন ধর্ম্মগ্লানি দর্শন করিবে। দেখ—"দ্রষ্টুরেব বৃত্তিসারূপ্যম্"। ওগো, অনুসন্ধানের চক্ষু একেবারে মুদ্রিত করিয়া নিয়ত প্রত্যক্ষ কর—এই পরিদৃশ্যমান জগৎরূপে যে চিত্তবৃত্তিসমূহ প্রকাশ পাইতেছে, উহা তোমার ইষ্টদেবই। এইরূপ দেখিতে দৃঢ় অভ্যস্ত হইলে তাঁহারই কৃপায় বুঝিতে পারিবে, "স্বগতভেদ" বা লীলা কি, এবং তারপর সর্ব্বভেদাতীত লীলাতীত লীলাময়কে লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিবে।

সে যাহা হউক, যোগজিজ্ঞাসুগণের বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে বলিয়াই "চিত্তবৃত্তি" শব্দের প্রয়োগ হয়, বাস্তবিক কিন্তু চিত্ত হইতে বৃত্তি ভিন্ন বস্তু নহে, চিত্ত• বৃত্তি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। চিৎ স্বরূপ আত্মা যখন দেশকালাবচ্ছিন্নরূপে অর্থাৎ বৃত্তিরূপে প্রতিভাত হন, তখনই তাঁহার নাম হয় চিত্ত। "রাহুর শির, শিলাপুত্রের শরীর" প্রভৃতি প্রয়োগ স্থলে যেরূপ অভিন্ন রূপেই প্রতীতি হয়, চিত্তবৃত্তি শব্দেও ঠিক সেইরূপই বুঝিতে হইবে।

বৃত্তিসমূহ কোনও স্থির পদার্থ নহে, উহা দ্রষ্টারই ব্যাপার বা ব্যবহার মাত্র। দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্য হওয়া এবং দ্রষ্টার ব্যাপারবান্ হওয়া একই কথা। অবিকারী নিষ্ক্রিয় আত্মার যে বিকারময় ব্যবহারময় প্রকাশ, তাহাই বৃত্তিসারূপ্য। যেরূপ গমন ভোজনাদি ব্যাপারগুলির কর্ত্তৃনিরপেক্ষ কোন সত্তা নাই বলিয়াই উহারা কোন বস্তু নহে, ঠিক সেইরূপই বৃত্তিগুলিরও দ্রষ্টৃনিরপেক্ষ কোন সত্তা নাই বলিয়া উহারাও কোন বস্তু হইতে পারে না। লীলাময় আত্মার—অবিদ্যাগ্রস্ত দ্রষ্টার যে ব্যাপারময়—ব্যবহারময় অভিব্যক্তি, তাহাই বৃত্তিনামে কথিত হইয়া থাকে। দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ হইতে আরম্ভ করিয়া এই পরিদৃশ্যমান বিশাল জগৎ, এ সকলই বৃত্তি বা ব্যবহার মাত্র। আত্মার যাহা ব্যবহার যাহা লীলা, তাহাই এই জগৎরূপে প্রতিভাত হইতেছে। বেদান্তশাস্ত্র যে "ব্যবহারিকসত্তা" শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহারও তাৎপর্য্য ইহাই। যেহেতু আত্মার ব্যবহার এই জগৎ, সেই হেতু জগতের ব্যবহারিক সত্তামাত্রই স্বীকার করা হয়। এই ব্যবহারিক সত্তা বুঝিতে পারিলেই আত্মার স্বগতভেদ বা বৃত্তিসারূপ্য উপলব্ধ হইয়া থাকে। অলাত চক্র যেরূপ কোন স্থির বস্তু না হইয়াও, অতি দ্রুত কম্পনরূপ ব্যাপার মাত্র হইয়াও, স্থির বস্তুরূপে প্রতীয়মান হয়, ঠিক সেইরূপই বৃত্তিসমূহ অতি দ্রুত স্পন্দনরূপ ব্যাপার মাত্র হইয়াও পদার্থরূপে প্রতীয়মান হয়। দ্বৈত অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত নিয়া যাঁহারা বিবাদ করেন বা সংশয়াপন্ন হন, তাঁহারা একটু ধীরভাবে এই বৃত্তিসারূপ্য কথাটি বুঝিতে চেষ্টা করিলেই তাহার নিঃসংশয় সমাধান করিতে পারবেন।

এই সূত্রে আরও একটী জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। এই যোগশাস্ত্রে দ্রষ্টা বা পুরুষ নামে যাহাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তিনি চিতি শক্তি। তিনি যদি অশক্ত পদার্থ হইতেন, তবে তাঁহার এই দ্রষ্টৃত্ব কিংবা বৃত্তি-সারূপ্য, এ সকল কিছুতেই সম্ভব হইত না। স্বয়ং সূত্রকারও দ্রষ্টাকে

পরে, চিতিশক্তি বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাহা শক্তি, তাহারই বৃত্তিরূপে বিকাশ হওয়া সম্ভব, সেই জন্যই দেবীমাহাত্ম্যেও উক্ত হইয়াছে—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।" এস বৃত্তি রূপিণী মা আমার, এস আত্মা আমার, প্রিয়তম সুহৃদ্ আমার, তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া নিজেকে পবিত্র করি।

এইখানে যোগদর্শনের চতুঃসূত্রী সমাপ্ত হইল। যোগ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার, তাহার প্রায় সকলই সংক্ষেপে এই চারিটী সূত্রে বলা হইল। প্রথমসূত্রে যোগদর্শনের আরম্ভ অধিকার-নির্ণয় প্রভৃতি বলিয়া দ্বিতীয়সূত্রে চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগের তটস্থ লক্ষণ ব্যক্ত করিলেন। চিত্তবৃত্তি ও জগদ্ব্যাপার একই কথা। যাঁহার লাভ হইলে জগদ্ব্যাপার নিরুদ্ধ হইয়া যায়, এবং যাঁহাকে না পাওয়ার জন্য এই জগদ্ব্যাপার প্রকাশিত হয়, তাঁহারই নাম যোগ। তৃতীয়সূত্রে যোগের স্বরূপলক্ষণ ভঙ্গিক্রমে বলা হইয়াছে। যাহা বাক্যও মনের অতীত বস্তু, তাহাকে লক্ষ্যার্থ বোধক শব্দ দ্বারাই প্রকাশ করিতে হয়। "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" এই সূত্রস্থ "স্ব" শব্দটীর দ্বারাই বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহা "স্ব" অর্থাৎ আত্মা বা ব্রহ্ম, তাহাই যোগ। যোগ বলিতে স্ব ব্যতীত অন্য কিছুই বুঝাইতে পারে না। বৃত্তিনিরোধ সমাধি প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াও যোগ শব্দের গৌণ প্রয়োগ হয়। চতুর্থসূত্রে জগদ্ব্যাপারের অর্থাৎ দৃশ্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া বৃত্তিসারূপ্যের কথা বলিয়া যাবতীয় সংশয়ের নিরাকরণ করিলেন। দর্শনশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে এই চতুঃসূত্রীর মধ্যে অনুশাসনাধিকরণ, বৃত্তিনিরোধাধিকরণ, স্বরূপাধিকরণ এবং বৃত্তিসারূপ্যাধিকরণ রূপ চারিটী অধিকরণও নির্ণয় করা যাইতে পারে। এ স্থলে আমরা সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ করিতে যাইব না। পরমত-খণ্ডন পূর্ব্বক স্বমতপ্রতিষ্ঠা করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। ঋষিপ্রণীত সূত্র হইতে যে সত্যের উপলব্ধি হয়, যাহা অন্যান্য দর্শনের বিরুদ্ধ নহে, এরূপ যুক্তি-

যুক্ত অর্থ নির্ণয় পূর্ব্বক পুরুষার্থ লাভের পথে অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টা করাই যোগরহস্য প্রণয়নের উদ্দেশ্য। আশাকরি সাধকগণ শুধু বাচনিক জ্ঞানরূপ পাণ্ডিত্যলাভ করিবার জন্যই এ শাস্ত্রের চর্চ্চা করিবেন না। নিজের জীবনকে উন্নত করিবার জন্য যোগী হইবার জন্যই ধীরভাবে এই শাস্ত্রে প্রবেশ করিবেন।

"অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্‌গূঢ়নির্ণয়ম্" এই কথাগুলি এই পাতঞ্জল যোগসূত্রের পক্ষে সর্ব্বথা প্রযোজ্য হইতে পারে। অতি অল্পকথায় নিঃসংশয়রূপে প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিপাদনে এবং সারবান্ বাক্যে অনেক গূঢ় তত্ত্বের নির্দ্দেশ করায় ইহা সর্ব্বথা অনবলাপ্য হইয়া আর্ষদৃষ্টির মহত্বই কীর্ত্তন করিতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যকারগণ এবং ব্যাখ্যাকারগণ এই সূত্রসমূহের যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এ গ্রন্থে তদপেক্ষা অভিনব পন্থায় ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সহৃদয় শ্রদ্ধাবান্ সাধকগণই এ বিষয়ে প্রমাণ হইবেন।

ইতি যোগরহস্য ব্যাখ্যায় চতুঃসূত্রী সমাপ্ত।

वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाऽक्लिष्टाः ॥५॥

वृत्तीर्विभजते निरोद्धव्या वृत्तय इति । वृत्तयः अनाद्यास्वाऽसंख्याता अपि पञ्चतय्यः पञ्चधा विभज्यमाना दृश्यन्ते । ताः पुनः क्लिष्टाश्चा-क्लिष्टा इति द्विधा । यावदेता विजातीय-भेदभावापन्नाः समुत्तिष्ठन्ति ऽविदुषां तावद्रजोबाहुल्यात् क्लेशदायकत्वात् क्लेशमूलकत्वाच्च क्लिष्टाः । यदा पुनः स्मृतियुक्तानुभवसम्पन्नानामेताः स्वगतभेदमात्रावगाहिन्यः प्रकाशन्ते, तदा सत्त्वबाहुल्यादानन्दमयात्मविलासरूपत्वाद् योग-हेतुकत्वाच्चाक्लिष्टाः । आसुरी दैवी चेति संज्ञाभेदः ।

যোগের যাহা অনুশাসন, যোগ সম্বন্ধে যাহা বিশেষ শিক্ষণীয়, তাহা অতি সংক্ষেপে অথচ অতি স্পষ্ট ভাষায় পূর্ব্বোক্ত চারিটি সূত্রে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই পঞ্চম সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রন্থ সমাপ্তি পর্য্যন্ত যাহা কিছু বর্ণিত হইবে, তাহা উক্ত চতুঃ-

সূত্রটীরই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মাত্র। ইতিপূর্ব্বে দ্বিতীয় সূত্রে বৃত্তিনিরোধকে যোগের তটস্থ লক্ষণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, নিরোদ্ধব্য সেই বৃত্তিসমূহ কত প্রকার, অর্থাৎ বৃত্তিসারূপ্য প্রাপ্ত দ্রষ্টার কত প্রকার ভেদ পরিলক্ষিত হয়, তাহাই পঞ্চম সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। ঋষি বলিলেন—বৃত্তি সমূহ পঞ্চতয়ী অর্থাৎ পাঁচ প্রকারে বিভক্ত ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট।

বৃত্তিসমূহ অনাদি এবং অসংখ্য হইলেও উহাদিগকে ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট ভেদে দুই প্রকারে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। এই দ্বিধাবিভক্ত বৃত্তিসমূহের পুনরায় পাঁচ প্রকার ভেদ পরিলক্ষিত হয়। উক্ত পঞ্চবিধ ভেদ কি কি, তাহা পরসূত্রে পাওয়া যাইবে। এস্থলে আমরা ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট বৃত্তি বুঝিতে চেষ্টা করিব। মানুষ যতদিন অজ্ঞান থাকে, অর্থাৎ বৃত্তি গুলি যে দ্রষ্টারই সারূপ্যমাত্র ইহা বুঝিতে না পারে, ততদিন তাহার নিকট বৃত্তিসমূহ বিজাতীয় ভেদভাবাপন্ন হইয়াই প্রকাশিত হইতে থাকে। এই অবস্থায় ঐগুলিকে লাভ বা ত্যাগ করিবার জন্য মানুষ মাত্রেরই একটা স্বাভাবিক প্রয়াস থাকে। বৃত্তিগুলির প্রতি অনুরাগ বা বিদ্বেষ থাকে বলিয়াই ঐরূপ ত্যাগ বা গ্রহণের প্রয়াস হইয়া থাকে। যতদিন বৃত্তিগুলিকে মানুষ অনাত্মবোধে দেখিবে, ততদিন উহাদের প্রতি রাগদ্বেষ-মূলক হেয়োপাদেয়তা বুদ্ধি থাকিবেই। ইহা রজোগুণের কার্য্য, সুতরাং ক্লেশদায়ক। আবার অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ উহাদের মূলে থাকে বলিয়া উহারা ক্লেশমূলকও বটে, তাই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৃত্তিসমূহ ক্লিষ্টরূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আবার যখন কাহারও গুরুকৃপায় জ্ঞানের আলোক লাভ হয় অর্থাৎ দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্যটী বেশ স্পষ্টভাবে অনুভব করিবার সামর্থ্য লাভ হয়, তখন বৃত্তিসমূহ তাহার নিকট স্বগতভেদ লইয়াই প্রকাশিত হইতে থাকে। "একমাত্র আত্মাই বহুরূপে বৃত্তিরূপে প্রকাশিত হইতেছেন," এইরূপ অনুভব তখন তাহার পুনঃ পুনঃ

উদিত হইতে থাকে, সুতরাং রাগদ্বেষমূলক ত্যাগ ও গ্রহণ একেবারেই বিদূরিত হইয়া যায়। এই অবস্থায় বৃত্তিগুলি আনন্দময় আত্মার বিলাসরূপেই পরিলক্ষিত হইতে থাকে। ইহা সত্ত্বগুণের কার্য্য এবং যোগের অতি সন্নিহিত অবস্থা। অতএব এই স্তরে উঠিয়া সাধকগণ বৃত্তিসমূহকে অক্লিষ্টরূপেই অনুভব করিয়া থাকেন। সম্প্রজ্ঞাত যোগারূঢ় হইলেই এই অক্লিষ্টা বৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। এস্থলে যাহা ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট বৃত্তি নামে অভিহিত হইল, অন্যত্র তাহাই আসুরী ও দৈবী নামেও কথিত হইয়া থাকে।

সাধক, যদি তুমি পুনঃ পুনঃ ক্লিষ্ট বৃত্তিসমূহের উদয়ে মর্ম্ম-পীড়িত হইয়া থাক, যদি ঐ ক্লেশদায়ক আসুরী বৃত্তিসমূহের হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য লালায়িত হইয়া থাক, তবে অক্লিষ্টাবৃত্তির সন্ধান কর। তোমার অন্তরে সঙ্কল্প-বিকল্প-আকারে এবং বাহিরে বিষয়ের আকারে যাহা কিছু প্রকাশ পায়, সে সকলই চিত্তবৃত্তি মাত্র, ঐগুলি যে দ্রষ্টারই সারূপ্যমাত্র, তোমার প্রিয়তম আত্মারই আনন্দময় লীলাবিলাসমাত্র, তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। যিনি তোমার গুরু, যিনি তোমার আত্মা, যিনি তোমার ইষ্টদেব, তিনিই যে বৃত্তির সাজ লইয়া ছদ্মবেশে আসিয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন, ইহা বারংবার অনুভব করিতে চেষ্টা কর। তুমি ঋষিবাক্যে গুরু-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এই সত্যপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হও, নিশ্চয়ই তুমি অক্লিষ্টবৃত্তির সন্ধান পাইয়া এই দুঃখবহুল সংসারকে আনন্দময়রূপেই দর্শন করিতে পারিবে।

প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রাস্মৃতয়ঃ ॥৬॥

পঞ্চভেদান্ দর্শয়তি প্রমাণেতি। চিন্মাত্রোঽয়ং সর্ব্বভাব মহেশ্বরঃ স্বরূপস্থিতেরন্যমাত্মানং বহুধেব কুরুতে। তথাপি শ্রেণীবিভাগেনাস্য প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রাস্মৃতিরূপাঃ পঞ্চ প্রকারা উপলভ্যন্তে।

ते पुनर्ज्ञानेन्द्रियपञ्चकद्वारेण पञ्चधा भेदमापद्यन्त इति सुष्ठूक्तं वृत्तयः पञ्चतय्य इति। अतएव च पञ्चवक्त्रं महेशं ध्यायन्ति योगिनः ॥६॥

ষষ্ঠসূত্রে বৃত্তির সেই পঞ্চবিধ ভেদ কি, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বোধস্বরূপ দ্রষ্টা, যিনি সর্ব্বভাবের বহুভাবের একমাত্র অধীশ্বর, তিনি যখন স্ব স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তিনি এক অদ্বিতীয়, আর যখন বৃত্তিসারূপ্যের মতন হন, তখন তিনি যে কত বহু-ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন, তাহা নির্ণয়যোগ্য নহে। এ জগতে দুইটী বালুকা কণাও একরূপ নহে, এতই বহুত্ব এবং এতই বহুত্বের অনন্ততা ও অনির্ণেয়তা। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত বহুত্বের মধ্যেও প্রত্যেক পদার্থই কিন্তু অদ্বিতীয়। তিনি স্বয়ং এক অদ্বিতীয়, তাই তাঁহার এই অচিন্তনীয় বহুত্বের প্রত্যেকটীও এক অদ্বিতীয়। এই অনিরূপণীয় বহুত্বকে ঋষি পঞ্চবিধ শ্রেণী বিভাগ করিয়া আমাদের বুঝিবার পথ অতিশয় সুগম করিয়া দিয়াছেন। এই পাঁচটী বিভাগ যথা, প্রমাণ বিপর্য্যয় বিকল্প নিদ্রা এবং স্মৃতি। ইহাদের লক্ষণ পরবর্ত্তী পাঁচটী সূত্রে ব্যাখ্যাত হইবে।

জ্ঞানময় দ্রষ্টা যতই বহুরূপ ধারণ করুন না কেন, উহা উক্ত প্রমাণাদি পঞ্চবৃত্তিরই অন্তর্নিবিষ্ট হইবে। ঐ পঞ্চবৃত্তি আবার চক্ষু-রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পথে প্রকাশ পায় বলিয়া প্রত্যেকেই পঞ্চ-বিধ ভেদবিশিষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং বৃত্তিসমূহকে যেদিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, উহারা পাঁচ প্রকারই হইয়া থাকে। বিজ্ঞানময় মহেশ্বরের উহাই পঞ্চ মুখ। এই জন্যই যোগিগণ পঞ্চ-বক্ত্র মহেশ্বরের ধ্যান করিয়া থাকেন।

সাধক তুমিও যখন "বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্" বলিয়া ধ্যান করিবে, তখন দেখিতে চেষ্টা করিও যিনি তোমার মধ্যে আমি নামে পরিচয় দিতেছেন, তিনিই প্রমাণাদি পঞ্চ-বৃত্তিরূপে চক্ষুরাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়পথে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছেন। এই সর্ব্বভাব-মহেশ্বরকে এই বিশ্বের কারণস্বরূপকে এই

সর্ব্বভয়হারী মঙ্গলময় শিবরূপ দ্রষ্টাকেই বারংবার দেখিতে চেষ্টা করিও। চিত্তচাঞ্চল্য তোমায় বারবার বাধা দিবে তাহা জানি, তুমি সেদিকে লক্ষ্য করিও না। ঐ চাঞ্চল্যের মধ্যদিয়াই বার বার তাঁহাকে দেখিও, প্রণাম করিও। কাতর প্রাণে বলিও— ওগো প্রিয়তম পরমাত্মা আমার, তুমি স্থিরভাবে প্রকাশিত হও, আমাকে তোমার সহিত একেবারে মিলাইয়া লও, আমাকে যোগী কর। সরল প্রাণে এইরূপ কাঁদিতে পারিলেই তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।

प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥৩॥

प्रमाणवृत्तिं निरूपयति प्रत्यक्षेति। ज्ञानस्वरूपो द्रष्टा यदा प्रमाणरूपेण निश्चयज्ञानरूपेणात्मानं प्रकाशयति, तदा स प्रमाण-वृत्तिरित्याख्यायते। बुद्धिरिति लोकप्रसिद्धं नाम प्रमाणस्य, प्रत्यक्षा-दयस्त्रयस्तस्य द्रष्टुः प्रमाणरूपेणाविर्भावहेतवः। तत्र प्रत्यक्षं ताव-दक्षाणामविकलकरणानां विषयसन्निकर्षजन्यम्। अनुमानं प्रत्यक्षलिङ्गे-नाप्रत्यक्षलिङ्गिनिश्चयः। आगमो नामाप्तवचनमिति नयनत्रयं प्रमाण-पुरुषस्य।

সপ্তমসূত্রে প্রমাণবৃত্তির নিরূপণ করা হইতেছে। ঋষি বলিলেন— "প্রত্যক্ষ অনুমান এবং আগম, ইহারাই প্রমাণ।" প্রমাণ শব্দের অর্থ নিশ্চয় জ্ঞান। বোধস্বরূপ আত্মা যখন নিশ্চয় জ্ঞানবৃত্তিরূপে প্রকাশিত হন, তখন তাহার নাম হয় প্রমাণ। প্রত্যক্ষ অনুমান এবং আগম এই তিনটীই দ্রষ্টার প্রমাণরূপে আবির্ভাবের হেতু।

প্রত্যক্ষ—অক্ষশব্দের অর্থ করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। অবিকল করণ সমূহের সহিত রূপরসাদি বিষয়গুলির সন্নিকর্ষ হইলে যে নিশ্চয় জ্ঞান

প্রকাশ পায়, তাহাকেই প্রত্যক্ষ নামক প্রমাণবৃত্তি বলা হয়। স্থূল কথা এই যে--বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলেই নিশ্চয় জ্ঞানরূপে অর্থাৎ প্রমাণবৃত্তিরূপে দ্রষ্টাপুরুষের আবির্ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

অনুমান—কোনও প্রত্যক্ষলিঙ্গদ্বারা অর্থাৎ হেতুদ্বারা যখন কোন অপ্রত্যক্ষ লিঙ্গীর অর্থাৎ হেতুমান্ পদার্থের নিশ্চয় হয়, তখন তাহার নাম হয় অনুমান। ধূম বহ্নি পরিচায়ক প্রত্যক্ষ লিঙ্গ, ইহা দ্বারা পর্ব্বতস্থিত অপ্রত্যক্ষ লিঙ্গী বহ্নির নিশ্চয়জ্ঞান হইয়া থাকে। এইরূপ সাধু অনুমানও প্রমাণবৃত্তি নামে কথিত হয়।

আগম—ভ্রম প্রমাদ শূন্য আপ্তকাম ঋষিদিগের যে বাক্য, তাহা দ্বারাও নিশ্চয়জ্ঞান-বৃত্তিরূপে দ্রষ্টাপুরুষের আবির্ভাব হয়; সুতরাং ইহাও প্রমাণ বৃত্তি। "আগতং শিব বক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজাননে। মতং যদ্ বাসুদেবস্য স আগমঃ প্রকীর্ত্তিতঃ"॥ অর্থাৎ যাহা জ্ঞানময় মহেশ্বরের মুখ হইতে আগত, শক্তিরূপিণী গিরিজাকর্তৃক পরিগৃহীত, এবং যাহা জগদ্ব্যাপক বাসুদেবের অভিমত, তাহাকে আগম বলে, এইরূপ একটা প্রবাদবাক্যও দেশে প্রচলিত আছে। আগমের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ঐরূপ বাক্যের প্রচলন ও প্রয়োজন। সে যাহা হউক, যাহারা বৈদিক আর্য্যপ্রতিভাসম্পন্ন মানুষ, বেদবাক্য বা ঋষিবাক্য শ্রবণ মাত্র তাহাদের শ্রুতবিষয়ে নিশ্চয়জ্ঞান উপস্থিত হয়। যথা, ঈশ্বর আছেন, পরলোক আছে, মুক্তি আছে, ইত্যাদি বাক্যদ্বারা আস্তিক্যবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের তদ্‌বিষয়ক নিশ্চয় জ্ঞান প্রকাশ পায়। সুতরাং আগমও প্রমাণ বৃত্তির অন্তর্গত।

প্রমাণ শব্দের অর্থ বুদ্ধি। প্রচলিত ভাষায় যাহা বুদ্ধি নামে পরিচিত, প্রমাণ বলিতে ঠিক তাহাই বুঝায়। সর্ব্বভাবাতীত বোধ-মাত্র স্বরূপ দ্রষ্টা এই প্রমাণরূপে বা বুদ্ধিবৃত্তিরূপে সকলের নিকটই সর্ব্বদা প্রকাশিত হইতেছেন। কিন্তু হায়! প্রায় সকলেই ইহাকে জড়-বুদ্ধি মনে করিয়া উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। প্রিয় সাধক,

তুমি দেখিও—ঐ প্রমাণরূপে বুদ্ধিরূপে নিশ্চয়জ্ঞান-রূপে তিনিই—তোমার ইষ্টদেবতাই প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছেন। প্রত্যক্ষ অনুমান এবং আগমরূপ নয়নত্রয় লইয়া সর্ব্বভূত মহেশ্বর জ্ঞানময় দেবতাই তোমার নিকটে সতত আবির্ভূত হইতেছেন। উহাঁকে অবজ্ঞা করিও না। প্রমাণমাত্র বলিয়া উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিও না, উহাঁকেই গুরু বলিয়া, আত্মা বলিয়া, ইষ্ট বলিয়া প্রণাম কর, উহাঁরই কৃপায়—ঐ প্রমাণ পুরুষেরই কৃপায় তুমি অপ্রমেয় আত্মস্বরূপে উপনীত হইতে পারিবে, উনিই তোমাকে স্নেহময়ী জননীরূপে বুকে করিয়া প্রমাণাতীত ক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া দিবেন। প্রমাণাদি বৃত্তিগুলিকে নিরুদ্ধ করিতে গিয়া কতই কঠোর প্রয়াস করিয়াছ,·কিন্তু যোগলাভ করিতে পার নাই, বিফল মনোরথ হইয়াছ। এইবার বুঝিতে পারিলে—ঐ যে প্রমাণ বৃত্তি, উনি আর কেহ নহেন, তোমারই ইষ্টদেব। বৃত্তি-সারূপ্য লইয়া অর্থাৎ প্রমাণ বৃত্তির সাজ পরিয়া তিনিই তোমার নিকট আবির্ভূত হইতেছেন। উহাঁর দিকে তাকাও, উহাঁকে আদর কর, কিছুদিন পরে দেখিতে পাইবে—বৃত্তির সাজ অন্তর্হিত হইয়াছে; তোমার ইষ্টদেব সতত স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। সাধক, যদি তুমি যথার্থ যোগী হইতে চাও, তবে এই দিক দিয়াই যোগ বুঝিবার চেষ্টা করিও। বৃত্তিরূপে অভিব্যক্তি কালেও দ্রষ্টাকেই দেখিতে চেষ্টা করিও, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে—তুমি কোন অবস্থায়ই যোগ হইতে বিচ্যুত হও নাই।

विपर्य्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् ॥ ८॥

प्रमाणं निरूप्य विपर्य्ययं दर्शयति विपर्य्यय इति। विपर्य्ययो मिथ्याज्ञानं, तद्धि शशविषाणादिवदस्तु, नेत्याह अतद्रूप-प्रतिष्ठम्। तद्रूपेण प्रतिष्ठां न गच्छतीत्यतद्रूपप्रतिष्ठं परिणाम-बाधयोग्य-

मनिर्व्वचनीय-प्रत्यक्षम्। भूतार्थविषयकप्रमाण-बाध्यत्वान्नास्य प्रमाण-त्वम्। भ्रान्तिरिति चास्य ख्यातिरिति द्वितीयः प्रकाशः पुरुषस्य ॥

অষ্টম সূত্রে বিপর্য্যয় বৃত্তি নিরূপণ করা হইয়াছে—বিপর্য্যয়বৃত্তি কি? মিথ্যা জ্ঞান। তবে কি শশবিষাণ বা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় মিথ্যা? না তাহা নহে, তবে কি—অতদ্রূপ প্রতিষ্ঠা। তদ্রূপে অর্থাৎ যাহা যে রূপে প্রথম প্রতীতিগোচর হয়, শেষ পর্য্যন্ত সেইরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে না—বাধিত হইয়া যায়। বস্তুর যথার্থ স্বরূপজ্ঞানের পূর্ব্বে কোন কারণে বস্তুটী অন্যথারূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে, তারপর যখন স্বরূপের জ্ঞান হয়, তখন পূর্ব্বলব্ধ অন্যথাজ্ঞান বাধিত হইয়া যায়, ইহাই মিথ্যাজ্ঞানরূপ বিপর্য্যয় নামক বৃত্তি। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি শুক্তিকাতে রজতভ্রান্তি প্রভৃতি বিপর্য্যয়বৃত্তির দৃষ্টান্তস্থল। বিপর্য্যয়বৃত্তি যদিও স্মৃতির রূপের মতনই রূপ ধারণ করে, তথাপি ইহাকে ঠিক স্মৃতি বলা যায় না, যেহেতু এইরূপ স্থলে বস্তুর প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে। আপত্তি হইতে পারে, যে স্থলে যথার্থ বস্তু উপস্থিত নাই, সে স্থলে প্রত্যক্ষ কিরূপে হইবে? হ্যাঁ এ আপত্তি করিতে পারা যায় বটে; কিন্তু ভ্রমস্থলেও প্রত্যক্ষ যে হইয়া থাকে, ইহা খুবই সত্য। রজ্জুতে যখন সর্প ভ্রান্তি হয়, তখন সর্পের প্রত্যক্ষই হয়, অন্যথা ভয় হৃৎকম্প পলায়নাদি হয় কিরূপে? সর্পের স্মৃতি কখনও ঐ সকল জন্মাইতে পারে না। এই জন্য বলিতে হয়—ভ্রান্তি স্থলে অর্থাৎ বিপর্য্যয়বৃত্তিস্থলে অনির্ব্বচনীয় রূপে পদার্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে; সুতরাং এই প্রত্যক্ষও অনির্ব্বচনীয়। এস্থলে ইহাই বিশেষ জ্ঞাতব্য যে, দ্রষ্টার যে বৃত্তি সারূপ্য বলা হইয়াছে তাহাও অবিদ্যাজনিত অর্থাৎ স্বরূপের অজ্ঞানজনিত এক প্রকার অনির্ব্বচনীয়-সৃষ্টি বা বিপর্য্যয়বৃত্তিমাত্রই। মনে রাখিতে হইবে সাধক, যে স্থলে তোমার ইষ্টদেব বিপর্য্যয়বৃত্তিরূপে

আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই স্থলেই তিনি অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টির হেতু হইয়া থাকেন। অনির্ব্বচনীয় রূপেই দ্রষ্টা পুরুষের দৃশ্যরূপতা হইয়া থাকে। আপাততঃ যাহা বৃত্তিরূপে প্রকাশিত হয়, স্বরূপ নির্ণয় হইলে আর সেই বৃত্তিসারূপ্য থাকে না। একমাত্র দ্রষ্টাই যে দৃশ্য আকারে প্রতীতি গোচর হইয়া থাকেন, ইহা স্বপ্নের দৃষ্টান্ত দ্বারাও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। এই বিপর্য্যয়বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়াই আত্মা বা ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ হইয়া থাকেন। এক কথায় বলিতে গেলে—পরিণাম-বাধযোগ্য অনির্ব্বচনীয় প্রত্যক্ষকেই বিপর্য্যয় নামক বৃত্তি বলা যায়।

———

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ॥৯॥

অথ বিকল্পরূপস্তৃতীয়ঃ প্রকারঃ কথ্যতে শব্দেতি। শব্দজ্ঞান-মনুপততীতি শব্দজ্ঞানানুপাতী, অথচ পরমার্থতস্তাদৃশ-বস্তুশূন্যো যোঽস্ফুটবোধবিশেষঃ স বিকল্পঃ। বিবিধঃ কল্পো বিকল্পস্তদাখ্য-বৃত্তিবিশেষ ইত্যর্থঃ। তদ্যথা রাহোঃ শিরশ্চৈতন্যং পুরুষস্য স্বরূপ-মিত্যাদি। বস্তুশূন্যত্বেঽপি বিকল্পো ব্যবহারহেতুতাং সমায়াতি। বিপর্য্যয়ো বিশিষ্টে ধর্ম্মিণি ধর্ম্মান্তরবিশিষ্টস্য তাদাত্ম্যাবভাসঃ; বিকল্পে তু পদজন্যপ্রতিপত্তিবিষয়তামাত্রং নতু বস্তুনঃ সত্ত্বেত্যনয়োর্ভেদঃ।

———

বৃত্তিসারূপ্যপ্রাপ্ত আত্মার আর এক প্রকার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়, তাহা বিকল্প নামে অভিহিত। নবম সূত্রে এই বিকল্প বৃত্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্য বিকল্প। যে স্থলে শব্দমাত্রকে অবলম্বন করিয়া একপ্রকার অস্ফুট জ্ঞানের প্রকাশ হয়, অথচ সেই শব্দ জন্য কোন বস্তুর নিশ্চয়তা হয়

না, সেই স্থলেই উহা বিকল্প নামক বৃত্তি নামে অভিহিত হয়। যথা রাহুর শির, চৈতন্যই পুরুষের স্বরূপ। এইরূপ বাক্যজন্য একটা অস্ফুট জ্ঞান হয় বটে, অথচ কিন্তু শির হইতে অতিরিক্ত রাহু বা চৈতন্যাতিরিক্ত পুরুষ নামক কোন বস্তু নাই। এইরূপ অনন্ত অসীম প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ করিলেও তাদৃশ কোন বস্তুর পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও ঐরূপ শব্দজন্য "অন্তের অর্থাৎ সীমার অভাব রূপ" একটা অস্ফুট জ্ঞান প্রকাশ পায়। এইরূপ জ্ঞানকেই বিকল্পবৃত্তি বলা যায়। স্থূল কথা এই যে, বিকল্প হইলে পরমার্থতঃ কোন বস্তু না থাকা সত্ত্বেও শব্দ জন্য এক প্রকার অস্ফুট জ্ঞানের উদয় হইয়া ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এই বিকল্প জ্ঞানই অধিক। অনেক সময়ই বস্তুসম্বন্ধীয় কোন বিশেষ-জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও, কেবল শব্দ প্রয়োগজন্য জ্ঞানের আভাসমাত্র লইয়া অথবা অসম্যক্ জ্ঞান লইয়াই এ জগতে ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বিকল্পের সহিত পূর্ব্বোক্ত বিপর্য্যয়ের প্রভেদ এই যে, বিপর্য্যয়স্থলে কোন বিশিষ্ট-ধর্ম্মীতে ধর্ম্মান্তর বিশিষ্টের তাদাত্ম্য অবভাসিত হয়। আর বিকল্পস্থলে শব্দজন্য বোধবিষয়তামাত্রই থাকে; কিন্তু বস্তুর সত্তা থাকে না।

শোন সাধক, জ্ঞান বলিলেই একটা জড়ীয় তত্ত্ববিশেষ মনে পড়িয়া যায়, এই যে ভুল ধারণা, ইহা ত্যাগ করিতে হইবে, নচেৎ দর্শন শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিবার সামর্থ্য হইবে না। জ্ঞান—একজন, ইঁহার ব্যক্তিত্ব আছে, ইনি সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত হইয়াও সর্ব্বেন্দ্রিয়-ধর্ম্ম-সমন্বিত। ইঁহাকে জ্ঞান, বোধ, অনুভব প্রভৃতি না বলিয়া দ্রষ্টা, পুরুষ, আত্মা, গুরু, ইষ্টদেব প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করাই উচিত। জ্ঞান যে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ নিগ্রহানুগ্রহক্ষম পরমেশ্বর, মানুষ এই বুদ্ধি-হইতে বিচ্যুত হইয়া যখন জ্ঞানের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন জ্ঞান লাভ করা ত দূরের কথা, আরও অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। জ্ঞানই যে মানুষের যথার্থ ইষ্ট বস্তু, জ্ঞান ব্যতীত অপর

কিছুই যে মানুষের বাঞ্ছনীয় নহে, হইতে পারে না, এই কথাটী ভুলিয়াই মানুষ অজ্ঞানের গভীর-অন্ধকারে নিপতিত হয়। বিশ্বময় যে অভাবের দারুণ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাওয়া যায়, উহা যে বাস্তবিক জ্ঞানেরই অভাব-জনিত চীৎকার, ইহা অতি অল্প লোকেই ধারণা করিতে পারে। কেহ বলে—ধনের অভাব, কেহ বলে—সুখের অভাব, কেহ বলে—স্বাস্থ্যের অভাব, কেহ বলে—অন্ন বস্ত্রের অভাব, কেহ বলে—ধর্ম্মের অভাব, কেহ বলে—শান্তির অভাব, এই সকল অভাবই যে একমাত্র জ্ঞানের অভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা বুঝিতে পারিয়া মানুষ যখন অন্তর বাহির ব্যাপী পরিপূর্ণ জ্ঞানময় সত্তার দিকে—বিজ্ঞানময় মহেশ্বরের দিকে দৃষ্টি ফিরায়, তখন বুঝিতে পারে—অভাবগুলি বাহিরের কোন বস্তুর সহিত সম্বন্ধ নহে, একমাত্র জ্ঞানের অভাবই মানুষকে সকল অভাবের যাতনায় মর্ম্ম পীড়িত করে। তাই বলিতেছিলাম—কি অন্তরে কি বাহিরে সকলই যে জ্ঞানময় গুরুর অভিব্যক্তি, ইহা বুঝিয়া লইলে মানুষ চিরতরে অভাবের যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। বৃত্তিরূপে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা যে জ্ঞানময় ইষ্টদেবেরই বিশেষ বিশেষ আকারীয় বিদ্যমানতা, ইহা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিলেই বৃত্তি জিনিষটা বুঝিতে পারা যায়; সুতরাং অভাবের আর্ত্তনাদও থামিয়া যায়, কিন্তু সে অন্য কথা।

অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা ॥ ১০ ॥

ক্রমপ্রাপ্তাং নিদ্রাং নির্দ্দিশতি অভাবেতি। অভাবপ্রত্যয়ং জাগ্রৎস্বপ্নাভাববিষয়কং প্রত্যয়মালম্বনং আশ্রয়ো যস্যা ইত্যভাবপ্রত্যয়ালম্বনা, তাদৃশী যা বৃত্তিঃ সা নিদ্রা সুষুপ্তিঃ। স এব পুরুষঃ "সুষুপ্তিকালে

সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি”। তন্ত্রেষু—যা দেবী সর্ব্ব-ভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতেতি। মূর্চ্ছাদিষ্বপি নিদ্রান্তর্ভাবঃ।

———

মহর্ষি পতঞ্জলি দেব অনন্তর ক্রমপ্রাপ্ত চতুর্থী বৃত্তি নিদ্রার বিষয় নির্দ্দেশ করিতেছেন—অভাব প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির নাম নিদ্রা। নিদ্রা সুষুপ্তি, স্বপ্ন নহে। স্বপ্নাবস্থায় যে বৃত্তি সমূহ প্রকাশ পায়, তাহা পরিণাম বাধযোগ্য অনির্ব্বচনীয় প্রত্যক্ষরূপ বিপর্য্যয় বৃত্তিরই অন্তর্গত। সুষুপ্তিকালে অন্য কোন রূপ জ্ঞানই থাকে না বটে, কিন্তু অভাববিষয়ক জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। এই অভাববিষয়ক প্রত্যয়কে অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়া যে বৃত্তির প্রকাশ হয়, তাহারই নাম অভাবপ্রত্যয়াবলম্বনা নিদ্রা। অনেকে মনে করেন—সুষুপ্তি কালে “আমি আছি” এইরূপ আত্মসত্তা বিষয়ক জ্ঞানও থাকে না, বাস্তবিক তাহা নহে। নিদ্রার অবসানে আমরা অনুভব করিয়া থাকি “আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম কিছুই ত জানিতে পারি নাই” এই যে অনুভব, ইহা স্মৃতি-রূপ। সুষুপ্তি কালের অবস্থা স্মরণ করিয়াই ঐরূপ বলি বা অনুভব করি। পূর্ব্বে যাহার অনুভব হয় নাই, তাহার স্মৃতি হইতে পারে না। স্মৃতি কি তাহা পরসূত্রে ব্যাখ্যাত হইবে। সে যাহা হউক, সুষুপ্তি কালেও বৃত্তির বিদ্যমানতা থাকে, তবে জাগ্রত কালে বা স্বপ্ন কালে বৃত্তি নানা বিষয়ক হয়, আর সুষুপ্তি কালে জ্ঞানাভাব-বিষয়ক বা সর্ব্বাভাব-বিষয়ক জ্ঞানবৃত্তি চলিতে থাকে। আরে “আমি কিছু জানি না” এই যে অনুভব ইহা ও ত জ্ঞানই। অজ্ঞানকে জানি বলিয়াই ত অজ্ঞান থাকে। মূর্চ্ছাদি স্থলেও ঐরূপ অজ্ঞান-বিষয়ক অর্থাৎ সর্ব্বাভাববিষয়ক জ্ঞানবৃত্তি চলিতে থাকে। উপনিষদ্ বলেন—“সুষুপ্তি কালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি” সুষুপ্তি কালে অন্যান্য যাবতীয় বৃত্তি বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, জ্ঞানময় পুরুষ

তখন তমোদ্বারা অভিভূত হইয়া অর্থাৎ অজ্ঞানমাত্র বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া সুখ রূপ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ নানাবিধ বৃত্তির আবির্ভাব তিরোভাব জন্য চঞ্চলতার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

দেখ সাধক, ঐ যে নিদ্রাবৃত্তি উহাকে বৃত্তিমাত্র বলিয়াই উপেক্ষা করিও না, বিজাতীয়ভেদ-দৃষ্টিতে দেখিও না, উনি তোমারই চিতি-শক্তিরূপিণী জননী, উনিই স্নেহময়ী মা, উনিই আত্মা, উনিই দ্রষ্টা পুরুষ। জাগরণ কালে বিষয় সমূহের প্রতিনিয়ত ঘাত প্রতিঘাতে যখন মন ও ইন্দ্রিয় সমূহ বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়ে, সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ রোগ শোক প্রভৃতির পীড়নে একান্ত বিব্রত হইয়া পড়ে, তখন ঐ যে নিদ্রারূপিণী স্নেহময়ী জননী স্বকীয় স্নেহ-শীতল বক্ষে আমাদিগকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া আদরচুম্বনে মুগ্ধ করিয়া আত্মহারা করিয়া রাখেন। তখন আমাদের সকল শ্রান্তি সকল অবসাদ বিদূরিত হইয়া যায়। আবার যখন তাঁহার নিবিড় স্নেহালিঙ্গন ছাড়িয়া আমরা বাহিরে চলিয়া আসি, তখন দেখিতে পাই—যেন নূতন শক্তি নূতন উদ্যম ফিরিয়া পাইয়াছি, ঐ যে মা, ঐ যে দ্রষ্টার অভাব-প্রত্যয়ালম্বনাবৃত্তি, উনি স্নেহময়ী জননী। এস, উঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ"॥ এইরূপ কেবল দৈনন্দিন নিদ্রায় নহে, যখন মহানিদ্রা উপস্থিত হয়, যখন মরণের কোলে জীব ঢলিয়া পড়ে, তখনও যে জীব ঐ আদরিণী মায়েরই স্নেহ-শীতল বক্ষে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম লাভ করিতে যায়, এই কথাটা ভুলিয়া যায় বলিয়া জীব মৃত্যুভয়ে চির জীবন সঙ্কুচিত থাকে। তাই বলিতেছিলাম—সাধক, নিদ্রাকে নিদ্রা বৃত্তিমাত্র বলিয়া বুঝিও না, উহাকে চিতি শক্তিরূপিণী জননীরূপেই দেখিও। ঐ নিদ্রাই তোমাকে মহা জাগরণস্বরূপে দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানের সামর্থ্য প্রদান করিবে। কিন্তু সে অন্য কথা।

জীব জীবিতকালে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটী অবস্থা ভোগ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে জাগ্রত অবস্থাটী প্রমাণাদি বৃত্তির বিকাশস্থলরূপে প্রতিভাত হয়। স্বপ্নাবস্থায় পরিণাম বাধযোগ্য অনির্ব্বচনীয় প্রত্যক্ষরূপ বিপর্য্যয়-বৃত্তিমাত্রেরই বিকাশ হয়। আর সুষুপ্তি কালে যে অভাব-প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিরূপ নিদ্রাবৃত্তির আবির্ভাব হয়, তাহা মানুষমাত্রেই অনুভব করিয়া থাকে। আবার বলিয়া রাখি তত্ত্বতঃ কিন্তু সকল বৃত্তিই বিপর্য্যয়-বৃত্তির অন্তর্গত।

अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः॥ ११ ॥

अथ पञ्चमीं वृत्तिं निरूपयत्यनुभूतेति। अनुभूतविषयस्य पूर्व्वानुभूतप्रत्ययस्य योऽसम्प्रमोषोऽनपहरणमविलुप्तिरिति यावत्, सा स्मृतिः। स्तेयार्थकस्य सम्प्रपूर्व्वकस्य मुषधातोरूपमिदम्। पूर्व्वानुभूत-प्रत्ययसदृश-प्रत्ययोदय इत्यर्थः। तत्र परमा चरमा च स्मृति-र्ब्रह्मोद्भवविषयिणी ब्रह्माहमस्मीति। अवरास्तु ग्रहण-ग्राह्य-विषया-स्स्मृतय इति व्याख्याता द्रष्टुरेव वृत्तिस्वरूपताः पञ्च। सप्तवृत्ति-वादिनः संशयकल्पनाख्ये द्वे वृत्ती वदन्ति। यथायोग्यं प्रमाणादिषु षयेष्वन्तर्भावान्नात्र पृथगुक्तिः। प्रतिनियतं विचारणीयोऽयमावि-र्भावो जाग्रदाद्यवस्थात्रयेषु यथायोग्यमेतासां चितिशक्ति प्रवाहरूपाणां वृत्तीनामिति। ११।

একাদশসূত্রে পঞ্চমীবৃত্তি স্মৃতির স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—অনুভূত-বিষয়সমূহের অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূত প্রত্যয়সমূহের যে অসম্প্রমোষ, তাহাই স্মৃতি। অসম্প্রমোষ শব্দের অর্থ—অবিলুপ্তি,

অর্থাৎ বিলুপ্ত না হওয়া। মুষ্‌ ধাতুর অর্থ—অপহরণ। সম্—প্র—মুষ ধাতু হইতে সম্প্রমোষ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সম্যক্‌ প্রকারে অপহৃত হওয়ার নাম সম্প্রমোষ, তাহার যে বিপরীত ভাব, তাহাই অসম্প্রমোষ অর্থাৎ অপহৃত না হওয়া। এস্থলে ঐরূপ শব্দ প্রয়োগের একটু উদ্দেশ্য আছে,—প্রতিক্ষণেই আমাদের বিভিন্ন বিষয়ক প্রত্যয়সমূহ উদিত হয়, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা কে যেন অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। কোথায় যে সেই প্রত্যয়গুলি লুক্কায়িত থাকে, তাহা দেখিতে পাই না; কিন্তু প্রত্যয়গুলি যে যথাযথ ভাবে কোথাও বিদ্যমান আছে, তাহা নিঃসংশয়রূপেই অনুমান করিতে পারি। কোনও অব্যক্ত ক্ষেত্রে অনুভূত প্রত্যয়-গুলি অপহৃত হইয়া যায়, আবার উপযুক্ত দেশ কাল ও পাত্রাদির সংযোগে সেই অপহৃত প্রত্যয়গুলি স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে। এই রহস্যটী বুঝিয়া লইবার জন্যই সূত্রে "অসম্প্রমোষ" শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে।

সাধক, তুমি স্মৃতিকে একটী বৃত্তিমাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিও না, চিতিশক্তিরূপিণী জননীই যে স্মৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহা বুঝিতে অনুভব করিতে প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করিও। এস আমরা স্মৃতিরূপিণী মাকে প্রণাম করি। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখিতেছি, আমরা আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই মা শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকি "নামৈকদেশগ্রহণে নাম মাত্র গ্রহণম্" এইরূপ একটী ন্যায় আছে। নামের যে কোন অংশ পরিগৃহীত হইলেই সেই নামের সর্ব্বাংশ গৃহীত হইয়া থাকে। আত্মার সংক্ষিপ্ত নাম 'মা'। ইহা সাধনসমর গ্রন্থে বলা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা হইতে পারে, পিতা ভ্রাতা সখা বন্ধু প্রভু প্রভৃতি না বলিয়া আত্মাকে মা বলা হয় কেন? তাহার উত্তর এই যে—ঐ সকল শব্দও আমরা অসঙ্কোচে বহুবার প্রয়োগ করিয়া থাকি।

আমাদের যখন যে নাম বা যে সম্বন্ধ ভাল বোধ হয়, তখন সেই নাম বা সেইরূপ সম্বন্ধেরই প্রয়োগ করিয়া থাকি। তবে মা শব্দটী বেশী বলা হয় এবং অনিচ্ছায়ও যেন উচ্চারিত হয়, ইহা সত্য। ইহারও একটু উদ্দেশ্য আছে—আমরা যখন আমাদের দিকে তাকাই, তখন আত্মাকে আর মা না বলিয়াই থাকিতে পারি না। যে পুত্র অপরাধের আকর, মলিনতার আধার, দুর্ব্বলতার বাসভূমি, সেরূপ পুত্রের পক্ষে মা ডাক একান্ত অপরিহার্য্যই হইয়া থাকে। পিতার শাসন আছে, বন্ধুর ঘৃণা আছে, ভ্রাতার উপেক্ষা আছে, প্রভুর দণ্ডবিধান আছে; কিন্তু মায়ের আমার সকল অবস্থাতেই কেবল স্নেহ আর আদর আছে। পুত্রের অপরাধ দেখিবার চক্ষু তাঁহার নাই, পুত্রের মলিনতা ধোয়াইয়া দিবার জন্য তিনি সততই সচেষ্ট, পুত্রের দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য প্রতিনিয়ত পুষ্টিকর আহারের সন্ধানে তিনি সর্ব্বদাই নিযুক্ত; এইরূপ মায়ের মত ব্যবহার প্রতিনিয়ত পাই বলিয়াই আত্মাকে আমরা কোনরূপেই মা না বলিয়া থাকিতে পারি না। আরও বিশেষ কথা এই যে আমরা আমাদিগকে যত বেশী অল্পবয়স্ক শিশু মনে করিতে পারি, ততই আমাদের সর্ব্বাবস্থায় একান্ত আশ্রয়রূপিণী মায়ের কথাই মনে পড়িয়া যায়। কিন্তু এ সকল এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক কথা। আমরা স্মৃতিরূপ বৃত্তির কথাই বলিতে ছিলাম। পরম এবং চরম স্মৃতি গ্রহীতৃবিষয়িণী, সেই স্মৃতির স্বরূপ—"ব্রহ্মাহমস্মি"। আর গ্রহণ বা গ্রাহ্যবিষয়ক স্মৃতি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট; যে হেতু, উহা অবিদ্যা-কল্পিত।

কেহ কেহ সংশয় এবং কল্পনা নামক আরও দুইটী বৃত্তির উল্লেখ করেন। হাঁ, সত্যই সংশয় এবং কল্পনারূপ দুইটী জ্ঞানভঙ্গিমা লক্ষ্য হয় বটে। উহার মধ্যে সংশয়কে প্রমাণবৃত্তির অন্তর্গত এবং কল্পনাকে বিকল্পবৃত্তির অন্তর্গতরূপে বুঝিয়া লইলেই পূর্ব্বোক্ত সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

এইরূপে প্রমাণাদি পঞ্চ বৃত্তির স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইল। প্রিয়তম সাধকগণকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, বৃত্তি আর কেহ নহে আত্মাই—চিতশক্তিরূপিণী মা-ই। যোগ ব্যতিরিক্ত স্থলে দ্রষ্টারই বৃত্তিসারূপ্য হয়। অবিদ্যাবশে যখন দ্রষ্টা বৃত্তির সমানরূপতা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ বৃত্তির আকারে আকারিত হন, তখনই বৃত্তির প্রকাশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আত্মা ব্যতীত বৃত্তির কোনই পৃথক্ সত্তা নাই, থাকিতে পারে না। বৃত্তি আত্মারই অবিদ্যা-কল্পিত ব্যাপার বা ব্যবহার মাত্র। আত্মা বৃত্তিসারূপ্য লইয়াই আমাদের বহুত্ব ভোগের সাধ মিটাইতেছেন। সাধক! যদি তুমি দ্রষ্টাকে বা আত্মাকে যথার্থই ধরিতে চাও, তবে বৃত্তিসারূপ্য কথাটী বিশেষভাবে স্মরণ রাখিও। এই পঞ্চবিধ বৃত্তির মধ্য দিয়াই তোমার ইষ্টদেব যে প্রতিনিয়ত তোমার সম্মুখে প্রকাশিত হইতেছেন, ইহা প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করিও। ঐ পঞ্চবিধ বৃত্তির মধ্যে, নিদ্রা এবং স্মৃতি নামক দুইটী বৃত্তিতে চিতিশক্তিরূপিণী মায়ের বিশেষ অভিব্যক্তি দেখিতে পাইবে। ঐ দেখ, নিদ্রাবৃত্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রতিদিনই মা তোমাদিগকে মুক্তির সন্ধান দিতেছেন। কোন অবস্থাতেই যে তুমি বদ্ধ নও, তুমি যে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায়ই মুক্ত আছ, এই তত্ত্বটী বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রতিদিনই মায়ের নিদ্রাবৃত্তিরূপে আবির্ভাব হয়। আর স্মৃতিরূপিণী মা জন্ম জন্মান্তরের স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্ববিধ জ্ঞান সমষ্টিকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়া "অহং ব্রহ্মাঽস্মি" এই চরম স্মৃতিতে—তোমার স্বকীয় স্বরূপে পৌঁছাইয়া দেন। তাই মায়ের সন্তানগণ জীবত্বের সুদৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ইহাই স্মৃতিরূপিণী বৃত্তির বিশেষত্ব।

আর একটী কথা এখানেই বলিয়া রাখিতেছি—জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় চিতিশক্তিরূপিণী মা পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ বৃত্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া আমাদিগকে বৃত্তির অতীত স্বরূপে উপনীত

হইবার সুযোগ প্রদান করিতেছেন। দেখ, স্বপ্নাবস্থায় বৃত্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া মা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন যে, জাগ্রত-কালে প্রমাণাদি বৃত্তিরূপে অর্থাৎ এই স্থূল শরীরাদি বিশ্বরূপে যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, তাহাও বিপর্য্যয়বৃত্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যেরূপ প্রতিদিন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ একদিন এই জগৎ-স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া যাইবে। দেখ, তোমার জীবন কালে ঐ চিতি শক্তিরূপিণা মা-ই কখনও প্রমাণরূপে—নিশ্চয় জ্ঞানরূপে, কখনও বিপর্য্যয়রূপে—ভ্রান্তিরূপে, কখনও বিকল্পরূপে, কখনও বা নিদ্রারূপে, আবার কখনও কখনও স্মৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। এই পঞ্চবিধ বৃত্তি আত্মারই লীলা-বিলাসময় পঞ্চবিধ ভঙ্গিমা। স্থিরভাবে ঐ ভঙ্গিমাগুলির দিকে লক্ষ্য রাখ, যিনি এই লীলার অধীশ্বর নিশ্চয়ই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইবে।

अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२ ॥

अथ कथमासां पञ्चवृत्तीनां निरोध इत्याहाभ्यासेति। अभ्यास-वैराग्याभ्यां वक्ष्यमाणलक्षणाभ्यां तन्निरोध स्तासां वृत्तीनां निरोधो भवेदासन्नतम-योगमहिम्नेति भावः। नान्यः पन्थाः कश्चित्तृतीय इति। न च योगस्यैव निरोध-हेतुत्वमुक्तमत्र तु तद्विरुद्धं वच इति वाच्यं। योगद्वारैवानयोर्हेतुतेति। यदासन्नतमो भवति योग श्चित्तस्योन्मुखीभवति निरोधाय तदैवाविर्भवति लक्षणद्वयमभ्यास-वैराग्य रूपमिति विदुषामनुभूतिः ॥ १२ ॥

দ্বাদশসূত্রে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ বৃত্তির কি প্রকারে নিরোধ হইতে পারে, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—অভ্যাস এবং

বৈরাগ্যের দ্বারা (আসন্নতম যোগের মহিমা প্রভাবে) তাহাদের (বৃত্তি সমূহের) নিরোধ হইয়া থাকে। অভ্যাস কি, বৈরাগ্য কি, তাহা পরে বলা হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে দ্বিতীয় সূত্রে "যোগের দ্বারাই বৃত্তি নিরোধ হয়" এ কথা বলা হইয়াছে, এ সূত্রে বলা হইল, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারাই বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। এই উভয় বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ নহে; কারণ অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা যোগ লাভ হয়, যোগ লাভ হইলেই অবিদ্যা এবং তৎকার্য্যরূপ বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ হইয়া যায়। যোগ-লাভের পক্ষে অভ্যাস এবং বৈরাগ্য ব্যতীত তৃতীয় কোন পন্থা নাই। যাঁহারা যোগলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সেই সত্যদর্শী পুরুষগণ সকলেই বলিয়া থাকেন—যখন যোগ আসন্নতম হয়, এবং চিত্ত ও নিরোধের জন্য উন্মুখ হয়, তখনই সাধকগণের অভ্যাস এবং বৈরাগ্যরূপ দুইটি লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায়।

तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ १३ ॥

द्वयोरेव निरोधोपायता दर्शिता तत्र वैराग्यबीजमप्यभ्यास इति मन्वान आदौ प्रधानं निरोधोपायं निरूपयति तत्रेति। तत्र योगे सत्यज्ञानादिलक्षणे द्रष्टुः स्वरूपे या स्थितिस्तस्यां; यद्वा तत्रस्थितौ तस्मिन् द्रष्टुः स्वरूपावस्थाने यो यत्नः पुनः पुनः प्रयासः सोऽभ्यास इत्यर्थः। ब्रह्मविचार इत्यस्य नामान्तरं। ब्रह्मणि विचरणमेव विचारो न तु वाचालोचनमात्रमिति। तथा जपपूजनहवननाम-कीर्त्तनादयोऽप्यभ्यास एवेति दिक्। वृत्तिसारूप्यमापन्नेऽपि द्रष्टरि सच्चित्सुखात्मके स्थितिप्रयत्न एवाभ्यासोपक्रमः। अस्माभिरयं सत्यप्रतिष्ठेति नाम्ना समुद्घुष्यते। "यो मां पश्यति सर्व्वत्र सर्व्वञ्च मयि पश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यतीति" स्वयं भगवतैवोपदिष्टम्। श्रुतयोऽपि "मनो ब्रह्मेत्युपासीत" इत्याहुः।

नह्यनुपक्रान्ताभ्यासस्य कथमपि स्वरूपस्थितिप्रयासः सम्भवति। ततश्च वृत्तिसारूप्यमापन्ने द्रष्टरि स्थितिप्रयत्नशीलस्य क्रमेण श्रीगुरुकृपाबलेन बुद्धावुपसंहृतात्मबोधस्य सास्मितसमाधिसमापन्नस्य समायाति स्वरूपस्थितिप्रयत्नरूपोऽभ्यास इति सर्व्वसम्प्रदायानुमोदितो निरुपद्रवः श्रुतिप्रदर्शितोऽयं प्रशस्तः पन्थाः ॥ १३ ॥

পূর্ব্বসূত্রে অভ্যাস এবং বৈরাগ্য, এই উভয়েরই নিরোধ-হেতুতা উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে অভ্যাসটী বৈরাগ্যের কারণ, অর্থাৎ অভ্যাস হইতেই বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে, ইহা মনে করিয়াই ঋষি প্রথমে অভ্যাসের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন—"তত্র স্থিতৌ যত্নঃ অভ্যাসঃ"। তাহাতে—যোগে অর্থাৎ দ্রষ্টার স্বরূপে—সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মায় যে স্থিতি, তদ্‌বিষয়ে যে যত্ন, তাহারই নাম অভ্যাস। অথবা "তত্র স্থিতৌ" সেই স্থিতিতে—সেই দ্রষ্টার স্বরূপাবস্থানে, যে যত্ন—পুনঃ পুনঃ প্রয়াস, তাহাই অভ্যাস। বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মবিচার বলিতে যাহা বুঝায়, এই যোগশাস্ত্রে অভ্যাস বলিতেও ঠিক তাহাই বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মে বিচরণ করার নাম ব্রহ্মবিচার, কেবল বাক্য দ্বারা মৌখিক আলোচনাকে ব্রহ্মবিচার বলে না। ব্রহ্মসত্তায় পুনঃ পুনঃ অবস্থানের প্রচেষ্টাকেই যথার্থ ব্রহ্মবিচার বলা হইয়া থাকে। ইহা দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শিত হইল। সকল দেশের ও সকল শাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য বিষয় এই অভ্যাস—এই "তত্র স্থিতৌ যত্নঃ"। ঐটী ব্যতীত কেহই ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না।

এখন কথা এই যে, দ্রষ্টার যাহা স্বরূপ তাহা অতি বিশুদ্ধ, যাবতীয় দ্বৈতভান বর্জ্জিত, সুতরাং তাহাতে স্থিতিই বা কি, আবার তদ্‌বিষয়ে প্রযত্নই বা কি হইতে পারে? এ প্রশ্নের যাহা সমাধান,

তাহাও ঋষিপ্রণীত "তত্র স্থিতৌ যত্নঃ" এই স্বল্পাক্ষর অসন্দিগ্ধ সূত্রের মধ্য হইতেই পাওয়া যায়।

কোন সাধকই প্রথমে বিশুদ্ধ-বোধস্বরূপে অবস্থান-বিষয়ক-প্রযত্ন অবলম্বন করিতে পারেন না, কোন কালেও কেহ পারেন নাই—পারিবেনও না। সকলকেই সর্ব্বপ্রথমে অভ্যাসের উপক্রম করিতে হয়। প্রথমে যাহা অভ্যাসের উপক্রম, পরিণামে তাহাই যথার্থ অভ্যাসে পরিণত হইয়া থাকে। অভ্যাসের উপক্রম কি? তাহাও ঐ "তত্র স্থিতৌ যত্নঃ"—তাঁহাতে থাকিবার প্রযত্ন। যতদিন দ্রষ্টার স্বরূপ উদ্‌ভাসিত না হয়, ততদিন আমাদের নিকট দ্রষ্টার যে বৃত্তিসারূপ্য প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে অবস্থানের প্রযত্ন করিতে হইবে; ইহাই অভ্যাসের উপক্রম—ইহাই অভ্যাসের সূত্রপাত। পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি—যদিও আত্মা সর্ব্ব-ভেদাতীত বস্তু, তথাপি সাধকগণকে এই ভেদাতীত আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে, স্বগতভেদের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ যে আত্মায় নাই, ইহা অনুভব করিবার জন্যই প্রথমে স্বগতভেদ ধরিয়া সাধনা করিতে হয়। যেরূপ কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিতে হয়, ঠিক সেইরূপই স্বগতভেদের সাধনাদ্বারা সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলে, তারপর ঐ স্বগত-ভেদকেও অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধসত্তার সন্ধান পাওয়া যায়। তখন সেখানে—সেই "তত্র স্থিতৌ যত্নঃ" করিতে হয়, এবং ইহাই যথার্থ অভ্যাস নামে কথিত হয়। যাঁহারা সাস্মিত সমাধিতে অভ্যস্ত নহেন, অর্থাৎ অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাতযোগ যাঁহাদের লাভ হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে দ্রষ্টার স্বরূপস্থিতিবিষয়ে প্রযত্নরূপ অভ্যাস একেবারেই অসম্ভব। যেরূপ পঞ্চম বর্ষীয় শিশু প্রজনন-ব্যাপার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, ঠিক সেইরূপ যাঁহারা সাস্মিত-সমাধি লাভ করেন নাই অর্থাৎ দ্রষ্টার বৃত্তি-সারূপ্যে বা স্বগতভেদে অবস্থান করিবার সামর্থ্য যাঁহারা অর্জ্জন

করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতিপ্রযত্ন-রূপ অভ্যাস একান্ত অজ্ঞেয় ব্যাপারই থাকে। অতএব সাধকমাত্রকেই সর্ব্বপ্রথমে অভ্যাসোপক্রম করিতে হইবে, বৃত্তিসারূপ্য-প্রাপ্ত দ্রষ্টায় অবস্থানের প্রযত্ন করিতে হইবে। আমরা ইহাকে "সত্যপ্রতিষ্ঠা" নামে উদ্‌ঘোষিত করিয়া থাকি। ভগবান্ স্বয়ং গীতাশাস্ত্রেও "যো মাং পশ্যতি" প্রভৃতি বাক্যে এই অভ্যাসের কথাই বলিয়াছেন। শ্রুতিতে মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবার যে উপদেশ আছে, তাহাও এই "অভ্যাস" এই সত্যপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বৃত্তিরূপে বহুরূপে সর্ব্বরূপে যাহা কিছু প্রতীতি-গোচর হয়, সে সকলই যে দ্রষ্টা। দ্রষ্টাই যে বৃত্তিসারূপ্য লইয়া সাধকগণের সম্মুখে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছেন, এই সত্যটীর উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনার প্রারম্ভেই বৃত্তিসারূপ্য-প্রাপ্ত দ্রষ্টায় পুনঃ পুনঃ অবস্থানের প্রযত্ন করিতে হইবে। ইহাকেই ইতিপূর্ব্বে অভ্যাসের উপক্রম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহা অভ্যাসের উপক্রম, তাহাও অভ্যাস ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

প্রাচীন ভাষ্যকারগণ অর্থ করিয়াছেন—"কোন একটী স্থানে মনকে ধরিয়া রাখিবার জন্য যে যত্ন, তাহাই অভ্যাস।" যোগের ভাষায় ইহাকে "ধারণা" বলা যায়। ধারণার বিষয় সূত্রকার স্বয়ংই যথাস্থানে স্পষ্টভাষায় বলিয়া দিবেন। যদি সেরূপ অর্থও স্বীকার করা যায়, তাহাতেও সাস্মিতসমাধি পর্য্যন্ত কোন ক্ষতি হয় না; কারণ, বৃত্তি সমূহকে দ্রষ্টারই সারূপ্য-জ্ঞানে, তাহাতে পুনঃ পুনঃ অবস্থানের চেষ্টাকে নিঃসংশয়ে ধারণাই বলা যাইতে পারে। ধারণা ধ্যান ও সমাধিরূপ শ্রেষ্ঠ যোগাঙ্গগুলিও যে এই অভ্যাসই, ইহা স্বীকার করিতে কোনরূপ আপত্তি থাকিতে পারে না।

সাধক! যদি তুমি সত্য সত্যই যোগলাভ করিতে চাও, তবে এই অভ্যাসের পথেই তোমাকে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথমে বৃত্তিসারূপ্য-প্রাপ্ত দ্রষ্টায় অবস্থানের প্রযত্ন করিতে থাক, ইহার ফলে যোগাঙ্গসমূহ

আপনা হইতেই অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে। ক্রমে শ্রীগুরুর কৃপাবলে তুমি সাস্মিত-সমাধিতে উপনীত হইয়া আত্মার স্বগতভেদ উপলব্ধি করিতে পারিবে। তখন তোমার আত্ম-বোধ দেহাদি হইতে উপসংহৃত হইয়া বুদ্ধিতে অবস্থান করিবে। সেই অবস্থায় ঐ বিজ্ঞান ক্ষেত্র হইতে বিশুদ্ধসত্তার দিকে, দ্রষ্টার স্বরূপের দিকে লক্ষ্য ফিরাইতে পারিবে, তখন এক একবার ঐ সত্তায় প্রবেশ করিতে উদ্যত হইবে, আবার নীচের দিকে নামিয়া আসিবে। আবার যত্ন করিবে, আবার নামিয়া আসিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ যে প্রযত্ন, ইহাই যথার্থ অভ্যাস। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে তুমি কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইয়া জন্ম জীবন সার্থক করিতে পারিবে। ইহা অতিদুরূহ নহে, শুধু প্রবল আগ্রহ সাপেক্ষ। তুমি কি সত্যই যোগী হইতে চাও?

প্রিয় সাধকগণের অবগতির জন্য আর একটী কথা এখানে উল্লেখ করা হইতেছে। পূজা হোম যাগযজ্ঞ শ্রাদ্ধ তর্পণ ব্রত নিয়ম প্রভৃতি যত কিছু শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম এতদ্দেশে প্রচলিত আছে, সে সকলও এই যোগশাস্ত্র প্রতিপাদ্য "অভ্যাস" ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ঐ সকল বৈধকর্ম্মের সাহায্যেও বৃত্তিসারূপ্য-প্রাপ্ত দ্রষ্টাতেই অবস্থানের চেষ্টা করা হয়। অবশ্য, বর্ত্তমানে বৈধকর্ম্মগুলি যেরূপ প্রাণহীন অনুষ্ঠানমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহাতে অভ্যাসের গন্ধও নাই, উহা কর্ম্মপদ বাচ্যই নহে। সে কথা ছাড়িয়া দিয়া দেখিতে হইবে, কর্ম্মগুলি যখন প্রাণময় হয়, স্বগতভেদময় হয় অর্থাৎ "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং" রূপে পর্য্যবসিত হয়, তখন উহাও অভ্যাস পদবাচ্যই হইয়া থাকে। আবার যখন কেহ চৈতন্যময়মন্ত্র জপ করে, কিংবা ভগবন্নাম কীর্ত্তন করে, তখনও সে অজ্ঞাতসারে "তত্রস্থিতৌ যত্নঃ" রূপ অভ্যাসেরই অনুশীলন করিয়া থাকে। তাইত বলিতেছিলাম— যে কোন সম্প্রদায়ের সাধকই হউন না কেন, এই যোগশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পন্থা অতিক্রম করিয়া কেহই চলেন না বা চলিতে পারেন না।

स तु दीर्घकाल-नैरन्तर्य्य-सत्कारासेवितो दृढ़भूमिः ॥ १४ ॥

अभ्यास-पराकाष्ठां दर्शयति स इति। सः अभ्यासः, तु शब्दोऽ-नायाससिद्धतां निषेधति। दीर्घकालः, उक्तञ्च—"बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते" इति। नैरन्तर्य्यं व्यवधानराहित्यम्, उक्तञ्च—"तस्मात् सर्व्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य चेति"। सत्कारः श्रद्धादरातिशयः, तैः सहायभूतैरित्यर्थः। आसेवितः आ सम्यक् सेवितोऽनुशीलितोऽभ्यास इति भावः। दृढ़भूमिर्दृढ़ाऽविचलिता संशय-विपर्य्ययादिभावनारहिता भूमिः स्थितिरित्यर्थो भवतीति शेषः। व्युत्थानरहितां वा सप्तमीं ज्ञानभूमिकां तूर्य्यगामभिप्रेत्यैव दृढ़भूमि-रित्युक्तम् ॥ १४ ॥

চতুর্দ্দশসূত্রে ঋষি অভ্যাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। সেই স্বরূপাবস্থান প্রযত্নরূপ অভ্যাস দীর্ঘকাল নিরন্তর এবং সৎকার অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আসেবিত হইলে দৃঢ়ভূমি হয়। দীর্ঘকাল সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে", বহু বহু জন্ম অতিক্রম করিয়া মানুষ জ্ঞানলাভ করে, তারপর আমাকে লাভ করিতে পারে। যাঁহারা মনে করেন অল্পকাল সাধনা করিয়াই আত্মজ্ঞান লাভ করিবেন, তাঁহারা ভগবানের এই কথাটীর প্রতি এবং পতঞ্জলিপ্রোক্ত এই দীর্ঘকাল শব্দটীর প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া"। যদি কখনও দেখা যায়,—অতি অল্পদিনমাত্র সাধনা করিয়াই কেহ যোগস্বরূপে উপনীত হইতে পারিয়াছেন, অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানলাভে ধন্য হইয়াছেন, তবে বুঝিতে হইবে—তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম হইতে তীব্র সাধনার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

নৈরন্তর্য্য শব্দের অর্থ—নিরন্তর অর্থাৎ ব্যবধানরহিত। দুইমাস যথানিয়মে সাধনা করা হইল, আবার একমাস বাধা হইল, এইরূপ না হওয়া অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন নিয়মপূর্ব্বক প্রত্যহ কিছু কিছু অভ্যাস হওয়া আবশ্যক। স্বয়ং ভগবান্‌ও বলিয়াছেন—"সর্ব্বকালে আমাকেই স্মরণ কর, এবং বিপরীত ভাবনা গুলির সহিত যুদ্ধ কর।" এইরূপ কেবল দীর্ঘকাল ও নিরন্তর অভ্যাস হইলেই হইবে না। সৎকারপূর্ব্বক অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও অতিশয় আদরের সহিত উহা আসেবিত হওয়া আবশ্যক। আসেবিত শব্দের অর্থ—সম্যক্ অনুশীলিত। পূর্ব্বোক্ত অভ্যাস দীর্ঘকাল নিয়ম পূর্ব্বক এবং অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলিত হইলেই উহা দৃঢ়ভূমি হয়; অর্থাৎ সংশয় ও বিপর্য্যয়াদি ভাবনা শূন্য হইয়া অবিচলিত স্থিতি লাভ হয়। অথবা দৃঢ়ভূমি শব্দের আর একটা অর্থও হইতে পারে—যোগবাশিষ্ঠে জ্ঞানের যে ভূমিকাসমূহের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে তুর্য্যগানাম্নী সপ্তমী ভূমিকাই এই দৃঢ়ভূমি শব্দের অর্থ। অভ্যাসের পরিপক্কাবস্থায় জ্ঞানের এই চরমভূমি লাভ হইয়া থাকে। সাধকগণের অবগতির জন্য এইস্থলে উক্ত জ্ঞানভূমিকা সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে, যথা—শুভেচ্ছা সুবিচারণা তনুমানসা সত্তাপত্তি অসংসক্তি পদার্থাভাবিনী এবং তূর্য্যগা। সাধকের সর্ব্বপ্রথমে শুভ ইচ্ছা অর্থাৎ শ্রেয়োলাভের ইচ্ছা হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সাধক যথার্থ সত্যবস্তু কি এবং তাহা কিরূপে লাভ হইবে, তজ্জন্য ব্যাকুলভাবে অন্বেষণ করিতে থাকে। তারপর সুবিচারণা উপস্থিত হয় অর্থাৎ সদ্‌গুরু লাভ হয়, ও তাঁহার কৃপায় বুঝিতে পারে যে, একমাত্র সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মাই দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে সাজিয়া রহিয়াছেন। সাধক তখন দৃশ্যসমূহের মধ্যেও সচ্চিদানন্দস্বরূপকেই যথাসম্ভব ভোগ করিতে চেষ্টা করে, ক্রমে তাহার নিত্য ও অনিত্য বস্তুবিষয়ক বিচার উপস্থিত হয়। এইরূপ সুবিচারণা হইতে তৃতীয় জ্ঞান ভূমিকা "তনুমানসা" আবির্ভূত হইতে থাকে। তনুমানসা শব্দের অর্থ ক্ষীণচিত্ততা। যোগশাস্ত্রে যাহাকে বৃত্তিনিরোধ বলা হইয়াছে, ক্ষীণচিত্ততা হইতেই তাহার সূত্রপাত হয়।

লক্ষ্য করিও সাধক, এস্থলে যাহা অভ্যাস নামে কথিত হইয়াছে, যোগবাশিষ্ঠে তাহাই সুবিচারণা নামে উক্ত হইয়াছে। স্থূলকথা সুবিচারণা ও তনুমানসা শব্দে অভ্যাস এবং বৃত্তিনিরোধের সূচনাই বুঝিতে হইবে। চতুর্থ জ্ঞানভূমিকা "সত্ত্বাপত্তি"। ইহাই দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান রূপ যোগ। যে অখণ্ড পূর্ণ জ্ঞানময় সত্তায় এই বিশ্ব অবস্থিত, সেই সত্তাস্বরূপ বস্তুর যে আপত্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি, তাহাই সত্ত্বাপত্তি। যোগদর্শনে যাহা যোগ, যোগবাশিষ্ঠে তাহাই "সত্ত্বাপত্তি" নামে অভিহিত হইয়াছে। যোগের ফল বৈরাগ্য, তাই যোগবাশিষ্ঠে যাহা অসংসক্তি, এই যোগ-শাস্ত্রে তাহাই "বৈরাগ্য" নামে অভিহিত হইয়াছে। ষষ্ঠভূমিকা "পদার্থাভাবিনী" ইহা অভ্যাসের প্রায় পরাকাষ্ঠা তুল্য। যখন একমাত্র আত্মা ব্যতীত অপর কোন পদার্থবিষয়ক প্রত্যয় উদিত হয় না, কেবল একাত্মপ্রত্যয়মাত্রই উদিত হইতে থাকে, তখনই বুঝিতে হইবে—"পদার্থাভাবিনী" রূপ ষষ্ঠভূমিকার আবির্ভাব হইয়াছে। সপ্তমী ভূমিকা "তুর্য্যগা"। ইহাই অভ্যাসের চরম পরাকাষ্ঠা। কৈবল্যপদ, নিরোধ, সমাধি, নির্ব্বাণ প্রভৃতি নামে এই সপ্তমী জ্ঞান ভূমিকারই পরিচয় প্রদান করা হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি এই সপ্তমী ভূমিকাকে লক্ষ্য করিয়াই এই সূত্রে দৃঢ়ভূমি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ জ্ঞানভূমিকা অর্থাৎ বিদেহকৈবল্য লাভ করিবার জন্য যে দীর্ঘকাল নিরন্তর সৎকারপূর্ব্বক অভ্যাসের অনুশীলন একান্তই আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য। যতদিন সাধকের ব্যুত্থান আছে, ততদিন বুঝিতে হইবে, অভ্যাস দৃঢ়ভূমিক হয় নাই।

দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥ ১৫ ॥

অভ্যাসং নিরূপ্য তস্মাদাবির্ভূতমপরং নিরোধোপায়ং বৈরাগ্যমুপদিশতি দৃষ্টেতি। দৃষ্টা ঐহিকাঃ কামিনীকাঞ্চনাদয়স্তথানুশ্রবিকাঃ

पारत्रिकाः स्वर्गादयो विषया भोगास्तेषु वितृष्णस्यासक्तिरहितस्याभ्यास निपुणस्याधिकारिणोवशीकार इति यथार्थ संज्ञा नाम वैराग्यमाविर्भवतीति शेषः। विगतो रागो यस्य स विरागः, द्वेषस्यान्न रागपदार्थस्तस्यापि रागरूपत्वादिति तस्य भावो वैराग्यम्।

इदमत्र ज्ञातव्यं—योगविमुखाः प्राकृता दृष्टादृष्ट विषयेषु विजातीय-भेदबुद्धिसम्पन्नाः सुतरामिष्टानिष्टविषयेषु रागद्वेषसमाकुलाः प्रवर्त्तन्ते। अपरे तु योगाभिमुखाः श्रद्दधाना जना ऐहिकामुष्मिकेषु भोग्यजातेषु द्रष्टुरात्मन एव स्वारूप्यं ज्ञात्वा स्वगतभेदेषु दृश्येषु न सज्जन्ते। स्वरूप-स्थितिप्रयत्न एव तेषां दृश्योदासीनतां जनयति, ततश्चेष्टानिष्ट प्रत्ययाभावान्न भोग्येष्वनुरागो नवा द्वेषः। एवञ्च विषयलोलुपं चित्तं वश्यभावमापन्नं रागद्वेषविहीनं भवतीति वशीकारसंज्ञावैराग्यमुच्यते। उक्तञ्च "रागद्वेष-विहीनैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्। आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधि-गच्छतीति।"

এইবার ঋষি বৈরাগ্যের কথা বলিতেছেন। বৈরাগ্য দুই প্রকার, বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্য এবং পর বৈরাগ্য। এই পঞ্চদশ সূত্রে বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যের স্বরূপ বলা হইতেছে। দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়-বিতৃষ্ণ চিত্তের (অর্থাৎ সাধকের) পূর্ব্বোক্ত রূপ বৈরাগ্য লাভ হইয়া থাকে। ঐহিক কামিনী কাঞ্চনাদি ভোগ্যবস্তু সমূহকে দৃষ্ট বিষয় কহে, এবং পারলৌকিক স্বর্গাদি ভোগ্যবিষয় সমূহকে আনুশ্রবিক বিষয় বলে, এই উভয়বিধ বিষয়ে যাহার বিতৃষ্ণা অর্থাৎ সম্যক্ অনাসক্তি আসিয়াছে, অভ্যাসে নিপুণ যোগের অধিকারী সেই ব্যক্তিই বশীকার সংজ্ঞা-বৈরাগ্যের অধিকারী হয়।

শুন সাধক, কিরূপে এই বৈরাগ্য উপস্থিত হয়—পূর্ব্বে যে স্বরূপস্থিতি প্রযত্নরূপ অভ্যাসের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা প্রতিনিয়ত

লক্ষ্য করিও সাধক, এস্থলে যাহা অভ্যাস নামে কথিত হইয়াছে, যোগবাশিষ্ঠে তাহাই সুবিচারণা নামে উক্ত হইয়াছে। স্থূলকথা সুবিচারণা ও তনুমানসা শব্দে অভ্যাস এবং বৃত্তিনিরোধের সূচনাই বুঝিতে হইবে। চতুর্থ জ্ঞানভূমিকা "সত্ত্বাপত্তি"। ইহাই দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান রূপ যোগ। যে অখণ্ড পূর্ণ জ্ঞানময় সত্তায় এই বিশ্ব অবস্থিত, সেই সত্তাস্বরূপ বস্তুর যে আপত্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি, তাহাই সত্তাপত্তি। যোগদর্শনে যাহা যোগ, যোগবাশিষ্ঠে তাহাই "সত্তাপত্তি" নামে অভিহিত হইয়াছে। যোগের ফল বৈরাগ্য, তাই যোগবাশিষ্ঠে যাহা অসংসক্তি, এই যোগ-শাস্ত্রে তাহাই "বৈরাগ্য" নামে অভিহিত হইয়াছে। ষষ্ঠভূমিকা "পদার্থাভাবিনী" ইহা অভ্যাসের প্রায় পরাকাষ্ঠা তুল্য। যখন একমাত্র আত্মা ব্যতীত অপর কোন পদার্থবিষয়ক প্রত্যয় উদিত হয় না, কেবল একাত্মপ্রত্যয়মাত্রই উদিত হইতে থাকে, তখনই বুঝিতে হইবে—"পদার্থাভাবিনী" রূপ ষষ্ঠভূমিকার আবির্ভাব হইয়াছে। সপ্তমী ভূমিকা "তুর্য্যগা"। ইহাই অভ্যাসের চরম পরাকাষ্ঠা। কৈবল্যপদ, নিরোধ, সমাধি, নির্ব্বাণ প্রভৃতি নামে এই সপ্তমী জ্ঞান ভূমিকারই পরিচয় প্রদান করা হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি এই সপ্তমী ভূমিকাকে লক্ষ্য করিয়াই এই সূত্রে দৃঢ়ভূমি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ জ্ঞানভূমিকা অর্থাৎ বিদেহকৈবল্য লাভ করিবার জন্য যে দীর্ঘকাল নিরন্তর সৎকারপূর্ব্বক অভ্যাসের অনুশীলন একান্তই আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য। যতদিন সাধকের ব্যুত্থান আছে, ততদিন বুঝিতে হইবে, অভ্যাস দৃঢ়ভূমিক হয় নাই।

दृष्टानुश्रविक-विषयवितृष्णस्य वशीकार-संज्ञा वैराग्यम् ॥ १५ ॥

अभ्यासं निरूप्य तस्मादाविर्भूतमपरं निरोधोपायं वैराग्य-मुपदिशति दृष्टेति। दृष्टा ऐहिकाः कामिनीकाञ्चनादयस्तथानुश्रविकाः

पारत्रिकाः स्वर्गादयो विषया भोग्यास्तेषु वितृष्णस्यासक्तिरहितस्याभ्यास
निपुणस्याधिकृतीवशीकार इति यथार्थं संज्ञा नाम वैराग्यमाविर्भवतीति
शेषः। विगतो रागो यस्य स विरागः, द्वेषश्चात्र रागपदार्थस्तस्यापि
रागरूपत्वादिति तस्य भावो वैराग्यम्।

इदमत्र ज्ञातव्यं—योगविमुखाः प्राकृता दृष्टादृष्ट विषयेषु विजातीय-
भेदबुद्धिसम्पन्नाः सुतरामिष्टानिष्टविषयेषु रागद्वेषसमाकुलाः प्रवर्त्तन्ते।
अपरे तु योगाभिमुखाः श्रद्दधाना जना ऐहिकामुष्मिकेषु भोग्यजातेषु
द्रष्टुरात्मन एव सारूप्यं ज्ञात्वा स्वगतभेदेषु दृश्येषु न सज्जन्ते। स्वरूप-
स्थितिप्रयत्न एव तेषां दृश्योदासीनतां जनयति, ततश्चेष्टानिष्ट प्रत्ययाभावान्न
भोग्येष्वनुरागो नवा द्वेषः। एवञ्च विषयलोलुपं चित्तं वश्यभावमापन्नं
रागद्वेषविहीनं भवतीति वशीकारसंज्ञावैराग्यमुच्यते। उक्तञ्च "रागद्वेष-
विहीनैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्। आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधि-
गच्छतीति।"

এইবার ঋষি বৈরাগ্যের কথা বলিতেছেন। বৈরাগ্য দুই প্রকার, বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্য এবং পর বৈরাগ্য। এই পঞ্চদশ সূত্রে বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যের স্বরূপ বলা হইতেছে। দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়-বিতৃষ্ণ চিত্তের (অর্থাৎ সাধকের) পূর্ব্বোক্ত রূপ বৈরাগ্য লাভ হইয়া থাকে। ঐহিক কামিনী কাঞ্চনাদি ভোগ্যবস্তু সমূহকে দৃষ্ট বিষয় কহে, এবং পারলৌকিক স্বর্গাদি ভোগ্যবিষয় সমূহকে আনুশ্রবিক বিষয় বলে, এই উভয়বিধ বিষয়ে যাহার বিতৃষ্ণা অর্থাৎ সম্যক্ অনাসক্তি আসিয়াছে, অভ্যাসে নিপুণ যোগের অধিকারী সেই ব্যক্তিই বশীকার সংজ্ঞা-বৈরাগ্যের অধিকারী হয়।

শুন সাধক, কিরূপে এই বৈরাগ্য উপস্থিত হয়—পূর্ব্বে যে স্বরূপস্থিতি প্রযত্নরূপ অভ্যাসের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা প্রতিনিয়ত

সেইরূপ অভ্যাসে নিরত, অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুসমূহে বিজাতীয়ভেদ-বুদ্ধি দূর করিবার জন্য যাহারা সর্ব্বত্র সত্যপ্রতিষ্ঠারূপ "অভ্যাসের" অনুশীলন করে, এক কথায় যাহারা "ঈশাবাস্য" করিয়া জগদ্‌ভোগ করে, তাহাদের বিষয়ের প্রতি ইষ্ট এবং অনিষ্ট বুদ্ধি বিদূরিত হইয়া যায়। তাহার ফলে হেয়োপাদেয় বুদ্ধি অর্থাৎ বিষয়ের ত্যাগ ও গ্রহণবিষয়ক বুদ্ধি সম্যক্ বিদূরিত হয়; এইরূপ অবস্থার নামই বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্য। যাহারা যোগপরাঙ্মুখ সাধারণলোক, তাহাদের অবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত। যেহেতু, তাহারা ঐহিক এবং পারলৌকিক ভোগ্যবিষয়সমূহকে বিজাতীয়ভেদ বুদ্ধিতেই দর্শন করে; সুতরাং তাহাদের বিষয়েতে ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধি থাকে অর্থাৎ অনুকূল-বিষয়ে অনুরাগ এবং প্রতিকূলবিষয়ে বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। জন-সাধারণ এইরূপে রাগদ্বেষের দ্বারা সম্যক্ আকুলীভূত হইয়া বিষয় সমূহকে ভোগ করে, এবং তাহার ফলে তাহাদের পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারবন্ধন সুদৃঢ় হয়। পক্ষান্তরে যাহারা যোগাভিমুখী এবং শ্রদ্ধাবান্, তাহারা ঐহিক এবং পারলৌকিক সমস্ত ভোগ্যবস্তুতে আত্মারই সারূপ্য বুঝিতে চেষ্টা করে, অর্থাৎ দৃশ্যবস্তুসমূহ যে আত্মারই স্বগতভেদ মাত্র, তাহা অনুভব করিতে পারে। তাহার ফলে —স্বরূপস্থিতিপ্রযত্নরূপ অভ্যাসের ফলে দৃশ্যবস্তুসমূহের প্রতি একটা উদাসীনতা স্বতই আসিয়া উপস্থিত হয়। "যাহা কিছু আমি দেখিতে পাইতেছি অর্থাৎ যাহা কিছু আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতেছে, সে সকল ত আমিই অর্থাৎ আত্মাই" এইরূপ জ্ঞানে পুনঃ পুনঃ বিচরণ রূপ অভ্যাসের ফলে ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধি অর্থাৎ অনুরাগ এবং বিদ্বেষ বিদূরিত হইয়া যায়; এবং এই রূপেই বিষয়লোলুপ চিত্ত ক্রমে বশ্যভাব প্রাপ্ত হয়, ইহারই নাম বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্য। গীতায় স্বয়ং ভগবান্‌ও বলিয়াছেন—"আত্মবশ্য রাগ দ্বেষ-বিমুক্ত ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা বিষয়ে বিচরণ করিয়া বিধেয়াত্মা অর্থাৎ যোগি-পুরুষগণ চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন।" এইরূপ রাগদ্বেষ-বিমুক্ত

হইয়া বিষয় সমূহের মধ্যে বিচরণ করিবার যে সামর্থ্য, তাহাই বৈরাগ্যের প্রথম অবস্থা। বিষয়ের ভোগকে ত্যাগ করিলেই বৈরাগ্য লাভ হয় না; যেহেতু, ত্যাগও অনুরাগ বিশেষই।

তৎ পরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥ ১৬ ॥

অভ্যাসবৎ বৈরাগ্যপরাকাষ্ঠামপি দর্শয়তি তদিতি। তৎ বৈরাগ্যং পরং শ্রেষ্ঠং পরবৈরাগ্যাখ্যং ভবতি। কুত ইত্যাহ পুরুষখ্যাতেঃ পুরুষস্য প্রত্যগাত্মনঃ খ্যাতেঃ প্রকাশাৎ। তৎ কথমিত্যুচ্যতে গুণবৈতৃষ্ণ্যং গুণেষু বক্ষ্যমাণেষু সত্ত্বাদিষু বৈতৃষ্ণ্যম্ বিতৃষ্ণাভাবঃ সম্যগনাসক্তিরিত্যর্থঃ। উক্তঞ্চ—বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে। ইদমত্র জ্ঞাতব্যং—অহঙ্কার-পরিহার এব বৈরাগ্যপরাকাষ্ঠা, কেবলেন পুরুষপ্রকাশেনাবির্ভবতি সা, নান্যেন ইতি।

এই সূত্রে পরবৈরাগ্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—পুরুষ খ্যাতি হইতে যে গুণ বৈতৃষ্ণ্য উপস্থিত হয়, তাহাই পর বৈরাগ্য। ইতিপূর্ব্বে যেরূপ অভ্যাসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ বৈরাগ্যেরও পরাকাষ্ঠা আছে, তাহারই প্রচলিত নাম "পরবৈরাগ্য", ইহা "পুরুষ খ্যাতি" হইতে অর্থাৎ আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার হইতে লাভ হইয়া থাকে। সাধক যতদিন আত্মস্বরূপের সন্ধান না পায়, ততদিন তাহার পরবৈরাগ্য কিছুতেই অধিগত হয় না। কারণ ইহা "গুণ বৈতৃষ্ণ্য স্বরূপ"। গুণের প্রতি বিতৃষ্ণা বা সম্যগ্ অনাসক্তিই পরবৈরাগ্য নামে কথিত হয়। গুণ—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, সূত্রকার নিজেই দ্বিতীয়পাদে গুণের বিষয় বলিবেন। সাধনসমর গ্রন্থে দ্বিতীয় খণ্ডে ত্রিগুণতত্ত্ব অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই জগতের মূল উপাদান গুণত্রয়। উহাদের প্রতি অর্থাৎ জগদ্বীজের

প্রতি যতদিন বিতৃষ্ণা না আসে, ততদিন বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা লাভ হয় না। পুরুষ অর্থাৎ আত্মাই যে একমাত্র অস্তিত্বস্বরূপ পদার্থ, সত্তা যে একমাত্র আত্মারই আছে, ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হইলে, আত্মাতিরিক্ত বস্তুর অসত্তা নিশ্চয় হয়। গুণত্রয় অনাত্মবস্তু, তাহাদের কোন সত্তা নাই, আত্মার সত্তা ধার করিয়াই গুণত্রয়ের সত্তা প্রতীতি গোচর হয়। এই যে জ্ঞান এই যে অনুভব, ইহার লাভ হইলে আর গুণত্রয়ের প্রতি তৃষ্ণা আসক্তি কোন প্রকারেই থাকিতে পারে না। যাহাদ্বারা জগৎ নির্ম্মিত যদি তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা আসে, তবে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যত লোভনীয় মূর্ত্তিতেই উপস্থিত হউক না কেন, উহার প্রতি বিতৃষ্ণা নিশ্চয়ই আসিবে, স্বভাবতঃই আসিবে। প্রথমে যাহা বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যরূপে বিষয়ের ত্যাগ বা গ্রহণে উদাসীনতারূপে আবির্ভূত হয়, তাহাই পরে আত্মস্বরূপের খ্যাতি হইলে পরবৈরাগ্যরূপে পরিণত হয়। ইহাই বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা। "কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি, কিং গৃহ্লামি ত্যজামি কিম্, আত্মনাপূরিতং সর্ব্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা"। এইরূপ জ্ঞানে উপনীত হওয়ার নামই পর বৈরাগ্য।

আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই সুতরাং ত্যাগ বা গ্রহণও কিছুই নাই, ইহাই মানবজীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা। উপনিষদের ঋষি— "মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্" বলিয়া এই পরবৈরাগ্যেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই অবস্থায় জীবের যে "আমি" জ্ঞান, তাহার সম্পূর্ণ বিলয় হইয়া যায়। গুণত্রয়ের প্রথম অভিব্যক্তিই "আমি" সুতরাং গুণত্রয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা বলিলেই অহঙ্কারের প্রতি বিতৃষ্ণা বুঝা যায়। শুন সাধক, যতদিন "আমি" আছে ততদিন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেও বৈরাগ্য আসে নাই, ইহা বুঝিয়া লইও। ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য আসে না। বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইলে ত্যাগরূপ বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। ওগো, তোমরা বৈরাগ্য আসিল না বলিয়া আর্ত্তনাদ করিও না, বৈরাগ্য অমনি আসে না। পুরুষখ্যাতি

হইতে পরবৈরাগ্যের উদয় হয়। এই ত ঋষির উপদেশ! তবে আর বেশপরিবর্ত্তন করিয়া ত্যাগনামক একটা গ্রহণের অনুষ্ঠান করিতে যাইবে কেন! সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য নামে কিছু গ্রহণ করিতে হয় না। আত্মস্বরূপে স্থিতির প্রযত্ন হইতে উহা স্বতঃই উপস্থিত হইয়া থাকে। ভগবান্ বলিয়াছেন—একমাত্র পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হইলেই বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ও বিদ্বেষ দূরীভূত হইতে পারে, অন্য কোন উপায়ে তাহা হয় না। তাই এ সূত্রেও ঋষি পুরুষখ্যাতি হইতেই পরবৈরাগ্য উদয়ের কথা বলিলেন।

আমরা কিন্তু পরবৈরাগ্য শব্দে চিত্তবৃত্তি সমূহের নিরোধই বুঝিয়া থাকি। যখন দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয়—পুরুষখ্যাতি হয়—সেই সময়ে সাধকের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া পর্য্যন্ত নিরুদ্ধ হইয়া যায়, যাবতীয় বৃত্তি নিরুদ্ধ থাকে, অহং জ্ঞান বিলয় প্রাপ্ত হয়, ইহাই পরবৈরাগ্য। আবার যখন সে অবস্থা হইতে ব্যুত্থিত হওয়া যায়, তখন ঠিক পরবৈরাগ্য থাকে না। তখন বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্য থাকে। মনে রাখিও সাধক, পরবৈরাগ্য আত্মসাক্ষাৎকার বা পুরুষখ্যাতির বাহ্যলক্ষণ।

वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः ॥ १७ ॥

दर्शितो निरोधोपायोऽधुनारुणोदयमिव योगपूर्व्वरूपं विवृणोति वितर्केति। दृश्यं द्रष्टुरेव सारूप्यमित्यनुभववतामभ्यासवैराग्यसम्पन्नाना-माविर्भवति हि सम्प्रज्ञातो नाम योगपूर्व्वरूपम्। स च वितर्क-विचारानन्दास्मितारूपानुगतः सोपानचतुष्टयरूपस्तथापि योग इत्या-ख्यायते योगैकान्तसन्निहितत्वात्। तथाहि दृश्यमिदमसावहं द्रष्टे-दृश्यदर्शनमिति द्रष्टुरेव त्रिधानुभासं विशेषेण तर्क्यत इति वितर्कस्तथा

ততস্ত্রয়মেক এব দ্রষ্টেতি তত্র বিচরণং বিচারো নাম। এবঞ্চ দেহেন্দ্রিয়া-দিষু হ্লাদময়োঽনুভবো জায়তে স আনন্দঃ। তত্রাপ্য—সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শ-মত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ততঃ ক্রমেণাস্মীত্যৈকাত্মিকাপ্রতীতিমাত্রে-ঽবস্থিতিরায়াতি সাস্মিতা। এতচ্চতুষ্টয়রূপমনুগম্যতে অববুধ্যতে ইতি রূপানুগম স্তস্মাদনুগমাদ্ যোগোঽয়ং সম্প্রজ্ঞাত ইতি। সবিশেষানুভব-রূপং সম্প্রজ্ঞানং বিদ্যতে ইতি সম্প্রজ্ঞাতঃ॥ ১৭॥

ইতিপূর্ব্বে নিরোধের উপায়স্বরূপ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে এই সপ্তদশ সূত্রে অরুণোদয়ের ন্যায় যোগের পূর্ব্বলক্ষণ বিবৃত করা যাইতেছে। দৃশ্যবর্গ যে দ্রষ্টারই সারূপ্যমাত্র, এইরূপ অনুভব যাঁহাদের লাভ হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহাদের বশীকার-লক্ষণ বৈরাগ্য আসিয়াছে, কেবল তাঁহাদের নিকটই যোগের পূর্ব্বরূপ সম্প্রজ্ঞাত নামক যোগের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যোগের একান্ত সন্নিহিত বলিয়াই সম্প্রজ্ঞাতকেও যোগ বলা হয়। এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ চারিপ্রকার, যথা—বিতর্কানুগত বিচারানুগত আনন্দানুগত এবং অস্মিতানুগত। দ্রষ্টার স্বরূপাবস্থানরূপ যোগে উপনীত হইতে হইলে, এই সোপান চতুষ্টয় অবলম্বন করিয়াই আরোহণ করিতে হয়। এমন কোনও সাধনপ্রণালী জগতে অদ্যাপি প্রচলিত হয় নাই, যাহাতে এই সার্ব্বজনীন সুনির্দ্দিষ্ট সোপান পরম্পরাকে অতিক্রম না করিয়াই একেবারে যোগে বা মুক্তিক্ষেত্রে উপনীত হওয়া যায়। ক্রমে আমরা ইহার স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমে বিতর্কানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগের বিষয় বলা হইতেছে—একমাত্র সচ্চিদানন্দ স্বরূপ দ্রষ্টাই যে দৃশ্য দর্শন এবং দ্রষ্টারূপ ত্রিবিধ বিলাস ভঙ্গিমা লইয়া প্রকাশিত হইতেছেন, যখন ইহা প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, অর্থাৎ সাধক যখন ত্রিপুটী জ্ঞানবিষয়ক বিতর্কমাত্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হন, বুঝিতে হইবে—তখন সেই সাধক বিতর্কানুগত

সম্প্রজ্ঞাত যোগে উপনীত হইয়াছেন। কিছুদিন এইরূপ যোগে অবস্থান করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত বিতর্ক বা জ্ঞানের ত্রিবিধ অনুভাস বিদূরিত হইয়া যায়, একমাত্র দ্রষ্টার প্রতিই লক্ষ্য থাকে। এই অবস্থায় কেবল জ্ঞানময় সত্তায় বিচরণ করিবার সামর্থ্য উপস্থিত হয়। ইহাই যোগের দ্বিতীয় সোপান বা বিচারানুগত সম্প্রজ্ঞাতযোগ। এই স্তরে অবস্থান করিতে করিতে দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতিতে এক অননুভূত অপূর্ব্ব হ্লাদময় অনুভব প্রকাশ পাইতে থাকে, একটা আনন্দময় অনুভবই যেন এই শরীর আকারে প্রকাশ পাইতেছে, এমনই বোধ হইতে থাকে, ইহা তৃতীয় সোপান বা আনন্দানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ। ক্রমে এ সমস্ত ভাব তিরোহিত হইতে থাকে, কেবল "অস্মি অস্মি" "আছি, আছি" এইরূপ একাত্মিকা প্রত্যয়মাত্রে উপনীত হওয়া যায়; ইহাই চতুর্থ সোপান বা অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ। অন্যত্র ইহা সাস্মিত-সমাধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যাহা যথার্থ যোগ, যাহা দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান, তাহার একান্ত সন্নিহিত এই যে চতুর্ব্বিধ অনুভব, ইহার প্রথমটী যদি উপস্থিত হয়, তবে অপর তিনটীও অবশ্য আসিয়া থাকে, তজ্জন্য বিশেষ প্রযত্নের প্রয়োজন হয় না। ঈশ্বরত্ব যে কি, তাহা এই সোপান চতুষ্টয়ে আরোহণ করিতে পারিলেই ঠিক ঠিক বুঝিতে পারা যায়। উপনিষদের সেই "ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্" কিংবা "অহংরুদ্রেভির্বসুভি-শ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ" ইত্যাদি ঋগ্বেদোক্ত বাক্যসমূহের প্রকৃত অর্থ যে কি, তাহা এই সম্প্রজ্ঞাত যোগে উপনীত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কিছুতেই বুঝা যায় না। সবিশেষ অনুভবরূপ সম্প্রজ্ঞান বিদ্যমান থাকে বলিয়াই ইহার নাম সম্প্রজ্ঞাত যোগ। সাধকের যত কিছু চেষ্টা যতকিছু উদ্যম, তাহা এই পর্য্যন্তই—এই অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ পর্য্যন্তই। যদি কাহারও ইহা লাভ হয়, তবে বুঝিতে হইবে,—তাহার উদ্যম সার্থক ও পরিসমাপ্ত হইয়াছে, শ্রীগুরুর অহৈতুকী কৃপা তাহার প্রতি বিশেষভাবেই বর্ষিত হইয়াছে।

প্রিয়তম সাধক। যখন তুমি দেখিতে পাইবে—তোমার জ্ঞানময় গুরুদেব বা জ্ঞানশক্তিময়ী মা-ই ত্রিবিধ ভঙ্গিমা লইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, কখনও দৃশ্যে কখনও দ্রষ্টায় কখনও বা দর্শনে তোমার অভীষ্ট দেবতার বিকাশ দেখিতে দেখিতে যখন তুমি নামরূপের বিশিষ্টতা হারাইয়া ফেলিবে, যে আনন্দঘন উপাদানে নামরূপের অভিব্যক্তি, সেইদিকে যখন তোমার লক্ষ্য ফিরিবে, ওগো এই বহুত্বের মধ্যেও যখন একত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িবে, তখনই বুঝিবে তোমার বিতর্কানুগত যোগের অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম প্রথম এই অবস্থা হইতে ক্ষণকাল মধ্যেই ব্যুত্থিত হইয়া পড়িতে হয়। শত চেষ্টায়ও বেশীক্ষণ অবস্থানের সামর্থ্য হয় না। তারপর অধিকতর শ্রদ্ধা বীর্য্য ও কাতরপ্রার্থনার ফলে ঐ ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ অবস্থানের যোগ্যতা আসে; তখন দেখিতে পাওয়া যায় —মায়ের আমার পূর্ব্বোক্তরূপ ভঙ্গিমাত্রয় ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে, কেবল জ্ঞানশক্তিময়ী মহতী সত্তারই প্রকাশ হইতেছে ও তাহাতে বিচরণ করিবার সামর্থ্য আসিয়াছে। এ অবস্থায় মাতৃবক্ষোরূপ উন্মুক্ত মহাপ্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হওয়ার ফলে একটা মুক্তভাব আসিয়া হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে থাকে। অনাদি কালের বদ্ধ জীব মুক্তির আভাস মাত্র পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতে থাকে। ওঃ আমি কি মহান্। আমি অবিনশ্বর, আমি সুখ দুঃখের অতীত, আমি ব্যাপক, আমিই সকল হইয়া রহিয়াছি! নাম নাই, রূপ নাই, কি নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্রবৎ সত্তা আমার! ও ধন্য আমি ধন্য আমি! এইরূপভাব আসিতে থাকে। ইহাই বিচারানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ।

তারপর আসে আনন্দানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ। ইহা আর বলিয়া বুঝাইতে হয় না, ইহার জন্য আর বিশেষ কোন চেষ্টাই করিতে হয় না। ঐরূপ বিচারানুগত যোগে প্রতিষ্ঠিত হইলেই একটা ঘন আনন্দময়—ঘন আহ্লাদময় আমিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। আমি বলিতে দেহ বলিতে ইন্দ্রিয় বলিতে আমির সত্তা বলিতে ঐ অপূর্ব্ব

হ্লাদময় ঘনসত্তা ব্যতীত আর কিছুই প্রতীতি গোচর হয় না। একটা জমাটবাঁধা ঘন আনন্দই আমার স্বরূপ। উর্দ্ধে নিম্নে দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাদ্‌ভাগে আনন্দঘন সত্তা ব্যতীত আর কিছুই যেন নাই, এমনই প্রত্যয় উঠিতে থাকে। ভগবান্ স্বয়ং গীতা শাস্ত্রে বলিয়াছেন—যোগারোহণ কালে ব্রহ্মসংস্পর্শ-জনিত অত্যন্ত সুখভোগ হইয়া থাকে। অভূতপূর্ব্ব সে সুখ, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সে ভোগ।

তারপর ধীরে ধীরে সে ভাবও ক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকে, ক্রমে অস্মিতানুগত যোগের লাভ হয়। এই অবস্থায় "আমি আমাকে জানিতেছি" অথবা "শুধু আমি আছি" এইরূপ প্রত্যয়ধারা উঠিতে থাকে। পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার স্তরের মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে আমিত্বটী এখানে বিশুদ্ধ অস্মিতায় উপনীত হয়। কেবল "অস্মি" এইরূপ বিশুদ্ধ প্রত্যয় ধারায় দাঁড়ায়। মানুষ সাধনা দ্বারা এই পর্য্যন্তই যাইতে পারে, ইহার পরবর্ত্তী যে অবস্থা তাহা ঠিক সাধনা-লভ্য বলা যায় না। উহা কৃপালভ্যই মনে হয়। উহা স্বয়মাগত বাক্যমনের অতীত একটী অবস্থা বিশেষ; কিন্তু সে অসম্প্রজ্ঞাত যোগের কথা এখানে থাকুক। আমরা আবার সম্প্রজ্ঞাত যোগেরই আলোচনা করিব। শুন সাধক! প্রথমে বিতর্কানুগতস্তরে দেখিতে পাওয়া যায়,—আমি ত্রিবিধ ভঙ্গিম-ময়, বিচারানুগতস্তরে দেখিতে পাওয়া যায়--আমি এক মহান্ সত্য। আনন্দানুগত স্তরে সেই আমিকে ঘন আনন্দময় সত্তারূপেই প্রতীতি গোচর হইতে থাকে। কিছুদিন এইরূপ চলে। অনেক সাধক এখানে আসিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। এখান হইতেই নানারূপ বিভূতির বিকাশ হইতে থাকে। ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি বুদ্ধির সাত্ত্বিক লক্ষণ সমূহ এখান হইতেই যথাসম্ভব প্রকাশ পাইতে থাকে। সে যাহা হউক, যাহারা গুরুকৃপায় ঐ সকল ধাঁধাঁর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তীব্র আকাঙ্ক্ষার সহিত অগ্রসর হইতে থাকে, তাহারা বিশুদ্ধ অস্মিতার

সন্ধান পায়। যদিও ইহাও জ্ঞানের এক প্রকার স্পন্দন বা ক্রিয়াশক্তি-মাত্র, যদিও এখানে কালিকধারা থাকিয়া যায়; তথাপি বলিব—যে সাধক মায়ের আমার এই অস্মিতামূর্ত্তির সন্ধান পাইয়াছেন, তিনি ধন্য। মহৎতত্ত্বের সাক্ষাৎকার, ঈশ্বর-দর্শন, বুদ্ধিতে আত্মবোধের উপসংহরণ প্রভৃতি বাক্যে যাহা বুঝায়, তাহাই যোগশাস্ত্রে সম্প্রজ্ঞাত যোগ নামে কথিত হইয়া থাকে। যে স্বগতভেদ বুঝিবার জন্য প্রথম হইতে দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্য অনুভব করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, সেই স্বগতভেদ এখানে আসিলেই সম্যক্ অনুভব যোগ্য হইয়া থাকে। ওগো, কত বলিব আর অনুভবের কথা! এ ক্ষেত্রের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না।

এস সাধক, ছুটিয়া আমার কোলে—এখানে, এই বুদ্ধিময়-ক্ষেত্রে, এই বিজ্ঞানক্ষেত্রে, ইহাই যে আমার উন্মুক্ত বক্ষঃ, তোমাদেরই জন্য যুগ যুগান্তর ধরিয়া এ বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। দেখ শুধু স্নেহে শুধু প্রেমে মুগ্ধ হইয়াই আমার এই অতৃপ্ত আকর্ষণ! আর কতদিন তোমরা আমাকে উপেক্ষা করিয়া বাহিরে বাহিরে ছুটিয়া বেড়াইবে। এস পুত্র, এস প্রিয়, এস সখা, তুমিও এখানে আসিয়া বল—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ॥ ১৮॥

যোগোদয়ং দর্শয়তি বিরামেতি। বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ—প্রত্যয়ঃ সবিশেষরূপঃ, অভ্যাসঃ স্বরূপস্থিতি-প্রযত্নরূপঃ, এতয়োর্বিরামপূর্ব্বক ইত্যর্থঃ। তথা সংস্কারশেষঃ প্রারব্ধসংস্কারমাত্রাবশেষঃ। ন তু সংস্কার-মূলায়া অবিদ্যায়া স্তস্যাস্তু সর্ব্বথাবিলয় এবেতি ভাবঃ। তথাভূতো

যোগোঽন্যঃ সম্প্রজ্ঞাতাদ্ অসম্প্রজ্ঞাত ইত্যর্থঃ। নির্ব্বিশেষবোধমাত্র-স্বরূপত্বান্ন কিঞ্চিৎ সম্প্রজ্ঞায়ত ইত্যসম্প্রজ্ঞাত ইতি যথার্থং নাম।

ননু অবিদ্যাবিলয়েঽপি সংস্কারশেষ ইতি কথং সঙ্গচ্ছতে ; উচ্যতে—সংস্কারোঽত্র প্রারব্ধমাত্রস্বরূপঃ, পূর্ব্বোত্তরয়োস্তু শেষবিনাশৌ যোগোদয়ক্ষণ এব। নায়মস্ত্যেবং নিয়মঃ—কারণনাশক্ষণ এব সকলকার্য্যনাশ ইতি। নহি কারণনাশে কার্য্যসত্তা ন দৃষ্টচরীতি বক্তুং শক্যতে। তথা হি দবিষ্ঠদেশাবস্থিতনক্ষত্রনাশেঽপি তৎকিরণদর্শনাৎ, ভ্রমাপগমেঽপি তৎকার্য্যদর্শনাচ্চ, অবিদ্যায়া বিলয়েঽপি তৎকার্য্যাণাং প্রারব্ধসংস্কারাণাং শেষঃ সম্ভবত্যেব। উক্তঞ্চ "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" ॥ ১৮ ॥

এইবার যোগোদয় প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্ব্বসূত্রে বুদ্ধি বা মহৎতত্ত্বের সাক্ষাৎকারকে সম্প্রজ্ঞাতযোগ নামে বর্ণনা করা হইয়াছে। আর এইসূত্রে—যিনি বুদ্ধিরও পরপারে অবস্থিত, সেই পুরুষ বা পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের বিষয়ই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ নামে বর্ণিত হইবে। যদিও বুদ্ধি হইতে পুরুষে আরোহণ, অথবা পুরুষ হইতে বুদ্ধিতে অবতরণকালে, ঐ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অব্যক্ত নামক অপর একটী তত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়, তথাপি উহা অনুভবের বিষয়ীভূত নহে বলিয়াই এস্থলে সে সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। পরে উপযুক্ত অবসরে অব্যক্তের কথা বলা হইবে। এক্ষণে সূত্রের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। ঋষি বলিলেন—"বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষঃ অন্যঃ।" সাধক একটু ধীরভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিও। সূত্রটী সহজ নহে, প্রতিপাদ্য বিষয়ও সহজ নহে, আরও বিশেষ কথা এই যে, আমরা ঋষিবাক্যকে যে পথে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, সে পথটীও অক্ষুণ্ণ। সূত্রে বলা হইয়াছে—

"বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ"। ইহার অর্থ—প্রত্যয় এবং অভ্যাসের বিরামপূর্ব্বক। সবিশেষ জ্ঞানের নাম প্রত্যয় এবং স্বরূপস্থিতি প্রযত্নের নাম অভ্যাস, ইহা পূর্ব্বে ঋষি স্বয়ংই বলিয়াছেন। এই যে প্রত্যয় এবং অভ্যাস, এই দুইটীর যখন একান্ত বিরাম হইয়া যায়, তখন যে অবস্থাটী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই অন্য। অন্য কি? সম্প্রজ্ঞাত হইতে অন্য—পৃথক অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—দ্রষ্টার যে স্বরূপাবস্থান, তাহাই যোগ। এস্থলে ঐ যোগেরই নাম দেওয়া হইল অসম্প্রজ্ঞাত। কোনরূপ বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না অর্থাৎ কোনরূপ কিছু সম্প্রজ্ঞাত হওয়া যায় না বলিয়াই ইহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত। ইহা স্বয়ং জ্ঞমাত্রস্বরূপ বোধমাত্র-স্বরূপ; সুতরাং জ্ঞানক্রিয়া জন্য যে সবিশেষজ্ঞান বা সম্প্রজ্ঞান, তাহা কোনরূপেই থাকিতে পারে না। স্বরূপে অবস্থানকালে বুদ্ধিক্ষেত্রের যে সূক্ষ্মতম প্রযত্নবিশেষ (অর্থাৎ অস্মিতা প্রভৃতি) তাহাও থাকে না; সেইজন্যই ঋষি "বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ" শব্দটীর প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রত্যয়ও থাকে না, আর অভ্যাসও থাকে না, উভয়েরই বিরাম হইয়া যায়। কি যে থাকে, তাহাও কিন্তু বলিবার উপায় নাই "ন তত্র বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ" বাক্য মনের অতীত সে স্বরূপ, মূকাস্বাদনবৎ অবর্ণনীয় সে স্বরূপ, ভাষায় কিরূপে প্রকাশ করা যাইবে! তথাপি কিন্তু বলিতে হয়, ভাবিতে হয়, বুঝিতে হয়, বুঝাইবারও চেষ্টা করিতে হয়। অখণ্ডসত্তা পূর্ণজ্ঞান এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা থাকে। অথবা অসৎ বলিতে কিছু থাকেনা, বিশিষ্ট জ্ঞান বলিতে কিছু থাকে না, অভাব বা দুঃখ বলিতেও কিছু থাকে না; তাই সে অবস্থার নাম সচ্চিদানন্দ। স্বরূপে উপনীত হওয়ার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্তই স্বরূপে অবস্থান করিবার জন্য প্রযত্ন থাকে বা অভ্যাস থাকে। "উত্তীর্ণে তু সরিৎপারে নাবা বা কিং প্রয়োজনম্।" নদীপার হইলে আর নৌকার প্রয়োজন কি? স্বরূপলাভ হইলে অভ্যাসের প্রয়োজন থাকে না। আবার "ইহা জানি, উহা জানি

আমাকে জানি" ইত্যাদি যে জানাগুলি বা প্রত্যয়গুলি, ইহারাও থাকিতে পারে না। সকল জানার যিনি জানা, তাঁহার প্রকাশ হইলে, স্বরূপের অজ্ঞানমূলক যে খণ্ডজ্ঞানরূপ প্রত্যয় সমূহ তাহারও বিরাম অবশ্যম্ভাবী। এইরূপে প্রত্যয় এবং অভ্যাস উভয়ই বিরামপ্রাপ্ত হইয়া যায়। অভ্যাস সম্বন্ধে আরও একটী বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে মানুষমাত্রেই সচ্চিদানন্দ প্রয়াসী, সুতরাং সকলেই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে স্বরূপস্থিতি-প্রযত্নরূপ অভ্যাসপরায়ণ। যে মানুষ ইহা জানে, দেখে—অনুভব করে, সেই যোগী বা সাধক নামে কথিত হয়। আর যাহারা ইহা জানে না তাহারা সাধারণ মানুষ নামেই পরিচিত। যাহা হউক, বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্ব পদটী প্রয়োগ করিয়া ঋষি যে কত গূঢ়ার্থ প্রকাশ করিলেন, তাহা কিয়ৎপরিমাণে আলোচিত হইল। এইবার "সংস্কারশেষঃ" কথাটী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। উহার অর্থ—সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ সংস্কারের মূল যে অবিদ্যা, তাহা সম্যক্ বিনষ্ট হইয়া যায়। জ্ঞান সূর্য্যের উদয় হইলে স্বরূপের অজ্ঞানরূপ যে অন্ধকার অর্থাৎ অবিদ্যা, তাহার বিলয় হইবেই। অল্প আলোকরূপ অন্ধকার প্রচণ্ড-আলোকে আত্মদান করিয়া একেবারেই মিলাইয়া যায়. আত্মহারা হইয়া যায়—নিজের পৃথক সত্তা হারাইয়া ফেলে। যে পৃথক্ সত্তাজ্ঞানকে অর্থাৎ অজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া সংস্কাররাশি পুঞ্জীভূত হইতেছিল, তাহা চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং পুনরায় আর নূতন সংস্কার সৃষ্টি হইয়া বন্ধন জন্মাইতে পারে না। এই জন্যই বলা হয়—অসম্প্রজ্ঞাত যোগ একবার মাত্র চকিতবৎ লাভ হইলেও জীবের অজ্ঞানবন্ধন চিরতরে খসিয়া পড়ে। জীব জীবন্মুক্ত হয়। যাবতীয় দ্বৈতসত্তার প্রত্যয় একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়। কি অবশিষ্ট থাকে, তাহার উত্তর দিবার জন্যই ঋষি বলিলেন—সংস্কারশেষঃ।

সংস্কার ত্রিবিধ—সঞ্চিত, আগামী ও প্রারব্ধ। যে সংস্কার গুলি বর্ত্তমান জন্মেই ফলপ্রদানে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, তাহার নাম

প্রারব্ধ। যেগুলি এ জীবনে ফলদান করিবে না, তাহা সঞ্চিত। এবং ইহ-জীবনে ফলাসক্তি পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমূহের যে বীজ থাকিয়া যায়, তাহা আগামী বা ভবিষ্যৎ নামে কথিত হইয়া থাকে। অসম্প্রজ্ঞাত যোগ লাভ হইলে এই ত্রিবিধ সংস্কারের মধ্যে মাত্র প্রারব্ধ সংস্কারই অবশিষ্ট থাকে। পূর্ব্বোক্তর অর্থাৎ সঞ্চিত এবং আগামী সংস্কারের যথাক্রমে অশ্লেষ ও বিনাশ হয়। তাৎপর্য্য এই যে—দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগ লাভ হইলে যোগীর পুনরায় দেহধারণ করিতে হয় না; সুতরাং সঞ্চিত সংস্কার সমূহের ফলপ্রদান অসম্ভব হয়। আর ঐরূপ যোগী যতদিন স্থূল শরীর ধারণ করিয়া বর্ত্তমান থাকেন, ততদিন যদিও নানাবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তথাপি তাহাতে অহংকর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধি এবং ফলাসক্তি না থাকা হেতু আগামী সংস্কার উৎপন্নই হয় না। এইরূপে দ্বিবিধ সংস্কার যোগলাভের সঙ্গে সঙ্গেই নিস্ফল বা বিলয় হইয়া যায়। মাত্র প্রারব্ধ সংস্কারই অবশেষ থাকে; তাই সূত্রে "সংস্কারশেষঃ" কথাটীর উল্লেখ আছে।

সাধক মনে রাখিও, সূত্রস্থ এই সংস্কারশেষ কথাটীর মধ্য দিয়া তুমি দুইটী রহস্য অবগত হইতে পারিলে। একটী—সংস্কারমাত্রই অবশেষ থাকে; কিন্তু সংস্কারের কারণ যে অবিদ্যা, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। অপরটী—প্রারব্ধ সংস্কারমাত্রই অবশেষ থাকে, সঞ্চিত এবং আগামী সংস্কার থাকে না।

এইবার একটী আশঙ্কা উপস্থিত হইবে—অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া গেলেও, অবিদ্যাজন্য সংস্কার অবশেষ থাকিবে, এ কথাটী যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে কি? উত্তরে বলা যাইবে—না যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। কারণের নাশক্ষণেই যে যাবতীয় কার্য্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। অবিদ্যারূপ কারণের নাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সঞ্চিত এবং আগামী সংস্কার বিলয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং কারণ নাশের সঙ্গেই কার্য্য নাশ ত হয়ই, তবে সকল কার্য্য নাশ হয় না, প্রারব্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকে। আরও একটী কথা এই যে,

কারণ বিনষ্ট হইলে কার্য্য থাকিতেই পারে না, এ কথাও সর্ব্বত্র বলা যাইতে পারে না; যেহেতু—অতি দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত কোনও নক্ষত্র বিনষ্ট হইয়া গেলেও কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহার কিরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্পভ্রান্তি বিদূরিত হইলেও ভীতি হৃৎকম্প প্রভৃতি কিছুক্ষণ থাকে। সুতরাং অবিদ্যারূপ কারণের নাশ হইলেও তাহার কার্য্যরূপ প্রারব্ধ সংস্কারসমূহ ভোগাবসান পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। অন্যথা জীবন্মুক্ত কথাটী শুধু কথামাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। স্বয়ং শ্রুতিও বলেন—ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির সেই জীবনই শেষ জীবন। আর তাহার জন্ম হয় না। যতদিন দেহপাত না হয় অর্থাৎ প্রারব্ধ সংস্কারের ভোগাবসান না হয়, ততদিন সে জীবিতবৎ প্রতীয়মান হয়। অতঃপর সে কৈবল্যপদ বা নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করে।

भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् ॥ १९ ॥

क्रमसद्योमोक्षयोः प्रयोजकत्वाद्द्विविधस्तावदसंप्रज्ञातयोगोदयो भवप्रत्यय उपायप्रत्ययश्च तयोराद्यं निर्दिशति भवप्रत्ययेति। भवप्रत्ययो भवः—स्वतः क्रमिकैव सञ्जातोदयः, प्रत्ययः—एकात्मप्रत्यय असम्प्रज्ञात-योग इत्यर्थः। स केषामित्याह—विदेहप्रकृतिलयानाम्। तथाहि आनन्दानुगतसम्प्रज्ञातयोगप्रभावेन विनष्टो येषां स्थूलदेहात्मबोधस्ते विदेहाः सूक्ष्मशरीराभिमानिन इत्यर्थः। तथाभूता ये लयंगता मृतास्ते विदेहलया उच्यन्ते। एवमस्मितानुगत सम्प्रज्ञातयोगप्रभावेन विनष्टो येषां सूक्ष्मदेहात्मबोधः कारणशरीरमात्राभिमानिनो ये लयं गता मृतास्ते प्रकृतिलया उच्यन्ते। एतेषां न पुनः स्थूलं जन्म न वा तदानीमेवासम्प्रज्ञातयोगोदयान्मोक्षः किन्तु विदेहभावापन्नाः प्रकृति-भावमापन्ना वा पूर्व्वलब्धेश्वरप्रणिधानजन्यवेगवशादेव देवयानमार्गेण क्रमशोऽसम्प्रज्ञातयोगमधिगता मुच्यन्त इति भावः।

এক্ষণে ক্রমান্বয় দুইটী সূত্রে অসম্প্রজ্ঞাত যোগোদয়ের প্রকার ভেদ কথিত হইবে। দুই প্রকারে অসম্প্রজ্ঞাত যোগোদয় হইতে পারে, তন্মধ্যে ভবপ্রত্যয় ক্রমমুক্তি প্রযোজক এবং উপায়প্রত্যয় সদ্যোমুক্তি প্রযোজক। এই উনবিংশ সূত্রে ভবপ্রত্যয়ের অর্থাৎ ক্রমমুক্তির বিষয়ই বলা হইতেছে। ভব শব্দের অর্থ—স্বতঃক্রমেণ সঞ্জাতোদয়ঃ অর্থাৎ আপনা হইতেই ক্রমে ক্রমে আবির্ভূত হয়। প্রত্যয় শব্দের অর্থ এস্থলে একাত্মপ্রত্যয় অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ। মুক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে হইতে স্বাভাবিক নিয়মে অসম্প্রজ্ঞাত যোগের উদয় হইলে, তাহাকে ভবপ্রত্যয় বলা যায়। এইরূপ ভবপ্রত্যয় যোগ লাভ হয় কাহাদের, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্যই সূত্রে "বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্" কথাটীর উল্লেখ হইয়াছে। যাহারা বিদেহলয় প্রাপ্ত কিংবা যাহারা প্রকৃতি লয় প্রাপ্ত, তাহাদেরই এইরূপ ভবপ্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত যোগ লাভ হইয়া থাকে।

এইবার বিদেহলয় এবং প্রকৃতিলয় কাহাকে বলে, তাহাই বলা হইতেছে। যাহাদের স্থূলদেহাত্মবোধ বিদূরিত হইয়া যায়, তাহারাই বিদেহ। পূর্ব্বোক্ত আনন্দানুগত সম্প্রজ্ঞাত-যোগ-সিদ্ধ ব্যক্তিগণেরই দেহাত্মবুদ্ধি দূর হয়, অন্যের নহে। সুতরাং তাদৃশ যোগিরাই যথার্থ বিদেহপদবাচ্য। ঐরূপ যোগীদের মধ্যে যাহারা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ লাভকরিবার পূর্ব্বেই প্রাক্তন কর্ম্মবশে মৃত্যুমুখে পতিত হয়—দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, তাহারাই বিদেহলয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঠিক এইরূপ অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগের প্রভাবে যাহাদের সূক্ষ্মশরীরাভিমানও বিদূরিত হইয়াছে, কিন্তু কারণদেহাভিমান দূর হয় নাই, তাহারা যদি অসম্প্রজ্ঞাত যোগ লাভের পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, তবে তাহাদিগকে প্রকৃতিলয় বলা যায়। এই উভয়বিধ যোগীরই ভবপ্রত্যয়রূপে যোগলাভ হইয়া থাকে। বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় যোগিগণ যেহেতু স্থূল সূক্ষ্ম ও দেহাভিমান হইতে মুক্ত হইয়াছেন, সেই হেতুই তাঁহাদের স্থূলদেহধারণ একেবারেই

অসম্ভব। পক্ষান্তরে তাঁহারা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হইতে বঞ্চিত হওয়ার ফলে, সেই সময়েই অর্থাৎ মৃত্যুকালেই মুক্তিলাভ করিতে পারেন না বটে, কিন্তু তাহারা গুরুকৃপায় পূর্ব্বলব্ধ পরমেশ্বরপ্রণিধানজন্য বেগ বশেই দেবযান মার্গে আরোহণ করিয়া ক্রমে অসম্প্রজ্ঞাত-যোগরূপ ব্রহ্মলোকে উপনীত হন ও মুক্তিলাভ করেন। এই দেবযান মার্গ বা ক্রমমুক্তির পথকেই "ভবপ্রত্যয়" বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। যথা, "যে চেমে অরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে তে অর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি অর্চ্চিষোঽহঃ। অহ্নঃ আপূর্য্যমাণপক্ষম্, আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্‌ষড়ুদঙাদিত্য এতি মাসাংস্তান্, মাসেভ্যঃ সংবৎসরম্। সংবৎসরাদাদিত্যম্। আদিত্যাচ্চন্দ্রমসম্। চন্দ্রমসো বিদ্যুতম্। তৎপুরুষোঽমানব এতান্ ব্রহ্ম গময়তি। এষ দেবযানঃ পন্থাঃ ইতি। এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং না বর্ত্তন্তে।" যাহারা সংসারাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত তপস্যা উপাসনা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর অর্চ্চি অর্থাৎ অগ্নির অভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। ক্রমে অর্চ্চি হইতে অহঃ, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ষণ্মাস, সম্বৎসর, আদিত্য, চন্দ্রমা ও বিদ্যুৎকেপ্রাপ্ত হন। অর্থাৎ সেই সেই স্থানের অভিমানী দেবতা তাহাকে বহন করিয়া বিদ্যুৎ অভিমানী দেবতা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন। সেইখানে এক অমানব পুরুষ অর্থাৎ গুরুশক্তি আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে উপনীত করেন। গুরুশক্তিই তাহাকে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইজ্ঞানে উপনীত করিয়া দেন। ইহাই দেবযান মার্গ। এই মার্গে যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা আর মানবদেহ ধারণরূপ পুনরাবর্ত্তন করেন না অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন। গীতাশাস্ত্রেও এই দেবযান মার্গে বিচরণ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এবং "তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্ম বিদো জনাঃ" বাক্যে দেবযানমার্গে প্রস্থিত ব্যক্তিগণের ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মোক্ষই কীর্ত্তিত হইয়াছে। অন্যান্য শাস্ত্রে যাহা ব্রহ্মপ্রাপ্তি মুক্তি প্রভৃতি নামে অভিহিত, যোগশাস্ত্রে তাহাই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ নামে

কথিত হইয়াছে। যাহারা পূর্ব্বোক্ত ক্রমমুক্তির পথে আরোহণ করিয়া অসম্প্রজ্ঞাত যোগলাভ করেন, তাহাদিগের সেই লাভকে "ভবপ্রত্যয়" বলা হয়। যাহারা বিদেহলয় বা প্রকৃতিলয় অর্থাৎ যাহারা আনন্দানুগত বা অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাতযোগসিদ্ধ, তাহারাই মৃত্যুর পরে পূর্ব্বোক্ত অর্চ্চিরাদি মার্গে অগ্রসর হইতে হইতে অসম্প্রজ্ঞাত যোগে উপস্থিত হইয়া থাকেন। এই যে অগ্রসর হওয়া, ইহাতে তাহাদের কোন কর্ত্তৃত্ববিশেষ থাকে না, যেন অবশভাবেই—সেই সেই অভিমানী দেবতাগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে থাকেন এবং ক্রমে একাত্ম-প্রত্যয়রূপ মুক্তিক্ষেত্রে উপনীত হন। এইজন্যই এই যে ক্রমমুক্তি, ইহা ভবপ্রত্যয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সাধক! স্মরণ রাখিও "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"। যাহারা কল্যাণকারী তাহারা কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। যোগপথে চলিতে চলিতে যদি তোমার দেহান্তও হইয়া যায়, তথাপি তুমি পরমগতি লাভ করিতে পারিবে। সুতরাং হতাশের বা ভয়ের কোন কারণই নাই, তুমি পূর্ণ উৎসাহে অগ্রসর হও। যদি সম্প্রজ্ঞাত যোগ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পার, তথাপি দেবযান মার্গে তোমার মোক্ষ সুনিশ্চিত। ভবপ্রত্যয় রূপেই তোমার একাত্মপ্রত্যয় বা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ লাভ হইবে—তুমি মুক্ত হইবে।

श्रद्धावीर्य्यस्मृति-समाधि-प्रज्ञापूर्व्वक इतरेषाम् ॥ २० ॥

अथोपायप्रत्ययं सद्योमुक्तिमिहैवासम्प्रज्ञातयोगोदयं कथयति श्रद्धेति। श्रद्धा गुरुवेदान्तवाक्येषु दृढ़प्रत्ययरूपा, वीर्य्यं शमदमोपरति तितिक्षारूपम्, स्मृतिरात्मनो ब्रह्मस्वरूपविषयिणी, समाधिर्वक्ष्यमाणार्थमात्रनिर्भासरूपः, प्रज्ञा सम्प्रज्ञातसमाधिजन्या विवेकरूपा,

এতাঃ পূর্ব্বা উপায়ভূতা যস্য স তথাভূতঃ, শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধি-প্রজ্ঞাপূর্ব্বকো যোগঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ ইহৈব মুক্তিপ্রযোজক ইতি শেষঃ। স কেষামিত্যাহ ইতরেষাম্—বিদেহপ্রকৃতিলয়ভিন্নানাম্ দেহভৃন্মুমুক্ষূণা-মিত্যর্থঃ। উক্তঞ্চ—ন চ তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ইহৈব লীযন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

এই বিংশ সূত্রে, পূর্ব্বসূত্রপ্রস্তাবিত সদ্যোমুক্তি প্রযোজক উপায়প্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত যোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। "ইতরেষাং" অন্য সকলের অর্থাৎ বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় ভিন্ন যাহারা দেহধারী মুমুক্ষু তাহাদের, এই উপায়প্রত্যয় হইয়া থাকে। ইহ জীবনেই যথোক্ত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অসম্প্রজ্ঞাত যোগে অধিকারী হইয়া তাঁহারা জীবন্মুক্ত আখ্যা লাভ করিতে পারেন। এইরূপ যোগিগণকে আর ক্রমমুক্তির পথে দেবযান মার্গে গমন করিতে হয় না, ইহাঁরা সদ্যই মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। শ্রুতিতেও উক্ত আছে—"তাঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না ; এই খানেই বিলীন হইয়া যায়।" সে যাহা হউক, কি কি উপায় অবলম্বন করিলে এই সদ্যোমুক্তি লাভ হইতে পারে, সেই কথা বলিতে গিয়াই সূত্রে শ্রদ্ধা বীর্য্য স্মৃতি সমাধি ও প্রজ্ঞার বিষয় উক্ত হইয়াছে। শ্রদ্ধা—গুরুবাক্যে ও বেদান্ত বাক্যে দৃঢ় প্রত্যয়। বীর্য্য—শম দম উপরতি ও তিতিক্ষা। স্মৃতি—"আমি ব্রহ্মই" এই রূপ ধ্রুব বিষয়কস্মরণ। সমাধি—ধ্যেয়বিষয় মাত্রের নিঃশেষ রূপে প্রকাশ (সমাধির বিষয় পরে বিশেষ ভাবে বলা হইবে) প্রজ্ঞা—সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিজাত-জ্ঞান—অনুভূত-সত্যজ্ঞান (কল্পনা নহে)। এই সকল উপায় পূর্ব্বক যে অসম্প্রজ্ঞাত যোগের বা অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহাই উপায়প্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত নামে কথিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বনে একাত্মপ্রত্যয় লাভ হয়

বলিয়াই ইহার নাম উপায়প্রত্যয়। পূর্ব্বসূত্রে যে ভবপ্রত্যয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কিন্তু অবশভাবে আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়।

এইবার শুন সাধক! যাহারা মহৎতত্ত্ব পর্য্যন্ত সাক্ষাৎকার করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহারা ক্রমমুক্তি লাভ করে, আর যাহারা এই জীবনেই তীব্রপ্রযত্ন ও সাধনসামগ্রী-সহায়ে অগ্রসর হইয়া দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়, তাহারা উপায়প্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত যোগী হইয়া সদ্যোমুক্তি লাভ করে। ইহা অতি স্পষ্ট কথা। ইহার মধ্যে প্রকৃতিলয় কথাটী নিয়া অনেকে অনেক রকম তর্ক বিচার ও মীমাংসা উপস্থিত করেন, তাঁহাদের সে সকল তর্ক একটু ধীরভাবে আলোচনা করিলে বেশ স্পষ্টরূপেই বুঝা যায়—ঐ সকল ব্যাখ্যাতৃগণ তত্ত্বদর্শী নহেন, অনুমানের উপর—প্রতিভার উপর দাঁড়াইয়া যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। আশাকরি যোগরহস্যের পাঠকগণকে সে সকল অস্পষ্ট সন্দিগ্ধ বাক্য কখনও সত্যদৃষ্টি হইতে অর্থাৎ অভ্রান্ত ঋষিবাক্যের সরল অর্থ গ্রহণ হইতে দূরে রাখিতে পারিবে না। স্বয়ং যোগেশ্বরী মা-ই আমাদিগকে সত্যের উজ্জ্বল আলোকে এই সকল দুর্গম স্থান অতিক্রম করিবার সামর্থ্য প্রদান করিবেন। সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা পরে বলা হইবে বলিয়াই এস্থলে আর বেশী আলোচনা করা হইল না।

তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ ॥ ২১ ॥

কীদৃশৈরয়মচিরগম্য ইত্যাহ তীব্রেতি। তীব্রোঽতিশয়িতঃ সংবেগঃ আগ্রহো যোগলিপ্সা যেষাং তথাভূতানাং বিযোগবিধুরাণামিত্যর্থঃ। আসন্নঃ সন্নিহিতো যোগ ইতি শেষঃ। যদাসন্নো ভবতি যোগ স্তদাভ্যাস-বৈরাগ্যেষু তীব্রসংবেগরূপলক্ষণং দৃশ্যতে যোগিনামিতি ভাবঃ।

কি প্রকার সাধকের পক্ষে এই যোগ অচিরগম্য, তাহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। ঋষি বলিলেন—যাহাদের তীব্র সংবেগ আসিয়াছে, তাহাদের পক্ষেই এই যোগ আসন্ন অর্থাৎ সন্নিহিত, ইহা বুঝিতে হইবে। তীব্র শব্দের অর্থ অতিশয়, সংবেগ শব্দের অর্থ আগ্রহ অর্থাৎ যোগলিপ্‌সা। এক কথায় বুঝিতে হইবে—পরম প্রেমাস্পদ প্রিয়তম পরমাত্মার বিরহ যাহাদের অতিশয় প্রবল, সেই বিয়োগ-বিধুর ব্যক্তিগণকেই তীব্র-সংবেগ-সম্পন্ন সাধক বলা যায়, এইরূপ সাধকগণের পক্ষেই যোগ আসন্ন হইয়া থাকে। প্রিয়তম পাঠক! আমরা কিন্তু অন্য এক দিক্ দিয়াও ইহা বুঝিয়া থাকি, তাহা এই যে—যখন বহু বহু জন্মকৃত সাধনা বলে গুরুকৃপায় কাহারও যোগ সন্নিহিত হয়, তখন তাহার মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্যের প্রতি তীব্র-সংবেগরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। সমুদ্রের টান পড়ে বলিয়াই নদীতে স্রোতের বেগ লক্ষিত হয়।

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোঽপি বিশেষঃ ॥ ২২ ॥

সংবেগতারতম্যাৎ সান্নিধ্যতারতম্যং দর্শয়তি মৃদ্বিতি। মৃদুর্মন্দঃ, মধ্যো নাতিশয়িতঃ, অধিমাত্রঃ—অধিকা মাত্রা যস্য স তথাভূতোঽতিশয়িত ইত্যর্থঃ। এতেষাং ভাবো মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বং তস্মাৎ। ততোঽপি পূর্ব্বোক্তাদাসন্নাদপি বিশেষো বৈলক্ষণ্যং দৃশ্যত ইতি শেষঃ। তথাহি—মৃদুতীব্র-সংবেগানামাসন্নঃ মধ্যতীব্রসংবেগানামাসন্নতরঃ, এবমধিমাত্র-তীব্রসংবেগানামাসন্নতম ইতি ॥ ২২ ॥

সংবেগের তারতম্য বশতঃ সান্নিধ্যেরও তারতম্য হয়। সংবেগ তিন প্রকার, মৃদু মধ্য এবং অধিমাত্র। যাহাদের মৃদু তীব্রসংবেগ

অর্থাৎ বিয়োগ-বিধুরতা মৃদু, তাহাদের পক্ষে যোগ আসন্ন। যাহাদের তীব্রসংবেগ মধ্য, তাহাদের পক্ষে যোগ আসন্নতর, এবং অধিমাত্র তীব্রসংবেগ সম্পন্ন যোগীর পক্ষে উহা আসন্নতম। অধিমাত্র শব্দের অর্থ অতিশয়। সংবেগের তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেই যোগ কিরূপ সন্নিহিত হইয়াছে, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। প্রাক্তন সুকৃতি না থাকিলে যোগলিপ্সা হয় না। আবার অনেক স্থলে দেখা যায়—ইচ্ছা আছে, কিন্তু সাধনসামগ্রী নাই। অক্ষুণ্নস্বাস্থ্য, দরিদ্রতা বা ঋণ না থাকা, সদ্গুরুলাভ, পরিজন বর্গের সহায়তা, স্থান ও কালের অনুকূলতা, ধারণাবতী মেধা প্রভৃতিকে সাধন সামগ্রী বলা হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন—বহু সহস্র লোকের মধ্যে একজন মাত্র যোগসিদ্ধির জন্য যত্ন করে। যত্নপরায়ণ অসংখ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে কোনও একজন যথার্থরূপে আমাকে জানিতে পারে অর্থাৎ যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

প্রিয়তম পাঠক! এই সকল বাক্যদ্বারা তোমাদের হতাশ বৃদ্ধি করা হয় নাই; বরং উৎসাহবৃদ্ধিই করা হইয়াছে। বর্ত্তমান জীবনে যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত সুকৃতির ফলস্বরূপ যোগ লাভ হইতে পারে না, এরূপ নিশ্চয় জ্ঞান ত কিছু নাই। বরং আশা খুবই আছে—এক মুহূর্ত্তে সকল অন্ধকার কাটিয়া যাইতে পারে। নাই বা থাকিল তীব্রসংবেগ, নাই বা হইল যোগ আসন্নতম, যোগপথে চলিতে আরম্ভ করিতে ক্ষতি নাই, বরং লাভই আছে। ঐপথে আরোহণ করিলে গুরুকৃপায় তীব্রসংবেগ আসিতে পারে, এবং উহাই একান্ত সম্ভব। যাহারা দুর্ব্বল কাপুরুষ তাহারাই পথের দুর্গমতা বা দীর্ঘতা দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়ে। পথ যতই দুর্গম বা দীর্ঘ হউক, তোমাদের পক্ষে উহা অতিক্রম করা কখনও কঠিন নহে। ঐ শুন ভগবান্ আবার এ কথাও বলিয়াছেন—অতি দুরাচার ব্যক্তিও আমাকে অনন্যভাক্ হইয়া ভজনা করিতে পারে, এবং এইরূপ ভজনার ফলে অতি অল্পকাল মধ্যেই দুরাচার ব্যক্তিও

ধর্ম্মাত্মা হইয়া উঠে ও নিত্যশান্তিময়-পদ লাভ করিতে পারে। সুতরাং হতাশের বা বিষাদের কিছুই কারণ নাই। তোমরা শরণাগত হইবার জন্য চেষ্টা কর। আত্মসমর্পণ করিবার জন্য উদ্যত হইলে স্বয়ং যোগেশ্বরই তোমাদের যোগী করিয়া দিবেন।

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা ॥ ২৩ ॥

নিত্যসিদ্ধো হি যোগস্তথাপি বিযোগবিলয়দ্বারেণামোঘং যোগোপায়ং নির্দ্দিশতীশ্বরেতি। ঈশ্বরে বক্ষ্যমাণলক্ষণে প্রণিধানাৎ প্রকর্ষেণ নিধানাৎ নিধীয়তে অনেনেতি নিধানং তস্মাৎ সম্যগাত্মসমর্পণাৎ, বা এব নিশ্চিতঃ, যোগোদয় ইতি শেষঃ। পরমেশ্বরে হ্যাত্মনিবেদনমহঙ্কার নিষ্কাসনপূর্ব্বকমেবাব্যাধিতোপায়ো যোগস্য, যতস্তীব্রসংবেগাদয়ঃ পূর্ব্বরূপাস্তদনুগ্রহেণৈব বা বির্ভবন্তীতি ॥ ২৩ ॥

ত্রয়োবিংশ সূত্রে অমোঘ যোগোপায় বর্ণিত হইয়াছে। যদিও যোগ কোনরূপ উপায়দ্বারা সাধ্য নহে, যদিও যোগ নিত্যসিদ্ধই, তথাপি উপায় অবলম্বন করিয়া যোগের অন্তরায়গুলি দূর করা যায় বলিয়াই সেই উপায় গুলিকে যোগেরই উপায় বলা হয়। বাস্তবিকই যোগের যত রকম উপায় বা প্রণালী প্রচলিত আছে, সে সকলই বিয়োগ বিলয়ের জন্য, "আমি বিয়োগী" এই মোহ বিদূরিত করিবার জন্য, যোগের জন্য নহে। দেশভেদে সম্প্রদায়ভেদে অধিকারভেদে উপায় সমূহেরও বহু ভেদ আছে এবং থাকিবে; কিন্তু এই যোগশাস্ত্র-বর্ণিত উপায়টী সার্ব্বজনীন এবং অব্যর্থ। অদ্য পর্য্যন্ত কোন সাধক এই উপায় অবলম্বন করিয়াও বিফলকাম হইয়াছেন, একথা শুনিতে পাওয়া যায় না। সে যাহা হউক, মহর্ষি পতঞ্জলিদেব যোগের উপায় নির্দ্দেশ

করিতে গিয়া বলিলেন—"ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" ঈশ্বর প্রণিধান হইতেই যোগ লাভ হয়। সূত্রের শেষে যে বা শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে, উহার অর্থ 'এব', অর্থাৎ ই, (নিশ্চয়)। ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে নিশ্চয় যোগলাভ হয়। ঈশ্বর কি, তাহা পরসূত্রে বর্ণিত হইবে। প্রণিধান শব্দের অর্থ সম্যক্ আত্মসমর্পণ। প্র শব্দের অর্থ প্রকর্ষ অর্থাৎ সম্যক্; নিধান শব্দের অর্থ আশ্রয়। ঈশ্বরে সম্যক্ আশ্রয় গ্রহণ করার নাম ঈশ্বর-প্রণিধান। যদিও জীবমাত্রেই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সর্ব্বতোভাবেই ঈশ্বরের আশ্রিত, তথাপি উহা যতদিন বাচনিক জ্ঞানমাত্রে পর্য্যবসিত থাকে, ততদিন উহাদ্বারা কোন ফলই লাভ হয় না। বাচনিক জ্ঞান জ্ঞানই নহে। "আমি যে সর্ব্বতোভাবেই ঈশ্বরের আশ্রিত" এই সত্যজ্ঞানে উপনীত হওয়ার জন্যই যত কিছু সাধনা, যতকিছু তপস্যা বা যতকিছু ছুটাছুটি। একমাত্র আত্ম-সমর্পণদ্বারাই এই আশ্রিতবোধ প্রকাশিত হয়। অহঙ্কার-নিষ্কাসন না হইলে সম্যক্ আত্মসমর্পণ হয় না। আত্মসমর্পণ না হইলে আশ্রয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। আশ্রয় যে কি, তাহা জানিতে না পারিলে যোগ লাভ হয় না। যাঁহার সহিত যুক্ত বা মিলিত হইতে হইবে, তাঁহার সম্যক্ পরিচয়ের জন্যই এই প্রণিধানের—এই আত্মসমর্পণের প্রয়োজন।

ইতিপূর্ব্বে "যমেবৈষ বৃণুতে" এই শ্রুতি বাক্যের ব্যাখ্যায় যে বরণ বা আত্মসমর্পণের কথা বলা হইয়াছে, প্রিয়তম সাধক, এইবার তাহা স্মরণ কর। যে ব্যক্তি আত্মাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে বরণ করে, আত্মসমর্পণ করে, তাহার নিকটই ইনি স্বকীয় স্বরূপ প্রকাশিত করেন। ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশিত হইলেই যোগ সিদ্ধ হইয়া যায়—জীব সম্যক্‌ভাবে ঈশ্বরসত্তায় মিলাইয়া যায়। জীব বলিতে পৃথক কিছুই থাকেনা। মিথ্যা অহঙ্কার চিরদিনের তরে বিলয় প্রাপ্ত হয়। এই সকল বিষয় সম্যক্ পরিদর্শন করিয়াই যোগ শাস্ত্রের ঋষি ঈশ্বরপ্রণিধানকেই যোগের অমোঘ উপায় রূপে নির্দ্দেশ করিলেন। অভ্যাস বৈরাগ্য

তীব্রসংবেগ প্রভৃতি যত কিছু এই পথের সহায়, সে সকলই এই ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে আবির্ভূত হইয়া থাকে। একদিনে এই প্রণিধান হয় না, চেষ্টাদ্বারা অভ্যাসের দ্বারা ইহা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। আরে! সত্য সত্যই ত আমরা ঈশ্বরেই অবস্থিত রহিয়াছি। সত্য সত্যই ত আমরা সর্ব্বতোভাবেই ঈশ্বরেরই আশ্রিত, কিন্তু যে কারণেই হউক, আমরা তাহা ভুলিয়া অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া জগতে বিচরণ করি, এই যে ভুল, ইহা ভাঙ্গা কি অসম্ভব বা অসাধ্য? কখনই না, যাহা সত্য সত্যই ভুল, তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া অসম্ভব হইবে কেন, বরং একান্তই সম্ভব। আমরা ভাঙ্গিতে চাই না, ভুলকেই ভালবাসি; তাই অসম্ভব মনে হয় বা বিলম্ব হয়। যেদিন যথার্থ এই ভুল ভাঙ্গিতে ইচ্ছা হইবে, সেইদিন সেই মুহূর্ত্তে স্বয়ং ঈশ্বরই স্বরূপ প্রকাশ করিয়া আমাদের এই ভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া দিবেন। আমাদের মিথ্যা অহঙ্কার তখন লজ্জায় চিরতরে মস্তক অবনত করিয়া থাকিবে।

সাধক! যদি যথার্থই যোগী হইতে চাও, তবে তুমি যে সম্প্রদায়েরই হও না কেন, তুমি এই ঈশ্বর-প্রণিধানের পথে অগ্রসর হও। কিরূপভাবে প্রণিধান করিতে হয়, তাহা "সাধনসমর" নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। তোমার প্রত্যেক প্রচেষ্টা—জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মই ঈশ্বরপ্রণিধানকে লক্ষ্য করিয়া অনুষ্ঠিত হউক। গীতার "মামেকং শরণং ব্রজ" কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া মুক্তির দিকে অগ্রসর হও, তোমার জীবন নিশ্চয়ই ধন্য হইবে।

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

অথ নয়ৈবেশ্বরং পরিচায়যতি ক্লেশেতি। ক্লেশা অবিদ্যাদয়ঃ অনাত্ম-প্রত্যয়রূপাঃ, কর্ম্ম হেয়োপাদেয়রূপং, বিপাকঃ কর্ম্মফলম্, আশয়ঃ কর্ম্ম-

বীজং সংস্কারাঃ, তৈরপরামৃষ্টঃ অসংস্পৃষ্টো যঃ পুরুষবিশেষঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যাং বিলক্ষণঃ পুরুষোত্তম ইত্যর্থঃ স ঈশ্বরঃ। তথা চ—"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥"

এই সূত্র হইতে ক্রমান্বয় তিনটী সূত্রে ঋষি ঈশ্বরের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যিনি ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক এবং আশয়ের দ্বারা অস্পৃষ্ট, তিনি ঈশ্বর। ক্লেশ—অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ, ইহারা পরে ব্যাখ্যাত হইবে। এস্থলে এই পর্য্যন্ত বুঝিয়া রাখিলেই চলিবে—অনাত্মপ্রত্যয়ই ক্লেশ, "আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু আছে'' এইরূপ যে প্রত্যয় তাহাই ক্লেশের স্বরূপ। কর্ম্ম—ত্যাগ ও গ্রহণ; অনাত্মপ্রত্যয় হইতেই এই ত্যাগগ্রহণরূপ কর্ম্ম হইয়া থাকে। যদা সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তদা কেন কিং কুর্য্যাৎ। বিপাক—পরিণাম অর্থাৎ কর্ম্মফল; কর্ম্ম থাকিলেই কর্ম্মফলরূপ বিপাক অবশ্যম্ভাবী। আশয়—কর্ম্মবীজ অর্থাৎ সংস্কারসমূহ। কর্ম্ম থাকিলেই তজ্জন্য সংস্কারও থাকিবে। এই যে ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক এবং আশয়রূপ চারিটী—যাহা জীবমাত্রে প্রতিনিয়ত দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা দ্বারা যিনি একেবারেই অস্পৃষ্ট অর্থাৎ এই চারিটীর স্পর্শমাত্রও যাঁহাতে নাই, তিনি ঈশ্বর।

সাধারণ কথায় বলা হয় "যাঁহাহইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়" তিনি ঈশ্বর। বেদান্ত শাস্ত্রও "জন্মাদ্যস্য যতঃ" প্রভৃতি বাক্যে ঠিক এই কথাই বলিয়া থাকেন। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ সর্ব্বত্রই ঋষিগণ ঈশ্বরের পরিচয় দিতে গিয়া এই বিশ্বের যিনি কারণ, তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এক্ষণে দেখিতে হইবে—এই যোগশাস্ত্রে যেরূপ ভাবে ঈশ্বরের পরিচয় পাওয়া গেল, ইহার সহিত বেদান্তাদিশাস্ত্রপ্রতিপাদিত ঈশ্বরের সহিত কোন বিলক্ষণতা আছে কিনা। না, তাহা নাই, থাকিতে পারে না, ঈশ্বর একজনই। সুতরাং যিনি যে

ভাবেই বলুন, সেই এক ঈশ্বরের কথাই বলিয়াছেন। কেবল আর্য্য-শাস্ত্রানুযায়িগণের নহে, অন্যধর্ম্মাবলম্বিগণেরও ঈশ্বর পৃথক নহেন। সকল দেশের সকল সম্প্রদায়েরই ঈশ্বর একজন। এই বিশ্বমানব একই ঈশ্বরের সন্তান। অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ ঈশ্বরকে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা পর্য্যন্তই বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু এই পুণ্যভূমি ভারতের দেব-মানবগণ ঈশ্বরকে জগতের উপাদান কারণরূপেও দর্শন করিয়া থাকেন। ঈশ্বর কেবল জগতের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারী নহেন, এই জগৎ আকারে আকারিতও তিনিই হইয়া রহিয়াছেন। "এক আমি বহু হইব" বলিয়া ঈশ্বরই বৃত্তিসারূপ্য লইয়া বহু সাজিয়া এই বিশ্ব সাজিয়া রহিয়াছেন। এই জীবজগতেও দেখিতে পাওয়া যায়, কোনরূপ বহুত্বের মধ্যে আসিয়া পড়িলেই "ইহা আমি নহে" "উহা আমি নহে" এইরূপ অনাত্মপ্রত্যয় আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহা আমি নহে, তাহা আছে, এইরূপ যে জ্ঞান—তাহাই ক্লেশ। আমাকে আমার জানায় কোনরূপ বেগ বা ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না; কিন্তু আমি ভিন্ন আর কিছুকে জানিতে হইলেই একটা বেগ বা ক্লেশ উপস্থিত হয়। এই যে অনাত্মপ্রত্যয় রূপ ক্লেশ, ইহা ঈশ্বরে নাই। তিনি ইহাদ্বারা একেবারেই অপরামৃষ্ট—অস্পৃষ্ট—কারণ তিনি এই বিশ্বকে আমিভিন্ন অন্য কিছুই দেখেন না। আমিই বিশ্বরূপে প্রকাশিত। বিশ্বের যত বৈচিত্র্যই থাকুক্ না কেন, সবই আমি। এই জ্ঞান তাঁহার নিত্য সিদ্ধ, সুতরাং অনাত্মপ্রত্যয়রূপ ক্লেশ ঈশ্বরে কোন প্রকারেই থাকিতে পারে না।

তারপর কর্ম্মের কথা। কর্ম্ম বলিলেই ত্যাগ বা গ্রহণ বুঝা যায়। ত্যাগ বা গ্রহণ অনাত্মপ্রত্যয় হইতেই আবির্ভূত হয়। যেখানে আমি ছাড়া কিছু নাই, সুতরাং সেখানে কর্ম্মও কিছু নাই—থাকিতে পারে না। আপত্তি হইতে পারে, ঈশ্বরে কর্ম্ম নাই, তবে এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপ ব্যাপার কিরূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে? উত্তর এই যে—সৃষ্টিব্যাপারে তাঁহার কোনরূপ প্রযত্ন বিশেষ আবশ্যক

হয় না। উহা স্বতঃই নিশ্বাসের ন্যায় আপনা হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অনাদিসিদ্ধ লীলাই এইরূপ অযত্নসিদ্ধ বিশ্ব প্রকাশের হেতু। একজন মানুষ কোনরূপ প্রযত্ন ব্যতীত কোন কিছু ভাবিতেও পারে না; সুতরাং মানুষের পক্ষে এই যে অযত্নসিদ্ধলীলা, ইহার ধারণা সহজসাধ্য না হইলেও, সে নিঃশ্বাসের দৃষ্টান্তে কতকটা বুঝিয়া লইতে পারে। এবং এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া লইয়া যদি সে সাধনায় অগ্রসর হয়, বৃথা বিতর্ক না করিয়া ঈশ্বরের সন্ধানে ছুটিতে থাকে, তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে—ঈশ্বর কিরূপে কোনরূপ কর্ম্ম না করিয়াও এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিয়া থাকেন। আচ্ছা সাধক! তুমি যখন নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠ, তখন এই বিশ্বের সৃষ্টি কি তুমিই কর না? তারপর যতক্ষণ জাগ্রত অবস্থায় থাক বা স্বপ্নাবস্থায়ই থাক, ততক্ষণ এই বিশ্বকে তুমিই কি রক্ষা পালন বা ভোগ কর না? তারপর যখন সুষুপ্তিতে প্রবেশ কর, তখন এই বিশ্বকে কি তুমিই সর্ব্বথা বিলয় করিয়া দাও না? এই যে ব্যাপার তুমি কর, ইহাতে তোমার কি বিন্দুমাত্রও প্রযত্ন বিশেষের প্রয়োজন হয়? দেখ, তুমি কোনরূপ কর্ম্ম অর্থাৎ ত্যাগ বা গ্রহণ কিছু না করিয়াই প্রতিদিন তোমার বিশ্বকে সৃষ্টি করিতেছ—ভোগ করিতেছ, আবার প্রলয়ও করিতেছ। ইহাতে তোমার কোনরূপ কর্ম্মই করা হয় না, অথচ বিশ্বব্যাপার সম্পন্ন হইয়া যায়। যাহা তোমাতেই সম্ভব, তাহা ঈশ্বরে অসম্ভব হইবে কেন? তবে প্রভেদ এই যে, তুমি এই বিশ্বকে তোমাহইতে পৃথকরূপে দেখ, আর ঈশ্বরে তাহা দৃষ্ট হয় না। ঈশ্বর সকলই আত্মস্বরূপে দর্শন করেন। তুমি অনাত্ম-প্রত্যয় সম্পন্ন জীব, সুতরাং ক্লেশের মধ্যেই অবস্থিত। আর ঈশ্বরে এই ক্লেশ নাই।

এইবার বিপাক এবং আশয়ের কথা সহজ-বোধ্য হইয়া পড়িবে। যাঁহার কর্ম্ম নাই, তাঁহার কর্ম্মফল এবং কর্ম্মজন্য সংস্কারও থাকিতে পারে না, সুতরাং ঈশ্বর যে বিপাক এবং আশয় হইতেও দূরে অবস্থিত,

তাহা বলাই বাহুল্য। এইখানেই জীবে এবং ঈশ্বরে ভেদ। জীব—ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক এবং আশয়দ্বারা একান্তভাবেই সংস্পৃষ্ট, আর ঈশ্বর এ সকল হইতে একান্ত মুক্ত। জীব সাধনাদ্বারা ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যতক্ষণ সেই অবস্থায় থাকে, ততক্ষণের জন্য সেও ঐ ক্লেশ কর্ম্মাদি হইতে মুক্ত থাকে। আবার ব্যুথিত হইলেই সে ঐ সকলদ্বারা সংস্পৃষ্ট হইয়া পড়ে। জীবিতকালে এইরূপ পুনঃ পুনঃ মুক্তির আস্বাদ লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিলেই জীব জীবন্মুক্ত আখ্যালাভ করে। কিন্তু সে অন্য কথা :—

এইবার সূত্রস্থ "পুরুষবিশেষ" কথাটীর তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। পুরুষাভ্যাং বিশেষঃ "পুরুষবিশেষঃ"। এস্থলে এইরূপ পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস করিতে হইবে। পুরুষকে বুঝিবার জন্য ইহাঁর তিন প্রকার বিভাগ করা হইয়াছে—ক্ষর অক্ষর এবং পুরুষোত্তম। তন্মধ্যে অধিভূত (১) পুরুষকে ক্ষর এবং কূটস্থ (২) পুরুষকে অক্ষর বলা হয়। এই দুই প্রকারের পুরুষ হইতে যিনি বিশেষ অর্থাৎ বিলক্ষণ, তিনিই পুরুষবিশেষ। এক কথায় পুরুষ বিশেষ বলিতে একমাত্র পুরুষোত্তমকেই বুঝায়। যিনি পুরুষোত্তম তিনি ক্ষর এবং অক্ষর হইতে অন্য, "পরমাত্মা" নামেও তিনিই উদাহৃত হইয়া থাকেন। যিনি এই লোকত্রয়ের (৩) মধ্যে সম্যক্ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, ইহাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই অব্যয় —নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু, তিনিই ঈশ্বর। গীতাশাস্ত্রের পঞ্চদশ অধ্যায়ের এই বাক্যগুলি যাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা এই যোগশাস্ত্রোক্ত "পুরুষ বিশেষ" কথাটীর রহস্য নিশ্চয়ই অবধারণ করিতে পারিবেন। "লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ" বলিয়া যিনি অর্জ্জুনকে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তিনিই পুরুষোত্তম,

---

(১) অধিভূত পুরুষ—যিনি ভূত ভৌতিক বস্তুতে অভিমানী অর্থাৎ জীব।

(২) কূটস্থ পুরুষ—যিনি স্বয়ং নির্ব্বিকার থাকিয়া এই বিশ্ব প্রপঞ্চের প্রকাশক।

(৩) লোকত্রয়—জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি।

তিনিই ঈশ্বর, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ত্রিলোকধারক। এই যোগশাস্ত্র তাঁহাকেই পুরুষ বিশেষ বলিয়া ক্লেশকর্ম্মাদির অস্পৃষ্ট বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহাতে বিন্দুমাত্র ক্লেশ বা অনাত্মপ্রত্যয় থাকে, এরূপ কেহ এই বিশ্বের বিধাতা হইতে পারেন না, কারণ বিশ্বের যে স্থানটী বা যে পরমাণুটী তাঁহার আত্মবোধের বাহিরে পড়ে, তাহার কোন সত্তাই থাকিতে পারে না। সুতরাং যিনি এই বিশ্বের বিধাতা, তিনিই ক্লেশ কর্ম্মাদির দ্বারা অস্পৃষ্ট পরমাত্মা।

সাধক! স্মরণ কর।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সর্ব্বভেদাতীত পরমাত্মাকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার কল্পিত স্বগতভেদের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, অন্যথা তাঁহাকে বুঝিবার কোন উপায়ই নাই। এই বিশ্ব যে তাঁহারই স্বগতভেদ, ইহা বেশ স্পষ্টভাবে অনুভব করিতে পারিলেই, সর্ব্বভেদাতীত বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়; তাই ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার প্রয়োজন। একমাত্র প্রণিধানের সাহায্যে একমাত্র আত্মসমর্পণের সাহায্যেই উহা সম্ভব; তাই যোগদর্শনে এই ঈশ্বরপ্রণিধান সূত্রের অবতারণা।

तत्र निरतिशयं सर्व्वज्ञबीजम् ॥ २५ ॥

ईश्वरमहिमानमुपस्थापयति तत्रेति। तत्रेश्वरे परमात्मनि निरतिशयं निष्क्रान्तमतिशयादिति देशकालयोरपि प्रकाशके परमेश्वरे तदवच्छिन्नस्यैव वस्तुनो न न्यूनत्वमतिशयत्वं वा। सर्व्वज्ञबीजं सर्व्वज्ञोऽक्षरपुरुषो व्यवहारिकेश्वरो हिरण्यगर्भ इति यावत्तस्यापि बीजं सत्यज्ञानादिलक्षणं समुपलभ्यते प्रणिधानकृद्भिर्योगिभिरिति शेषः।

ঈশ্বরের সম্যক্ পরিচয় লাভের জন্য এই সূত্রে তাঁহার বিশেষ মহিমা উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাঁহাতে নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞ-বীজ (আছে)। যাহা অতিশয় হইতে নিষ্ক্রান্ত, তাহারই নাম নিরতিশয়। যে সকল বস্তু দেশাবচ্ছিন্নরূপে বা কালাবচ্ছিন্নরূপে প্রতীতিগোচর হয়, সেই সকল বস্তুতেই ন্যূনত্ব বা অতিশয়ত্ব পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু ঈশ্বর দেশ এবং কালেরও প্রকাশক; সুতরাং তাঁহাতে ন্যূনত্ব বা অতিশয়ত্বাদিরূপ কিছু থাকিতেই পারে না। এ বিষয়ে উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে,—প্রকৃতির পরে অবস্থিত যে পুরুষ, তিনিই পরাকাষ্ঠা,তিনিই নিরতিশয়, তিনিই পরমগতি। কেবল ইহাই নহে, সর্ব্বজ্ঞ বীজও একমাত্র তাঁহাতেই। সর্ব্বজ্ঞ শব্দের অর্থ যিনি সর্ব্ববস্তুর জ্ঞাতা, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞানশক্তিমত্তায় যিনি অভিমান করেন, তিনি শাস্ত্রে অক্ষরপুরুষ, কূটস্থচৈতন্য অথবা হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনিই ব্যবহারিক ঈশ্বররূপে পরিচিত, অর্থাৎ মানুষ সাধারণতঃ এই অক্ষরপুরুষকেই ঈশ্বর বলিয়া জানে এবং উপাসনা করে। এই যে অক্ষরপুরুষ বা সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহারও বীজ সেই ঈশ্বরে। বীজ শব্দের অর্থ কারণ, "যেন বিনা যন্ন ভবতি তৎ তস্য কারণম্।" যাহাকে ব্যতীত যে বস্তু হইতেই পারেনা, তাহাই সেই বস্তুর কারণ। এস্থলেও দেখা যায়—সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়াই অক্ষর পুরুষের প্রকাশ হয়, সুতরাং যিনি যথার্থ ঈশ্বর, তিনি সর্ব্বজ্ঞ যে অক্ষর পুরুষ, তাঁহারও বীজ বা কারণ। তাই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্"। ক্ষরপুরুষ—জীব অল্পজ্ঞ। অক্ষরপুরুষ—ব্যবহারিক ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। আর যিনি সর্ব্বজ্ঞেরও বীজ, তিনিই পুরুষোত্তম, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ঈশ্বর। আশঙ্কা হইতে পারে—যিনি পরমাত্মা, তিনিত নিরস্ত-সমস্ত-দ্বৈতপ্রপঞ্চ; সুতরাং তিনি ঈশ্বর কিরূপে হইবেন। যিনি ভাবাতীত ত্রিগুণরহিত অদ্বয়বোধমাত্র স্বরূপ,তিনি কিরূপে "লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্তি", কিরূপে তিনি এই লোকত্রয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট

হইয়া ইহাকে ধারণ করিবেন? আপাতদৃষ্টিতে এ আপত্তি উঠিতে পারে বটে; কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরকে সত্তাস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ বস্তুরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এরূপ সংশয় উপস্থিত হইতেই পারে না। আরে "জগৎ আছে" এই কথাটা বলিলে বাস্তবিক কি বুঝায়—"আছে" বা সত্তারূপ যে বস্তু, তাহাই জগৎ আকারে প্রকাশ পাইতেছে। ইহাই ত 'জগৎ আছে' কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য্য! আচ্ছা, তাহা হইলে দেখ দেখি, এ জগৎকে কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। এ জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুর মধ্য দিয়া সত্তারূপে বা প্রকাশরূপে কে অনুপ্রবিষ্ট! ঐ যিনি সত্তারূপে প্রকাশরূপে সমস্তজগতের কারণরূপে অবস্থান করিতেছেন, তিনিই ত যথার্থ ঈশ্বর। তবে—ঈশ্বরত্বরূপ অভিমান তাহাতে নাই, "আমি এ জগতের অধিষ্ঠাতা পাতা সংহর্ত্তা," এরূপ ভাবনা তিনি কখনও করেন না। তিনি নিত্য নির্ব্বিকার আত্মারাম পরমাত্মা পরমেশ্বর। এত বিকারের কারণ হইয়াও তিনি নির্ব্বিকার থাকিতে পারেন, ইহাই তাঁহার মহত্ত্ব, ইহাই তাঁহার পরমত্ব।

আরও দেখ—একজন মানুষকে দেখিয়া তুমি স্বচ্ছন্দে বলিয়া থাক, "এই একটী জীব"। এরূপ প্রয়োগ করিবার সময় মাংসপিণ্ড মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সর্ব্বায়ব-সমন্বিত চৈতন্যকেই জীব বলিয়া বুঝিয়া থাক। বাস্তবিক কিন্তু জীব বলিতে ঐ দেহাদি হইতে পৃথক, অথচ দেহাদিতে উপহিত চৈতন্যমাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। ঠিক এইরূপ ঈশ্বরশব্দেও প্রথম দৃষ্টিতে সর্ব্বজ্ঞ যে অক্ষর পুরুষ তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হয়, কিন্তু একটু বিচার দৃষ্টিতে দেখিলে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, ঐ যে সর্ব্বজ্ঞ অক্ষর পুরুষ, তিনি বাস্তবিক ঈশ্বর নহেন, ব্যবহারিক ঈশ্বরমাত্র; কিন্তু যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা, যিনি ঐ সর্ব্বজ্ঞ কূটস্থপুরুষেরও বীজ, তিনিই যথার্থ ঈশ্বর। তিনিই "পরেষাং পরম্"।

আশঙ্কা হইতে পারে—এরূপ নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ঈশ্বরে কিরূপ

প্রণিধান হইতে পারে? হাঁ হইতে পারে, যিনি নিত্য-নিরঞ্জন সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা, তিনিই লীলাবশতঃ বৃত্তিসারূপ্য লইয়া জীব সাজিয়া রহিয়াছেন, এবং অক্ষরপুরুষ বা ব্যবহারিক ঈশ্বরও তিনিই, অন্য কেহ নহে। ক্ষরপুরুষ এবং অক্ষরপুরুষ উভয়ই যে সেই পুরুষোত্তম, ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিলেই প্রণিধান আসিয়া পড়িবে। নিগুর্ণ ঈশ্বরে কি করিয়া প্রণিধান হইবে, এ সকল প্রশ্নও তখন উঠিতে পারিবে না। সাধক! তুমি যাহা পাও—ক্ষরপুরুষই পাও আর অক্ষর পুরুষই পাও, তাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া আত্মনিবেদন করিতে থাক। যেদিন যথার্থ আত্মনিবেদন হইয়া যাইবে, সেই দিনই দেখিতে পাইবে "ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" সকল সংশয় বিদূরিত হইয়াছে। কিরূপে ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে পারে, তাহা পরবর্ত্তী সূত্রেই বলা হইবে। যাহারা যথার্থ আত্মসমর্পণযোগী অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বর প্রণিধানকারী সাধক, তাহারাই পরমেশ্বরে নিরতিশয়ত্ব ও সর্ব্বজ্ঞ-কারণত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকে। যাহা নিরতিশয় বস্তু, তাহা নিশ্চয়ই সর্ব্বজ্ঞেরও বীজস্বরূপ হইবে। অথবা যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞেরও বীজ, সেই হেতু তাঁহাতে নিরতিশয়ত্ব থাকিবেই। অক্ষর পুরুষ পর্য্যন্ত অতিশয়, অর্থাৎ অতিশয়ত্বের পরিসমাপ্তি অক্ষরপুরুষ পর্য্যন্তই। কিন্তু যিনি "অক্ষরাদপি চোত্তমঃ" অক্ষরপুরুষ হইতেও উত্তম, তাহাতে অতিশয়ত্ব বলিয়া কিছু থাকিতেই পারে না। তিনি ত আর সাপেক্ষ পদার্থ নহেন, যে ন্যূনাধিকত্ব কল্পিত হইবে! এস্থলে আর একটী বিশেষ কথা এই যে, সর্ব্বজ্ঞ বলিলেই সর্ব্বশক্তিমান্ও বুঝা যায়; কারণ, জ্ঞানই শক্তি—জ্ঞানাতিরিক্ত শক্তি নাই। অতএব সর্ব্বজ্ঞের বীজ বলাতে সর্ব্বশক্তিরও বীজ বলা হইল। যিনি সর্ব্বজ্ঞ-ত্বের এবং সর্ব্বশক্তিমত্তারও কারণ, যিনি নিরতিশয়, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ক্লেশ কর্ম্মাদি দ্বারা সম্যক্ অস্পৃষ্ট পুরুষ বিশেষ পুরুষোত্তম।

পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬ ॥

পরমকারুণিকগুরুরপি স এবেত্যাহ পূর্ব্বেষামিতি। পূর্ব্বেষাং ব্রহ্মাদীনামপি কিমুতেদানীন্তনানামিতি ভাবঃ। গুরুরাত্মস্বরূপোপদেষ্টা স এবেতি শেষঃ। কুতএবমিত্যাহ কালেনানবচ্ছেদাৎ। কালো হি নাম ক্রিয়ারূপঃ ক্রিয়াবচ্ছিন্নরূপো বা, তদবচ্ছেদরহিতাৎ। নহি দেশকালাবচ্ছিন্নস্যাত্মস্বরূপোপদেষ্টৃত্বমনবচ্ছেদাদাত্মনঃ। ইদমত্রাবধেয়ম্—প্রণিধানমিচ্ছায়ৈ গুরুরূপেণ তস্যৈবেশ্বরস্যাবির্ভাবো ভবেদর্জ্জিত শিষ্যোচিতগুণস্যাধিকারিণ ইতি। অতএব গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধির্নরকায়েত্যুক্তম্। ব্রহ্মপালবঃ সর্ব্বলোকগুরবঃ স ঈশ্বর এব। উক্তঞ্চ "যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনি"তি। দেবে ঈশ্বরে।

পূর্ব্বোক্ত দুইটী সূত্রে ঈশ্বরের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে যোগিগণের পক্ষে হতাশ হইবারই সম্ভাবনা, কারণ এরূপ ঈশ্বর সর্ব্বথা বাক্য মনের অতীত, সুতরাং তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া প্রণিধান চলিতেই পারে না, অথচ বলা হইয়াছে—ঈশ্বর প্রণিধানই যোগলাভের অব্যর্থ উপায়। এইরূপ হতাশ বা আশঙ্কা দূর করিবার জন্যই এই সূত্রের অবতারণা। ঋষি বলিলেন—তিনি (সেই ঈশ্বর) পূর্ব্ববর্ত্তিগণেরও গুরু, যেহেতু তাঁহাতে কালের অবচ্ছেদ নাই।

ঈশ্বর "পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ"। যাঁহারা আদি গুরু নামে খ্যাত, ব্রহ্মা প্রজাপতি ঋষিগণ আচার্য্যগণ, যাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুরূপে এ জগতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ঈশ্বর তাঁহাদেরও গুরু। সূত্রে যে "অপি" শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা দ্বারা বুঝা যায়, যিনি গুরুগণেরও গুরু, বর্ত্তমান কালীয় জনগণেরও যে গুরু একমাত্র

তিনিই, এ বিষয়ে আর সংশয় কি? এককথায় একমাত্র ঈশ্বরই সকলের গুরু। গুরু শব্দের অর্থ—আত্মস্বরূপের উপদেষ্টা। যিনি নিজের স্বরূপ প্রকাশিত করেন, তিনিই যথার্থ গুরু। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে "আত্মাই স্বকীয় স্বরূপ প্রকাশিত করেন"; সুতরাং যিনি পুরুষোত্তম, যিনি পরমাত্মা, যিনি ঈশ্বর, তিনি ব্যতীত অন্য কেহই গুরু হইতে পারেন না।

কেন পারেন না? যেহেতু আর সকলেই যে কালের দ্বারা অবচ্ছেদ প্রাপ্ত। কাল বলিতে কেহ কেহ ক্রিয়াকেই বুঝিয়া থাকেন, কেহ বা ক্রিয়ার আধারকে কাল বলিয়া থাকেন, সে তর্ক এখানে তুলিবার আবশ্যক নাই। আমরা বুঝিব, যাহা দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তাহা কখনও দেশকালের অতীত বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিতে পারে না। ঈশ্বর যেহেতু দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, সেই হেতুই তাঁহার স্বরূপ তিনি ভিন্ন অন্য কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব গুরু বলিতে একমাত্র ঈশ্বরকেই বুঝায়। গুরু-গীতার মন্ত্রগুলি পাঠ করিলেও এই সত্যই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তবে মনুষ্যশরীররূপে যে গুরু স্থূলে প্রত্যক্ষ হয়, তিনি কে? তিনি গুরুরই স্থূল অভিব্যক্তি মাত্র। পরমাত্মা ব্রহ্ম ঈশ্বর প্রভৃতি যেরূপ এক একটী নাম, "গুরু" এই শব্দটীও সেইরূপ তাঁহারই একটী নাম মাত্র। ইহা কখনও কোন মানুষের নাম হইতে পারে না। যিনি ঈশ্বর, তিনিই জীবের কল্যাণের জন্য, প্রণিধান শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এইজন্যই গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিলে নরকগামী হইতে হয় শাস্ত্রে এরূপ উল্লেখ আছে। যতদিন গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি না হয়, ততদিন ঠিক গুরুলাভ হয় না। গুরুলাভ না হইলে বুঝিতে হইবে,—এখনও শিষ্যোচিত গুণ অর্জ্জিত হয় নাই। যখন কোন মানুষ ঠিক ঠিক শিষ্যোচিত গুণের অধিকারী হয় অর্থাৎ ঈশ্বর প্রণিধান করিবার অধিকার লাভ করে, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে ঈশ্বরকেই গুরুরূপে লাভ করিয়া সে ধন্য হয়। উপনিষদেও উক্ত

হইয়াছে, যাহার গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি হয়, কেবল তাঁহার নিকটই উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য অর্থ সমূহ প্রকাশিত হয়। তদ্‌ভিন্ন অপর সকলে কেবল শুকপাখীর মত শব্দাবৃত্তিই করিয়া থাকে। সকল দেশে সকল সম্প্রদায়েরই এই গুরুরূপে ঈশ্বরের আবির্ভাব একান্ত স্বীকৃত সত্য। ঈশ্বরের অনন্তশক্তি, তন্মধ্যে যাহা কৃপাশক্তি বা অনুগ্রহশক্তি নামে পরিচিত, তাহাই ঘনীভূত হইয়া মনুষ্যদেহরূপে প্রকটিত হইয়া থাকে। তাই গুরু সর্ব্বদা কৃপালুই হইয়া থাকেন। গুরুর রোষও শিষ্যের কল্যাণের জন্যই। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বরই জীব সন্তানগণের প্রতি স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া স্থূল মনুষ্য-দেহের মত প্রতিভাত হইয়া থাকেন। যাঁহার নিকট আত্মা স্বকীয় স্বরূপটী প্রকাশিত করিবেন, সেই ব্যক্তিরই গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি হয়। অথবা সেই ব্যক্তি ঈশ্বরকেই গুরুরূপে পাইয়া থাকে। গুরুতে কাহারও ঈশ্বর-বোধ হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা একমাত্র প্রণিধানের দ্বারাই হইয়া থাকে। যে ঈশ্বর-প্রণিধান যোগের অমোঘ উপায়, সেই প্রণিধান গুরুরূপধারী ঈশ্বর হইতেই আরম্ভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গুরুকে যথার্থ ঈশ্বররূপে স্বীকার করিয়া লইতে পারে, সে নিশ্চয়ই নির্ব্বিচারে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হয়; এবং এইরূপ আত্মসমর্পণ যেদিন নিষ্পন্ন হইয়া যায়, সেইদিন হইতেই সে আত্মস্বরূপের বা যোগের সন্নিহিত হইতে থাকে। এ নিয়মের অন্যথা কখনও হয় না। যেস্থলে ইহার অন্যথা পরিদৃষ্ট হইবে, বুঝিও সেস্থলে ঠিক ঠিক ঈশ্বরবোধ হয় নাই, সুতরাং আত্মনিবেদনও হয় নাই। যে মহতী শক্তির হাতে— যে স্নেহময়ী মায়ের চরণে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া সাধক পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারে, সেই শক্তিরই ঘনীভূত বিকাশ মনুষ্য-দেহরূপে প্রতীয়মান গুরু। এ সকল তত্ত্ব "সাধনসমর" গ্রন্থে সুন্দররূপে বলা হইয়াছে। দেশে যে আজকাল গুরুবাদ তুলিয়া দিবার জল্পনা কল্পনা চলিতেছে, উহা বালকোচিত চঞ্চলতা মাত্র।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥

অথ তৎপ্রণিধানবীজমুপদিশতি তস্যেতি। তস্য পরমগুরোরীশ্বরস্য বাচকঃ প্রকাশকঃ প্রতিবন্ধাপনয়নরূপঃ। প্রণবো গুরুমুখাজ্জ্ঞাতব্যো মন্ত্রবিশেষঃ। মন্ত্ররাজে নাদবিন্দুযুতে ত্রয়োদশস্বরে শূদ্রাণান্তু চতুর্দ্দশস্বরে রূঢ়োঽপি প্রণবশব্দঃ প্রণূয়তেঽনেনেতি যৌগার্থবলাৎ সম্প্রদায়সিদ্ধ-সর্ব্বমন্ত্রোপলক্ষকঃ বাচ্যার্থস্য বিলক্ষণত্বেঽপি সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং ব্রহ্মৈকলক্ষ্যত্বাৎ। বীজমিতি চাস্যান্বর্থং নাম। তথাহি বটকণিকায়ামিব মহামহীরুহঃ সূক্ষ্মতমে নাদবিশেষে বাচকে বিরাজতে বাচ্যস্যেশ্বরস্য সর্ব্বো মহিমা। উক্তঞ্চ "বাচকেঽপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্য এব প্রসীদতীতি" ॥ ২৭ ॥

এই সূত্রে ঈশ্বরপ্রণিধানের বীজ উপদিষ্ট হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—প্রণব তাঁহার বাচক। সেই পরমগুরু পরমেশ্বরের বাচক প্রণব মন্ত্র। বাচক শব্দের অর্থ প্রকাশক। ইহা সত্য যে, স্বপ্রকাশ ঈশ্বরের প্রকাশক কখনও প্রণব হইতে পারে না; তথাপি প্রণবকে বাচক বলা হয়। অভিপ্রায় এই যে—ঈশ্বর স্বপ্রকাশ হইলেও যোগিচিত্তের মলিনতারূপ প্রতিবন্ধক বশতঃই সেই স্বপ্রকাশ ঈশ্বর অপ্রকাশিতই থাকেন। প্রণবের সাহায্যে সেই মলিনতারূপ প্রতিবন্ধকসমূহ দূরীভূত হইয়া যায়। এইরূপে প্রণবকে ঈশ্বরের বাচক বলা যায়। প্রণবশব্দের অর্থ—গুরুমুখ হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রবিশেষ। যদিও প্রণবশব্দে সাধারণতঃ মন্ত্রশ্রেষ্ঠ নাদ-বিন্দুযুক্ত ত্রয়োদশ স্বরবর্ণ এবং শূদ্রের পক্ষে চতুর্দ্দশ স্বরবর্ণ বুঝাইয়া থাকে, তথাপি "প্রকৃষ্টরূপে নুত অর্থাৎ স্তুত হয় ইহা দ্বারা" প্রণব শব্দের এইরূপ যৌগিক অর্থ অবলম্বন করিয়া বলা যায় যে, এস্থলে প্রণব শব্দটী সম্প্রদায়-সিদ্ধ অর্থাৎ গুরু-পরম্পরাক্রমে আগত সর্ব্ববিধ

মন্ত্রেরই উপলক্ষণ। ঐরূপ যে কোন মন্ত্রই হউক না কেন এবং মন্ত্র যে কোন ভাষায়ই হউক না কেন, যদিও উক্ত মন্ত্রসমূহের বাচ্যার্থগত ভেদ পরিলক্ষিত হয়, তথাপি লক্ষ্যার্থে কোন ভেদই নাই। কারণ, যাবতীয় মন্ত্রেরই লক্ষ্যার্থ সেই অদ্বয় ব্রহ্ম। সুতরাং প্রণব-শব্দে গুরুমুখ হইতে প্রাপ্ত যে কোন মন্ত্রই বুঝা যাইতে পারে। এবং এইরূপ বুঝাই একান্ত সঙ্গত। অন্যথা যাহারা প্রণবমন্ত্র ওঁকার হইতে বঞ্চিত, তাহাদের পক্ষে ঈশ্বরপ্রণিধান অসম্ভব হইয়া পড়ে। অথচ ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যে, যে কোন ব্যক্তি ঐ মন্ত্র ব্যতীতও ঈশ্বরপ্রণিধানে সিদ্ধ হইতে পারে। আর একটী কথা আছে—যে কোন মন্ত্রই হউক না কেন, উহার সাহায্যে ঈশ্বর প্রণিধানের পথে অগ্রসর হইলে অধিকাংশ যোগীরই অনাহতনাদ প্রকাশ পায়। ঐ নাদ প্রথম প্রথম বিভিন্ন প্রকারের হইলেও শেষকালে ওঁ কারেই পর্য্যবসিত হয়। এই নাদ সকল সম্প্রদায়ের সাধকেরই প্রাপ্তব্য। যদি ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রণবশব্দে ওঁ কার বলা হয়, তবে তাহাতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। তন্ত্রশাস্ত্রে প্রণবশব্দটী মন্ত্রমাত্রকে লক্ষ্য করিয়াও প্রয়োগ হইয়াছে। সে যাহা হউক, পূজাতত্ত্ব নামকগ্রন্থে মন্ত্ররহস্য সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

মন্ত্রের আর একটী প্রচলিত নাম বীজ। এই শব্দটী অন্বর্থ। যেরূপ বটকণিকায় সুবিশাল বটবৃক্ষটী সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত থাকে, ঠিক সেইরূপই অতি সূক্ষ্মে প্রণবাদি মন্ত্ররূপ নাদবিশেষে সূক্ষ্মভাবে ঈশ্বরের সকল মহিমাই অবস্থিত আছে। সুতরাং গুরূপদিষ্ট উপায়ে অনুশীলন করিলে নিশ্চয়ই ঈশ্বর-মহিমা-সমূহ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। শাস্ত্রেও উক্ত আছে—বাচক যদি বিজ্ঞাত হয়, তবে বাচ্য যিনি, তিনিও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। কিরূপে বাচকের স্বরূপবিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা পরসূত্রে বলা হইতেছে।

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

মন্ত্রচৈতন্যং প্রণিধানহেতুকমাহ তদিতি। তজ্জপস্তস্য প্রণবাদি-মন্ত্রস্য জপঃ কর্ত্তব্য ঈশ্বরপ্রণিধান-কামিনেতি শেষঃ। যতোঽন্তরেণ জপান্ন সিদ্ধ্যতি যুগসহস্রেণাপি তৎপ্রণিধানম্। অথ কোঽয়ং জপো নামেত্যত আহ তদর্থভাবনম্। তস্য প্রণবাদিমন্ত্রস্য যোঽর্থঃ সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব-সর্ব্বব্যাপিত্বাদিরূপো মহিমা, ন তু কেবলং মূর্ত্তিবিশেষরূপ ইতি। তস্য ভাবনমনুভবঃ, নতু শব্দমাত্রোচ্চারণমিতি ভাবঃ। পুনঃ পুনর্মন্ত্রার্থজ্ঞানানুরূপোঽনুভব এব জপ ইত্যর্থঃ। ইদমেব মন্ত্রচৈতন্যমিত্যাখ্যায়তে। তথাহি মননাত্ত্রায়ত ইতি মন্ত্রঃ, মন্ত্রার্থ-জ্ঞানং গুরুস্তদাত্মকোঽনুভব এবেষ্টদেব এতত্ত্রয়ৈক্যং মন্ত্রচৈতন্যমিতি ধ্যেয়ম্ ॥ ২৮ ॥

এই সূত্রে কিরূপে ঈশ্বর প্রণিধান করিতে হয়, তাহা বলিতে গিয়া সাধনার বিশেষ রহস্য মন্ত্রচৈতন্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—"তজ্জপস্তদর্থভাবনম্"। তাহার—প্রণবাদি মন্ত্রের জপ করিতে হইবে। যাহারা ঈশ্বরপ্রণিধানকামী, তাহাদের জপ একান্ত কর্ত্তব্য। যেহেতু জপব্যতীত কেহই—কোন সম্প্রদায়ের সাধকই ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। এই জপের অভাবে যুগসহস্রব্যাপী চেষ্টাও নিষ্ফল হইয়া যায়। তাই ঋষি এই যোগ-শাস্ত্রেও বিশেষভাবে জপেরই উপদেশ দিলেন।

জপ কি? তদর্থ ভাবনম্। সেই প্রণবাদি যে মন্ত্র, যাহা গুরু-পরম্পরা ক্রমে প্রাপ্ত, তাহার অর্থ ভাবনাই জপ। যে মন্ত্রের যাহা অর্থ, তাহা গুরুমুখ হইতে অবধানের সহিত শ্রবণ পূর্ব্বক সেই শ্রুত বিষয়ের যে পুনঃ পুনঃ মনন অর্থাৎ অনুভব, তাহাই জপ শব্দের অর্থ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মন্ত্রের বাচ্যার্থ বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু

লক্ষ্যার্থ সকলেরই এক। যেরূপ সাধক যেরূপ অর্থ চিন্তনের অধিকারী, গুরু তাহাকে সেইরূপ অর্থই গ্রহণ করাইয়া থাকেন। মন্ত্রের বাচ্যার্থে সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বব্যাপিত্ব সর্ব্বশক্তিমত্তা জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি মহিমা অবগত হওয়া যায়, এই সকল মহিমার অনুচিন্তন করাই কর্ত্তব্য। যাহারা মহত্ত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন্ত্র প্রতিপাদ্য কোন মূর্ত্তি বিশেষের ধ্যান করেন, তাহাদের সে মন্ত্র জপ বড়ই কষ্টসাধ্য হয়; কারণ জগতে যত প্রকার কঠোরতা আছে, তার মধ্যে মূর্ত্তি বিশেষের ধ্যানই সর্ব্বাপেক্ষা কঠোরতম কার্য্য বলিয়া মনে হয়। ইহা আমাদের বহুধা পরীক্ষিত সত্য। কদাচিৎ কোন সৌভাগ্যবান্ সাধক এই কঠোরতায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন; কিন্তু অধিকাংশকেই বিফল-মনোরথ হইতে হয়। কারণ মূর্ত্তিচিন্তায় চিত্তের তুল্যজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ রূপ যে একতানতা, তাহা প্রায়ই হয় না। চিন্তার প্রত্যেক স্পন্দনই মূর্ত্তির বিভিন্ন অবয়ব লইয়া উঠিয়া থাকে। তাহার ফলে যোগ লাভকরা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু যদি মূর্ত্তির মহত্ত্ব চিন্তন করা যায় অর্থাৎ আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপীর অথবা চৈতন্যময়ী মহতী শক্তির চিন্তা করা যায়, তবে চিত্তের স্বাভাবিক চঞ্চলতা বশতঃ যত বিক্ষিপ্ততাই আসুক না কেন, উহা তুল্যজাতীয়ই হয় এবং যোগ-লাভের পক্ষে সহায় হয়। সুতরাং কেবল মূর্ত্তিচিন্তা অপেক্ষা মূর্ত্তির মহত্ত্বচিন্তা কিংবা ঈশ্বরের সত্তামাত্রের চিন্তাই সাধনার পক্ষে সমধিক উপযোগী এবং সাধকগণের পক্ষেও সহজসাধ্য। যাঁহারা মূর্ত্তিচিন্তা অপেক্ষা মহত্ত্ব বা সত্তার চিন্তাকে কঠোরসাধ্য বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহারা কখনও উহা করিয়া দেখেন নাই, অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলেন। কিন্তু এসকল অন্য কথা।

আমরা বলিতেছিলাম, মন্ত্রের অর্থ ভাবনা করিতে হইবে। এই অর্থ নিয়াই যত গোল। যাহারা যথার্থ যোগলিপ্সু, তাহাদের পক্ষে মন্ত্রের লক্ষ্যার্থ অবলম্বন করিয়াই ভাবনা করা কর্ত্তব্য। সত্তা জ্ঞান এবং আনন্দ, ইহা সকল মন্ত্রের এবং ঈশ্বরের সকল

নামেরই লক্ষ্যার্থ। এই অর্থটী শ্রদ্ধার সহিত প্রত্যক্ষ-ঈশ্বর শ্রীগুরুর মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া পুনঃপুনঃ সেই অর্থের অনুচিন্তন করিতে করিতে তদাত্মক অনুভব প্রকাশ পাইবেই। এই অনুভূতিকেই সূত্রে "তদর্থভাবনং" বলা হইয়াছে। যতদিন মন্ত্রজপের সঙ্গে অর্থবোধ এবং অর্থানুরূপ অনুভব প্রকাশ না হয়, ততদিন বুঝিতে হইবে—মন্ত্রজপই হইতেছে না, সুতরাং বাক্যদ্বারা মাত্রউচ্চারণ-রূপ জপ করিয়া কেহ কখনও প্রণিধানে সমর্থ হইতে পারে না।

এই যোগশাস্ত্রে যাহা জপ নামে অভিহিত হইয়াছে, অন্যত্র তাহাই মন্ত্রচৈতন্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মন্ত্র গুরু এবং দেবতা, এই তিনের ঐক্য করার নাম মন্ত্রচৈতন্য। ইহাই যথার্থ মন্ত্রজপ। যাহা মনন করিলে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহার নাম মন্ত্র। মন্ত্র প্রতিপাদ্য যে লক্ষ্যার্থ, তাহাই মন্ত্রের সদ্গুরু এবং সেই অর্থানুরূপ যে অনুভূতি, তাহাই ইষ্টদেবতা। এই তিনটী যখন এক হইয়া যায় অর্থাৎ মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যখন অর্থবোধ হইতে থাকে এবং অর্থানুরূপ অনুভবেরও প্রকাশ পায়, তখনই যথার্থ মন্ত্রজপ হয়। ইহাকেই মন্ত্রচৈতন্য কহে। * এইরূপ জপ হইতেই ঈশ্বরপ্রণিধান সিদ্ধ হইয়া থাকে। এমন কোন যোগী বা সাধক নাই, যিনি এইরূপ জপ অর্থাৎ যোগ-শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ঈশ্বর প্রণিধানের উপায় অবলম্বন না করিয়াই যোগ-লাভে কৃতকৃত্য হইয়াছেন।

মন্ত্রের যাহা বাচ্যার্থ, তাহার চিন্তা দ্বারাও ক্রমে লক্ষ্যার্থে উপনীত হওয়া যায়। আবার প্রথম হইতেই লক্ষ্যার্থ ধরিয়া অগ্রসর হইলে বাচ্যার্থের অনুচিন্তন অনিচ্ছায়ও উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহা একটী সুন্দর রহস্য। সে যাহা হউক, সাধক কখন কি অধিকারের জপে সমর্থ, তাহা গুরুই নির্ণয় করিয়া দিবেন। মন্ত্রজপ করিতে করিতে কিরূপে প্রণিধান সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা পর পর সূত্রগুলির সম্যক্ আলোচনা করিলেই সুন্দররূপে বুঝা যাইবে।

* সাধনসমর ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা দেখ।

স্থূল কথা এই যে, ঈশ্বর প্রণিধানই যোগলাভের উপায়, মন্ত্রজপের দ্বারাই সেই প্রণিধান সিদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু সেই জপ যেন শুকপাখীর মত শব্দাবৃত্তি না হয়, উহা যেন অর্থভাবনারূপ হয়, এপর্য্যন্ত ইহাই পাওয়া গেল।

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥ ২৯ ॥

চৈতন্যময়মন্ত্রজপফলং কীর্ত্তয়তি তত ইতি। ততোঽর্থভাবনরূপাৎ মন্ত্রজপতঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমঃ প্রতীপমঞ্চতীতি প্রত্যক্ স চাসৌ চেতনশ্চেতি প্রত্যক্‌চেতনঃ অনাত্মভাব-পরিজ্ঞাতা প্রাণ ইত্যস্য প্রসিদ্ধং নাম। তস্যাধিগমস্তদ্বিষয়কং পরোক্ষং জ্ঞানমিত্যর্থঃ। ন কেবলমেতাবদপি চান্তরায়াভাবঃ অন্তরায়াণাং বিঘ্নানাং বক্ষ্যমাণলক্ষণানামভাবো ভবতীতি শেষঃ। ঈশ্বরমহিমানুভাবয়তঃ কথঞ্চিৎ তৎসাধর্ম্ম্যলাভস্য ফলমেতৎ ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্বোক্তরূপ মন্ত্রজপের ফল এই সূত্রে কীর্ত্তিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—তাহাহইতে অর্থাৎ চৈতন্যময় মন্ত্রজপ হইতে প্রত্যক্ চেতনার অধিগম হয় এবং অন্তরায়সমূহের অভাব হয়। যাহা বিপরীত ভাবের জ্ঞাতা, তাহাকে প্রত্যক্‌চেতন বলে। আত্মা যখন অনাত্মভাবের জ্ঞাতারূপে প্রকাশিত হন, তখন তিনি প্রত্যক্‌চেতন বা প্রত্যগাত্মা নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। প্রচলিত ভাষায় আমরা ইহাকে প্রাণ এই সর্ব্বপ্রসিদ্ধ নামেই বুঝিয়া থাকি। অর্থভাবনারূপ মন্ত্রজপ করিতে করিতে এই প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়। সূত্রে যে 'অধিগম' শব্দের উল্লেখ আছে, তাহা পরোক্ষজ্ঞান অর্থেই

ব্যবহৃত হইয়াছে, অপরোক্ষরূপে অধিগম নহে। যে পরোক্ষ জ্ঞান কখনও কোনরূপ সংশয় বা বিপর্য্যয়ভাবনাদ্বারা বিন্দুমাত্র কম্পিত হয় না—এরূপ যে সুদৃঢ় পরোক্ষজ্ঞান, যাহা অপরোক্ষের একান্ত সন্নিহিত, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই ঋষি এস্থলে অধিগম শব্দটীর উল্লেখ করিয়াছেন।

সাধক মনে করিও না, তুমি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া অথবা মৌখিক উপদেশ শ্রবণ করিয়া প্রত্যক্ চৈতন্য সম্বন্ধে পরোক্ষজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। ঐরূপে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা পরোক্ষ জ্ঞানেরও পূর্ব্বাভাস মাত্র। যথার্থ পরোক্ষ জ্ঞান লাভের জন্যই ত সাধনার দরকার—গুরু কৃপার প্রয়োজন। ঐরূপ জপ করিতে করিতে, ঈশ্বর-মহত্ত্বের পুনঃ পুনঃ অনুচিন্তন করিতে করিতে, একটু একটু করিয়া যখন ঈশ্বর-মহত্ত্বের আভাস চিত্তক্ষেত্রে নিপতিত হইতে থাকে, তখন হইতেই সুদৃঢ় পরোক্ষজ্ঞান লাভের সূত্রপাত হয়। এবং এইরূপ প্রত্যক্-চৈতন্য-বিষয়ক পরোক্ষজ্ঞান হইতেই অন্তরায় সমূহেরও অভাব হয়। যাহারা যোগপথে অগ্রসর হইবার পক্ষে বিঘ্নরূপে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহাদিগকে অন্তরায় কহে; তাহারা ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে থাকে। এই অন্তরায় সমূহ কি তাহা পরসূত্রে পাওয়া যাইবে। ঈশ্বর-সাধর্ম্ম্যের আভাস আসিয়া পড়ারই বাহ্য লক্ষণ—এই অন্তরায়াভাব।

যাঁহারা দীর্ঘকাল যাবৎ কোন মন্ত্র জপ করিয়াও এইরূপ প্রত্যক্ চৈতন্যের সন্ধান পান না, বা অন্তরায়সমূহ দূরীভূত হয় না, বুঝিতে হইবে—তাঁহারা অর্থভাবনরূপ জপ করিতে পারিতেছেন না। যদিও এই অর্থভাবনরূপ ব্যাপারটীর রহস্য শ্রীগুরুর মুখ হইতেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য এবং তাহার ফলও অবশ্যম্ভাবী, তথাপি প্রাণপ্রতিষ্ঠা নামক পুস্তকে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে। ধীমান সাধক উহা হইতেই অভীষ্ট বিষয় পাইতে পারিবেন।

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতি ভ্রান্তি-
দর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি
বিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ॥ ৩০ ॥

অন্তরায়ান্ দর্শয়তি ব্যাধীতি। ব্যাধিরস্বাস্থ্যং স্ত্যান-মকর্ম্মণ্যতা চিত্তস্য, সংশয়ঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যুভয়কোটিকভাবনরূপঃ, প্রমাদোঽনবধানতৌদাসীন্যমিতি যাবত্, আলস্যং কায়মনসো গুরুত্বং, অবিরতি বিষয়াসক্তিঃ, ভ্রান্তিদর্শনং বিপর্য্যয়জ্ঞানম্, অলব্ধভূমিকত্বং প্রত্যক্ষতায়া অভাবঃ, অনবস্থিতত্বং লব্ধায়ামপি ভূমিকায়াং নৈব প্রতিষ্ঠাভাবঃ, এতে নব চিত্তবিক্ষেপাঃ চিত্তস্য বিক্ষেপভূতা স্তে অন্তরায়া বিঘ্না যোগস্যেতি শেষঃ॥ ৩০ ॥

এই সূত্রে পূর্ব্বোক্ত অন্তরায় সমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যাধি স্ত্যান সংশয় প্রমাদ আলস্য অবিরতি ভ্রান্তিদর্শন অলব্ধভূমিকত্ব এবং অনবস্থিতত্ব ইহারাই চিত্তের বিক্ষেপ স্বরূপ অন্তরায়। ক্রমে ইহাদের বিবৃতি করা যাইতেছে। (১) ব্যাধি—অস্বাস্থ্য। শারীরিক এবং মানসিক ভেদে ইহা দুই প্রকার। শারীরিক ব্যাধিও মনেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। যাহা প্রধানতঃ শরীরকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায় তাহাকে ব্যাধি কহে, এবং যাহা প্রধানভাবে মনকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, তাহাকে আধি কহে, এই উভয়বিধ অস্বাস্থ্যকে লক্ষ্য করিয়াই সূত্রে ব্যাধি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। (২) স্ত্যান—চিত্তের অকর্ম্মণ্য ভাব। কোন একটা কার্য্যেই চিত্ত বেশ বসিতে চায় না, যেন ভাসা ভাসা উপর দিয়া চলিয়া যাইতে চায়। ইহারই নাম স্ত্যান। (৩) সংশয়—"এইরূপ সাধনা দ্বারা আমি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব কি না।" হয়ত হইতেও পারে, আবার নাও হইতে পারে, এইরূপ যে ভাব, তাহার নাম সংশয়। যে গুরুর নিকট হইতে

সাধনপ্রণালী গ্রহণ করা হয়, তাঁহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস না থাকার ফলেই এইরূপ সংশয় উপস্থিত হয়। (৪) প্রমাদ—অনবধানতা। চিত্তের একটা উদাসীন ভাব। অবধানপ্রয়োগ করিবার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাহা না করা। স্ত্যানের সহিত প্রমাদের পার্থক্য এই যে, স্ত্যানে চিত্ত কোন কার্য্যেই অবহিত হইতে পারে না। আর প্রমাদে চিত্ত সাধনা ব্যতীত অন্যত্র বেশ অবহিত হইবার সামর্থ্য রাখে। (৫) আলস্য—শরীর ও মনের গুরুত্ব অর্থাৎ তামসিক জড়তা। যে গুরুত্বের জন্য সূক্ষ্মবিষয় সমূহের ধারণা করিতে যে পরিশ্রম, তাহা স্বীকার করিতে চায় না। (৬) অবিরতি—বিষয় বিরতি না হওয়া অর্থাৎ বিষয় ভোগের প্রতি আসক্তি থাকা। (৭) ভ্রান্তি দর্শন—যাহা সত্য বস্তু নহে, তাহাকেই সত্যরূপে অভীষ্টরূপে দর্শন। (৮) অলব্ধ ভূমিকত্ব—যথাসাধ্য সাধনা করিয়াও কোনরূপ প্রত্যক্ষতা লাভ না হওয়া। (৯) অনবস্থিতত্ব—সাধনাদ্বারা কোনও ভূমি লাভ হইলেও তাহাতে স্থিতি লাভের সামর্থ্যহীনতা। এই নয়টী যোগ পথের অন্তরায়। ইহারাই চিত্ত বিক্ষেপ।

অর্থভাবনারূপ মন্ত্র জপের ফলে যখন প্রত্যক্ চেতনার অধিগম হয়, তখন ধীরে ধীরে এই অন্তরায় গুলি দূর হইতে থাকে, একেবারেই যে সকল অন্তরায় দূর হইয়া যায়, তাহা নহে। সাধকের সুকৃতি, গুরুশক্তির বিকাশ এবং সাধনার তীব্রতা অনুসারে এই অন্তরায় সমূহের নিরাকরণ হইয়া যায়। যাঁহারা কোনরূপ চেষ্টা না করিয়াও এই সকল অন্তরায়ের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কৃপার পাত্র, ভগবান্ তাঁহাদের সুমতি প্রদান করুন। হ্যাঁ, তবে একথাও সত্য যে, শত শত অন্তরায় সত্ত্বেও তাঁর কৃপার উপলব্ধি হইতে পারে। যদি হয়, তবে অন্তরায় গুলির বল ক্ষীণ হইয়া যায়। সে যাহা হউক, প্রত্যক্চেতন অধিগত হইলে এই অন্তরায়গুলি দূর হয় কেন? তখন সাধক আংশিকভাবে ঈশ্বরধর্ম্মের অধিকারী হয়—মনের শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাহারই ফলে পূর্ব্বোক্ত প্রতিকূল ভাব গুলি ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

এক মাত্র ঈশ্বর প্রণিধান হইতেই ইহা অতি সহজে সিদ্ধ হইয়া থাকে। "যে যাঁহাতে আত্মদান করে সে কতকটা তাঁহার সাধর্ম্ম্য লাভ করে" এই শাশ্বতনিয়ম বশেই অন্তরায় দূরীকরণের সামর্থ্য সাধকগণ লাভ করিয়া থাকেন।

दुःखदौर्म्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः ॥ ३१ ॥

विक्षेपसहोदरांस्त्वाह दुःखेति। दुःखमाध्यात्मिकादिप्रतिकूलवेदनीयं, दौर्म्मनस्यं क्षोभ इच्छाविघातजन्यः, अङ्गमेजयत्वमङ्गकम्पनं, श्वास-प्रश्वासा नासाभ्यन्तराद् बहिश्चारिण इत्यर्थः। एते चत्वारो विक्षेपसहभुवः विक्षेपैः सह भवन्ति जायन्त इत्यर्थः। विक्षिप्तचेतसो बाह्यलक्षणान्येतानीति भावः ॥ ३१ ॥

এই সূত্রে পূর্ব্বোক্ত বিক্ষেপ সমূহের বাহ্যলক্ষণ স্বরূপ সহোদর গণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দুঃখ দৌর্ম্মনস্য অঙ্গমেজয়ত্ব এবং শ্বাস প্রশ্বাস, এই চারিটী হইল বিক্ষেপের সহভূ অর্থাৎ ইহারা বিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই আবির্ভূত হয়। (১) দুঃখ—আধ্যাত্মিক রোগাদি জন্য, আধিদৈবিক—বাত্যাবৃষ্টি বজ্রপাত প্রভৃতিজনিত. এবং আধিভৌতিক ব্যাঘ্রতস্করাদিজনিত। রোগাদি ত্রিবিধ কারণ হইতে চিত্তের যে অস্বচ্ছন্দতা উপস্থিত হয় তাহাই দুঃখ। (২) দৌর্ম্মনস্য—ইচ্ছার অভিঘাতজন্য চিত্তের যে ক্ষোভ বা অবসাদ উপস্থিত হয়, তাহাই দৌর্ম্মনস্য। (৩) অঙ্গমেজয়ত্ব—অঙ্গের কম্পন। সাধনাকালে চিত্ত একটু একটু স্থৈর্য্যের অভিমুখী হইলে বিভিন্ন অঙ্গে বা সর্ব্বাবয়বে একপ্রকার অস্বাভাবিক স্পন্দন হইতে থাকে। ইহাই যোগশাস্ত্রে

অঙ্গমেজয়ত্ব নামে অভিহিত হয়। যদিও ইহা প্রথম প্রথম অলব্ধ-ভূমিকত্বরূপ অন্তরায় দূরের পক্ষে কতকটা সহায় হয় তথাপি এই অঙ্গকম্পন যে বিক্ষেপেরই সহোদরমাত্র ইহাতে সংশয় নাই। যোগারূঢ় ব্যক্তির পক্ষে ইহারও প্রতীকার প্রয়োজন। (৪) শ্বাস প্রশ্বাস—নাসাভ্যন্তরচারী না হইয়া বহির্দ্দেশে যে শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহাই এস্থলে শ্বাস প্রশ্বাস শব্দের তাৎপর্য্য। যেমন যেমন চিত্তস্থৈর্য্য উপস্থিত হয়, ঠিক তেমন তেমনই শ্বাস প্রশ্বাসের বেগ কমিয়া যায়—ঠিক নাসাভ্যন্তরচারী হয়, শেষে একেবারেই স্থির হইয়া যায়। কিন্তু বিক্ষেপ উপস্থিত হইলেই শ্বাসের বেগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই চারিটীও বিক্ষেপবিশেষ বা বিক্ষেপের বাহ্য লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়—চিত্তের অবস্থা কিরূপ। প্রত্যক্‌চেতনাধিগম হইতে এই সকল বিঘ্নও দূরীভূত হইয়া যায়। বিক্ষেপরূপ অন্তরায় যদি দূর হয়, তবে তাহার বাহ্য লক্ষণ গুলিও নিশ্চয়ই দূর হইয়া যাইবে। একমাত্র ঈশ্বরপ্রণিধান হইতেই এই সকল ফল লাভ হইয়া থাকে, ইহাই যোগসূত্রকার ঋষির অভিপ্রায়।

तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥ ३२ ॥

अन्तरायप्रतिषेधोपायमुपदिशति तदिति। तत्प्रतिषेधार्थं तेषा-मन्तरायाणां प्रतिषेधार्थं प्रशमनार्थमेकतत्त्वाभ्यास एकमद्वयं यत् तत्त्वं प्रत्यक्‌चेतनरूपं प्रागुक्तं तत्र स्थितिप्रयत्नरूपोऽभ्यासः कर्त्तव्यो योग-लिप्सुभिरिति शेषः। ननु जपेनैवान्तरायाभाव उक्तः, कथं पुनरेक-तत्त्वाभ्यास इति, नैष दोषः—जपफलं प्रत्यक्‌चेतनाधिगमस्तत्रावस्थानप्रयत्नः अन्तरायप्रतिषेधे साक्षाद्धेतुरिति विशेषोऽत्र प्रदर्शितः ॥३२॥

পূর্ব্বোক্ত অন্তরায় সমূহের প্রতিষেধ করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহাই এই সূত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহাদের প্রতিষেধের জন্য একতত্ত্বের অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। তাহাদের—পূর্ব্বোক্ত ব্যাধি স্ত্যান প্রভৃতি নয়টী এবং দুঃখ দৌর্ম্মনস্য প্রভৃতি চারিটীর প্রতিষেধ অর্থাৎ প্রশমন করিবার জন্য একতত্ত্বাভ্যাস করিতে হইবে। একতত্ত্ব কি ? এক অদ্বয় যে তত্ত্ব, যাহা পূর্ব্বে প্রত্যক্‌চেতনরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহা অর্থভাবনরূপ জপের ফলে লাভ হয়, তাহাই একতত্ত্ব। সেই একতত্ত্বের অভ্যাস করিতে হয়। অভ্যাস কি, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—"তত্র স্থিতৌ যত্নঃ" তাহাতে অবস্থানের জন্য যে পুনঃ পুনঃ প্রযত্ন তাহাই অভ্যাস। যাহারা যথার্থ যোগলিপ্সু তাহারা যে কোন প্রণালীর সাধনাই করুন না কেন, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মুমুক্ষু সাধকগণ এই একতত্ত্বেরই অভ্যাস করিয়া থাকেন এবং তাহারই ফলে অন্তরায় হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

এস্থলে আপত্তি হইবে—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জপের ফল অন্তরায়াভাব, আবার এখানে বলা হইল—অন্তরায় দূর করিবার জন্য একতত্ত্ব অভ্যাস করিতে হইবে। ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? ইহার উত্তর অতি সহজ—জপের ফল প্রত্যক্‌চেতনাধিগম, সেই প্রত্যক্‌ চেতন হইতেই অন্তরায়াভাব হইয়া থাকে। কিরূপে হয় তাহা বলিতে গিয়াই এই একতত্ত্বাভ্যাসের কথা বলা হইল। যদি কোনও যোগী, গুরুকৃপায় জপের ফল প্রত্যক্‌চেতন লাভ করিতে পারেন, তবে সেই অতিপ্রিয়তম প্রাণময় সত্তায় পুনঃ পুনঃ অবস্থান করিবার বাসনা তাঁহার স্বতঃই পরিবর্দ্ধিত হইবে। এইরূপ অভ্যাসের ফলে অধিকাংশ সময়ে প্রত্যক্‌ চেতনের দিকেই সাধকের লক্ষ্য থাকে,—তাহার ফলে সাধক কিছু কিছু ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে থাকে, সুতরাং যত রকমের অন্তরায় বা অন্তরায়ের সহকারী আছে, তাহারা সকলেই নতমস্তকে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে জপ হইতে যে প্রত্যক্‌

চেতনাধিগম হয়, তাহাই যাবতীয় অন্তরায় দূরীকরণে সমর্থ। আচার্য্যদের নিয়মও এই যে, কোন বিষয় প্রথমে সামান্য রূপে বলিয়া পরে তাহাই বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন, ইহাতে পুনরুক্তি বা বিরুদ্ধ উক্তি হয় না বা হইতে পারে না।

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य-विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् ॥ ३३ ॥

न केवलं विक्षेपप्रतिषेधः मैत्र्यादिसाधनसामर्थ्यमप्याविर्भवत्येक-तत्त्वाभ्यासादित्याह मैत्रीति। मैत्रीकरुणादीनां सुखदुःखादीनाञ्च यथा-क्रमेणान्वयः। विषयशब्दश्च मैत्र्यादिप्रत्येकमभिसम्बध्यते। तथाहि मैत्री सौहार्द्दं नेर्ष्या, सुखविषयेषु अभ्युदयसम्पन्नेषु सुखितेष्वित्यर्थः। दया करुणा न माध्यस्थम्, दुःखविषयेषु दुःखितेषु, मुदिता हर्षो न विषादः, पुण्यविषयेषु पुण्यात्मकेषु, उपेक्षा उदासीनता न द्वेषः, अपुण्यविषयेषु पापविषयेष्वित्यर्थः। एवं भावनातश्चित्तप्रसादनं चित्तस्य प्रसन्नता जायत इति भावः। तादृशीभावनासामर्थ्यं त्वेकतत्त्वाभ्यासा-दायाति। दर्शितः प्रथमः पुरुषार्थो धर्म्मो नाम शिष्टमानव-शीलरूपः शान्तिहेतुरमोघ इति।

একতত্ত্ব অভ্যাসের ফল যে কেবল অন্তরায়-প্রতিষেধই, তাহা নহে, মৈত্র্যাদি ভাবনার সামর্থ্যও উহা হইতেই আবির্ভূত হয়। মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা, এই চারিটীকে লক্ষ্য করিয়াই মৈত্র্যাদি শব্দ প্রয়োগ হয়; ক্রমে ইহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। (১) মৈত্রী —মিত্রতা সৌহার্দ্দ্য। ইহার ভাবনা করিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে। কোথায়? সুখবিষয়ে অর্থাৎ সুখী ব্যক্তিদের প্রতি।

সাধারণতঃ দেখা যায়—জগতে কোনও মানুষ সর্ব্বথা সুখী হইলে, তাহার পরিচিত ব্যক্তিবর্গের প্রাণে অল্পাধিক ঈর্ষ্যার সঞ্চার হয়। এইরূপ হইলে চিত্ত কলুষিত থাকে; সুতরাং যোগমার্গে অগ্রগতি নিরুদ্ধ থাকে, সেইজন্যই ঋষি মৈত্রী ভাবনার কথা বলিলেন। কোনও ব্যক্তি কোনও প্রকার উন্নতি লাভ করিলে, তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র ঈর্ষ্যার ভাব পোষণ না করিয়া প্রাণপণে মৈত্রীভাব পোষণ করিতে হইবে। যদি কোন নিকটতম আত্মীয় বন্ধুর উন্নত অবস্থা হয়, যদি কোন প্রিয়জন সর্ব্ববিষয়ে সুখী হইয়া উঠে, তবে তাহার প্রতি যেরূপ ঈর্ষ্যাভাব আসেনা, বরং আনন্দই উপস্থিত হয়, ঠিক সেইরূপ যে কোন ব্যক্তির অভ্যুদয়ে অকপট প্রাণে আনন্দ অনুভব করিতে হইবে। জগতে এইটী কিন্তু বড়ই দুর্ল্লভ। দুঃখীর প্রতি দয়া করিবার লোক অনেক আছে, কিন্তু অপরের সুখে নিজে যথার্থ সুখ অনুভব করেন, এরূপ লোক খুব কমই আছেন। সে যাহা হউক, পূর্ব্বে যে একতত্ত্বাভ্যাসের কথা বলা হইয়াছে, তাহার ফলে ঐরূপ মৈত্রী ভাবনা অতি সহজ সাধ্য হইয়া উঠে। এইরূপ পরবর্ত্তী তিনটীর বিষয়ও বুঝিতে হইবে।

(২) করুণা দুঃখ বিষয়েষু। করুণা—দয়া পরদুঃখ হরণের ইচ্ছা। "অপরে দুঃখ পায় পাউক তাহার নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে, আমি তাহার কি করিব?" এইরূপ ভাব যোগলিপ্সু ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। দয়া সত্ত্বগুণের বৃত্তি, তাহার অনুশীলন দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়। সকল অবস্থায়ই যে সকলের দুঃখ দূর করা যায় বা দূর করা সম্ভব, তাহা নহে; কিন্তু দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য ইচ্ছা ও প্রযত্ন থাকিলেই করুণাবৃত্তির অনুশীলন হইতে পারে। অবশ্য, যাহারা যোগলিপ্সু, তাহারা যে সর্ব্বত্র কেবল দুঃখী লোকের অন্বেষণ করিয়া তাহার দুঃখ দূর করিবার চেষ্টাই করিবেন, তাহা বলা হইতেছে না। তাহার সম্মুখে যে দুঃখের চিত্র উপস্থিত হয়, কেবল তাহার প্রতিকার করিবার জন্য একটা প্রবৃত্তি বা উদ্যম প্রকাশ পাইলেই দয়া বৃত্তির

অনুশীলন হইয়া থাকে। স্থূলকথা এই যে, দুঃখবিষয়টী সম্মুখে উপস্থিত হইলে তখন উদাসীন ভাবে না থাকিয়া দেশ কাল পাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক যথাসাধ্য দুঃখের প্রতিকারে প্রযত্ন করিবে। অপরের দুঃখে সহানুভূতিই মনুষ্যত্ব। দেবতাদের কিন্তু ইহা নাই। স্বর্গে দুঃখ নাই, সুতরাং সহানুভূতিও নাই। যখন কোন স্বর্গবাসী জীব পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে, তখন তাহার দুঃখে কোন দেবতাই একটুও সহানুভূতি দেখান না; কারণ, তাঁহারা ত দুঃখ কি তাহা জানেন না; সহস্র সহস্র বৎসর দেবতাদের সঙ্গে একত্র বসবাস করিবার ফলে পরস্পর যে সৌহার্দ্দিলাভ হয়, স্বর্গ হইতে বিদায় কালে সেই দেবতারাই যখন বিন্দুমাত্র সহানুভূতির ভাবও দেখান না, তখন কিন্তু মনে হয়—স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোক সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এ সকল উপাখ্যান মাত্র। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়—করুণা দেবতাদেরও দুর্ল্লভ ধন। মানুষ ইহার অনুশীলন করিয়া চিত্তের যাবতীয় মলিনতা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে।

(৩) মুদিতা পুণ্যাত্মকেষু। মুদিতা হর্ষ। কেহ কোনরূপ পুণ্য কার্য্যের—সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে দেখিতে পাইলে, তাহাতে হর্ষ প্রকাশ করিতে হয়, ঐরূপ কার্য্যে আনন্দের সহিত অকপট প্রাণে উৎসাহ প্রকাশ করিতে হয়। "আমি কেন ঐরূপ করিতে পারিলাম না" বলিয়া বিন্দুমাত্র বিষণ্ণ হওয়া উচিত নহে; কারণ, বিষাদ তমোগুণের ধর্ম্ম, উহাতে চিত্ত মলিন থাকে। হর্ষ সত্ত্বগুণের চিহ্ন, তাই সৎকার্য্যে হর্ষান্বিত হইবারই উপদেশ আছে।

(৪) উপেক্ষা অপুণ্যাত্মকেষু। কেহ কোনরূপ পাপ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে দেখিতে পাইলে তাহার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে হয়, অর্থাৎ নিন্দনীয় কার্য্যে উদাসীন থাকাই কর্ত্তব্য। যেরূপ স্থলে উপদেশাদি দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্তি করান সম্ভবপর, সেরূপ স্থলে অবশ্য তাহা করিতেই হইবে; কিন্তু যেখানে তাহা সম্ভবপর নহে, সেক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র

বিদ্বেষ বুদ্ধি পোষণ না করিয়া উদাসীন থাকিবে। একটী প্রবাদ আছে "পাপকে ঘৃণা করিও পাপীকে ঘৃণা করিও না"। আজ যে পাপী, দুদিন পরে হয়ত সে পুণ্যাত্মা হইতে পারে। ঘৃণা বিদ্বেষ এগুলিও চিত্তের মলিনতারই পরিচয়, সুতরাং অতি গর্হিতকর্ম্মা মানুষকে দেখিয়াও বিদ্বিষ্ট হইবে না, উদাসীন থাকিবে।

যোগশাস্ত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলিদেব এই যে মৈত্রী করুণা মুদিতা ও উপেক্ষারূপ চারিটী শ্রেষ্ঠ শীলের উল্লেখ করিলেন, এই সকল শীল অবলম্বন করিলে চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হয়। চিত্ত প্রসন্ন হইলে বুদ্ধি স্থির হয়, স্থির বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব প্রতিগ্রহীত হয়, এইরূপে মানুষ যোগলাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে। পূর্ব্বে যে একতত্ত্বাভ্যাসের কথা বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারাই এই মৈত্র্যাদি-শীল লাভ হইতে পারে। সর্ব্বাবস্থায় যদি এক চৈতন্যময় সত্তায় অবস্থান করিবার প্রযত্ন থাকে, তবে এই সকল শীল অনায়াসে লাভ হয়। যাঁহারা একতত্ত্বাভ্যাস করেন না, তাঁহারাও পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতি বশেই হউক, অথবা ইহজন্মকৃত অধ্যবসায় প্রভাবেই হউক, এই মৈত্র্যাদির ভাবনা অর্থাৎ অনুশীলন করিলে যে যথার্থই সুখী হইতে পারেন, এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বহুল পরিমাণেই আছে। যোগরহস্যের প্রথমেই বলা হইয়াছে—যাহারা পুরুষার্থ অর্থাৎ চতুর্ব্বর্গ লিপ্সু তাহাদের জন্যই এই শাস্ত্র। এস্থলে তাহাই পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, যাহারা মাত্র ধর্ম্ম-লাভ করিতে চান, তাহারাও এই মৈত্রী করুণা প্রভৃতি শীলের অনুশীলন করিবেন। আর ইহাই ত বিশ্বমানব ধর্ম্ম! সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষেই ইহা আচরণীয় এবং ইহাই একমাত্র ঐহিক শান্তিরও হেতু। কেবল তাহা নহে, পরে, শৌচ সন্তোষ ব্রহ্মচর্য্য সত্য অস্তেয় প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করা হইবে, তাহাও এই ধর্ম্মবর্গেরই অন্তর্গত। ধর্ম্মই মানুষকে উভয় লোকে সুখের অধিকারী করে। ধর্ম্মহীন অর্থ কামের সেবা যে মানুষকে দিন দিন অশান্ত ও অসুখী করিয়া তোলে,

তাহা আজকাল পাশ্চাত্য দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এবং তদনু-করণশীল এতদ্দেশীয় জনগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও অতি স্পষ্ট রূপেই বুঝিতে পারা যায়। সে যাহা হউক, মানুষের চরিত্র যে কত উন্নত হইতে পারে, তাহা এই যোগসূত্রের ঋষিই জগতে সর্ব্বপ্রথম প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। মৈত্রী করুণা প্রভৃতির অনুশীলন মানুষ-মাত্রেরই ধর্ম্ম। যাঁহারা মুক্তিকামী, তাঁহারা একতত্ত্ব অভ্যাসের পথে অগ্রসর হইয়া সর্ব্বভূতে আত্ম-প্রাণের প্রসারতা দেখিতে পাইবেন; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এই মৈত্রী প্রভৃতি শীল অনিবার্য্যরূপেই উপস্থিত হয়। আর যাহারা মাত্র প্রথম-পুরুষার্থ-কামী, তাহাদের পক্ষেও ইহার অনুশীলন অসম্ভব নহে, একটু চেষ্টা করিলে অনেকেই এই শীল লাভ করিয়া জীবনকে শান্তিময় করিতে পারেন। এবং তাঁহাদের আদর্শে অন্য লোকও এই পথে অগ্রসর হইয়া নিজ নিজ জীবনকে উন্নত করিয়া তুলিতে পারে।

প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য ॥ ৩৪ ॥

ইতঃ পঞ্চভিরেকাগ্রত্বোপায়ং বিশিনষ্টি, তত্র প্রথমং তাবৎ প্রাণ-প্রতিষ্ঠাক্রমমুপদিশতি প্রচ্ছর্দ্দনেতি। প্রাণস্য পূর্ব্বোক্তপ্রত্যক্-চেতনারূপস্যৈকতত্ত্বস্য সুদুরাচারাণামপি অনুভবযোগ্যস্য প্রচ্ছর্দ্দন-বিধারণাভ্যাং প্রচ্ছর্দ্দনং বমনং বাহ্যবৃত্তিষ্বনুভব ইত্যর্থঃ। উক্তঞ্চ— "অপানে জুহ্বতি প্রাণ" মিতি। তথান্তঃসু বিধারণং বিশেষেণ ধারণা ধারণা। উক্তঞ্চ—"প্রাণেঽপানং তথাপরে" ইতি। এতাভ্যাং বা এব বিষয়বতী প্রবৃত্তিরুৎপন্নেতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত একতত্ত্বাভ্যাস কিরূপে শীঘ্র ফলদায়ক হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য এই সূত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠার কৌশল উপদিষ্ট হইতেছে। আর এই সূত্র হইতে পাঁচটী সূত্রে একতত্ত্বাভ্যাস ব্যাপারটী কিরূপ ভাবে কার্য্যকরী অবস্থায় উপনীত হয়, তাহাও প্রদর্শিত হইবে। ঋষি বলিলেন—প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দন ও বিধারণ করিতে হইবে। প্রচ্ছর্দ্দন শব্দের অর্থ বমন—অর্থাৎ বাহ্য বস্তু সমূহে প্রাণের অনুভব। অন্তরে যিনি প্রাণরূপে—প্রত্যক্‌চৈতন্যরূপে প্রতিনিয়ত অনুভবযোগ্য হইতেছেন, তিনিই বাহিরে দৃশ্য রূপে—জ্ঞেয়রূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন, এইরূপ যে প্রত্যক্ষ অনুভব, তাহারই নাম প্রচ্ছর্দ্দন। আর বিধারণ শব্দের অর্থ বিশেষরূপে ধারণা করা, অনুভব করা। ইহা অন্তরের ক্রিয়া। কাম ক্রোধাদি বৃত্তিরূপে কিংবা ভাব সঙ্কল্প প্রভৃতির আকারে অন্তরে যাহা প্রকাশ পায়, তাহা যে প্রাণই প্রত্যক্ চৈতন্যই অন্য কিছু নহে, এইরূপ পুনঃ পুনঃ অনুভব করাকেই বিধারণ বলা হয়। প্রাণপ্রতিষ্ঠা নামক পুস্তকে ইহা সুন্দর রূপে আলোচিত হইয়াছে। ভগবদ্‌গীতায় স্বয়ং ভগবান্‌ও—"অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সাধকপ্রবর অর্জ্জুনকেও এই প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণ রূপ অপূর্ব্ব প্রাণপ্রতিষ্ঠা কৌশলেরই উপদেশ দিয়াছেন। এ সূত্রেও একটী "বা" শব্দের প্রয়োগ আছে, উহার অর্থ এব অর্থাৎ নিশ্চয়ই। এইরূপ প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দন ও বিধারণ দ্বারা নিশ্চয়ই বিষয়বতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, ইহা পরবর্ত্তী সূত্রের সহিত অন্বিত।

যাঁহারা এই সূত্রে "প্রাণস্য"-শব্দটীর প্রাণবায়ুরূপ অর্থ করেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই, উহা কনিষ্ঠাধিকারীর পক্ষেই প্রযুজ্য। বিশেষতঃ ঐরূপ বায়ুক্রিয়া উপযুক্ত অধিকারী কর্ত্তৃক গুরু সন্নিধিতেই অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন, অন্যথা বিপরীত ফলও হইতে পারে।

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতি-নিবন্ধনী ॥ ৩৫ ॥

প্রাণস্য প্রচ্ছর্দ্দন-বিধারণাভ্যাং কিং স্যাদিত্যাহ বিষয়বতীতি। বিষয়বতী—বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ বিদ্যন্তে যস্যা ইতি বিষয়বতী বিষয়াকারা ইত্যর্থঃ। বা এব। প্রবৃত্তিঃ প্রকৃষ্টা বৃত্তিঃ—বিজাতীয়ভেদবত্যা বৃত্তেঃ প্রকৃষ্টা স্বগতভেদমাত্রাবগাহিনী বৃত্তিরক্লিষ্টেতি ভাবঃ। উৎপন্না সতী চিত্তস্য স্থিতিনিবন্ধনী চিত্তস্থৈর্য্যকারিণী ভবতীতি শেষঃ ॥৩৫॥

পূর্ব্বোক্তরূপ প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দন এবং বিধারণ দ্বারা নিশ্চয়ই বিষয়বতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, এবং উহাই চিত্তস্থৈর্য্যের উপায়স্বরূপ হইয়া থাকে। বিষয়বতী প্রবৃত্তি কি? রূপ রসাদি বিষয়কে অবলম্বন করিয়া যে প্রকৃষ্টাবৃত্তির উদয় হয়, তাহাই বিষয়বতী প্রবৃত্তি। সাধারণতঃ যে শব্দাদি বিষয়ক বৃত্তি সমূহের উদয় হয়,তাহা হইতে ইহা প্রকৃষ্ট বলিয়াই ইহাকে বৃত্তি না বলিয়া "প্রবৃত্তি" বলা হইয়া থাকে। খুলিয়া বলিতেছি—মনে কর, একটি পুষ্প দেখিতেছ, উহাতে যদি প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর অর্থাৎ প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দন করিতে থাক, তবে অল্পক্ষণ পরেই দেখিতে পাইবে,—পুষ্পনামক কোন পৃথক্ বস্তু ওখানে নাই। তোমার প্রাণই অর্থাৎ "আমিই" পুষ্প আকারে প্রকাশ পাইতেছে। যে "আমি" পুষ্পের দ্রষ্টা হইয়া বাহিরে দৃশ্যরূপে পুষ্পকে নিতান্ত পৃথক বস্তুরূপে দর্শন করিতেছিল, সেই আমিই সেই প্রত্যক্-চৈতন্যই সেই প্রাণই ঐ পুষ্প আকারে আকারিত হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ যে প্রত্যক্ষ অনুভব ইহারই নাম প্রবৃত্তি। ইহা বিজাতীয় ভেদজ্ঞান মূলক বৃত্তি হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ, ইহা স্বগতভেদাবগাহিনী; তাই ইহার নাম প্র—বৃত্তি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—দ্রষ্টাই বৃত্তির সারূপ্য লইয়া প্রকাশিত হন। এই সারূপ্যটী যখন অনুভব যোগ্য হইতে থাকে, তখনই তাহার নাম হয় প্রবৃত্তি। বাহিরে প্রত্যেক বিষয়ে

এবং অন্তরে :প্রত্যেক ভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠার ফলে প্রত্যেক বৃত্তিই "প্রবৃত্তি" হইয়া উঠে, বিজাতীয়ভেদ-প্রতীতি বিলুপ্ত হইতে থাকে, তখন এক আমিরই বহুরূপ প্রকাশ পাইতে থাকে। এই "প্রবৃত্তির" প্রকাশ হইলে সাধক আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়ে, অভ্যাস বৈরাগ্য প্রভৃতি যোগলাভের উপায়গুলি তখন অতি সহজসাধ্য বলিয়াই মনে হইতে থাকে। ইহা ছাড়া বিশেষ ফল—ঐ "চিত্তস্য স্থিতিনিবন্ধনী"। বিষয়-বতী প্র-বৃত্তির উদয় হইলেই চিত্তের স্থৈর্য্যলাভ হয়। যতক্ষণ যে বিষয়ে মন সংযুক্ত রাখিতে ইচ্ছা, ততক্ষণ সেই বিষয়ে মন লাগাইয়া রাখা যায়; কারণ, এই প্র-বৃত্তি এত লোভনীয় এত মুগ্ধকর যে, চিত্ত যেন ঠিক চুম্বকের আর্কষণে আকৃষ্ট হইয়াই তাহাতে লাগিয়া থাকিতে চায়। এসূত্রেও ঋষি "বা" শব্দের প্রয়োগ দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন—নিশ্চয়ই চিত্ত স্থিতিপদ লাভকরে, ইহার অন্যথা হয় না। অবশ্য, এই বিষয়বতীর স্থৈর্য্যও যথার্থ স্থৈর্য্য নহে, উহাও বহুস্পন্দন বিশিষ্টই হইয়া থাকে। তাহা থাকুক, তথাপি যোগপথে অগ্রসর হইবার পক্ষে এই যে স্থৈর্য্য ইহাও উপেক্ষণীয় নহে। বিজাতীয়বৃত্তির দর্শন অপেক্ষা স্বগতবৃত্তিদর্শন যে অনেকটা স্থৈর্য্যের পরিচায়ক, তদ্‌বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই।

সাধক! চিত্তস্থির করিতে পার না বলিয়া কতই না উৎকণ্ঠা ভোগ করিতেছ; আচ্ছা, এই প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণ বা প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হও, দেখিবে চিত্তস্থৈর্য্য যেন আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইবে। চিত্তচাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া বিষয়বতী প্রবৃত্তি-উদয়ের জন্য চেষ্টা কর। আকুলপ্রাণে—দেখ বিষয়রূপে তোমার প্রাণপ্রিয় ইষ্টদেবই। যিনি বিষয়ের সাজে বা ভাবের সাজে তোমার নিকটে উপস্থিত, তিনিই তোমার ইষ্টদেব, তিনিই গুরু, তিনিই পিতা মাতা সখা বন্ধু সুহৃদ্ সব গো! তাঁকে দেখ, কাতরভাবে আত্মনিবেদন কর, তোমার চিত্ত স্থির হইবে।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ॥ ৩৬ ॥

চিত্তস্থৈর্য্যলক্ষণমপ্যাহ বিশোকেতি। বিশোকা বিগতঃ শোক ইষ্টবিয়োগজং দুঃখং যতঃ সা বৃত্তির্বিশোকা নাম। বা এবার্থে। বিশোকা এব জ্যোতিষ্মতীত্যাখ্যায়তে প্রকাশরূপত্বাৎ। সমুৎপন্নায়াং খলু বিষয়বতী-প্রবৃত্তৌ প্রত্যক্ষোঽনুনা ভবতি শুভ্র আকাশকল্পঃ স্বচ্ছো-নিস্তরঙ্গঃ কশ্চিৎ প্রকাশস্তদাবির্ভাবকালে শোকদুঃখাদীনামপগমো ভবতি চিত্তস্য স্থিতিপদং লভত ইত্যর্থঃ।

চিত্তস্থৈর্য্যের একটী বাহ্যলক্ষণ আছে, বিষয়বতীপ্রবৃত্তির উদয় হইলে সেই লক্ষণটী প্রকাশ পায়, এই সূত্রে তাহারই কথা বলা হইতেছে—বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী। যাহা পূর্ব্বে বিষয়বতী প্র-বৃত্তি নামে উক্ত হইয়াছে, তাহাই বিশোকা। ইহার উদয়ে শোক অর্থাৎ অভীষ্ট-বস্তুর বিয়োগজনিত দুঃখ সম্যক্ দূরীভূত হইয়া যায়। যিনি অভীষ্ট-দেব, তাঁহার সন্ধান পাইলে আর ইষ্টবিয়োগজন্য দুঃখ থাকিতে পারে না; তাই ইহার নাম বিশোকা। যতক্ষণ বিষয়বতীপ্র-বৃত্তি প্রকাশিত থাকে, ততক্ষণ কোনরূপ শোক দুঃখ থাকিতে পারে না, বরং বুকটা আনন্দেই পরিপূর্ণ থাকে। ঠিক বিষয়বতী প্রবৃত্তির উদয় হইয়াছে কিনা, তাহা এই একটী লক্ষণদ্বারাই ধরা পড়ে। এই বিশোকারই অন্য নাম জ্যোতিষ্মতী। চিত্ত স্থির হইলেই অর্থাৎ বিষয়বতী প্রবৃত্তির উদয় হইলেই শুভ্র স্বচ্ছ নিস্তরঙ্গ আকাশকল্প একটী অভূতপূর্ব্ব লোভনীয় প্রকাশসত্তার প্রত্যক্ষতা হইতে থাকে; তাই ইহাকে জ্যোতিষ্মতী বলে। আমরা ইহাকে গগনসদৃশ গুরুমূর্ত্তি বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি। কখনও বা ইহাকে স্নেহময়ী মায়ের আমার অঙ্গজ্যোতি বলিয়াও আনন্দে স্বীকার করি। তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ বা সুষুম্নার মুখ খুলিবারও ইহাই লক্ষণ। এসূত্রেও "বা"

শব্দটী এবার্থক অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থেই প্রয়োগ হইয়াছে। বিষয়বতী প্রবৃত্তির উদয় হইলে এই বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতীরূপ লক্ষণ নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে। সকল সম্প্রদায়ের সাধককেই এই লক্ষণের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, ইহার অন্যথা হইতে পারে না। কেহ ভগবৎলাভ করিলেন বা ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেন, অথচ বিশোকা দর্শন করিলেন না, ইহা হইতেই পারে না। সকল সাধককেই এই ভ্রম প্রমাদশূন্য ঋষি প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হইতে হইবে, ইহার অন্যথা কোন কালেই হইতে পারে না। কিন্তু এসকল অন্য কথা।

वीतराग-विषयं वा चित्तम् ॥ ३७॥

विषयवतो प्रवृत्तेरवान्तरफलं वैराग्यमाह वीतेति। वीतरागविषयं वीतो विगतो रागो यस्मात् तथाभूतो विषयः शब्दादि र्यस्य चित्तस्य तत् तादृशं चित्तं वा एव भवतीतिशेषः। रागद्वेषोभय-वचनोऽयं रागशब्दो द्वेषस्यापि रागरूपत्वादिति दर्शितो वशीकारसंज्ञा वैराग्योदयः॥ ३७॥

বিষয়বতী প্রবৃত্তির উদয় বা বিশোকার প্রকাশ যখন বেশ ঘন হইতে থাকে, তখন চিত্তও নিশ্চয়ই বীতরাগবিষয় হইয়া উঠে। পূর্ব্বে যে বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সেই বৈরাগ্যও আপনাহইতেই উপস্থিত হয়। ঈশ্বরপ্রণিধান এমনই অমোঘ উপায়, পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ এমনই অব্যর্থ সাধনা, ইহার ফলে যোগের সমস্ত লক্ষণ যেন আপনা হইতেই প্রকাশ পাইতে থাকে। দেখ, ঈশ্বর-প্রণিধান হইতেই প্রত্যক্‌চৈতন্যের সন্ধান পাওয়া যায়, আবার প্রত্যক্‌চৈতন্য ধরিয়াই বিষয়বতী প্রবৃত্তির উদয় হয়। যখন পূর্ব্বোক্ত

জ্যোতিষ্মতী বৃত্তিকে যতক্ষণ ইচ্ছা ধরিয়া রাখিবার সামর্থ্য হয়, তখনই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ বিষয়বতী প্রবৃত্তি অনেকটা প্রকৃতিগত হইয়া আসিয়াছে এবং চিত্তও ক্রমে একটু একটু করিয়া স্থৈর্য্যের আস্বাদ পাইয়া মুগ্ধ আছে। এই অবস্থায় যেন বাধ্য হইয়াই চিত্তকে বীতরাগ-বিষয় হইতে হয়; না হইয়া উপায় নাই। বীত—বিগত, রাগ শব্দে রাগদ্বেষ উভয়ই বুঝায়। বিষয়ের প্রতি চিত্তের যে স্বাভাবিক ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধিজনিত রাগ ও দ্বেষ, তাহা একেবারেই দূর হইয়া যায়। সকল বিষয়ই যখন বিষয়বতী প্র-বৃত্তিরূপে এক, সকল বিষয়ই যখন "দর্পণ দৃশ্যমান নগরীর ন্যায়" বিশোকার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠে, সকল বিষয়ই যখন প্রত্যক্‌চৈতন্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তখন আর বিষয়ের প্রতি ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধি বা তজ্জন্য রাগ দ্বেষ কিরূপে থাকিবে? দ্রষ্টার সারূপ্য-বোধ যত ঘনীভূত হইতে থাকে, বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্যও ততই প্রকাশ পাইতে থাকে। মনে রাখিও সাধক! যতদিন বিষয়বতী প্রবৃত্তির উদয় না হয়, যতদিন বিশোকাজ্যোতিঃ প্রকাশিত না হয়, ততদিন বৈরাগ্য বৈরাগ্য করিয়া সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া পর্ব্বত-কন্দরে প্রবেশ করিলেও বৈরাগ্য যে কি, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। এসূত্রেও "বা" শব্দটি নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

স্বপ্ন-নিদ্রা-জ্ঞানালম্বনং বা ॥ ३८ ॥

तदा चित्तं कथमिव भवेदित्याह स्वप्नेति। स्वप्नश्च निद्रा च तयोर्यज्ज्ञानं तादृशं ज्ञानमालम्बन आश्रयन इति स्वप्ननिद्राज्ञाना-लम्बनं, वा एव, भवतीति शेषः। विषयवती-प्रवृत्ति-प्रभावेन वीतराग-विषयं चित्तं प्रत्यक्षमपि विषयजातं कदाचित् स्वप्नदृष्टमिव कदाचिद् वा सुषुप्ताविव सर्व्वविषयाभावमनुभवतीत्यर्थः ॥ ३८ ॥

এই অবস্থায় একটু একটু করিয়া সমাধির আভাস পাওয়া যায়। এই সূত্রে তাহাই প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—"স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা" চিত্ত যে পরিমাণে বীতরাগবিষয় হইতে থাকে, সেইপরিমাণে, নিশ্চয়ই সে কখনও স্বপ্নজ্ঞানালম্বনবৎ আবার কখনও বা নিদ্রাকালীন জ্ঞানালম্বনবৎ হইয়া পড়ে। খুলিয়া বলিতেছি—স্বপ্নাবস্থায় চিত্তের আলম্বন যেরূপ নিতান্ত কল্পিত-বিষয়ই হয়, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসমূহ যথাযোগ্য দেশকালাদির অভাবে যেরূপ নিতান্ত অলীকরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপই এই দৃশ্য প্রপঞ্চ, এই জগৎ, এই মাংসপিণ্ডময় দেহ, এই মন ইন্দ্রিয়, ইহারা সকলেই যেন অলীক, সকলই যেন স্বপ্নবৎ, এইরূপ জ্ঞান অর্থাৎ অনুভব হইতে থাকে। এই যে দৃশ্যসমূহ, ইহা ত স্বরূপতঃ দ্রষ্টাই, দ্রষ্টা ব্যতীত এই দৃশ্যবর্গের কোন সত্তাই ত থাকে না; এইরূপ অনুভব যখন স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন এ বিশ্ব—এই জাগ্রত অবস্থাও ঠিক স্বপ্নরূপেই প্রতীয়মান হইতে থাকে। যাঁহারা এইক্ষেত্রে উপস্থিত না হইয়া শুধু মুখে বলেন—"এ বিশ্ব স্বপ্নমাত্র", তাঁহাদের সে বাক্য বাক্যমাত্র। আর ইহা—প্রত্যক্ষ অনুভব, ইহা জ্ঞান, ইহা বোধ। এবিষয়ে একটী বাল্যকালীয় আত্মসম্বেদনও আছে—"বিশ্বং স্বপ্নসমং, মমেতি বচনং মিথ্যেতি সঞ্জানীহি"। সে যাহা হউক, মানুষ প্রতিদিন যে অল্পাধিক স্বপ্ন দর্শন করে, তাহার প্রয়োজনও এই—এই জাগ্রত অবস্থাকে স্বপ্নরূপে দেখা। যতক্ষণ স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়া জানা না যায়, ততক্ষণ ত স্বপ্ন সত্যই থাকে; কিন্তু জাগ্রতে স্বপ্ন মিথ্যারূপেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ যে সকল সাধক জাগরণের সন্ধান পাইয়াছেন, যাঁহারা প্রত্যক্ চৈতন্য ধরিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই বিশ্বকে স্বপ্নবৎ দর্শন করিবেন। ইহা চেষ্টা করিয়া হয় না, চিত্ত যেরূপ স্বভাবতঃই বীতরাগ হইয়া পড়ে, ঠিক সেইরূপই বিষয়বতীর উদয়ে সাধকগণ এই জাগ্রত অবস্থাকেও স্বাভাবিক ভাবেই স্বপ্নরূপে অনুভব করিতে পারেন।

যতদিন চেষ্টা করিয়া জগৎকে স্বপ্নমাত্ররূপে দেখা যায়, ততদিন কিছুতেই চিত্ত বীতরাগ-বিষয় হয় না।

এইবার নিদ্রার কথা বলিব। পূর্ব্বোক্তরূপ স্বপ্নজ্ঞান একটু ঘন হইলেই, অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর পৃথক্ সত্তাবোধ আরও বেশী ক্ষীণ হইয়া পড়িলেই চিত্ত ঠিক নিদ্রিতবৎ হইয়া পড়ে। গভীর নিদ্রাকালে যেরূপ দৃশ্য বা জ্ঞেয়-বিষয়ক কোন জ্ঞানই থাকে না, সেইরূপ এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত থাকিতে থাকিতেই ক্ষণকালের জন্য ইহার অস্তিত্ববোধ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। এমন কি জগতের কোন স্মৃতি পর্য্যন্তও থাকে না, একমাত্র প্রত্যক্ চৈতন্যের উদয়েই এই সকল অবস্থা—এইরূপ অনুভব আসিতে থাকে। নিশ্চয়ই আসে, ইহার অন্যথা হয় না, হইতে পারে না; তাই সূত্রে নিশ্চয়ার্থ বা শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে। এমন কোন সাধক এমন কোন যোগী কোনদেশে কোনকালে জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি এই যোগশাস্ত্র প্রতিপাদ্য সত্য সমূহের উপলব্ধি না করিয়াই কৃতকৃত্য হইয়াছেন। সাধক, যখন তুমি দেখিতে পাইবে—তোমার শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া এই জগৎটা ঠিক স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মত নিতান্ত কাল্পনিকরূপেই ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার যখন দেখিতে পাইবে—তুমি এমন একটা যায়গায় এমন একটা সত্তায় উপস্থিত হইয়াছ, যেখানে ঠিক সুষুপ্তি অবস্থার ন্যায় এই দৃশ্যবর্গ একেবারেই বিলয় হইয়া গিয়াছে, তখনই ঋষিপ্রণীত এই "স্বপ্ন নিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা" সূত্রের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। ইহা সত্য—ধ্রুব সত্য। সাধক মাত্রেরই ইহা হয় এবং হওয়া আবশ্যক। নতুবা সাধনা মৃত-কর্ম্মমাত্র। ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে যে প্রত্যক্ চৈতন্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই সাধকগণ এই সত্য অনুভব করিতে পারেন। হে আমার প্রিয়তম সাধকবৃন্দ। তোমরা কি একটু চেষ্টা করিয়া এই সত্যের উপলব্ধি করিবে না? না না, তা কি হয়, তোমরা যে মানুষ! মানুষ মাত্রেরই এই সত্য উপলব্ধি

করা উচিত এবং একান্ত সম্ভব। এস, অগ্রসর হও! নিশ্চয়ই মনুষ্যত্বলাভে ধন্য হইতে পারিবে।

यथाभिमत-ध्यानाद्वा ॥ ३९ ॥

एवमलं भवति चित्तं ध्यानायेत्याह यथेति। यथाभिमतं अभीष्ट-मनतिक्रम्य अणुर्महान् वार्थस्तस्य ध्यानादेकतानतयावस्थानरूपाद्, वा एव, किं स्यादस्य वशीकार इति परेणान्वयः ॥ ३९ ॥

এইরূপ অবস্থা হইতেই অর্থাৎ চিত্ত যখন স্বপ্নজ্ঞানালম্বন হয় অথবা নিদ্রাজ্ঞানালম্বন হয়, তখনই ধ্যানের সামর্থ্য আসে। ধ্যান কি, তাহা পরে ঋষি স্বয়ংই বলিবেন; সুতরাং এস্থলে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখানে এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখিলেই চলিবে যে ধ্যান "করিবার" কিছু নহে, উহা "হয়,"—অর্থাৎ আপনা হইতেই আসে। ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে পর পর যে সকল অবস্থা উপস্থিত হইতে থাকে, ঋষি এইসকল সূত্রে ক্রমে তাহাই ব্যক্ত করিলেন। ধ্যানের সামর্থ্য লাভ হইলে যোগী ইচ্ছানুরূপ বিষয়ের ধ্যান করিতে পারেন। স্থূল বা সূক্ষ্ম যে কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া ধ্যান চলিতে পারে। এইরূপ ধ্যান করিলে কি লাভ হয়, তাহা পরসূত্রে বলা হইতেছে। এ সূত্রেও 'বা' শব্দটী নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ নিশ্চয়ই যথাভিমত ধ্যান হইতে পরসূত্রোক্ত পরমাণু বা পরমমহত্ব পর্য্যন্ত বশীভূত হইয়া থাকে। যাঁহারা মনে করেন—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ কোন একটা বিষয়ের চিন্তা করিতে পারিলেই ধ্যান হইল, তাঁহারা এখনও বুঝিতে পারেন নাই—ধ্যান কি ব্যাপার। মায়ের কৃপায় ক্রমে বুঝিতে পারিবেন।

পরমাণু-পরম-মহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥

যথাভিমতধ্যানাদেব ভবতি বশীকারসংজ্ঞাবৈরাগ্যোদয়ঃ, তমেব দর্শয়তি পরমাণ্বিবতি। পরমাণুতঃ অতিসূক্ষ্মবস্তুতঃ পরমমহত্ত্বান্তঃ পরম-মহৎ পরিমাণং বস্তু পর্য্যন্তং যথাভিমতং ইত্যর্থঃ। অস্য ধ্যানপ্রবণচিত্তস্য বশীকারোভবতীতি শেষঃ। যদা যত্র চেচ্ছা জায়তে তদা তত্রৈব স্বৈরবিচরণং কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা বা কর্ত্তুং শক্নোতি, নতু বিষয়বশগমিব চিত্তং বিশিষ্টেষু বিষয়েষু সজ্জত এবেতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীগুরুর কৃপায় ঈশ্বরপ্রণিধানের ফলে যোগীর যখন ধ্যান করিবার সামর্থ্য আসে, তখন সে যথাভিমত বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই ধ্যানপ্রবাহ পরিচালিত করিতে পারে; এইরূপ ধ্যান করিতে করিতেই পূর্ব্বোক্ত বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যের উদয় হয়। ইতিপূর্ব্বে "বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তং" সূত্রে যে বৈরাগ্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই বৈরাগ্য কি প্রকারে আবির্ভূত হয়, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্যই ঋষি এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ঋষি বলিলেন—যথাভিমত ধ্যান হইতে নিশ্চয়ই পরমাণু হইতে পরম মহত্ব পর্য্যন্ত চিত্তের বশীকার হইয়া পড়ে। অতিসূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় বস্তু হইতে আরম্ভ করিয়া পরম-মহৎ পরিমাণ বস্তু পর্য্যন্ত অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম দ্রব্যের অবিভাজ্য অংশ হইতে আরম্ভ করিয়া অতিমহৎ দেশকালপর্য্যন্তের মধ্যে, যোগীর যে বিষয়টী অভিমত, তাহাতেই তিনি ধ্যান লাগাইতে পারেন। অতি সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে অতি মহৎ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই, যোগী স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে সমর্থ হন। আবার ইচ্ছা করিলে কোন বিশিষ্ট বিষয়ের ধ্যান নাও করিতে পারেন। অথবা যে বস্তু যেরূপে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়, সেরূপে ধ্যান না করিয়া অন্য প্রকারে অর্থাৎ পারমার্থিক

সত্তামাত্র লইয়াও ধ্যান করিতে পারেন। স্থূল কথা এই যে, ধ্যানের যদি সামর্থ্য আসে, তবে যোগী যে কোন বিষয় অবলম্বনে যে কোন প্রকারে ধ্যান করিতে পারেন। এইরূপ ধ্যান করিয়া কি ফল লাভ হয়? "অস্য বশীকারঃ," ইহার (চিত্তের বা যোগীর) বশীকার হয়। যে বিষয়ে ধ্যান করিবে, সেই বিষয়ই যোগীর বশীভূত হইবে। বশীকার শব্দটীর মধ্যে অভূততদ্ভাব অর্থে 'চ্বি'প্রত্যয় আছে। উহার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে যাহা বশীভূত ছিল না, এক্ষণে তাহা বশীভূত হইয়াছে। কিরূপে ইহা সম্পন্ন হয়, তাহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য।

শুন, বিষয়গুলিকে ধরিয়া,—কি স্থূল কি সূক্ষ্ম যাহা সমীপস্থ হয়, তাহাকেই ধরিয়া ধ্যানের সাহায্যে উহার স্বরূপ,—অবস্থা গতি পরিণতি প্রভৃতি যত কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হয়। ধ্যান ঠিক ঠিক লাগাইতে পারিলে সকল বিষয়কেই দ্রষ্টার সারূপ্যরূপে পাওয়া যায়। এই সারূপ্য পর্য্যন্ত উপলব্ধির পথে বিষয় সমূহের যে স্ব স্ব বিশিষ্টতা, তাহারও প্রকাশ হইয়া পড়ে। স্থূল বিষয়ই হউক, আর সূক্ষ্ম বিষয়ই হউক, সকলই স্বকীয় স্বরূপের অজ্ঞান জন্য বিক্ষেপ হইতে সঞ্জাত; সুতরাং যোগী যদি স্বরূপাভিমুখী হন, তবে এই বিক্ষেপজাত বিষয়সমূহের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে বিষয়গত বিশিষ্টতা তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িবেই। এইরূপ বিশিষ্টতা গুলির যে দ্রষ্টা হইতে পৃথক সত্তা নাই, ইহা নিশ্চয় করিবার পক্ষে ধ্যানই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়; সুতরাং ধ্যান অবলম্বনে বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশিত হইবার ফলে চিত্ত একেবারেই অনাসক্ত হইয়া পড়ে। সে অবস্থায় যোগী দেখিতে পায়—"সবই এক, সবই আমি, সবই আমার প্রিয়তম আত্মা মাত্র; অন্য কোথাও কিছু নাই। বিকার নাই ধ্বংস নাই উৎপত্তি নাই ইষ্ট নাই, অনিষ্ট নাই, সকলই এক—সকলই এক। সকলই সত্য সকলই সত্য।" এইরূপ জ্ঞানে বিচরণ করিবার সামর্থ্য

আসিলেই পূর্ব্বকথিত বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্য লাভ হয়। ধ্যান ব্যতীত উহা কখনও লাভ হইতে পারে না; তাই ঋষি বলিলেন;—"যথাভিমতধ্যানাৎ অস্য বশীকারঃ"। কেবল শাস্ত্রপাঠ কিংবা উপদেশ শ্রবণে বিষয় ত্যাগের ইচ্ছারূপ বৈরাগ্য আসিতে পারে, কিন্তু তাহা বৈরাগ্য নহে, এই বশীকারত্বই যথার্থ বৈরাগ্য। ইহা ধ্যানজন্য বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশের ফলে লাভ হয়।

এ স্থলে আশঙ্কা হইবে—যদি স্থূল সূক্ষ্ম বস্তুকে ধ্যানের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহার স্বরূপ প্রকৃতি প্রভৃতি জানিয়া তবে বৈরাগ্য আনিতে হয়, তবে কোনও মানুষের পক্ষেই যাবতীয় বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য কোন কালেই ঘটিতে পারে না; কারণ, বিষয় অনন্ত, মানুষের স্পৃহাও অনন্ত, যদি একটী একটী করিয়া বিষয় ধরিয়া ধ্যানের সাহায্যে নিস্পৃহতা আনিতে হয়, তবে অনন্ত জীবনেও উহার শেষ হইতে পারে না। না, এরূপ আশঙ্কার অবসর নাই; যেহেতু কোন একটী বিষয় ধরিয়া উহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া লইতে পারিলেই যাবতীয় বিষয়ের স্বরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। যেরূপ পাত্রস্থ একটীমাত্র তণ্ডুল সিদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহা দেখিয়াই যাবতীয় তণ্ডুলের অন্নত্ব সুনিশ্চিত হয়, ঠিক সেইরূপ একটী বা দুইটী বিষয় ধরিয়া ধ্যানের সাহায্যে যদি দ্রষ্টার সারূপ্য পর্য্যন্ত যাওয়া যায়, তবে অতি সহজেই চিত্ত স্বীকার করিয়া লয় যে, যাবতীয় বিষয়ই এইরূপ, উহাদের আর কোন বিশেষত্ব থাকিতে পারে না। যতদিন চিত্ত এরূপ নিঃসংশয় না হয়, ততদিন পরমাণু হইতে পরম মহত্ব পর্য্যন্ত ধ্যানের সাহায্যে দর্শন করাই কর্ত্তব্য।

পরমাণু শব্দে দার্শনিক দৃষ্টিতে সূক্ষ্ম আকাশীয় অবস্থাকেই লক্ষ্য করা হয়। এস্থলে কিন্তু পরমাণু শব্দে স্থূল পদার্থ সমূহের অবিভাজ্য অংশরূপ সূক্ষ্ম বস্তুকেও বুঝিতে হইবে। পরমাণু হইতে পরম মহত্ব পর্য্যন্ত বলিতে সাধারণ ভাবে ক্ষুদ্র বৃহৎ স্থূল সূক্ষ্ম সকল বিষয় বুঝিয়া লইলেই আর কোন গোল থাকিবে না। আসল

কথা এই যে চিত্ত যাহা কিছু চায়, তাহা যত সূক্ষ্ম বা যত স্থূল হউক, সকল পদার্থই ধ্যানের প্রভাবে বশীকার হইতে বাধ্য হয়, ইহাই এই সূত্রে বিশেষ জ্ঞাতব্য।

क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृ-ग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः॥ ४१ ॥

ध्यानं विभिनष्टि क्षीणेति। क्षीणवृत्तेः क्षीणाः स्वस्वभावापन्ना विप्लुताघनीभूतभावा इत्यर्थः, वृत्तयो यस्य तथाभूतस्य योगि-चित्तस्य, ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु द्रष्टृकरणविषयेषु तत्स्थतदञ्जनता—तत्र यथाभि-मते वस्तुनि स्थितियोग्यता तत्स्थता नतु विच्छिन्नता, तथा तदञ्जनता तदाकारिताकारता नत्वत्यन्तविविक्तता भवतीतिशेषः। दृष्टान्ते-नैतद्द्रढ़यति—अभिजातस्येव मणेः समुज्ज्वलस्य स्फटिकादेरिव। इयमेव तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिरिति संकीर्त्यते योगिभिर्यथार्थ नाम॥ ৪১ ॥

এই সূত্র হইতে ধ্যানের বিশেষ বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হইবে। ধ্যান একটু পরিপক্ক অবস্থায় আসিলেই উহা সমাপত্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঋষি বলিলেন—চিত্ত ক্ষীণবৃত্তি হইলে, তাহা অভিজাত মণির ন্যায় গ্রহীতৃ গ্রহণ এবং গ্রাহ্য বিষয়ে তৎস্থতা ও তদঞ্জনতা প্রাপ্ত হয়, ইহারই নাম সমাপত্তি। এক্ষণে একটী একটী করিয়া সূত্রস্থ শব্দগুলির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। (১) ক্ষীণবৃত্তি—বৃত্তির স্বাভাবিক চাঞ্চল্য রহিত হইলে চিত্তের একটা জড় পদার্থের ন্যায় ঘনীভূতভাব উপস্থিত হয়, তাহা যখন কিয়ৎপরিমাণে শিথিল হইয়া যায়, তখন চিত্ত যে কোন বিষয়ে কিছুক্ষণের জন্য সংসক্ত হইবার মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই সূত্রে ক্ষীণবৃত্তি শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে। (২) অভিজাত মণির ন্যায়—অতিশয় উজ্জ্বল

স্ফটিকাদি মণির ন্যায়। স্ফটিকাদি স্বচ্ছমণি জবা প্রভৃতি পুষ্পের সান্নিধ্যবশতঃ রক্তাদিবর্ণদ্বারা কিয়ৎপরিমাণে অভিরঞ্জিত হয়, ঠিক এইরূপই ক্ষীণবৃত্তি চিত্ত ধ্যেয়-বিষয়দ্বারা অভিরঞ্জিত হইয়া থাকে। (৩) গ্রহীতৃগ্রহণ গ্রাহ্যেষু—সংক্ষেপে সমগ্র জগৎতত্ত্বকে বিশ্লেষণ করিলে এই তিনটীই পাওয়া যায়। প্রথমতঃ গ্রহীতা—পুরুষ, যাঁহার সত্তায় এবং প্রকাশে সকল বস্তুই সত্তাবৎ এবং প্রকাশশীল হয়। দ্বিতীয়তঃ গ্রহণ, অর্থাৎ করণবর্গ—যাহাদ্বারা বিষয়সমূহ পরিগৃহীত হয়, মন বুদ্ধি ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ সকলই এই গ্রহণ শব্দে বুঝা যায়। তৃতীয় গ্রাহ্য, যাহা গ্রহীত হয়,—রূপরসাদি বিষয়সমূহ। (৪) তৎস্থতা—তাহাতে অর্থাৎ অভিলষিত বিষয়ে (পূর্ব্বোক্ত তিনটীর মধ্যে যখন যেটীতে থাকিবার ইচ্ছা, ঠিক সেইটীতে) কিছুক্ষণ অবস্থান করিবার যোগ্যতা। (৫) তদঞ্জনতা—তদাকারে আকারিত হওয়া। ধ্যেয়বিষয়ে চিত্তের ঐকান্তিক একাগ্রতা হইলেই চিত্ত ধ্যেয় বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হয়, ইহাই তদঞ্জনতা। এইবার সমগ্র সূত্রের অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে—উজ্জ্বল স্ফটিকাদি মণি রক্তবর্ণ পুষ্পাদির সান্নিধ্যবশতঃ যেরূপ সেই বর্ণ দ্বারা অভিরঞ্জিত হয়, ঠিক সেইরূপ চিত্ত যখন স্বাভাবিক চঞ্চলতা পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষীণবৃত্তিতা নিবন্ধন গ্রহীতৃবিষয়ে গ্রহণবিষয়ে বা গ্রাহ্যবিষয়ে অবস্থানকরতঃ সেই সেই আকার প্রাপ্ত হইয়া যায়, তখন তাহার নাম হয় সমাপত্তি। খুলিয়া বলিতেছি—পূর্ব্বে যে দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই বৃত্তিসারূপ্য ব্যাপারটীকে যখন কোন যোগীর প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিবার যোগ্যতা উপস্থিত হয়, তখন যোগিচিত্তের যে অবস্থা প্রাপ্তি হয়, তাহারই নাম সমাপত্তি। সম্যক্‌প্রকারে প্রাপ্তির নাম সমাপত্তি। চিত্ত যখন ধ্যেয়বিষয়কে সম্যক্‌প্রকারে প্রাপ্ত হয়, তখনই চিত্তের তৎস্থ-তদঞ্জনতা হইয়া থাকে, এবং ইহাকেই যোগিগণ "সমাপত্তি" নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

মানুষ সাধারণতঃ এই বৃত্তিসারূপ্য কথাটীই বুঝিতে পারে না;

যিনি চৈতন্যস্বরূপ দ্রষ্টা, তাঁহাতে এই সারূপ্য কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে, ইত্যাদি কত বিতর্ক কত সংশয় উপস্থিত হইয়া প্রকৃত সাধনার পথ হইতে সাধককে বহু দূরে সরাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ অভ্যাস ও বৈরাগ্য অধিগত হইলে অর্থাৎ সত্যপ্রতিষ্ঠা প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও ঈশ্বরপ্রণিধানের অনুশীলন করিলে ইহা বুঝিতে পারা দুরূহ ব্যাপার ত থাকেই না, বরং অনেকটা সহজসাধ্যই হইয়া উঠে। আমরা সাধারণতঃ জগৎটাকে যেন একটা জমাটবাঁধা ঘন জিনিষরূপেই দেখি, কাঠ মাটী পাথর প্রভৃতি বস্তুগুলি যেন কত ঘন কত জমাটবাঁধারূপেই প্রতীয়মান হয়, বাস্তবিক কিন্তু ঐগুলি দ্বারা আমাদের চিত্তের তাৎকালিক অবস্থাই প্রতীতি-গোচর হইয়া থাকে। চিত্তটাই ত জগৎ আকারে দেখা যায়! বাহিরের এই যে জড়ত্ব, এই যে একটা ঘন ভাব, ইহা বাস্তবিক পক্ষে বাহিরের নহে, আমাদের চিত্তেরই। যতদিন চিত্তের এই জমাটবাঁধা ভাবটা দূরীভূত না হয়, ততদিন কিছুতেই অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না, অর্থাৎ ধ্যান বা সমাপত্তির সন্ধানও পাওয়া যায় না। একমাত্র ঈশ্বরপ্রণিধানের ফলেই অভ্যাস বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধনার উপকরণ সমূহ উপস্থিত হইতে থাকে, তখন চিত্ত ক্ষীণবৃত্তি হইয়া পড়ে, অর্থাৎ ঐ যে একটা জমাটবাঁধা ভাব, ঐটা দূরীভূত হইয়া যায়; তখন চিত্ত সূক্ষ্ম আকাশীয় ভাব প্রাপ্ত হয়। বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী অবলম্বন করিয়াই চিত্তের ঐ জড়ত্ব অপসৃত হয়—কিছু কিছু চিৎ-ধর্ম্ম প্রকাশ পাইতে থাকে। এই অবস্থায় চিত্তকে যাহাতে লাগান যায়, তাহাতেই লাগিয়া থাকিতে পারে, অর্থাৎ ধ্যেয়বিষয়ে চিত্ত বেশ বসিয়া যায়।

ধ্যেয়বিষয় জগতে তিনটী মাত্র, হয় গ্রহীতা—পুরুষ, না হয় গ্রহণ—করণবর্গ, নচেৎ গ্রাহ্য—রূপরসাদি বিষয়। এই ত্রিবিধ ধ্যেয় বিষয়ের মধ্যে চিত্ত যথাভিমত বস্তুতে তৎস্থ তদঞ্জনতা প্রাপ্ত হইয়া যায়। ধ্যেয়বিষয়ে চিত্তের অবস্থান যোগ্যতা, ধ্যেয়বিষয়ের

আকারে আকারিত হওয়া, যাহা সাধকগণ প্রায় প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, সেই অবস্থার নাম সমাপত্তি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে চিৎ বস্তু যখন বৃত্তিসারূপ্য প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহার নাম হয় চিত্ত। চিৎএর যে এই চিত্ত হওয়া, ইহা যে অবস্থায় প্রত্যক্ষ হয়, অনুভবের বিষয় হয়, তাহাকেই সমাপত্তি বলা যায়। ক্রমে পর পর সূত্রার্থ আলোচনা করিলে এই বিষয়টী আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে।

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ ॥ ৪২ ॥

সন্তি চাসংখ্যাতা ভেদাঃ সমাপত্তে স্তথাপি প্রাধান্যেন চত্বার এব, তেষু চ পুনর্গ্রাহ্যবিষয়ায়া ভেদা দ্বিবিধ স্তয়ো রাদ্যং নিরূপয়ন্নিতি। তত্র সমাপত্তিষু শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ শব্দস্তদর্থে স্তদ্বিষয়কং জ্ঞানমেতেষাং পরস্পরবিলক্ষণানাং ত্রয়াণাং যে বিকল্পা বিভিন্নকল্পনানি তৈঃ সঙ্কীর্ণা সংমিশ্রা যা সমাপত্তিঃ সা সবিতর্কা। বিবিধস্তর্কো বিতর্কঃ শব্দস্তদর্থস্তজ্জ্ঞানরূপস্তেন সহ বিদ্যত ইতি সবিতর্কা। এবঞ্চ ভবতি হি যদা চৈতন্যস্বরূপস্য দ্রষ্টুঃ শব্দার্থাদি-বিকল্পানাং সঙ্কীর্ণতা প্রত্যক্ষীভূতা তদৈবোচ্যতে সবিতর্কা সমাপত্তিরিতি ॥ ৪২ ॥

সমাপত্তির ভেদ অসংখ্য, তন্মধ্যে গ্রাহ্যবিষয়ক-সমাপত্তির ভেদ দুইপ্রকার—সবিতর্কা ও নির্ব্বিতর্কা, আর গ্রহণ বিষয়ক সমাপত্তির ভেদ দুই প্রকার সবিচারা ও নির্ব্বিচারা, এই চারি প্রকার ভেদই

প্রধান ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই সূত্রে প্রথম ভেদ সবিতর্কা সমাপত্তির বিষয় বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—সমাপত্তি যখন শব্দ অর্থ এবং জ্ঞান, এই ত্রিবিধ বিকল্প দ্বারা সঙ্কীর্ণ থাকে, তখন তাহাকে সবিতর্কা বলা হয়। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী স্পষ্ট করা যাইতেছে। "গো" একটী শব্দ, ইহা একপ্রকার ধ্বনি মাত্র, গো শব্দের অর্থ- তদাকারীয় একটী পশুবিশেষ, এবং গো-বিষয়ক জ্ঞান, এই যে শব্দ অর্থ এবং জ্ঞান, ইহারা পরস্পর অত্যন্ত বিলক্ষণ। এই তিনটীর প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র—সম্পূর্ণ পৃথক, অথচ দেখা যায়—ব্যবহার কালে এই তিনটী যেন যুগপৎ অভিন্ন ভাবেই প্রকাশ পায়। এইরূপ জগতের সর্ব্বত্র। দেখ সাধক, যাহাকে তুমি পুত্র বলিয়া আহ্বান করিতেছ, ঐ যে শব্দ সঙ্কেত, উহা নিতান্ত কল্পিত। ঐরূপ শব্দ ব্যতীতও পুত্র নামক সেই মূর্ত্তিটী স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। আবার পুত্রের মূর্ত্তিও কিন্তু তোমার পুত্রবিষয়ক যে জ্ঞান তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই যে পৃথকৃত্ব—এই যে অত্যন্ত বিভিন্ন—শব্দ অর্থ ও জ্ঞান, এই তিনের বিকল্প দ্বারা তোমার জ্ঞান সর্ব্বদাই সঙ্কীর্ণ হইতেছে। অবিমিশ্র বিশুদ্ধ জ্ঞান যে কি বস্তু, তাহা তুমি ধরিতে বা বুঝিতেই পার না। জ্ঞান বলিলেই তুমি শব্দ এবং তাহার অর্থের সহিত অভিন্নভাবে মিশ্রিত জ্ঞানকেই বুঝিয়া থাক। দেখ দেখ সাধক, তোমার জ্ঞান অর্থাৎ তুমিই কত শিশু—নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারিতেছ না। শব্দ ও অর্থরূপ দুইখানি যষ্টি দুই হাতে ধরিয়া তবে তোমাকে দাঁড়াইতে হয়। হইতে পারে তুমি অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ, কিন্তু তথাপি তোমার জ্ঞানময় দেহটী আত শিশু, নহে কি? হ্যাঁ, নিজের এই শিশুত্ব যদি অনুভব করিতে পার, যদি পূর্ণবয়স্ক হইবার জন্য বাসনা জাগে, যদি শব্দ ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে ইচ্ছা হয়, তবে ঈশ্বরপ্রণিধানের পথে অগ্রসর হও, গুরু বলিয়া তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন কর। যিনি তোমার শিশুত্বের পরিচয় করাইয়া দিলেন, তিনিই তোমায়

স্বপ্রতিষ্ঠ করাইয়া দিবেন। কিন্তু এ সকল অন্য কথা। আমরা সবিতর্কা সমাপত্তি বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। চিত্ত যখন একটু একটু করিয়া ধ্যানপ্রবণ হয়, কোন একটা বিষয়ে তৎস্থতা ও তদঞ্জনতা প্রাপ্ত হয়, তখন বেশ পরিষ্কারভাবেই প্রত্যক্ষ হইতে থাকে যে, জ্ঞান একান্ত স্বতন্ত্র বস্তু হইয়াও শব্দ ও অর্থের বিকল্পদ্বারা সংকীর্ণ না হইয়া প্রকাশ পাইতে পারিতেছে না। জ্ঞানকে ধরিতে গেলেই কোনও একটা শব্দ (তাহা মানস শব্দও হইতে পারে) এবং তাহার অর্থকে আশ্রয় করিতে হয়। জ্ঞান যেন সঙ্কীর্ণ পদার্থ—শব্দ ও অর্থের সহিত একান্তভাবেই মিশ্রিত। এইভাবটী যখন যোগীর প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয় হইতে থাকে, তখনই বুঝিতে হইবে—যোগী সবিতর্ক সমাপত্তি ক্ষেত্রে আরোহণ করিতে পারিয়াছেন। যদিও সাধনার দিক দিয়া ইহা উচ্চতম অবস্থারূপেই গণনীয় হইয়া থাকে, তথাপি যে যথার্থ সাধক—সে এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, নিশ্চয়ই একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে,—ওগো, যাতনায় তার বুকটা ফাটিয়া যাইতে থাকে, সে যাতনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সাধক যখন তাহার ইষ্টদেবতাকে এত সঙ্কীর্ণরূপে দেখিতে পায়, শব্দ ও অর্থের দ্বারা বিতর্কযুক্ত হইয়া যখন অভীষ্ট-দেবের প্রকাশ হয়, তখন সে নিশ্চয়ই মরমে মরিয়া যায়। একি গুরো! একি ভগবন্! তুমি নিত্যশুদ্ধ স্বতন্ত্র মুক্ত আত্মা, আজ এতদূরে আসিয়াও দেখি তুমি বিতর্কদূষিত। তুমি নির্ব্বিকল্প হইয়াও আমারই ভাগ্যদোষে আজ শব্দ ও অর্থরূপ বিকল্প দুষ্ট। কিছুতেই তোমার সে বিশুদ্ধ স্বরূপটী ধারণাও করিতে পারিতেছি না। ওগো জগতের লোক, তোমরা একমাত্র পুত্রহারা বিধবার দুঃখ দেখিয়াছ, তোমরা পতিব্রতার পতিবিয়োগ-যাতনা লক্ষ্য করিয়াছ, তোমরা অন্নহীনের ক্ষুধার জ্বালা প্রত্যক্ষ করিয়াছ, সে সকল দুঃখ এ দুঃখের সঙ্গে তুলনায়ই নহে। ভগবান্ নিজে যেরূপ অনির্দ্দেশ্য অচিন্ত্য ও মহৎ, তাহার বিরহও—তাঁহাকে পূর্ণরূপে না পাওয়ার দুঃখও ঠিক সেইরূপ

অনির্দ্দেশ্য অচিন্ত্য এবং মহৎ। প্রিয়তম সাধক! যখন তুমি সবিতর্ক-সমাপত্তি ক্ষেত্রে আরোহণ করিতে পারিবে, তখন জগতের লোক হয়ত তোমায় ধন্য ধন্য করিবে, কিন্তু তুমি অন্তরে অন্তরে এই অনির্দ্দেশ্য তীব্র দুঃখ অনুভব করিও, তবেই পূর্ণতার মুক্ত প্রাঙ্গণে উপনীত হইতে পারিবে।

स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्र-निर्भासा निर्व्वितर्का ॥ ४३ ॥

अथापरं समापत्तिभेदं दर्शयति स्मृतीति। स्मृतिः शब्दार्थज्ञान-संकीर्णेति भावः, तस्याः परिशुद्धौ विगतसङ्कीर्णतायामित्यर्थः। स्वरूप-शून्येव स्वरूपेण ज्ञातृतारूपेण शून्या इव—वस्तुतस्तु तदापि सूक्ष्मतया तद्विद्यमानत्वादिति। अर्थमात्रनिर्भासा अर्थमात्रं ध्येयविषयमात्रं ज्ञानमयं निर्भासते निःशेषेण प्रकाशते न किञ्चिदपि प्रकाशागोचरं तिष्ठतीति भावः। इयमेव निर्व्वितर्का वितर्केण विहीना समापत्तिरिति शेषः ॥ ४३ ॥

এই সূত্রে নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তির বিষয় বলা হইতেছে। সবিতর্কা সমাপত্তির পরিপকাবস্থায়, সাধকের কাতর প্রার্থনায় পর পর যে সকল অবস্থা আসিতে থাকে, তাহাই এক্ষণে ক্রমে ক্রমে বর্ণিত হইবে। সাধক মাত্রেরই এই সকল অবস্থা আসিয়া থাকে। যাহারা প্রকৃত কল্যাণকামী পুরুষ, তাহাদের কাহারও এই সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা ব্যতীত সফলকাম হইবার উপায় নাই। "যতমত তত পথ" এই যে প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, তাহা বহিরঙ্গ সাধনবিষয়েই প্রযুজ্য, কিন্তু

অন্তরঙ্গ সাধন সকলেরই একরূপ, যতদিন সাধক এই সত্যে উপস্থিত হইতে না পারে, অর্থাৎ যতদিন এই যোগশাস্ত্র-প্রদর্শিত পন্থায় উপস্থিত হইতে না পারে, ততদিন বুঝিতে হইবে—সে প্রকৃত পন্থা ধরিতে পারে নাই। হইতে পারে কোনও সাধক যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপরিচিত, কিন্তু তাহার অন্তরে অন্তরে যে সাধনা চলিয়া থাকে, তাহা ঠিক এই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বনেই অগ্রসর হয়, সাধক হয়ত জানেও না, যে আমি যোগের অনুশীলন করিতেছি। হয়ত সে বাহিরে শুধু নামকীর্ত্তন বা জপ বা পূজা, এইরূপ একটা কিছু করিতেছে; কিন্তু যখনই সে ধীর স্থির হইয়া ভগবান্‌কে দেখিবার জন্য চেষ্টা করে, তখনই তাহার চিত্ত এই যোগপথকেই অবলম্বন করে। ঋষিবাক্য সমূহ এমনই সত্য, এমনই সার্ব্বজনীন। সে যাহা হউক, ঋষি বলিলেন—সবিতর্কা সমাপত্তি হইতেই ক্রমে নির্ব্বিতর্ক অবস্থা উপস্থিত হয়। তখন কিরূপ হয়—স্মৃতি পরিশুদ্ধ হয়, স্বরূপ শূন্যের মতন হয়, আর অর্থমাত্র নির্ভাস হয়। ক্রমে এই তিনটী কথার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। প্রথমতঃ স্মৃতি পরিশুদ্ধ হয়—শব্দ, অর্থ এবং জ্ঞান, এই ত্রিবিধ বিকল্প দ্বারা স্মৃতির অর্থাৎ জ্ঞানের যে সঙ্কীর্ণভাব, তাহা একেবারেই তিরোহিত হইয়া যায়। যে বিষয়ক সমাপত্তি হয়, সেই বিষয়ের শব্দ ও অর্থের স্মৃতি থাকে না, মাত্র ধ্যেয়পদার্থেরই স্মৃতি থাকে। এইরূপে স্মৃতি পরিশুদ্ধ হইলে অর্থাৎ শব্দ ও অর্থকে পরিত্যাগপূর্ব্বক মাত্র ধ্যেয়-বিষয়ক-স্মৃতি প্রকাশিত হইলে, তখন স্বরূপ শূন্যের মতন হয়। স্বরূপ যে আমি বা জ্ঞাতা, তাহা শূন্যের ন্যায় হইয়া পড়ে, "আমি ধ্যান করিতেছি" এইরূপ ভাবটাও থাকে না। সূত্রে একটী "ইব" শব্দের প্রয়োগ করিয়া ঋষি বুঝাইয়া দিতেছেন—যে যদিও সে সময়ে স্বরূপটী শূন্যবৎ হইয়া যায় তথাপি কিন্তু সূক্ষ্মভাব তখনও তাহা থাকে। জ্ঞাতৃতার যে স্থূলভাব—অর্থাৎ "আমি এই পদার্থটিকে জানিতেছি" এই যে ভাব, তাহা প্রায় লোপ হইয়া যায়; কিন্তু

সূক্ষ্মভাবে জ্ঞাতৃত্ববোধ থাকিয়া যায়। স্মৃতি শুদ্ধ হইলেই অর্থাৎ শব্দ ও অর্থবিষয়ক বিকল্প বিদূরিত হইলেই জ্ঞাতৃতা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন কি থাকে? "অর্থমাত্র নির্ভাস"—ধ্যেয় যে পদার্থ, তাহাই নিঃশেষ রূপে প্রতিভাসিত হইতে থাকে। ইহাই নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি। সাধারণতঃ জ্ঞেয় পদার্থগুলির অতি অল্প অংশই আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। "আমি বৃক্ষটীকে জানিতেছি" বলিলে বৃক্ষের অতি অল্প অংশই আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, অধিকাংশই অজ্ঞাত থাকে। কিন্তু এইরূপ সমাপত্তির অবস্থায় পদার্থটী নিঃশেষ রূপেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। এমন কোন অংশ থাকে না, যাহা আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতেছে না, যুগপৎ পদার্থের সর্ব্বাংশই পরিগৃহীত হইয়া পড়ে, ইহাই নির্ভাস। এ পর্য্যন্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল—অর্থ মাত্রের অর্থাৎ পদার্থ মাত্রের যে নিঃশেষরূপে প্রকাশ, তাহাই নির্ব্বিতর্ক-সমাপত্তি। ঐরূপ প্রকাশ হইবার সময়ে স্মৃতির সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া যায়—শব্দ ও অর্থ বিষয়ক সংকীর্ণতা থাকে না। আর ধ্যাতারও তখন শূন্যবৎ অবস্থা হইয়া পড়ে। যখন কোন সাধক কোন গ্রাহ্য-পদার্থ-বিষয়ক সম্যক্জ্ঞান লাভের অভিলাষী হন, তখন তাঁহাকে সেই পদার্থ অবলম্বনে ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান করিতে করিতে সে দেখিতে পাইবে, চিত্তের যে বহুভাবে বিক্ষিপ্ত হওয়া রূপ অবস্থা, তাহা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে—মাত্র সেই ধ্যেয় পদার্থ বিষয়ক শব্দটী আছে, সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যেয় বস্তুর আকারটী আছে, আর যে ধ্যান করিতেছে, সেই ধ্যাতা যে জ্ঞান স্বরূপ আমি, সেও আছে। সেই জ্ঞানই যেন এই ত্রিবিধভাবে প্রকাশ পাইতেছে। এই পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিলে—ধ্যেয় পদার্থ বিষয়ক এইরূপ জ্ঞান হয় যে, আমিই ত ঐ পদার্থ সাজিয়া রহিয়াছি। ঐ শব্দ, ঐ অর্থ, উহাও আমিই অন্য কেহ নহে। এইরূপ অবস্থার নাম সবিতর্কা সমাপত্তি। তারপর আরও অগ্রসর হইলে অর্থাৎ ঐভাবে কিছুক্ষণ ধ্যান চালাইলে

শব্দ এবং অর্থ বিষয়ক যে স্মৃতি, তাহা আর থাকে না; মাত্র জ্ঞানময় পদার্থ-বিষয়ক স্মৃতি প্রবুদ্ধ থাকে। এই সময় সুতরাং ধ্যাতৃভাব পরিক্ষীণ হইয়া যায়—"আমি অমুক বস্তুকে ধ্যান করিতেছি" এই ভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়; মাত্র সেই পদার্থ-আকারীয় যে জ্ঞানময় সত্তা, তাহার প্রকাশ হইয়া পড়ে। এইরূপ জ্ঞানময় সত্তার উদয় হইলেই সেই পদার্থের সম্যক্ জ্ঞান হইয়া থাকে। অবশ্য এ অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকা বড় শক্ত, প্রায়ই থাকা যায় না; তথাপি ঐ অল্পক্ষণের মধ্যেই পদার্থের যাহা স্বরূপ, তাহা সম্যক্ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহাই নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি। গ্রাহ্যবিষয়সমূহে এইরূপ সমাপত্তির ফলে পরবৈরাগ্য লাভ হয়; কারণ, পদার্থরূপে যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, তত্ত্বদৃষ্টিতে তাহা বাস্তবিক পদার্থই নহে, জ্ঞান মাত্র। এইরূপ পুনঃ পুনঃ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতে হইতে সত্তাবিষয়ক প্রতীতি চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহাই পরবৈরাগ্য, ইহাই মুক্তির অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা।

एतयैव सविचारा निर्व्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता ॥ ४४ ॥

ग्राह्येष्विव ग्रहणविषयाया: समापत्तेरपि भेदोद्विविधः, स उच्यते एतयेति। एतया पूर्व्वोक्तया सवितर्क-निर्व्वितर्क-समापत्त्या एव सूक्ष्मविषया ग्रहणविषया समापत्तिः, सविचारा निर्व्विचारा च व्याख्याता। तथाहि—करणवर्गेषु सूक्ष्मविषयेषु शब्दार्थज्ञानविकल्पसङ्कीर्णा सविचारा, तथा स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्व्विचारेति ॥ ४४ ॥

গ্রাহ্যবিষয়ক সমাপত্তির ন্যায় গ্রহণবিষয়ক সমাপত্তির ভেদও দুই প্রকার, এই সূত্রে তাহাই বলা হইতেছে। গ্রহণবিষয়ক সমাপত্তির ঐ দুই প্রকার ভেদ যথাক্রমে সবিচারা ও নির্ব্বিচারা নামে কথিত হয়। এই দুই প্রকার ভেদও পূর্ব্বোক্তরূপেই বুঝিতে হইবে অর্থাৎ গ্রহণ বিষয়ক সমাপত্তিও যখন শব্দার্থজ্ঞান-বিকল্প দ্বারা সঙ্কীর্ণা থাকে, তখন সবিচারা এবং স্মৃতি পরিশুদ্ধ হইলে যখন স্বরূপ শূন্যের ন্যায় হইয়া অর্থমাত্র নির্ভাস হইতে থাকে, তখন নির্ব্বিচারা নামে কথিত হয়।

রূপরসাদি গ্রাহ্যবিষয়ক সমাপত্তি স্থূল, তদপেক্ষা সূক্ষ্ম— ইন্দ্রিয় মন প্রাণ বুদ্ধি প্রভৃতি করণ বিষয়ক। ধ্যানের সামর্থ্য যেরূপ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, ধ্যেয়বিষয়ও সেইরূপ ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে থাকে। প্রথমে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ ধরিয়া সমাপত্তি হয়, পরে ইন্দ্রিয় ধরিয়াই সমাপত্তির যোগ্যতা আসে। ক্রমে মনকে অতিক্রম করিয়া সে বুদ্ধিক্ষেত্র পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারে। গ্রহণবিষয়ক সমাপত্তি এইখানেই শেষ। বুদ্ধির পর আর সে যাইতে পারে না, সে কথা পরসূত্রে বলা হইবে। এখানে সবিচারা নির্ব্বিচারা কথা দুইটী বুঝিতে পারিলেই এ সূত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যাহা বিচারের সহিত অর্থাৎ বিচরণের সহিত বিদ্যমান তাহা সবিচার এবং যাহা বিচার-বিরহিত তাহা নির্ব্বিচার নামে কথিত হয়। শব্দ অর্থ ও জ্ঞান-বিষয়ক বিকল্প দ্বারা সঙ্কীর্ণ অবস্থায় জ্ঞান তিন ভাবে বিচরণ করে বলিয়া উহাকে সবিচার বলা হয়, আর ধ্যেয়বিষয়ক-স্মৃতি পরিশুদ্ধ হইলে অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ বিষয়ক বিকল্প জন্য সংকীর্ণতা দূর হইলে, ধ্যাতা ভাবটী পর্য্যন্তের অভাব হইয়া পড়ে, তখন ধ্যেয়বিষয়টীই নিঃশেষ রূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। এই অবস্থায় জ্ঞান আর ত্রিবিধ ভাবে বিচরণ করে না বলিয়া ইহার নাম নির্ব্বিচারা সমাপত্তি। বিশেষ এই যে, সমাপত্তি সূক্ষ্মবিষয়ক হইলেই এই দুই নামে অভিহিত হয়, যেহেতু, তখন আর স্থূল বিষয়ের ন্যায় বিভিন্নরূপ তর্ক থাকে না।

এইজন্যই স্থূল অর্থাৎ গ্রাহ্যবিষয়ক সমাপত্তির নাম সবিতর্কা ও নির্ব্বিতর্কা, আর সূক্ষ্ম অর্থাৎ গ্রহণ বিষয়ক সমাপত্তির নাম সবিচারা ও নির্ব্বিচারা। পূর্ব্বে যে বিতর্কানুগত এবং বিচারানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার বিলক্ষণতা কি, তাহা পরে বলা হইবে।

সূক্ষ্মবিষয়ত্বঞ্চালিঙ্গ-পর্য্যবাসনম্ ॥ ৪৫ ॥

সূক্ষ্মত্বপরাকাষ্ঠাং নিরূপয়তি সূক্ষ্মেতি। সূক্ষ্মবিষয়ত্বং চ অলিঙ্গ-পর্য্যবসানং, অলিঙ্গং প্রধানং প্রকৃতিস্তদবসানং বুদ্ধিপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। অব্যক্তত্বাদলিঙ্গস্য নৈব সমাপত্তিবিষয়তা, মর্য্যাদাবচনোঽয়ং পর্য্য-বসানশব্দঃ। ইদমত্র তাৎপর্য্যং—সমাপত্তেস্তাবদাদৌ স্থূলেষু গ্রাহ্য-বিষয়েষু লগতি ততঃ সূক্ষ্মেষু তন্মাত্রাদিতোমহত্তত্ত্বপর্য্যন্তেষু। ননু প্রধানাদপি সূক্ষ্মং গ্রহীতৃতত্ত্বমস্তি, সত্যং—তস্য সূক্ষ্মত্বং নাপেক্ষিতং জ্ঞানাবিষয়ত্বাদুক্তং সূক্ষ্মমিতি ন সমাপত্তিবিষয়তাঽবিষয়ত্বাৎ তস্য ॥ ৪৫ ॥

পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি সূক্ষ্ম বিষয় অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে। সেই সূক্ষ্মত্বের পরাকাষ্ঠা কি, তাহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। ঋষি বলিলেন—সূক্ষ্ম বিষয়ত্ব অলিঙ্গ পর্য্যবসান। লিঙ্গ শব্দের অর্থ পরিচায়ক চিহ্ন, যাহার কোনরূপ পরিচায়ক লক্ষণ নাই, তাহাকে অলিঙ্গ কহে, অথবা কেহ কখনও যাহার কোন পরিচয় পায় না, তাহাকে অলিঙ্গ কহে। অলিঙ্গ শব্দের অর্থ প্রধান—প্রকৃতি। সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। ইহার স্বরূপ পরে বর্ণিত হইবে। এস্থলে উহার বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

সূক্ষ্মত্বের পরিসমাপ্তি এই প্রকৃতি পর্য্যন্তই। প্রকৃতি পর্য্যন্ত বলিতে

প্রকৃতিই সীমা, এইরূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ প্রকৃতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক মহৎতত্ত্ব পর্য্যন্ত সমাপত্তির বিষয়তা। প্রকৃতি অব্যক্ত, সুতরাং তাহা সমাপত্তির বিষয় হইতে পারে না। এই জন্য সূত্রে অলিঙ্গ পর্য্যবসান শব্দটী মর্য্যাদাবচন, অর্থাৎ অতদ্‌গুণ-সম্বিজ্ঞান অর্থই বুঝাইতেছে। কেন যে অলিঙ্গ প্রকৃতি সমাপত্তির বিষয় হইতে পারে না, এ প্রশ্ন যাঁহারা সাধক তাহারা নিশ্চয়ই করিবেন না। সমাপত্তি—জ্ঞানক্রিয়া বিশেষ, আর প্রকৃতি ক্রিয়ার অতীত চরম সাম্য অবস্থা। উহার ব্যবহারিক সত্যতা অবশ্য-স্বীকার্য্য হইলেও জ্ঞানক্রিয়ার বিষয়তা কোনরূপেই সম্ভবপর হইতে পারে না। সে যাহা হউক, সমাপত্তি প্রথম প্রথম স্থূলে—গ্রাহ্যবিষয়েই থাকে, তারপর পরিপক্কাবস্থায় সূক্ষ্মে অর্থাৎ তন্মাত্রা হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্তে যায়। সমাপত্তির চরম বিকাশ বুদ্ধিতে। অস্মিতা মহৎতত্ত্ব অহঙ্কার চিত্ত প্রভৃতি শব্দে যাহা কিছু বুঝায়, সে সকলকে লক্ষ্য করিয়াই এস্থলে ঐ বুদ্ধি শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে। "আমি আমাকে জানিতেছি" বা "আমি আছি" ইহাই চরম সমাপত্তি। অলিঙ্গ বা প্রকৃতি ইহারও বীজ স্বরূপ। এই জন্যই অলিঙ্গকে সমাপত্তির সীমারূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এস্থলে জিজ্ঞাসা হইবে—আচ্ছা, গ্রহীতৃ বিষয়ক সমাপত্তির কথাও ত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তবে এস্থলে বুদ্ধি পর্য্যন্তই শেষ, এই সিদ্ধান্ত কিরূপে সঙ্গত হইবে। হ্যাঁ, এ আপত্তি খুবই সত্য। যাঁহারা সমাপত্তির সন্ধান পান নাই, তাঁহাদিগকে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া সহজসাধ্য নহে; তথাপি চেষ্টা করায় ক্ষতি নাই।

গ্রহীতা যে পুরুষ, তিনি সূক্ষ্ম বটেন, কিন্তু আপেক্ষিক সূক্ষ্ম নহেন, অর্থাৎ ভূত হইতে তন্মাত্র সূক্ষ্ম, তন্মাত্র হইতে অহঙ্কার সূক্ষ্ম, অহঙ্কার হইতে মহৎতত্ত্ব সূক্ষ্ম, আবার তাহা হইতেও অলিঙ্গ (প্রকৃতি) সূক্ষ্ম, এইরূপ যে আপেক্ষিক সূক্ষ্মতা, তাহা পুরুষেতে একেবারেই অসম্ভব। তথাপি তাঁহাকে সূক্ষ্ম বলা হয়—তাহার অভিপ্রায় এই যে, পুরুষ জ্ঞানক্রিয়ার অবিষয়ীভূত—তিনি অজ্ঞেয় বস্তু, যাঁহাকে জ্ঞানশক্তি

দ্বারাও ধরা যায় না, তাঁহাকে সূক্ষ্মই বলিতে হয়। তবে সে সূক্ষ্মতার সহিত এই ব্যবহারিক জগতের সূক্ষ্মতার কোন সম্বন্ধই নাই। ঐ যে পুরুষ, যিনি চরম সূক্ষ্ম অজ্ঞেয় বস্তু, তাঁহাতেও কিন্তু সমাপত্তি হইতে পারে। যখন বুদ্ধির সমস্ত মলিনতা কাটিয়া যায়—অর্থাৎ "আমি আমাকে জানি" মাত্র এইরূপে প্রকাশিত হয়, তখন সেই বুদ্ধিতে ঐ যে অজ্ঞেয় পুরুষ, তাঁহার সত্তাটী পরিগৃহীত হয় অর্থাৎ "আমিরও প্রকাশক একজন আছেন" এইরূপ পুরুষের অস্তিত্ব বিষয়ক জ্ঞান-ধারা তখন বুদ্ধিতে চলিতে থাকে, এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই গ্রহীতৃ-বিষয়ক-সমাপত্তি বলা হয়। বুদ্ধি তখন অনেকটা পৌরুষীয় সত্তা বিষয়ে তৎস্থতা ও তদঞ্জনতা প্রাপ্ত হয়। যে মুহূর্ত্তে এই পুরুষবিষয়ক সমাপত্তি বেশ ঘন হয়, পূর্ণ হয় অর্থাৎ তৎস্থতা তদঞ্জনতা পূর্ণভাবে হইয়া যায়, সেই মুহূর্ত্তেই বুদ্ধির সম্যক্ বিলয় হইয়া যায়। কি এক অব্যক্ত অবস্থার মধ্য হইতে পুরুষের স্বকীয় স্বরূপ ফুটিয়া উঠে, তখনই তাহার নাম হয় যোগ বা দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান। দ্রষ্টা যে নিত্যই স্বরূপে অবস্থিত, ইহাই তখন প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আবার ক্ষণকাল মধ্যেই ঐ কি এক অব্যক্ত অবস্থার মধ্য হইতে চকিতবৎ বুদ্ধি স্বপ্রতিষ্ঠ হয়। অর্থাৎ আবার যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিই থাকে; তবে বিশেষ লাভ এই হয় যে, পুরুষ বিষয়ক প্রজ্ঞা নিয়া আসে। সেই প্রজ্ঞাই জীবকে জীবন্মুক্ত বা চিরানন্দময় করিয়া রাখে। হিরণ্ময় ভূমি স্পর্শ করিয়া আসলে বুদ্ধিও হিরণ্ময় হইয়া পড়ে। মায়ের সন্তান একবার মাতৃ সত্তায় আত্মহারা হইলে আর কখনও মাকে ভুলিতে পারে না। নিজের স্বরূপ একবার প্রত্যক্ষ হইলে আর কি কখনও তাহা বিস্মৃত হওয়া যায়? কিন্তু এ সকল কথা এখানে আর বিস্তৃত ভাবে বলা নিষ্প্রয়োজন। উপযুক্ত অবসরে স্বয়ং সূত্রকারই বলিবেন। এস্থলে আমরা সেই "গ্রহীতৃ গ্রহণ গ্রাহ্যেষু তৎস্থ তদঞ্জনতা" কথাটার যে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইতেছিল তাহারই সমাধান করিতেছিলাম। যথার্থ সমাধান বিনা সাধনায় হয় কি?

সাধক! যোগশাস্ত্রকে তোমরা যত দুরূহ মনে করিয়া দূর হইতেই প্রণাম করিয়া বিদায় হইতে চাও, ইহা তত দুরূহ নহে। একটু শ্রদ্ধা ও অভিনিবেশ সহকারে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলেই শ্রীগুরু কৃপা করিয়া ইহার গম্ভীর রহস্য সমূহ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেন। তুমি অজ্ঞানেও ত এই যোগই করিতেছ! কত জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া যোগের অনুশীলন করিতেছ! কিন্তু জান না যে তুমি যোগাভ্যাসই করিতেছ। এইবার চক্ষুরুন্মীলন কর, দেখ—তুমি বিয়োগবিধুর নহ, তুমিও যোগী—তুমিও আনন্দময় মুক্তপুরুষ।

এইবার সহৃদয় পাঠকগণের সুবিধার জন্য আবার সংক্ষেপে এই সমাপত্তির বিষয় আলোচনা করিব। বিষয়বতী প্রবৃত্তি বা বিশোকা যাহাদের প্রকাশিত হয় নাই, তাহাদের পক্ষে সমাপত্তির আলোচনায় কোন ফল নাই। বিশোকার প্রকাশে চিত্ত বীতরাগ-বিষয় হয়, তারপর যথাভিমত বস্তু ধ্যান করিবার সামর্থ্য হয়। সেই ধ্যান স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় বিষয়ক হইতে পারে। ধ্যানেরই গভীর অবস্থা সমাপত্তি। কোন একটী বিষয় অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে করিতে যখন চিত্ত কিছুক্ষণের জন্য সেই ধ্যেয়বিষয়ে অবস্থান করিবার মত সামর্থ্য পায়, তখন তদঞ্জনতা প্রাপ্ত হয়—ধ্যেয় বিষয়ের আকারে আকারিত হইয়া পড়ে, ইহারই নাম সমাপত্তি। এই সমাপত্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থে প্রযুক্ত হইয়া সবিতর্কা নির্ব্বিতর্কা দুই প্রকার ভেদ প্রাপ্ত হয়, আর তন্মাত্রা অবধি বুদ্ধি পর্য্যন্তে সূক্ষ্মবিষয়ে প্রযুক্ত হইয়া সবিচারা নির্ব্বিচারা দ্বিবিধ ভেদ প্রাপ্ত হয়। এই উভয় ভেদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটী শব্দ, তাহার অর্থ এবং তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান, এই ত্রিবিধ বিকল্প দ্বারা সংমিশ্রিত। আর পর পরটীতে সেই সংকীর্ণতা থাকে না। তখন ধ্যাতাই ধ্যেয় আকারে প্রকাশ পাইতে থাকে। এই সমাপত্তির পরিসমাপ্তি হয় বুদ্ধিতে। বুদ্ধি যখন বুদ্ধি আকারে আকারিত হয়, তখনই সমাপত্তির সার্থকতা। সাধারণ অবস্থায় বুদ্ধি প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রকাশে নিযুক্ত থাকায় তাহাকে বিষয় আকারেই

আকারিত থাকিতে হয়, এমন একটু অবসরও বুদ্ধি পায় না, যখন সে নিজে একটু স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে। অথচ বুদ্ধি যতক্ষণ না স্বপ্রতিষ্ঠ হইতেছে, ততক্ষণ পুরুষবিষয়ক প্রজ্ঞা লাভের অর্থাৎ ভগবান্‌কে লাভ করিবার কোন উপায়ই হয় না; যেহেতু ভগবান্ বুদ্ধিরও পরপারে অবস্থিত। বুদ্ধিতে দাঁড়াইতে পারিলে তবে বুদ্ধির পরপারের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার সামর্থ্য আসে। সে যাহা হউক, বুদ্ধিতে যখন নির্ব্বিচারা সমাপত্তি হয়, তখন "আমি আছি" বা "আমাকে আমি জানি" এইরূপ প্রত্যয়ধারা চলিতে থাকে। সাধক সাধনা দ্বারা এই পর্য্যন্তই যাইতে পারে। তারপর কি হয়, তাহা বলিবার প্রয়োজন হয় না। সে নিজেই তখন বাক্য মনের অতীত স্বরূপের আস্বাদ পাইতে পারে।

এই ত হইল সংক্ষিপ্ত আলোচনা। ইহার মধ্যে আমাদের কিছু বিশেষ বক্তব্য আছে—এই যে সমাপত্তি, যাহাতে ইহা প্রথম হইতেই ভগবৎসত্তা বিষয়িনী হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হয়। অবশ্য যাঁহারা যথার্থ ভগবৎ-পিপাসু, মাত্র তাহারাই এইরূপ করিয়া থাকেন, নতুবা যাঁহারা অর্থকামের সেবা করিবার জন্য যোগশাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তাঁহারা স্থূলবিষয় সমূহে সমাপত্তি লাভ করিতে করিতে ক্রমে সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হইবেন, আর পথিমধ্যে ঐরূপ সমাপত্তির ফলে অনেক সিদ্ধি শক্তি ঐশ্বর্য্যও লাভ করিয়া যাইতে পারেন। তাঁহাদের কথা এস্থলে বলা হইতেছে না। যাঁহারা সত্যসত্যই প্রাণারামকে চান, তাঁহারা প্রথম হইতেই ভগবৎসত্তা ধরিয়া সাধনা করিয়া থাকেন অর্থাৎ "ভগবান্ আছেন" এই অস্তিত্বকে ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। ক্রমে বৃত্তিসারূপ্যবোধ বা সত্যপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠায় উপনীত হইয়া তাঁহারা অতিঅপূর্ব্বভাবে বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতীর প্রকাশে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। অতঃপর সেই একান্ত আলম্বন ভগবৎ সত্তায় সমাপত্তি লাভ করিয়া একেবারে বুদ্ধিতে আরোহণ পূর্ব্বক

ধন্য হইয়া যান। ভগবৎসত্তা বোধের নামই বুদ্ধি। এই বুদ্ধিতে আরোহণ করিবার পক্ষে সত্তা বোধ বা সত্যপ্রতিষ্ঠা অতি অপূর্ব্ব উপায়। গীতায় উপনিষদে এবং এই যোগশাস্ত্রে ইহা ভূয়ো ভূয়ো উপদিষ্ট হইয়াছে। এইপথে আর প্রত্যেক বস্তুকে ধরিয়া ধরিয়া সমাপত্তির আবশ্যক হয়না; কারণ সকল বস্তুমাত্রেই ভগবৎ সত্তার পরিচায়ক। অতএব কি বাহিরে, কি অন্তরে, কি স্থূলে, কি সূক্ষ্মে, যাহা কিছু প্রকাশ পায়, তাহা যত নিন্দিত বা সংকীর্ণ হউক, কিংবা যত প্রশংসিত বা বিশুদ্ধ হউক, সকলই যে আমার প্রাণারামের সত্তা বা প্রণারামই; ঠিক এইরূপ ভাব নিয়া অগ্রসর হইলেই যথার্থ ঈশ্বরপ্রণিধান হয় এবং তাহারই ফলে যোগলাভ হইয়া থাকে। একমাত্র ঈশ্বর প্রণিধান বিহীন হইয়াই যোগশাস্ত্র নীরস কঠোর ও আরণ্যকগণেরই আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে। বাস্তবিক তাহা নহে, ইহা মধুর। মধুময় ঈশ্বর প্রণিধানে অগ্রসর হইলে সাধকের অন্তরে ও বাহিরে যে লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, তাহাই যোগশাস্ত্র বর্ণিত সাধনা রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ता एव सवीजः समाधिः ॥ ४६ ॥

अथ समाधिभेदमाह ता एवेति। ताः समापत्तयश्चतुर्व्विधाः एवान्ययोगव्यवच्छेदे, सवीजः समाधिरित्याख्यायते। वीजस्य कारणस्य अविद्याया इत्यर्थो विद्यमानत्वात् सवीज इति। "तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि" रिति परत्र वक्ष्यते। समापत्तिर्वृत्तिविशेषरूपा, समाधिर्वृत्तिनिरोधरूपा, सम्प्रज्ञातस्तु ग्रहणेष्वपि कैवलबुद्धिविषयकः। इदमत्रावधेयम्—त्रिगुणात्मकस्य चित्तसत्त्वस्य प्रकाशपरवैराग्यनिरोधपरिणामाः सम्प्रज्ञा योगः समापत्तिः समाधिरिति नामभिः परिचीयन्ते ॥ ४६ ॥

এই সূত্রে সবীজ সমাধির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহারাই সবীজ সমাধি। তাহারাই—পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ সমাপত্তিই সবীজ-সমাধি নামে যোগিগণ কর্ত্তৃক পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বীজ শব্দের অর্থ কারণ অর্থাৎ অবিদ্যা, তাহা বিদ্যমান থাকে বলিয়াই ইহারা সবীজ-সমাধি নামে অভিহিত হয়। বাস্তবিক মূল যে অজ্ঞান বা অবিদ্যা, তাহা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ ব্যতীত কোন প্রকারেই বিনষ্ট হয় না। তৎপূর্ব্বপর্য্যন্ত যত গভীর সমাপত্তি বা সমাধিই ইউক না কেন, সে সকলই সবীজ; তাহাতে অবিদ্যা বীজ বিনষ্ট হয় না। এই সবীজ-সমাধি হইতেই ক্রমে নির্বীজসমাধি আসে, তাহা পরসূত্র হইতে বলা হইবে।

সমাধির লক্ষণ বিভূতি-পাদে সূত্রকার নিজেই বলিবেন, এখানে এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখিলেই চলিবে, যে সমাপত্তিরই অন্য নাম সমাধি। এস্থলে আমরা সমাপত্তি, সমাধি এবং পূর্ব্বোক্ত সম্প্রজ্ঞাত যোগের মধ্যে কি বিলক্ষণতা আছে, তাহার আলোচনা করিব। যদিও স্বরূপতঃ ইহাদের মধ্যে বিভিন্নতা বিশেষ কিছু নাই, তথাপি মহর্ষি পতঞ্জলি দেবের বলিবার ধরণ দেখিয়া যতটা লক্ষ্য করা যায়, তাহা এই যে—সমাপত্তি বলিলে—চিত্তেরই বিশেষ বৃত্তি বুঝা যায়। বিষয়বতী প্রবৃত্তিই ক্রমে পরিপক্কাবস্থায় তৎস্থ-তদঞ্জনতা প্রাপ্ত হইয়া সমাপত্তি নাম ধারণ করে। আর সমাধি বলিলে—ইতরবৃত্তি নিরোধের দিকেই লক্ষ্য বেশী থাকে। যদিও কোন বৃত্তিবিশেষের তৎস্থ-তদঞ্জনতা হইলে তদিতর বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ থাকিবেই, তথাপি সেই নিরোধের দিকটা লক্ষ্য করিয়াই সমাধি শব্দের প্রয়োগ হয়। ইহাই সমাপত্তি এবং সমাধির মধ্যে বিশিষ্টতা। এইবার সম্প্রজ্ঞাত যোগের কথা বলিব—সম্প্রজ্ঞাতযোগ কেবল গ্রহণ-বিষয়কই হইয়া থাকে। সমাপত্তি কিন্তু গ্রাহ্য-বিষয়েও হইতে পারে। আবার গ্রহণ-বিষয়ের মধ্যেও কথা আছে—তন্মাত্র ইন্দ্রিয় মন, এই সকল বিষয় অবলম্বন করিয়াও সমাপত্তি হয়। কিন্তু সম্প্রজ্ঞাতযোগ কেবল বুদ্ধিবিষয়কই হইয়া

থাকে। আরও খুলিয়া বলিতেছি—চিত্ত ত্রিগুণাত্মক। চিত্ত যখন বহির্মুখে ধাবিত হয়, তখন যেরূপ তাহাতে সুখ দুঃখ ও মোহরূপ ত্রিগুণের তিনটী লক্ষণ প্রকাশ পায়, ঠিক সেইরূপই যখন অন্তর মুখে ধাবিত হয়, তখনও তাহাতে তিনটী লক্ষণই প্রকাশ পায়। উহাদের নাম মহৎ-প্রকাশ, পরবৈরাগ্য এবং নিরোধ। সত্বগুণের প্রতিলোম পরিণামের চরম লক্ষণ মহৎ-প্রকাশ, ইহাই সম্প্রজ্ঞাত যোগনামে অভিহিত হয়। এইরূপ রজোগুণের চরম লক্ষণ পরবৈরাগ্য, ইহাই সমাপত্তি রূপে প্রকাশ পায়। আর তমোগুণের ধর্ম্ম নিরোধ, ইহারই অন্য নাম সমাধি; সুতরাং সম্প্রজ্ঞাতযোগ সমাপত্তি এবং সমাধি, এই তিনটী অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত। ইহার একটী হইলে অন্যটী থাকিবেই —তবে সূক্ষ্ম অনুভূতিরাজ্যে প্রবেশ করিলে এই তিনের মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহাই এস্থলে ব্যক্ত করা হইল। আশা করি সহৃদয় সাধকগণ এইবার এই তিনটীর সমস্যা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারিবেন।

निर्व्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ॥ ४৩ ॥

निर्वीजसमाधिपूर्व्वरूपं सूचयति चतुर्भि निर्विचारेति। निर्व्विचार वैशारद्ये निर्व्विचार-समापत्तेः सम्यक् प्रतिष्ठायामित्यर्थः। अध्यात्म-प्रसादः अध्यात्मनांबुद्धिपर्य्यन्तानां करणवर्गाणां प्रसादो निर्म्मलता द्रष्टुः स्वरूपावधारणयोग्यतेति यावत् भवतीतिशेषः ॥ ४৩ ॥

এইবার নির্বীজ সমাধির পূর্ব্বরূপ চারিটী সূত্র দ্বারা সূচনা করা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—নির্ব্বিচার বৈশারদ্য হইলে অধ্যাত্ম প্রসাদ হয়। নির্ব্বিচার শব্দে—নির্ব্বিচারা সমাপত্তি বুঝিতে হইবে।

বৈশারদ্য শব্দের অর্থ বিশারদের ভাব অর্থাৎ অতিশয় নিপুণতা। যোগী যখন নির্ব্বিচার সমাপত্তিতে বেশ সুনিপুণ হইয়া উঠেন অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগে আরোহণ করিতে সমর্থ হন, তখন তাঁহার অধ্যাত্ম-প্রসাদ হয়। অধ্যাত্ম শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ। এই অন্তঃকরণবর্গের প্রসাদ অর্থাৎ পরম নির্ম্মলতা সাধিত হয়। তখন অন্তঃকরণে বিষয়াসক্তি বা বিষয়-সংস্পর্শ জনিত মলিনতা বিন্দুমাত্রও থাকে না। এক কথায় বুঝিতে পারা যায়—তখন সাধকের মন প্রাণ বুদ্ধি ইন্দ্রিয়, সকলেই সমভাবে ভগবান্‌কে পাইবার জন্য লালায়িত হয়। যোগীর চিত্ত তখন ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুর দিকেই ধাবিত হয় না। ইহা নির্বীজ-সমাধির অবশ্যম্ভাবী পূর্ব্ব লক্ষণ। যে কোনও যোগী নির্বীজ-সমাধি লাভ করেন, অর্থাৎ অসংপ্রজ্ঞাত যোগে উপনীত হয়েন, তাঁহারই সেইরূপ লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে অন্তঃকরণবর্গের অতিশয় প্রসন্নতা হইয়া থাকে। এই যোগশাস্ত্রে সেই স্বতঃসিদ্ধ লক্ষণ সমূহই সূত্রাকারে গ্রথিত রহিয়াছে।

———

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥

অধ্যাত্মপ্রসাদফলমাহ ঋতম্ভরেতি। তত্র তস্মিন্নধ্যাত্মপ্রসাদে সতি, ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা ঋতং কারণাত্মকং সত্যং বিভর্ত্তীতি ঋতম্ভরা, প্রজ্ঞা প্রকৃষ্টজ্ঞানং আবির্ভবতীতি শেষঃ। তদা সর্ব্বং হ্যেতদ্ দৃশ্যজাতং বোধময়ো দ্রষ্টৈবেতি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমুদেতীতি ভাবঃ। উক্তঞ্চ—
"প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে।"

———

এই সূত্রে অধ্যাত্ম প্রসাদের ফল বর্ণিত হইতেছে। অধ্যাত্ম-প্রসাদ হইলে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়। ঋত শব্দের অর্থ কারণাত্মক সত্য, যে প্রজ্ঞা তাহাকে ধারণ করে, সেইরূপ প্রজ্ঞাকে ঋতম্ভরা কহে। প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট জ্ঞান। চিত্তের অর্থাৎ অন্তঃকরণ-বর্গের পরম নির্ম্মলতা সাধিত হইলে জ্ঞান এরূপ উৎকর্ষতা লাভ করে যে, সে অবস্থায় এই সমস্ত দৃশ্য-প্রপঞ্চ সকলই বোধময়, সকলই দ্রষ্টা মাত্র, এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব হইতে থাকে। জগতের যে একটা স্থূলত্ব, জগতের যে একটা পৃথক্ অস্তিত্ব, যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহা সম্যক্ বিদূরিত হইয়া যায়। সর্ব্বত্র আত্ম-বোধময় সচ্চিদানন্দ-ঘন স্বরূপই উদ্ভাসিত হইতে থাকে। তখন সাধক আনন্দে তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। নির্বীজ সমাধির বা অসম্প্রজ্ঞাত যোগের ইহাও একটী পূর্ব্বলক্ষণ। এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা লাভের যে শান্তি, ইহাকেও তুচ্ছ করিয়া সাধককে আরও অগ্রসর হইতে হইবে। যতক্ষণ না স্বরূপে অবস্থান হয়, ততক্ষণ কিছুতেই তৃপ্তি বোধ না করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, তবে ত ভগবৎস্বরূপ প্রত্যক্ষ হয় বা দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয়। সে কথা পরে বলা হইতেছে।

ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞা শব্দটী বড় চমৎকার। এই জগৎ সাধারণ দৃষ্টিতে কার্য্য মাত্র রূপেই প্রতীয়মান হয়। এই কার্য্যাংশ হইতে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া যখন ঋততে অর্থাৎ কারণে নিপতিত হয়, তখন সেই যে দৃষ্টি, সেই যে জ্ঞানময়ী দৃষ্টি, তাহাকে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা কহে। যেমন ঘট-বিষয়ক দৃষ্টি যখন আকৃষ্ট হইয়া মৃত্তিকায় নিবিষ্ট হইয়া যায়, অথবা বস্ত্র-বিষয়ক দৃষ্টি যখন তুলাতে নিবিষ্ট হইয়া যায়, কিংবা ঘন তুষার-বিষয়ক দৃষ্টি যখন জলীয় পরমাণুতে নিবিষ্ট হইয়া যায়, তখন যেরূপ ব্যবহারিক কার্য্যাংশ হইতে দৃষ্টি অপসৃত হইয়া মাত্র কারণাংশেই বিন্যস্ত থাকে, ঠিক সেইরূপ জগৎরূপে বহু নামরূপাত্মক হইয়া যাহা প্রতিনিয়ত জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে, তাহার যে ঋ-ত অর্থাৎ কারণ

যে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ দ্রষ্টা, তাঁহাতে যখন জ্ঞান পর্য্যবসিত হয়, তখন সেই জ্ঞানকে ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞা বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ সমাপত্তির বা সবিচার সমাধির পরিপক্কাবস্থায় এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার প্রকাশ হয়। এই প্রজ্ঞার উদয় হইলেই মানুষ নিজেকে যথার্থ ধন্য মনে করিতে পারে। কিন্তু সে অন্য কথা। চিত্তপ্রসাদ হইতেই যে প্রজ্ঞার আবির্ভাব হয়, তাহা গীতায়ও উক্ত হইয়াছে—"চিত্ত প্রসন্ন হইলেই বুদ্ধিও স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হয়।" বুদ্ধির স্থৈর্য্য ও প্রজ্ঞা একই কথা।

শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া সা বিশেষার্থত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥

সা কীদৃশীত্যাহ শ্রুতেতি। শ্রুতং শাস্ত্রেভ্যো গুরুমুখাদ্বা। অনুমানং প্রতিভামাত্রগম্যং। এতাভ্যাং যাদৃশী প্রজ্ঞা জায়তে তাভ্যা মন্যবিষয়া বিলক্ষণবিষয়া সা ঋতম্ভরেতি শেষঃ। কুত এব মিত্যাহ বিশেষার্থত্বাৎ প্রত্যক্ষানুভবরূপত্বাৎ। তথাহি শ্রুতানুমানজং জ্ঞানং প্রকৃষ্টমপি পরোক্ষম্। ঋতম্ভরা তু প্রজ্ঞা নিয়তপ্রত্যক্ষরূপা আত্মানুভব-রূপত্বাদিতি ॥ ৪৯ ॥

সেই প্রজ্ঞা কিরূপ, তাহা এই সূত্রে বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—শ্রুত এবং অনুমানজাত যে প্রজ্ঞা, তাহা হইতে ইহা পৃথক্; যেহেতু, এই প্রজ্ঞা প্রত্যক্ষ অনুভব স্বরূপ। শ্রুত—শাস্ত্রাদি-অধ্যয়নজন্য অথবা গুরুমুখ হইতে পুনঃ পুনঃ দ্রষ্টার স্বরূপ শ্রবণ জন্য যে জ্ঞান প্রকাশ পায়, তাহাই শ্রুত জ্ঞান নামে কথিত হয়। আর স্বকীয় প্রতিভাদ্বারা যাহা বুঝিতে পারা যায়, তাহাই অনুমান-জাত জ্ঞান। এই উভয়বিধ জ্ঞান হইতে পূর্ব্বোক্ত ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা

অত্যন্ত পৃথক্; কারণ, শ্রুতানুমান-জন্য জ্ঞান অতিশয় পরিপক্ক হইলেও তাহা পরোক্ষজ্ঞান মাত্র, আর ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা একেবারেই প্রত্যক্ষ-অনুভব স্বরূপ। "আমিই এই বহুরূপে আকারিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছি, আমি-ব্যতীত জগৎ নামে কোন পৃথক বস্তু নাই।" এইরূপ আত্মানুভব রূপ যে জ্ঞান, তাহাই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার স্বরূপ। ঋত শব্দের অর্থ "আমি", তাহাকে ভরণ অর্থাৎ ধারণ করে বলিয়াই, এই প্রজ্ঞার নাম ঋতম্ভরা। "ময্যেব সকলং জাতং, ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং, ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি" ইহাই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা। "একোহহং বহু স্যাম প্রজায়েয়" ইহাই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা। সহস্রবার শ্রবণ বা অনুমান করিলেও, ইহা যতক্ষণ প্রত্যক্ষ অনুভব রূপে প্রকাশ না পায়, ততক্ষণ ইহাকে প্রজ্ঞা নামে কিছুতেই অভিহিত করা যায় না।

तज्जः संस्कारोऽन्य-संस्कारप्रतिवन्धी ॥ ५० ॥

अस्तु तथा किं तेनस्यादित्याह तदिति। तज्जः तस्या ऋतम्भरा प्रज्ञाया जायते इति ऋतम्भरा प्रज्ञाजन्यः संस्कारः सर्व्वं ह्येतदात्मैवेति-रूपः अन्यसंस्कार-प्रतिवन्धी अनात्मसंस्कार-विरोधीत्यर्थः। ऋतम्भरा खल्वनात्मसंस्कारं हन्तीति भावः ॥ ५० ॥

ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা শ্রুতানুমানজন্য জ্ঞান হইতে বিলক্ষণ হইলেও তাহার কার্য্যকারিতা কি, তাহা এই সূত্রে বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—তজ্জন্য যে সংস্কার, তাহা অন্য সংস্কারের প্রতিবন্ধী। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা পুনঃ পুনঃ প্রকাশ হইতে থাকিলে, তজ্জন্য যে সংস্কার চিত্তক্ষেত্রে আহিত হয়, তাহা অন্য যাবতীয় সংস্কারের প্রতিবন্ধক হয়।

সাধারণতঃ মানুষের যে জ্ঞান প্রকাশ পায়, উহা অনাত্মপ্রত্যয়স্বরূপ অর্থাৎ বিজাতীয়ভেদ-বিশিষ্টজ্ঞান। জ্ঞানের এই যে অনাত্মপ্রত্যয়-রূপতা বা বিজাতীয়ভেদ-বিশিষ্টতা, ইহাই যত কিছু দুঃখের কারণ, পূর্ব্বেও ইহা বারংবার বলা হইয়াছে। শ্রীগুরুকৃপায় যদি ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার প্রকাশ হয় অর্থাৎ সর্ব্বাত্মবোধের উদয় হয়, তবে নিশ্চয়ই অনাত্ম-প্রত্যয় বা বিজাতীয়ভেদ-জ্ঞান বিলুপ্ত হইতে থাকে। যতবেশী ঘন ঘন এই ঋতম্ভরার উদয় হইবে, ততবেশী অন্য সংস্কার বিলয় প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। সাধক যদি এই প্রজ্ঞার সন্ধান পায়, তবে তাহার নির্বীজ-সমাধি বা অসম্প্রজ্ঞাত-যোগ অবশ্যম্ভাবী এবং আসন্ন হইয়া থাকে। ইহা বহু সুকৃতি লভ্য। শ্রীভগবান্‌ও গীতায় বলিয়াছেন—"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।" আমি ছাড়া আর কিছু আছে, এই যে প্রতীতি, ইহারই নাম—অন্য সংস্কার। এই সংস্কারই পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুরূপ বন্ধনের হেতু, অথবা ঐ সংস্কারই বন্ধন। আর "অহমেব সর্ব্বং ময়ি ভাতি সর্ব্বম্" এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাই ঐ সংস্কারকে প্রতিরুদ্ধ করিয়া দেয়। ওগো কি আর বলবো, তোমার গুরুরই নাম ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা। আর ঐ অন্য সংস্কার বিলয় করিয়া দেওয়াই গুরুর কৃপা। ঐ যে প্রত্যহ পড়িয়া থাক "ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্" উহাই এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা। উনি অহৈতুক কৃপাসিন্ধু, ইনি অসীম শক্তির আধার, ইনি অতুলনীয় স্নেহের আধার, ইনি পরম শান্তি-দাতা। ডাক কাতর প্রাণে—জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু।

ইনিই তোমার "বারাণসী-পুরপতি বিশ্বনাথ।" বরণা এবং অসির মধ্যবর্ত্তী যে পুর বা ক্ষেত্র, তাহাকে বারাণসীপুর কহে। তোমার প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরূপ উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী যে দেহপুর, তাহাই বারাণসীপুর, তাহার অধিপতি বিশ্বনাথ। যিনি বিশ্ব আকারে আকার প্রাপ্ত হন, যিনি বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা মহেশ্বর, ওগো তাঁকেই যোগ-শাস্ত্রের ভাষায় ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা কহে। উঁহাকে একটা তত্ত্বমাত্র মনে

করিয়া আকাশের মত কিছু মনে করিওনা, উনি একজন। উনি সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়-ধর্ম্মসমন্বিত, উনিই "অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ"। উনি আশুতোষ, উনি ভোলানাথ, উনি গুরু। উঁহাকে পাও না বলিয়াই পরম সুখের সন্ধান পাওনা। ব্যাকুল হইয়া ডাক, কৃপা অনুভবের সামর্থ্য প্রার্থনা কর, উনিই কৃপারূপে প্রকাশিত হইয়া তোমার অন্যসংস্কার বিলয় করিয়া দিবেন। উনিই মহতী শক্তিস্বরূপিণী জননী, উনিই যাবতীয় অনাত্মপ্রত্যয়রূপ অসুর সমূহের ধ্বংস করিয়া থাকেন। যিনি এখানে এই যোগশাস্ত্রে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা, তিনিই ত জীবসন্তানগণের স্নেহময়ী মা। মা ও গুরু অভিন্ন। বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না, প্রজ্ঞা কিরূপে শক্তিস্বরূপ বস্তু হইবে? ঐ যে ঋষি বলিলেন,—অন্য-সংস্কার প্রতিবন্ধী। সে কথাটাত স্বীকার কর, বিশ্বাস কর। আচ্ছা, যাহা অন্য সংস্কারের প্রতিবন্ধ করিতে পারে, তাঁহাকে শক্তি বলিতে সঙ্কোচ বোধ কর কেন? বল উনিই মা, উনিই মহতী শক্তি। যখন যাহা ইচ্ছা বল,—পিতা মাতা সখা বন্ধু সুহৃদ্ পুত্র কন্যা জায়া, যাহা ইচ্ছা বল, সবই যে উনি! ঐ প্রজ্ঞা ছাড়া আর ত কিছু নাই। যত বিভিন্ন দেবদেবীমূর্ত্তি দেখিতে পাও, যত বিভিন্ন মন্ত্র ও নাম শুনিতে পাও, তাহা আর কেহ নয়—ঐ ঋতম্ভরা মা। যতক্ষণ তোমার বিন্দুমাত্র ভেদ প্রতীতি বা সংশয় থাকিবে, ততক্ষণ বুঝিব—তুমি ঠিক ঠিক মাকে দেখিতে পাইতেছ না। গীতায় যে "অহং, মাম্, ময়া, মম, ময়ি, মত্তঃ", কথাগুলি শুনিতে পাও, এইবার নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে—কে তিনি, কে ভগবান্! ঐ ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা। শুধু ভাষার শুধু বলিবার ভঙ্গীর বিভিন্নতা মাত্র। বস্তুতঃ কিন্তু কোন ভেদ নাই, কোন বিলক্ষণতা নাই।

শুন, মনে রাখিও—অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ, নির্ব্বিচারা সমাপত্তি, সবীজ সমাধি, দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্য অনুভব, এই যে যোগ শাস্ত্রীয় পরিভাষাগুলি, ইহারা সকলেই প্রায় একার্থ বাচক। ঐ ঋতম্ভরা

প্রজ্ঞা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাই ঐ সকল পরিভাষার যথার্থ তাৎপর্য্য। স্বর্গলাভ, হিরণ্যগর্ভ অক্ষর-পুরুষ কূটস্থ-চৈতন্য বা মহৎ-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার, প্রভৃতি শব্দে যাহা বুঝায়, তাহাও এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। আবার অন্যত্র শ্রীবৃন্দাবন বৈকুণ্ঠধাম কৈলাসপুরী গোলোকধাম প্রভৃতি শব্দেও এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাই বুঝিও। কারণ, এইক্ষেত্রে উপনীত হইলেই নাপ্রজ্ঞ নপ্রজ্ঞ নোভয়তঃ প্রজ্ঞ একাত্মপ্রত্যয় সার পরম প্রেমাস্পদের সাক্ষাৎলাভ হয়। ইহাতে কোনরূপ সংশয় বা বিতর্ক কোথাও কিছু নাই। ঋষিবাক্য সর্ব্বত্রই উদার ও সুস্পষ্ট। সকল শাস্ত্র একই সুরে গাথা। শুধু প্রতিভার তারতম্য বশতঃ বুঝিবার তারতম্য হয়। কিরূপে এই ঋতম্ভরায় উপনীত হইবে? প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন এবং সেবাদ্বারা। "অহংবোধকে প্রণিপাতিত করিতে পারিলেই "একোঽহং"রূপ ঋতম্ভরার সাক্ষাৎ পাইবে। বল—জয়গুরু! জয় বিশ্বনাথ! গুরুই কৃপা করিয়া স্বকীয় স্বরূপ প্রকাশ করিবেন, অন্যথা কোন উপায়ই নাই,—যাহাতে ঋতম্ভরার প্রকাশ হইতে পারে। কিন্তু এ সকল অন্য কথা—

তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধাৎ নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ॥ ৫১॥

ইতি শ্রীপতঞ্জলিপ্রোক্তে যোগসূত্রে সমাধিপাদঃ॥

দর্শিতঃ পূর্ব্বরূপোঽথ প্রকৃতং দর্শয়তি তস্যেতি। তস্যাপি ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞাজন্যসংস্কারস্যাপি নিরোধে লীলারসাস্বাদ লিপ্সায়া অপি রাহিত্যে সতীতিভাবঃ। সর্ব্বনিরোধাৎ সর্ব্বরূপেণ যৎ প্রতীয়তে তস্যাখিল-প্রতীতিবিলয়াদিত্যর্থঃ। নির্ব্বীজঃ অবিদ্যাবীজ-বিলয়েন পুনর্বন্ধ-

जनकाभावाभावादितिभावः, समाधिर्वक्ष्यमाण-लक्षणः आविर्भवतीति शेषः इदमेव तटस्थलक्षणमसम्प्रज्ञातयोगस्य चित्तवृत्तिनिरोधरूपम् ॥ ५१ ॥

इति योगरहस्ये प्रथमः पादः ॥

---

৪৭ সংখ্যক সূত্র হইতে যে নির্বীজ সমাধির পূর্ব্বসূচনা করা হইতেছিল, এইবার অধ্যায় সমাপ্তিতে তাহারই কথা বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—তাহারও অর্থাৎ ঋতম্ভরাপ্রজ্ঞাজন্য সংস্কারেরও নিরোধ হইলে সর্ব্বনিরোধ বশতঃ নির্বীজসমাধি আবির্ভূত হয়। ঋতম্ভরাপ্রজ্ঞাজন্য যে সংস্কার, তাহা স্বগতভেদমাত্ররূপ—উহা লীলানামেই অভিহিত হইয়া থাকে। দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্য—আত্মার বহু আকারীয় অভিব্যক্তি যখন সাধকের প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, তখন সে উহাকে লীলা না বলিয়া থাকিতেই পারে না। লীলাদর্শন বা স্বগতভেদ-দর্শন বড়ই প্রীতিকর বড়ই আনন্দদায়ক হইলেও কিছু দিন পরে সাধকের এই লীলা দর্শনলিপ্সা ও কিছুক্ষণের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যায়, যিনি লীলাময়, তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। এই স্বগতভেদময় অপূর্ব্ব বিশ্বলীলার যিনি মূল, যাঁহা হইতে এই লীলা স্ফুরিত হয়, তাঁহাকে অন্ততঃ একবারও দেখিবার ইচ্ছা সাধকের স্বতঃই হইয়া থাকে লীলাদর্শনেরলালসা রহিত হইলেই ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞাজন্য সংস্কারের নিরোধ হইয়া যায়; সুতরাং তখন সর্ব্বনিরোধ অবশ্যম্ভাবী। সর্ব্বরূপে যাহা কিছু প্রতীতিগোচর হয়, তাহার নিরোধ হইয়া যায়। তখন আর কিছুই থাকেনা, কি থাকে, তাহাও ঠিক বলা যায় না, তাহা বাক্যের অতীত মনের অতীত। তথাপি কিন্তু বলিতে হয়—"সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরস্ত-সমস্ত-দ্বৈতপ্রপঞ্চং নিরঞ্জনং শান্তং" "স আত্মা"। ইহাই দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানরূপ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ, ইহাই চিত্তবৃত্তি নিরোধ। এইরূপ সর্ব্ব নিরোধ না হইলে

অর্থাৎ সর্ব্ব বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, তাহার অস্তিত্বপ্রতীতি বিলয় না হইলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইতে পারে না। বৃত্তিনিরোধ না হইলে স্বরূপে অবস্থান অসম্ভব ; তাই গ্রন্থারম্ভে চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই যোগের তটস্থলক্ষণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই নিরোধের দিক্ দিয়াই ইহাকে নির্বীজ সমাধি বলা হইয়াছে। তাই ঋষি বলিলেন—"সর্ব্বনিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ"। অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির দিক্ দিয়াই ইহাকে সমাধি বলা হয় ; কারণ, সে অবস্থায় স্বতঃই যেন সর্ব্বের নিরোধ হইয়া যায়। আর স্বরূপ প্রকাশের দিক্ দিয়া ইহাকে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বা দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান বলা হইয়া থাকে। সমাধিও যে তমোগুণেরই প্রতিলোম পরিণাম, ইহা পুর্ব্বেও বলা হইয়াছে। সর্ব্বকে নিরোধ করিতে তমোগুণের প্রলয়-শক্তিরই প্রয়োজন। মূলাপ্রকৃতিরূপিণী মায়ের আমার সর্ব্বশেষ কার্য্য এই—"সর্ব্বনিরোধ"। সর্ব্বরূপে যাহা প্রতীত হয়, তাহার অস্তিত্ব-প্রত্যয় বিদ্যমান থাকিতে কোন রূপেই সর্ব্বনিরোধ হইতে পারে না ; তাই মা আমার তমোগুণময়ী মূর্ত্তিতে শেষ পরিণাম প্রকাশ করিয়া সর্ব্বকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখেন। সাধনার দিক্ দিয়া অর্থাৎ ব্যাপারের দিক্ দিয়া হয়—এই সর্ব্বনিরোধ। স্বরূপের দিক্ দিয়া কিন্তু কিছুই হয় না—যাহা নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশ, তাহার যে অপ্রকাশ ছিল, তাহাই মাত্র বিদূরিত হইয়া যায়।

এই সমাধিকে নির্বীজ বলা হইয়াছে। বীজ—কারণ অর্থাৎ অবিদ্যা। অবিদ্যারূপ বীজ চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়, আর কখনও ফলোৎপাদন করিতে পারে না, আর কখনও দ্বৈতপ্রপঞ্চের পারমার্থিক-সত্তা-প্রতীতি আনয়ন করিতে পারে না ; তাই ইহাকে নির্বীজ সমাধি বলা হইয়া থাকে। অবশ্য এইরূপ নির্বীজ সমাধির পরও ব্যুত্থান হয়, আবার লীলা দর্শন হয়, জগৎ ভান হয়, তাহা বড়ই মধুর হয়। তাহা হউক, যোগ অবস্থায় কিন্তু জগতের পৃথক্ সত্তাজ্ঞান থাকিতেই পারে না বা থাকে না ; সুতরাং এই নির্বীজ সমাধি একবার মাত্র

হইলেও জীব বিমুক্ত হইয়া যায়। তবে কথা এই যে—ইহা একবার মাত্র হইলেই বার বার হইবার খুবই সম্ভবনা থাকে এবং হয়ও। অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া গেলেও যতদিন প্রারব্ধ সংস্কারের ক্ষয় না হয়, ততদিন অবিদ্যার কার্য্য দেহ বিদ্যমান থাকে ও অন্যান্য লোকহিতকর কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়। এ সকল কথা পূর্ব্বেও আলোচনা করা হইয়াছে।

ইহারই নাম ঈশ্বর-দর্শন। পূর্ব্বে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার উদয়ে ঈশ্বর দর্শনের কথা বলা হইয়াছে বটে, তাহা হিরণ্যগর্ভ রূপ ব্যবহারিক ঈশ্বর-দর্শন। আর এইখানে উপনীত হইতে পারিলে, এই দ্রষ্টার স্বরূপে-অবস্থান করিতে পারিলে যে, দৃশ্য-দর্শনের অতীত দ্রষ্টার স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইতে পুনরায় ব্যুত্থিত হইয়া সাধক সানন্দে বলিয়া উঠে—"এতদিনে আমি যথার্থ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। আর আমার প্রাপ্তব্য কিছু নাই, আর আমার সংশয় কিছু নাই, আর আমার অভাবও কিছু নাই। আমি পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণ। আমি চৈতন্য স্বরূপ বস্তু। আমি ধন্য, ওহো আমি ধন্য! ইহাই সমাধি। সাধক! কবে তুমি এইরূপ নির্ব্বীজ সমাধি লাভে ধন্য হইবে।

ইতি যোগরহস্য ব্যাখ্যায় সমাধি-পাদ নামক প্রথম অধ্যায়।

योग-रहस्यम् ।

साधन-पादः ।

द्वितीयोऽध्यायः ॥

तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ १ ॥

दर्शितः पूर्व्वस्मिन् पादे योगस्तदुपक्रमः समाधिश्चात्र तत् साधनं सविशेषं व्याख्यातं भविष्यति। उक्तञ्चेश्वर-प्रणिधानस्यैव योग साधनत्वं तच्चान्तरेण कर्म्मयोगान्न सिद्ध्यति। कर्म्मप्रवणं हि चित्तं सुकौशलकर्म्मभिरेव प्रणिधानाय समुत्सहत इति क्रियायोगं निर्द्दिशति तप इति। तपस्तपोलोक आज्ञाचक्रं बुद्धितत्त्वमित्यर्थ स्तत्र यः स्वाध्यायः स्वस्य सच्चिदानन्दलक्षणस्य द्रष्टुरात्मनोऽध्यायोऽध्ययन-मधिगमनमिति भावः। आदौ वृत्तिसारूप्यतया ततो निर्व्विशेष तयेति। तदात्मकानि यानीश्वरप्रणिधानानि ईश्वरे परमगुरौ सर्व्वभावमहेश्वरे प्रणिधानं यै स्तथाभूतान्यात्मसमर्पणफलकानि कर्म्माणीत्यर्थः। तानि क्रियायोग उच्यते। क्रियाभिः कर्म्मभिरेव योगः सम्पत्स्यत इतीश्वर-प्रणिधानात्मकानां कर्म्माणां समीचीनाख्या क्रिया-योग इति। ततश्चानुष्ठीयमानान्यपि वेदादि-शास्त्रविहितानि कर्म्माणि यावदीश्वरप्रणिधानात्मकानि न भवन्ति तावत्तेषां नैव योग साधनता। किञ्च स्वभावनियतानि व्यवहारिकाण्यपि कर्म्माणीश्वर प्रणिधानात्मकानि चेत्, क्रियायोगाख्यामधिगन्तुमर्हन्तीति। बुद्धावात्मा

नुसन्धानरूपस्तपः-स्वाध्याय एव कर्म्मसु कौशलं, येन च ध्रुवं प्रणिधानं निष्पद्यते। इममेव क्रियायोगं बुद्धियोगाभिधानेन समुद्‌घोषितवान् भगवान् वासुदेवः स्वयमेवगीताशास्त्रेषु। प्रागुक्ताभ्यासस्य वक्ष्यमाण संयमाख्यास्यान्तरङ्ग-साधनस्य च विवरणमेतदितिचात्रावगन्तव्यम् ॥

প্রথম পাদে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ, তাহার উপক্রম অর্থাৎ অভ্যাস প্রভৃতি, এবং সমাধি, এই সকল বিষয় বলা হইয়াছে। এই দ্বিতীয় পাদে তাহার সাধন প্রণালী সবিস্তার ব্যাখ্যাত হইবে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—একমাত্র ঈশ্বরপ্রণিধানই যোগের অব্যর্থ উপায়। সেই ঈশ্বর-প্রণিধান কখনও কর্ম্মযোগ ব্যতীত সিদ্ধ হয় না; যেহেতু, চিত্ত স্বভাবতই কর্ম্মপ্রবণ, কর্ম্ম ব্যতীত চিত্ত ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। অথচ কর্ম্মই শুভ বা অশুভ ফলের জনক হইয়া জীবকে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুরূপ সংসার প্রবাহে নিপাতিত করে। কর্ম্মের এই যে স্বাভাবিক অনিষ্টকারিতা, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এবং ঈশ্বর-প্রণিধানের পথে অগ্রসর হইবার জন্য অতিশয় কৌশল পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। সেই কৌশলটী কি, তাহাই এই অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে সুন্দর ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানসমূহই ক্রিয়াযোগ। তপঃ শব্দের অর্থ তপোলোক—আজ্ঞাচক্র অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব, তাহাতে যে স্বাধ্যায় অর্থাৎ স্ব এর—সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার যে অধিগম, তাহাই তপঃস্বাধ্যায়। খুলিয়া বলিতেছি—তপোলোকে বা বুদ্ধিতত্ত্বেই আত্মার সন্ধান পাওয়া যায়। মন ইন্দ্রিয় বা বিষয় সমূহ হইতে বুদ্ধি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সূক্ষ্মতম তত্ত্ব। বুদ্ধি আত্মারই প্রতিবিম্ব স্বরূপ বস্তু। তাই ইহা আত্মার একান্ত সন্নিহিত। অপর তত্ত্বসমূহ অপেক্ষাকৃত বিপ্রকৃষ্ট বা স্থূল, সেই জন্যই সাধকগণ তপঃস্বাধ্যায় করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তপো

লোকেই স্ব এর অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। প্রথমে বৃত্তি সারূপ্যরূপে, পরে নির্ব্বিশেষ রূপে এই "অধ্যায়" সম্পন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পাদেও একথা বলা হইয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত বিশুদ্ধবোধস্বরূপ নির্ব্বিশেষ আত্মার সন্ধান না পাওয়া যায়, ততদিন বৃত্তিসারূপ্য প্রাপ্ত আত্মারই অধ্যয়ন করিতে হয়। ফলে ফুলে আকাশে বাতাসে কাষ্ঠে প্রস্তরে সর্ব্বত্র, আবার কামে ক্রোধে ক্ষুধায় পিপাসায় শোকে সুখে সর্ব্বত্র, অন্তরে বাহিরে এইরূপ বৃত্তিসারূপ্যপ্রাপ্ত আত্মাকে বুদ্ধিদ্বারা দর্শন করিতে হয়। মন এবং ইন্দ্রিয় সমূহ যাহাকে বিষয়মাত্ররূপে জড়পদার্থরূপ আনিয়া উপস্থিত করে, তাহা যে বাস্তবিক জড় নহে—আত্মাই, বুদ্ধিদ্বারা এইরূপ নিশ্চয় করিতে হয়, ইহাকেই তপঃ স্বাধ্যায় বলে। এইখানেই তপঃ স্বাধ্যায়ের আরম্ভ, তারপর গুরুকৃপায় ক্রমে তপোলোকে অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বে আরোহণ করিয়া নির্ব্বিশেষ আত্মার অধ্যয়ন করিবার সামর্থ্য আসে, তখন আর বৃত্তিসারূপ্যপ্রাপ্ত আত্মার অধ্যয়ন করিতে হয় না। তখনই এই তপঃস্বাধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হইয়া যায়।

এইরূপ তপঃস্বাধ্যায়ের মধ্য দিয়া যাহাতে ঈশ্বরপ্রণিধান সিদ্ধ হইতে পারে, এরূপভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহই ক্রিয়াযোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যিনি পরমগুরু, যিনি সর্ব্বভাবমহেশ্বর, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিবার নামই ঈশ্বরপ্রণিধান। ইহা ইচ্ছা মাত্রেই সিদ্ধ হয় না, কর্ম্মদ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হইতে পারে। যেরূপ ভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ঈশ্বরপ্রণিধানের দিকে দিন দিন অগ্রসর হওয়া যায়, সেই কৌশলটী শিক্ষা দিবার জন্যই পতঞ্জলিদেব তপঃস্বাধ্যায় শব্দটীর প্রয়োগ করিয়াছেন। এই তপঃস্বাধ্যায় অর্থাৎ বুদ্ধিতে আত্মানুসন্ধান রূপ কৌশলের সাহায্যেই কর্ম্ম সমূহের মধ্য দিয়া সাধক ঈশ্বরপ্রণিধানে সিদ্ধ হইতে পারে, ক্রমে নির্ব্বিশেষ আত্মস্বরূপের অধ্যয়ন করিবার সামর্থ্য লাভ হয়, সাধক তখন অসম্প্রজ্ঞাত যোগে উপনীত হইয়া কৃতকৃত্য হন। ইহাই সাধনার ও সিদ্ধির ক্রম।

এই সূত্রটীর প্রতিপাদ্য বিষয়-ক্রিয়াযোগ। ক্রিয়াযোগ শব্দের অর্থ—ক্রিয়দ্বারা অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা যোগলাভ করা। মানুষ মাত্রেরই চিত্ত অতিশয় কর্ম্মপ্রবণ। চিত্তকে কতগুলি ক্রিয়ার সমষ্টি বলিলেও কোন ক্ষতি হয় না। সহজ কথায় চিত্তবৃত্তি বলিতেই ক্রিয়া বুঝায়, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক, চিত্ত ক্রিয়া করিবেই। "নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" ক্ষণকালের জন্যও কেহ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারেনা। "নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ" দেহধারী ব্যক্তি কখনও সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না; সুতরাং মানুষকে যদি যোগ লাভ করিতে হয়, তবে ঐ ক্রিয়ার মধ্য দিয়াই লাভ করিতে হইবে। সাধারণতঃ যোগ বলিলেই বৃত্তিনিরোধ বা সর্ব্ব কর্ম্মপরিত্যাগ বুঝা যায়। অথচ দেখিতে পাওয়া যায়—জীবের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ একেবারেই অসম্ভব। এই বিরুদ্ধ অবস্থাদ্বয় কিরূপে সামঞ্জস্যপ্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ভগবান্ নিজেও বলিয়াছেন—"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" কর্ম্মসমূহের মধ্যে যে কৌশলটী আছে, সেইটিকে অবলম্বন করিতে পারিলেই মানুষ যোগলাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে। আর এস্থানে পতঞ্জলিদেবও ক্রিয়াযোগ শব্দে ঠিক সেই কথাটীই বলিলেন—ক্রিয়াদ্বারাই যোগলাভের যোগ্যতা আসিবে। যেরূপ কৌশলে ক্রিয়া করিতে পারিলে যোগলাভ হয়, ঋষি সেই কৌশলটীর নাম দিলেন—তপঃস্বাধ্যায় অর্থাৎ বুদ্ধিতে আত্মার অধিগম। আর ভগবান্ বাসুদেবও গীতাশাস্ত্রে ঐ কৌশলটীর নাম দিয়াছেন—বুদ্ধিযোগ। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই বুদ্ধিযোগের কথাই বহুভাবে বহুস্থানে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। যোগশাস্ত্রে প্রবেশ করিয়াও সেই বুদ্ধি যোগটীরই উপদেশ পাইলাম। এখানে উহার নাম "তপঃস্বাধ্যায়।"

এ পর্য্যন্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল, তপঃস্বাধ্যায়াত্মক কর্ম্মসমূহের দ্বারাই মানুষ যোগ লাভ করিতে পারে। ঈশ্বরপ্রণিধান

যোগের অব্যর্থ উপায়, ইহাও অনেকবার বলা হইয়াছে, সুতরাং বুঝিতে হইবে—এই বুদ্ধিযোগের মধ্য দিয়াই অর্থাৎ তপঃ-স্বাধ্যায়াত্মক কর্ম্ম সমূহের মধ্য দিয়াই ঈশ্বরপ্রণিধানটী অবশ্য সিদ্ধ হইয়া যায়। কিরূপে ইহা সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা বলিতেছি—ঈশ্বরপ্রণিধান কি? ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। বাস্তবিক ত জীবমাত্রেই ঈশ্বরে প্রণিহিত আছে। ঈশ্বরের সত্তাই জীবের সত্তা, ঈশ্বরের প্রেরণায়ই জীব জীবিত থাকে ও কর্ম্ম করে; সুতরাং প্রণিধান ত স্বতঃই সিদ্ধ। তবে এই যে স্বতঃসিদ্ধ প্রণিধান, ইহা সাধারণ জীব জানে না। অথবা জানিয়াও মানে না—স্বীকার করে না। "অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ" লইয়াই জীবন যাপন করে। তারপর সৌভাগ্যবশে সকল কর্ম্মের মধ্য দিয়া যদি ঈশ্বরের সত্তা ও তাহার কর্ত্তৃত্ব দেখা আরম্ভ হয়, যদি "তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্" ঠিক ঠিক আরম্ভ হয়, তবে সেই স্বতঃসিদ্ধ প্রণিধান প্রতীতি গোচর হইতে থাকে। এই যে প্রতীতি-গোচর হওয়া, ইহারই নাম ঈশ্বরপ্রণিধান করা। সুতরাং কর্ম্মের মধ্য দিয়া যদি তপঃস্বাধ্যায় থাকে, তবে ঈশ্বরপ্রণিধান অবশ্যম্ভাবী। অতএব এইরূপে কর্ম্মসমূহ যখন তপঃস্বাধ্যায়াত্মক হইয়া ঈশ্বর-প্রণিধান রূপ ফলে পর্য্যবসিত হয়, তখনই কর্ম্মসমূহের নাম হয় ক্রিয়াযোগ; কারণ এরূপ কর্ম্ম অচিরকাল মধ্যেই যোগের হেতু-স্বরূপ হইয়া থাকে, এবং ইহাই সুকৌশল কর্ম্ম।

এস্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, যদি কেহ বেদাদি-শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন, অথচ ঐ তপঃস্বাধ্যায়রূপ কৌশলটী তাহার মধ্যে না থাকে, তবে তাহা ক্রিয়াযোগ পদবাচ্য হইবে না। অর্থাৎ সেরূপ কর্ম্ম শত জীবন অনুষ্ঠান করিলেও মানুষ যোগ লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। এই যে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা বেশ সন্ধ্যা পূজাদি করেন বা সাধন ভজনও করেন, অথচ শেষ পর্য্যন্ত যোগ হইতে বঞ্চিতই থাকেন, তাহার একমাত্র কারণ ঐ কৌশলের অভাব। কর্ম্মের মধ্য দিয়া ঈশ্বর প্রণিধান হয় না,

বুদ্ধিতে আত্মানুসন্ধান থাকে না, কাজেই চিরজীবন কর্ম্ম করিয়াও ক্রিয়াযোগ করা হয় না। কর্ম্মের মধ্যে যদি বিন্দুমাত্রও যোগ সাধনতা থাকে, তবেই না সেই কর্ম্মগুলি ক্রিয়াযোগ পদবাচ্য হইবে? কতগুলি মৃতকর্ম্মের অনুষ্ঠান মানুষকে কখনও উন্নত করিতে বা যোগী করিতে পারে না। আবার অন্য দিকে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়—যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্বভাবনিয়ত কর্ম্মগুলির মধ্যে অর্থাৎ আহার ব্যবহার প্রভৃতি দৈনন্দিন কর্ম্মগুলির মধ্যেও ঐ তপঃস্বাধ্যায়রূপ কৌশলটী অবলম্বন করিতে পারেন, তবে তাহা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম না হইলেও, উহারা সত্যসত্যই ক্রিয়াযোগরূপেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে; এবং অচিরকাল মধ্যেই ঐ ব্যক্তি যোগী বা সাধকরূপে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব যাহারা কল্যাণকামী পুরুষ, তাহারা নিশ্চয়ই কর্ম্মসমূহকে এইরূপ তপঃস্বাধ্যয়েশ্বর-প্রণিধানাত্মক করিয়া ক্রিয়াযোগে পর্য্যবসিত করিতে যত্নবান হইবেন। পূর্ব্বে যে "অভ্যাস" বলা হইয়াছে এবং পরে যে "সংযম" নামক অন্তরঙ্গ সাধন বলা হইবে, তাহাও এই ক্রিয়াযোগই। মানুষ মাত্রেই কর্ম্ম-পরায়ণ, সুতরাং সকলেই ক্রিয়াযোগ করিতে বাধ্য। স্থলবিশেষে উহার আকার অবস্থা বা নাম পরিবর্ত্তিত হয় মাত্র।

যাঁহারা তপঃ শব্দের অর্থ তপস্যা, স্বাধ্যায় শব্দের অর্থ বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের যে কিছুমাত্র বিরোধিতা নাই, তাহা ধীমান্ পাঠকগণ একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যা শিরোধার্য্য করিবার ফলেই এই সত্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে এবং আমাদের একান্ত আশ্রয়নীয় যোগমার্গ অপেক্ষাকৃত সুগম ও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে।

समाधि भावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च ॥ २ ॥

सद्यः फलं कीर्त्तयति क्रियायोगस्य समाधीति । समाधि-भावनार्थः समाधिः प्रागुक्तः सबीज-निर्वीजाख्यस्तस्य भावनमनुशीलनं तदेवार्थः प्रयोजनमस्य क्रियायोगस्य । ईश्वरप्रनिहितचित्तस्यैव सम्भवति समाधिभावना वक्ष्यति च समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानादिति । तथा क्लेशतनूकरणार्थश्च क्लेशानां वक्ष्यमाणलक्षणानामविद्यादीनां तनूकरणं क्षीणीकरणं तदेवार्थः प्रयोजनमस्येति च । भेदप्रत्ययो हि समाधि-प्रतिपक्षः, हेयोपादेयबुद्धिजनकतया च क्लेशदायकः, तपः स्वाध्यायात्मकेश्वरं प्रणिधान फलकेन हि क्रियायोगेन तदुभयं नश्यते स्वगत भेदमात्रावगाहितया च तस्येति ॥ २ ॥

এইসূত্রে ক্রিয়াযোগের সদ্যঃফল কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—সমাধিভাবনার্থ এবং ক্লেশতনুকরণার্থ। সমাধি শব্দে পূর্ব্বোক্ত সবীজ ও নির্বীজ সমাধি বুঝিতে হইবে। 'ভাবন' শব্দের অর্থ এস্থলে অনুশীলন। ক্রিয়াযোগ অনুষ্ঠিত হইলে চিত্ত দিন দিন সমাধি ভাবনার যোগ্য হইয়া উঠে। ঈশ্বরপ্রণিহিত চিত্তেরই সমাধি ভাবনা সম্ভব, একথা স্বয়ং সূত্রকারই পরে বলিবেন। পূর্ব্বোক্ত রূপ ক্রিয়াযোগের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিলেই ঈশ্বর প্রণিধান সিদ্ধ হয়, তখন তাদৃশ চিত্তেরই সমাধিভাবনা করিবার যোগ্যতা উপস্থিত হয়। কেবল তাহাই নহে, ক্লেশ তনুকরণার্থও অর্থাৎ অবিদ্যা প্রভৃতি পরসূত্রে বর্ণিত ক্লেশসমূহও এই ক্রিয়াযোগের ফলে দিন দিন ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। ভেদজ্ঞানই সমাধির প্রতিপক্ষ। আবার ঐ ভেদজ্ঞান হইতেই হেয়োপাদেয় বুদ্ধি উপস্থিত হয় বলিয়া উহা ক্লেশদায়কও বটে। পূর্ব্বোক্ত তপঃস্বাধ্যায়াত্মক ঈশ্বরপ্রণিধান ফলক ক্রিয়াযোগের ফলে তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়; যেহেতু, সজাতীয়

বিজাতীয় ভেদে একান্ত মুগ্ধ চিত্তও ক্রিয়াযোগের ফলে স্বগতভেদ অবধারণ করিতে সমর্থ হয়। চিত্ত যে পরিমাণে স্বগতভেদের অবধারণ করিতে পারে, সেই পরিমাণেই হেয়োপাদেয়তা বুদ্ধি তনূতা অর্থাৎ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। সুতরাং ক্রিয়াযোগের দুইটী ফল দুইদিক দিয়া লাভ হইয়া থাকে। একদিকে চিত্ত ধীরে ধীরে সমাধির যোগ্য হইয়া উঠে, অন্য দিকে অবিদ্যা অস্মিতা প্রভৃতি ক্লেশ গুলিও দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে। এই ফল অতি অল্পকাল মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। যেখানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বহুবর্ষ যাবৎ ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াও অনুষ্ঠাতা পূর্ব্বোক্ত ফল প্রাপ্ত হন নাই, সেখানে বুঝিতে হইবে কতকগুলি প্রাণহীন ক্রিয়াকাণ্ড মাত্রেরই অনুষ্ঠান হইয়াছে। যথার্থ ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান হয় নাই। ক্রিয়াগুলি তপঃস্বাধ্যায়াত্মক হইলে, উহা হইতে নিশ্চয়ই ক্রিয়াযোগের পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ ফল লাভ হইয়া থাকে। স্থূলকথা এই যে, যাহারা যোগলিপ্সু, যাহারা যথার্থই ক্লেশময় সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছুক, তাহাদের পূর্ব্বোক্ত তপঃস্বাধ্যায়াত্মক এবং ঈশ্বর-প্রণিধানফলক ক্রিয়াযোগ করিতেই হইবে। অন্যথা কোন প্রকারেই চিত্তের সমাধিযোগ্যতা এবং ক্লেশ সমূহের ক্ষীণতা হইতে পারে না।

আশঙ্কা হইতে পারে—যাহারা সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী নহে, যাহারা বেদাদি-শাস্ত্রবিহিত দৈব পৈত্রাদি কর্ম্ম করে না, তাহাদের ক্রিয়াযোগ কিরূপে সম্পন্ন হইবে? এই আশঙ্কার উত্তর এই যে, যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হউক না কেন, সকলেরই বিধি-নিষেধ-মূলক শাস্ত্র আছে। স্ব স্ব সম্প্রদায় গত সেই বিধিনিষেধ গুলির অনুপালন যদি তপঃস্বাধ্যায়াত্মক এবং ঈশ্বরপ্রণিধানফলক হয়, অর্থাৎ বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্ম হয় ও ঈশ্বরে প্রণিধান রূপ ফল আনয়ন করে, তবে তাহাই ক্রিয়াযোগ পদবাচ্য হইবে। এতদ্ভিন্ন আরও একটী কথা পূর্ব্বসূত্র ব্যাখ্যাকালে বলা হইয়াছে যে, যদি ব্যবহারিক জীবনে অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মগুলিও ক্রিয়াযোগ রূপে পর্য্যবসিত হয়, তবে তাহা

হইতেও সমাধিভাবন এবং ক্লেশতনুকরণরূপ দ্বিবিধ ফল নিশ্চয়ই লাভ হইতে পারে।

এই যোগশাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই, অথবা কোনরূপ কল্পনারও অবসর নাই, কিংবা বিভিন্ন মত সমূহের কোনরূপে খণ্ডনের প্রয়াসও নাই। যাহা চিরন্তন সত্য, অর্থাৎ যাহারা সত্যলাভের পথে অগ্রসর হইতে যথার্থ অভিলাষী, তাহাদের সকলেরই যাহা সুনির্দ্দিষ্ট প্রশস্ত পথ, তাহাই এই শাস্ত্রে সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः ॥ ३ ॥

क्लेशान् कथयति अविद्येति। विद्या यया तदक्षरमधिगम्यते इति श्रुतिः, न विद्या अविद्या—अज्ञानमसम्यक्ज्ञानमित्यर्थः। नञोऽल्पार्थत्वं यदुक्तमज्ञानं ज्ञानविरोधि वस्तुकिञ्चिदनिर्व्वचनीयं नाम, तदाद्य प्रतिपत्तये, तत्त्वतस्तु ज्ञानव्याप्यमज्ञानं, यथा चासम्यक् प्रकाशस्तम इति। अस्मिता अस्मीत्यस्यभावः। रागः प्रीतिकरो द्वेषस्तद्‌-विपरीतः। अभिनिवेशः स्वसत्ताविलयाशङ्का। इत्येते पञ्चक्लेशाः क्लिश्नन्ति योगिनः स्वरूपस्थितिप्रेयसः, प्राकृतास्त्वेषां क्लेशजनकत्व मनुभवितुमपि नार्हन्ति। विवरणमेतेषा मूर्द्ध्वं करिष्यते ॥ ३ ॥

পূর্ব্বসূত্রে যে ক্লেশ তনুকরণের বিষয় বলা হইয়াছে, সেই ক্লেশ সমূহ কি কি, তাহাই এই তৃতীয় সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। ঋষি বলিলেন—অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ এবং অভিনিবেশ, এই পাঁচটী ক্লেশ। এই পঞ্চবিধ ক্লেশের স্বরূপ কি, তাহা সূত্রকার

নিজেই পর পর সূত্রে বলিবেন, সুতরাং এস্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সাধকদিগের প্রথম অবগতির জন্য ক্লেশগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়মাত্র এস্থলে দেওয়া যাইতেছে। প্রথমে অবিদ্যা,—এই অবিদ্যার স্বরূপ বুঝিতে হইলে বিদ্যার পরিচয় জানা আবশ্যক। উপনিষদ্ বলেন—যাহাদ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করা যায়, তাহার নাম বিদ্যা। সহজ কথায় বিদ্যা শব্দে জ্ঞান বুঝিলেই চলিবে। যে জ্ঞান মানুষকে দিন দিন ব্রহ্মস্বরূপে উপনীত করাইতে সমর্থ, সেই জ্ঞানই বিদ্যা। আর অবিদ্যা সেই বিদ্যারই অল্প বা অসম্যক্ প্রকাশমাত্র। "ন বিদ্যা অবিদ্যা"। অল্পার্থ বুঝাইতে নঞ্ এর প্রয়োগ হইয়াছে। অবিদ্যা বা অজ্ঞানও জ্ঞানের ব্যাপ্যই, অল্প বা অসম্যক্ জ্ঞানই, অজ্ঞান অন্য কিছু নহে। যেরূপ অল্প বা অসম্যক্ আলোকেরই নাম অন্ধকার, ঠিক সেইরূপই অসম্যক্ জ্ঞানই অজ্ঞান বা অবিদ্যা নামে কথিত হইয়া থাকে। যদিও জ্ঞান বস্তু অদ্বয় এবং পূর্ণ, তাহাতে অল্পত্ব বহুত্ব নাই, অথবা কোনরূপ ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবও নাই, তথাপি যে কোন কারণেই হউক, সেই অদ্বয়পূর্ণ জ্ঞানই যখন ব্যাপ্য ব্যাপকভাবে—অল্পাধিকভাবে প্রকাশিত হয়, তখনই তাহার নাম হয় অজ্ঞান বা অবিদ্যা। এই অবিদ্যা বিদ্যার বিরোধীরূপেই আত্মপ্রকাশ করে। যেরূপ অন্ধকার আলোকের বিরুদ্ধ-বস্তুরূপেই প্রতীতিগোচর হয়, ঠিক সেইরূপই অজ্ঞানও যেন জ্ঞানেরই বিরুদ্ধ কোন ভাবরূপ পদার্থরূপেই প্রকাশিত হয়। বাস্তবিক কিন্তু জ্ঞানের সত্তায়ই অজ্ঞানের সত্তা এবং জ্ঞানের আংশিক প্রকাশেই অজ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে। যাহা জ্ঞানের সত্তায় এবং প্রকাশে সত্তা ও প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা তত্ত্বতঃ জ্ঞানকে কখনও আবরণ করিতে পারে না। এইজন্যই অজ্ঞান অবিদ্যা অসৎ প্রভৃতি শব্দের নঞ্‌টী অল্পার্থ বুঝাইতেই প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, অবিদ্যা শব্দে আমরা বিদ্যারই অসম্যক্ প্রকাশমাত্র বুঝিয়া লইব। আমরা জানি জ্ঞানস্বরূপ দ্রষ্টা যখন বৃত্তিসারূপ্য প্রাপ্ত হয়,

তখন তাঁহারই নাম হয় অজ্ঞান বা অবিদ্যা। আর তিনি যখন স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁহার নাম হয় বিদ্যা বা জ্ঞান। যিনি বিদ্যা, তিনিই দেশকালের মধ্যে আসিয়া পড়িলে, অবিদ্যা আখ্যা গ্রহণ করেন। এইরূপে আমরা অবিদ্যার প্রথম পরিচয় পাইলাম। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরবর্ত্তী দুইটী সূত্রে পাওয়া যাইবে।

অস্মিতা—অস্মির যে ভাব, তাহা অস্মিতা। রাগ প্রীতিকারক, দ্বেষ তাহার বিপরীত। অভিনিবেশ স্বসত্তা-বিলয়ের আশঙ্কা। এই পাঁচটীকে ক্লেশ বলা হয়। ইহারা স্বরূপস্থিতি প্রয়াসী যোগিদিগকেই ক্লেশ প্রদান করে। যাহারা সাধারণ লোক, তাহারা ইহাদের ক্লেশ-দায়কত্ব অনুভব করিতেও পারে না। সে যাহা হউক, এই অস্মিতা প্রভৃতি ক্লেশের স্বরূপও সূত্রকার নিজেই বর্ণনা করিবেন।

अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु
विच्छिन्नोदाराणाम् ॥ ४ ॥

तत्राविद्यां विशिनष्टि द्वाभ्यामविद्येति। अविद्या क्षेत्रं प्रसव-भूमिर्जननी क्लेशामुत्तरेषामस्मितादीनां चतूर्णां। कथम्भूतानां—प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्। प्रसुप्ता वीजीभावापन्ना स्तनवः प्रक्षीणाः प्रतिपक्षभावनात इतिभावः। विच्छिन्नाः क्लेशान्तरव्यवाहिताः, उदारा लब्धवृत्तिका एतादृशानामवस्थाचतुष्टयापन्नानामस्मिता-रागद्वेषाभि-निवेशरूप क्लेशचतुष्टयानां जननी अविद्येत्यर्थः। इदमत्रावगन्तव्यं—याहि केषाञ्चित् प्रसवभूमिर्भवति सा शक्तिरेव। गर्भधारण-प्रसव परिपालनसंहरणादि व्यापारदर्शनेनास्या मातृत्वमतीवस्फुटम्। विशुद्धबोधमात्र स्वरूपस्य द्रष्टुर्वृत्तिसारूप्य कारिणीयमविद्या सृष्टि-स्थितिप्रलयकरी अघटनघटनपटीयसी महतीयं शक्तिर्महामायेति। प्रधान-

मिति प्रकृतिरितिचास्याः ख्यातिः। शक्तिरूपत्वमस्याः "स्वस्वामिशक्त्योः" रित्यादिना परत्र वक्ष्यते च। ततश्च ब्रह्मणः सत्तया सत्तामती प्रकाशेन प्रकाशवती चेयमविद्या सगुणं ब्रह्मैव।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চক্লেশের মধ্যে প্রথমতঃ অবিদ্যার বিশেষ বিবরণ দুইটী সূত্রে করা হইতেছে। এই সূত্রে অবিদ্যার কার্য্য বা তটস্থ লক্ষণ বলিয়া পরসূত্রে অবিদ্যার স্বরূপ প্রদর্শিত হইবে। ঋষি বলিলেন— অবিদ্যা হইতেছেন ক্ষেত্র অর্থাৎ প্রসবভূমি—জননী। কাহাদের জননী, পরবর্ত্তী চতুষ্টয়ের অর্থাৎ অস্মিতা রাগ দ্বেষ এবং অভিনিবেশ, এই চারিটীর। অস্মিতা প্রভৃতি চারিটী সন্তানের প্রসবকারিণী অবিদ্যা। ইহাই অবিদ্যার তটস্থ লক্ষণ বা কার্য্য। ঐ চারিটী সন্তানের আবার চতুর্ব্বিধ অবস্থা আছে। প্রসুপ্ত তনু বিচ্ছিন্ন এবং উদার। ক্রমে ইহাদের অর্থ বলা হইতেছে। প্রসুপ্ত বীজীভাব প্রাপ্ত—কার্য্যোন্মুখ না হওয়া। তনু—প্রক্ষীণ অবস্থা, প্রতিপক্ষ ভাবনা দ্বারা যখন ক্লেশ সমূহ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার নাম হয় তনু; যেরূপ ক্ষমার অনুশীলন দ্বারা ক্রোধ ক্ষীণ হইয়া যায় সেইরূপ। বিচ্ছিন্ন—অন্য ক্লেশের দ্বারা ব্যবহিত হওয়া। যেরূপ রাগ কালে দ্বেষের বা দ্বেষ কালে রাগের বিচ্ছিন্ন ভাব হয়। উদার—লব্ধবৃত্তিক অর্থাৎ সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হওয়া। এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা পূর্ব্বোক্ত অস্মিতা প্রভৃতি ক্লেশ চতুষ্টয়ের প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কখনও উহারা সুষুপ্তবৎ ভাবে থাকে, কোনরূপে বাহিরে প্রকাশ পায় না। কখনও অতি ক্ষীণ ভাবে দেখা দেয়, কখনও অন্য ক্লেশের দ্বারা ব্যবধান প্রাপ্ত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ পায়, আবার কখনও বা একেবারে লব্ধবৃত্তিক হয় অর্থাৎ স্বকীয় পূর্ণ স্বরূপেই প্রকাশ পায়। এই চারি প্রকার অবস্থাপন্ন যে অস্মিতা রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশরূপ

চতুর্ব্বিধ ক্লেশ, ইহাদের প্রসবকারিণী অবিদ্যা। ইহাই সূত্রের সাধারণ অর্থ। কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় আছে :—

যে অপরের প্রসবকারিণী, সে নিশ্চয়ই শক্তিস্বরূপ বস্তু হইবে। গর্ভে ধারণ, প্রসব, প্রতিপালন, ক্ষীণ করা এবং পুনঃ সংহরণ করা-রূপ ব্যাপার সমূহ দর্শন করিলে এই অবিদ্যাকে প্রসবভূমি বা মা-ই বলিতে হয়। জননীর যাহা কার্য্য, তাহা সমস্তই এই অবিদ্যাতে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। সর্ব্বপ্রথমেই দেখ—অস্মিতা আমিত্ব। আমার যে আমিত্ব, যাহা আছে বলিয়া "আমি আছি", সেই যে আমার আমি, তাঁহাকে প্রসব করেন ঐ অবিদ্যা; তারপর রাগদ্বেষ অভিনিবেশরূপ অবস্থাগুলির মধ্যদিয়া বহু জন্মজন্মান্তর ধরিয়া উহাকে প্রতিপালন করিয়া পরিপুষ্ট করিয়া ক্রমে সমাধির সাহায্যে প্রক্ষীণ করিয়া সর্ব্বশেষে একেবারে সংহরণ করিয়া লয়েন। এইরূপে ঐ অবিদ্যাই যে আমাদের মা, ইহা অতিশয় স্ফুট। তারপর আরও দেখ—এই অবিদ্যাই বিশুদ্ধবোধস্বরূপ দ্রষ্টাকে বৃত্তি-সারূপ্য প্রাপ্ত করাইয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি স্থিতি লয়েরও হেতুস্বরূপ হন। ইনিই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহতী শক্তি মহামায়া। অন্যত্র ইনিই প্রধান বা প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই অবিদ্যা যে শক্তিস্বরূপ বস্তু, তাহা স্বয়ং পতঞ্জলিদেবও "স্বস্বামিশক্ত্যোঃ" ইত্যাদি সূত্রে বলিয়াছেন। অতএব দ্রষ্টার অর্থাৎ ব্রহ্মের সত্তায় সত্তামতী এবং তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশবতী এই অবিদ্যা সগুণ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। অগ্নিময় লৌহপিণ্ডকে যদি অগ্নি বলা যায়, তাহাতে যেরূপ কোন দোষই হয় না; (কারণ, সে অবস্থায় লৌহ পিণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুই অগ্নিময়।) সেইরূপ অবিদ্যাও ব্রহ্মময়ই। ধীমান্ সাধক! তুমি ইহাকে অজ্ঞান বলিয়া তুচ্ছ বলিয়া মিথ্যা বলিয়া ভ্রান্তি বলিয়া যতই উড়াইয়া দিতে চেষ্টা কর না কেন, যতক্ষণ তোমার দেহ-বোধ আছে, ততক্ষণ উহাকে একেবারে উড়াইয়া দিতে কিছুতেই পারিবে না। সুতরাং অবিদ্যাকে সগুণ ব্রহ্মরূপে বুঝিতেই চেষ্টা

করিও, তোমার জীবন মধুময় হইবে। দেখ, অবিদ্যার, যে অস্তিত্ব তাহা ব্রহ্মই; আর অবিদ্যার যে প্রকাশ, তাহাও ব্রহ্মই। যাহার অন্তর বাহির ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তাহাকে ব্রহ্ম বলিতে আপত্তি করিবে কেন? ব্রহ্ম যখন শক্তিমান্ বা সগুণ, তখন তাঁহারই নাম হয়—অবিদ্যা বা অজ্ঞান। ইহা উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে; ইহাই সাধ্য বস্তু। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই সাধনা চলে। যতক্ষণ সাধনা আছে, যোগ ধ্যান সমাধি আছে, ততক্ষণই অবিদ্যা আছে। তবে যে ইহাকে অজ্ঞান বা অবিদ্যা বলা হয়, তাহার উদ্দেশ্য—উহার স্বরূপটী পরিষ্কার ভাবে দেখাইয়া দেওয়া। স্বকীয় স্বরূপের যে অজ্ঞান, তাহাই অবিদ্যা। অর্থাৎ বোধ যখন স্ববোধকেও যেন বোধ করেন না—এইরূপ যে লীলাময় ভাব, তাহাই অবিদ্যার স্বরূপ বা প্রথম অভিব্যক্তি। পরে ইহা আরও বিস্তৃত ভাবে বলা হইবে। পরে ইনি "আমি"কে সৃষ্টি করেন, পরে ঐ এক আমিকে বহু 'আমি' রূপে প্রকাশিত হইতে বাধ্য করেন। তারপর ঐ বহু আমিগুলিকে কত অবস্থা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া পরিপুষ্ট করিয়া সংহরণের অবস্থায় লইয়া আসেন; তাই যোগদর্শনের ঋষি ইহাঁকে অস্মিতারও প্রসবভূমিরূপে নির্দেশ করিলেন।

প্রিয়তম সাধকবৃন্দ! এতদিনে তোমাদের মায়ের সন্ধান পাইলে? তোমার যে আমি, তাহার যিনি জননী, তিনি তোমার মা, শাস্ত্র তাঁহাকে যে নাম বা যে রূপই প্রদান করুক না কেন, তিনি যে মা, ইহা সত্য। সকল নামে সকলরূপে এমন কি তোমার ঐ "আমি" নামেও সেই মা-ই বিরাজিতা। তাঁহাকে দেখ—প্রণাম কর, শ্রদ্ধা কর—মায়ের শরণাগত হও। উনিই তোমাকে স্বরূপে অবস্থান করাইয়া দিবেন। উনিই মহাশক্তি জননী, উনিই ঈশ্বর, উহাঁতেই প্রণিধান করিতে হইবে।

अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचि
सुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ५ ॥

अथाविद्यास्वरूपं दर्शयति अनित्येति। सेयमविद्याजननी चतुः कुक्षिः। तत्र प्रथमा कुक्षिस्तावदनित्ये नित्यख्यातिः। तथाहि अनित्यं कालावच्छिन्नं तच्चाहंप्रत्ययरूपं, तत्र नित्यख्यातिः नित्यत्वप्रत्ययः कालातीतत्वप्रत्यय इति यावत्। एतेनास्याः अस्मिताप्रसूत्वं सूचितं। द्वितीया कुक्षिरशुचौ शुचित्वख्यातिरूपा। तथाहि शुचिर्ज्ञानं, अशुचौ ज्ञानहीने जड़े नामरूपमात्र इति यावत्, शुचित्व ख्यातिः पवित्र-सौन्दर्य्यमयत्वादिप्रतीतिः। एतेनास्या रागजननीत्वं सूच्यते। तृतीया कुक्षि दुःखे सुखख्यातिरूपा। तथाहि यदल्पं तद्दुःखं तस्मिन्सुखख्याति भूमत्वबोधः, सूचितं द्वेषजनित्वमनेनाविद्यायाः। चतुर्थी कुक्षिरनात्मस्वात्मख्यातिरूपा। तथाहि अनात्मसु देहे-न्द्रियादिषु आत्मत्वख्यातिरात्मबोध इत्यर्थः, सूचितमेतेनास्या अभि-निवेश-प्रसविनीत्वमिति विपर्य्ययवृत्तिरूपाविद्येति ॥ ५ ॥

মহর্ষি পতঞ্জলিদেব এই সূত্রে অবিদ্যার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই অবিদ্যা জননী চতুঃকুক্ষি। প্রথম কুক্ষি অনিত্যে নিত্যখ্যাতি, দ্বিতীয় অশুচিতে শুচিখ্যাতি, তৃতীয় দুঃখে সুখখ্যাতি এবং চতুর্থ কুক্ষি অনাত্মায় আত্মখ্যাতি। প্রথম কুক্ষি হইতে অস্মিতা, দ্বিতীয় কুক্ষি হইতে রাগ, তৃতীয় কুক্ষি হইতে দ্বেষ এবং চতুর্থ কুক্ষি হইতে অভিনিবেশ নামক সন্তানের আবির্ভাব হয়। ক্রমে এই কুক্ষি চতুষ্টয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে—প্রথমতঃ অনিত্যে নিত্য খ্যাতি। যাহা কালাবচ্ছিন্ন তাহা অনিত্য। অহংপ্রত্যয়ই সর্ব্ব

প্রথম অনিত্য বস্তু; কারণ, অহংপ্রত্যয়ের মধ্যেও কালিকধারা বিদ্যমান থাকে। (কিরূপে থাকে, তাহা পরে বলিব) যাহা কিছু দৃশ্য বা জ্ঞেয়, সে সকলই অনিত্য হইলেও এই সকল অনিত্যের মূলেও একটী অনিত্য আছে, সেটী অন্য কিছু নহে—"অহং"প্রত্যয়। আমাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত যে অহংবোধটী প্রকাশ পাইতেছে, ইহা স্বরূপতঃ অনিত্য হইলেও আমাদের নিকট নিত্যরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। প্রতিদিন কত শত জীব মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াও, আমার যে "আমি" তাহাকে নিত্য বলিয়া অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি যাবতীয় বিকারের অতীত বলিয়াই মনে করি। এইরূপ যে মনে করা, ইহারই নাম অনিত্যে নিত্যখ্যাতি। তারপর অশুচিতে শুচিত্বখ্যাতি ইহা দ্বিতীয়। শুচি শব্দে একমাত্র চৈতন্য বা জ্ঞানকেই বুঝায়। "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে" জ্ঞানের মতন পবিত্র জিনিষ আর নাই। এই জ্ঞান যাহাতে নাই, তাহা অশুচি। জড় পদার্থসমূহকেই অশুচি বলা হয়, আর ঋষি এস্থলে ঐরূপ অর্থেই অশুচি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই জড় পদার্থসমূহে যখন চেতন ধর্ম্ম পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ পবিত্রতা কমনীয়তা সৌন্দর্য্য প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়, তখনই অশুচিতে শুচিখ্যাতি হয়। একটা অস্থি-চর্ম্ম-মাংস পিণ্ডময় অশুচি জড়দেহে আমরা কত পবিত্রতা কত সৌন্দর্য্য কত কমনীয়তা দেখিয়া মুগ্ধ হই। কেবল দেহে নহে, এইরূপ যাবতীয় জড়পদার্থে—ফুলেফলেপর্ব্বতে প্রাসাদে সর্ব্বত্র যত সৌন্দর্য্য বা যত পবিত্রতা পরিলক্ষিত হয়—সে সকলই যে চৈতন্যেরই বিকাশ, ইহা না বুঝিয়া উহা জড়েরই ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া লই। "সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য পবিত্রতা প্রভৃতি, বোধ বা অনুভব-স্বরূপ বস্তু, উহা কখনও জড় পদার্থে থাকিতে পারে না, ফুলের সৌন্দর্য্য ফুলের নহে, আমার বোধে। শর্করার মধুরতা শর্করায় নহে, আমার বোধে। কামিনীর কমনীয়তা ঐ দেহে নহে আমার বোধে" ইহা সত্য। বিচার-দৃষ্টিতে উহা প্রত্যক্ষও বটে, কিন্তু তথাপি প্রতিনিয়ত ঐ জড়

পদার্থ সমূহে চৈতন্যধর্ম্মের অনুভব হইয়া থাকে। ইহাকেই ঋষি অশুচিতে শুচিত্বখ্যাতি বলিয়াছেন।

তৃতীয়—দুঃখে সুখ খ্যাতি। যাহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন তাহাই দুঃখ, যাহা ভূমা বা অসীম, তাহাই সুখ। অল্পকে ভূমা জ্ঞান করাই দুঃখে সুখ-খ্যাতি। যাহা নাম ও রূপ লইয়া প্রকাশিত হয়, তাহা যত মূল্যবান্‌ই হউক বা যত সুন্দরই হউক, অথবা যত বৃহৎ হউক, উহা যে অল্প তদ্‌বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই। এই অল্পতেই আমাদের অলং বুদ্ধি—পর্য্যাপ্ত বুদ্ধি হয় অর্থাৎ প্রচুর পাইয়াছি, এইরূপ প্রতীতি হয়। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই ঋষি দুঃখে সুখ-খ্যাতি কথাটী বলিয়াছেন। অতঃপর চতুর্থ—অনাত্মায় আত্মখ্যাতি। অনাত্মা—দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি, তাহাতে আত্মবোধ হওয়া। আমরা মুখে বলি—"আমার দেহ", দেহ হইতে আমি পৃথক্। কিন্তু এই দেহে আঘাত পাইলে অমনি বলিয়া থাকি—"আমি ব্যথিত"। এইরূপ মনেও। মুখে বলি—আমার মন, কিন্তু কেহ অন্যায় দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিলে উহা শ্রবণ করিয়া বলিয়া থাকি—"আমি অপমানিত"। বাস্তবিক কিন্তু আমি ব্যথিতও নহে অপমানিতও নহে, অথচ ঐরূপ প্রতীতি সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই ঋষি অনাত্মায় আত্মখ্যাতি কথাটী বলিয়াছেন। এই চতুর্ব্বিধরূপে প্রকাশিত যে অতদ্‌রূপ-প্রতিষ্ঠ জ্ঞান বা বিপর্য্যয় বৃত্তি তাহাই অবিদ্যার স্বরূপ।

এ পর্য্যন্ত আলোচনায় সূত্রের অর্থ যেরূপভাবে বুঝিতে পারা গিয়াছে, কেবল এই দিক দিয়া বুঝিলেই ঠিক বুঝা হইবে না, আরও বুঝিবার বিষয় আছে। আমরা অবিদ্যাকে মা বলিয়া বুঝিয়া আসিয়াছি। যিনি মা, তিনি যদি সন্তানের নিকট ঐরূপভাবে আত্মপ্রকাশ করেন, তবে তাঁহাকে মা না বলিয়া—মায়াবিনী বলাই সঙ্গত নহে কি? যে মা আমাকে অবোধ শিশু সন্তান পাইয়া ঐরূপ ভ্রমে ঐরূপ মিথ্যায় নিপাতিত করেন, তিনি কিরূপ জননী, এ সংশয় সাধকমাত্রের মনেই জাগিবে। কিন্তু একটু ধীরভাবে লক্ষ্য

করিলে এ সংশয়ের স্থান থাকিবে না। ঋষি অবিদ্যা জননীকে মায়াবিনী মূর্ত্তিতে দেখাইবার জন্যই এই সূত্র প্রণয়ন করেন নাই; মাকে যাহাতে আমরা ভালরূপে চিনিতে পারি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই, তাহার জন্যই এত সুন্দররূপে মায়ের আমার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এস প্রিয়তম সাধক, আমরা আমাদের অবিদ্যা জননীর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করি। যিনি আমার "আমি" কে প্রসব করিয়াছেন, তিনি যে সত্য সত্যই আমার মা ইহাতে কাহারও সংশয় হইতে পারে না। কেবল প্রসব করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হন নাই, প্রতিনিয়ত আমার ঐ আমি বোধটিকে নিত্য—অবিনাশী—চিরস্থায়ী রূপে অনুভব করাইতেছেন। ইহাই ত অনিত্যে নিত্যখ্যাতি। আচ্ছা, এইবার দেখ—আমরা যদি ঐ আমিকে সর্ব্বদা নিত্যরূপে অনুভব না করিতাম, তবে কখনও কি যাহা যথার্থ যে নিত্য বস্তু, সেই আত্মার সন্ধান পাইতে পারিতাম? "আমি" এইটী যে আত্মার অতি সন্নিহিত নাম। আত্মা নিত্য, তাই তাঁহার একান্ত সন্নিহিত বলিয়া এই আমিকেও নিত্যরূপেই বুঝিয়া থাকি। এই আমিকে যদি অনিত্য বলিয়াই বুঝিতাম, তবে কখনও নিত্য বস্তুর স্বরূপ অবধারণই করিতে পারিতাম না। ভাগ্যে আমিকে নিত্যরূপে অনুভব করি, তাই আশা আছে, একদিন এই আমির সঙ্গে যেগুলি জড়াইয়া গিয়াছে, সেই "আমার" গুলিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমিতে—বিশুদ্ধ আমিতে উপনীত হইতে পারিব। এবং সেই দিনই আমার অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হইয়া যাইবে। তখন ঐ আমিই, আমিরও যাহা প্রকাশক, যিনি না থাকিলে আমিও থাকিতে পারে না, তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইবে। মা আমাকে এই পর্য্যন্ত বুকে করিয়া আনিয়া দেখাইয়া দিবেন—বৎস, এ আমি—আমি নহে, ঐযে আমি। তখনই ত "সোঽহং" বলিয়া, এ আমিকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারিব। নিত্য বস্তু যে কি, তাহা তখনই ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিয়া আনন্দে মহোল্লাসে বলিয়া উঠিব—

অহো আমি ধন্য! আমি ধন্য! আমি আমি নহি; আমি—চেতন, আমি—নিত্য, আমি—আত্মা। সুতরাং আমাকে অসম্প্রজ্ঞাত যোগে উপনীত করাইবার জন্যই, অবিদ্যা মা আমার অনিত্যে নিত্যখ্যাতি মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন আমাকে ভ্রান্তির কুহকে মিথ্যার মোহে পাতিত করিবার জন্য নহে। কেবল ইহাই নহে, এ সকল ত গেল সাধনার দিকের কথা। যাহারা যথার্থ সাধক তাহারা এ তথ্য আলোচনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। এতদ্‌ভিন্ন আরও আছে।—ভাবিয়া দেখ সাধক, আমাদের আমিকে যদি প্রতিনিয়ত আমরা নিত্য বোধ না করিয়া অনিত্য নশ্বর ধ্বংসশীল মনে করিতাম, তবে আমাদের জীবন-কালটা কি দুর্ব্বিষহ জ্বালাময় হইত। প্রত্যেক জীবই যদি তার আমিকে নিত্য বোধ না করিত, "আমি নশ্বর" এই বোধ যদি সর্ব্বদা সকল জীবের জাগিয়া থাকিত, তবে এ জগৎটা একটা ভয়াবহ নরকে পরিণত হইত। একটা সত্য ঘটনা বলিতেছি—

শিবপুর নিবাসী জনৈক সাধকের একমাত্র পুত্রের বিয়োগ জনিত শোকে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ব্যাধি উপস্থিত হয়। তাহার ফলে মৃত্যু চিন্তা প্রবল-ভাবে তাহাকে আক্রমণ করে। সে সর্ব্বদাই ভাবিত "আমি মরিব" ছেলেটা মারা গিয়াছে, ঠিক আমিও ত ঐরূপই মারা যাইব, এই মুহূর্ত্তেই ত মরিতে পারি; সুতরাং আর আহার করিব কেন, রাত্রিতে ঘুমাইয়া থাকিব, তখন যদি মারা যাই, তবে কি হইবে? বাড়ী হইতে বাহিরে যাইব? যদি রাস্তায় মৃত্যু হয়। ইত্যাদি মৃত্যু-বিষয়ক বহুবিধ চিন্তা ঐ সাধককে প্রায় অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিয়াছিল এবং সত্য সত্যই যেন সে দিন দিন মৃত্যুর মুখেই প্রবেশ করিতেছিল। বহুদিন কষ্ট পাইয়া উক্ত সাধক সেই দুঃসহ জ্বালাময় মানসিক ব্যাধি হইতে মায়ের কৃপায় মুক্ত হইয়াছেন এবং বর্ত্তমানে বেশ ভালই আছেন।

এই সংক্ষিপ্ত ঘটনার বিবরণ হইতে সহৃদয় পাঠকগণ বেশ বুঝিতে পারিবেন—অবিদ্যারূপিণী জননী অনিত্যে নিত্য-খ্যাতিরূপে আত্ম প্রকাশ

করিয়া আমাদের কি মঙ্গল সাধন করিতেছেন। এইরূপে কি মুক্তির সময়ে কি জীবন কালে উভয়ত্রই, ঐ অনিত্যে নিত্যখ্যাতিই আমাদের একমাত্র সম্বল। ঐ অবিদ্যা জননীই আমাদের জীবন কালের শান্তি, আবার মোক্ষ কালের গতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিয়াছেন। অবিদ্যা যে সত্য সত্যই আমার মা, তাই প্রতিনিয়ত আমরা তাঁহার নিকট হইতে মায়ের মতন ব্যবহারই পাইয়া থাকি।

এইরূপ কেবল অনিত্যে নিত্যখ্যাতি রূপে নহে, অপর তিন রূপেও অবিদ্যা জননী আমাদের পরম মঙ্গল সাধন করিতেছেন। অশুচিতে শুচিখ্যাতিরূপে অর্থাৎ জড় পদার্থে চৈতন্যধর্ম্ম দর্শনরূপে তিনি আমাদের এই ব্যবহারিক জীবনকে কত মধুময় করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা জড় পদার্থে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রভৃতি দর্শন করি বলিয়াই এক দিকে আমাদের জীবনকাল শান্তিময় হয়, অন্যদিকে যিনি যথার্থ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রভৃতির আকর, তাঁহারও সন্ধান লাভ হইয়া থাকে। ওগো, জড় পদার্থগুলি যদি সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিহীনরূপেই প্রতীয়মান হইত, তবে এ জগৎ যে জীর্ণারণ্যে পরিণত হইত! আত্মাই যে একমাত্র অনন্ত সৌন্দর্য্যের এবং পরম মাধুর্য্যের অদ্বিতীয় আকর, তাহা এই অশুচিতে শুচিবোধরূপে মায়ের প্রকাশ হওয়ার ফলেই আমরা জানিতে পারি। তারপর দুঃখে সুখখ্যাতি—অল্পে ভূমাবোধ, ইহাও মায়ের অতুলনীয় স্নেহেরই পরিচয়। যাহা অল্প—আমরা প্রতিনিয়ত যদি তাহাকে অল্প-রূপেই দেখিতাম—দুঃখ-রূপেই বুঝিতাম, তবে আমাদের জীবন কেবল দুঃখময়ই থাকিত। ক্ষণিক আনন্দের যে একটা তৃপ্তি তাহা হইতেও বঞ্চিত থাকিতাম। তাহার ফলে কি হইত? আত্মাই যে আনন্দ-স্বরূপ বস্তু ইহার ধারণাও করিতে পারিতাম না। আমরা যে ভূমার বা সুখের সন্ধান পাই, তাহা এই অল্পকে বা দুঃখকে সুখরূপে পুনঃ পুনঃ অনুভব করিবার অবশ্যম্ভাবী ফলমাত্র।

আর চতুর্থ—অনাত্মায় আত্মবোধ। ইহাও আমাকে আত্মস্বরূপে

প্রতিষ্ঠিত করিবার অব্যর্থ উপায়। যদি দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি অনাত্মবস্তু গুলিকে আত্মারূপে অনুভব না করিতাম, তবে আমার যথার্থ স্বরূপ যে আত্মাই, তাহার সন্ধান কখনও পাওয়া যাইত না। দেখ প্রিয়তম সাধক, এ সকলই মায়ের মতন ব্যবহার নহে কি? দেখ তিনি অস্মিতাকে প্রসব করিয়া তাহার পরিপুষ্টি বিধানের জন্য অনিত্যকে নিত্যরূপে, অশুচিকে শুচিরূপে, দুঃখকে সুখরূপে, এবং অনাত্মাকে আত্মরূপে প্রতীতিগোচর করাইতেছেন। শিশু সন্তানকে জননী যেমন স্তন্য পান করাইয়া দিন দিন পরিপুষ্ট করেন, ঠিক সেই রূপই এই অবিদ্যা জননী আমাদের আমি গুলিকে প্রসব করিয়া দিনের পর দিন জ্ঞানস্তন্য পান করাইয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাইবার অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত যোগের যোগ্য করিয়া তুলিতেছেন। নিত্য শুচি সুখ আত্মা, এ সকলই চৈতন্যের পর্য্যায়, আর অনিত্য অশুচি দুঃখ অনাত্মা, এগুলি চিত্তের পর্য্যায়। যিনি চিৎ তিনিই চিত্তরূপে প্রকাশিত হইয়া, যিনি বিদ্যা তিনিই অবিদ্যারূপে প্রকাশিত হইয়া কি অপূর্ব্ব মাতৃলীলার অভিনয় করিয়া থাকেন!

আরও দেখ সাধক, ঐ যে অনিত্য নিত্য অশুচি শুচি প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধার্থ-বোধক শব্দগুলি, উহারা সকলেই খ্যাতি অর্থাৎ অনিত্যও খ্যাতি, আবার নিত্যও খ্যাতি, অন্য কিছু নহে। খ্যাতি শব্দের অর্থ প্রকাশ, বোধ—অনুভব। এখন বেশ বুঝিতে পারিবে—অবিদ্যা ঠিক একই সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটী খ্যাতি লইয়া প্রকাশিত হয়। যখনই বলা হয় অনিত্যে নিত্য খ্যাতি, তখনই বুঝা যায়—অনিত্যখ্যাতি এবং নিত্যখ্যাতি, এই উভয়ই যুগপৎ বিদ্যমান। তবে একটী গৌণ অন্যটী মুখ্য ভাবে থাকে। খ্যাতি বিদ্যারই একটী নাম। খ্যাতি যখন উভয়াত্মিকা তখনই তাহার নাম হয় অবিদ্যা। সহজ কথায় যিনি ব্রহ্ম যিনি বিদ্যা, তিনি যখন আমাদের মা হইয়া আত্ম প্রকাশ করেন এবং আমাদের সহিত মায়েরই মতন ব্যবহার করেন তখন তাঁহার শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ নাম হয়—সগুণ ব্রহ্ম বা অবিদ্যা।

ওগো আমার প্রিয়তম সাধক সন্তান! আরও নিকটে আসিয়া দেখ—"আমি আছি" এই যে নিত্যসিদ্ধ অনুভব, উহার মধ্যে ঐ আমিটার নাম অবিদ্যা আর আছি অর্থাৎ অস্তিত্বটার নাম বিদ্যা। ঐ আমির নাম জীব আর অস্তিত্বটা ব্রহ্ম। আমি যখন আছির দিকে লক্ষ্য করিতে পারে, তখন আর আমি থাকে না, আমি তখন 'আছে' হইয়া যায়, সত্তামাত্রই প্রকাশিত হইয়া উঠে। ইহাই স্বরূপস্থিতিরূপ যোগ। এই যে যোগস্বরূপে অবস্থান, ইহাও ঐ অবিদ্যা মায়েরই কৃপায়। তাই বলি, তোমরা অবিদ্যাকে ঘৃণার চক্ষুতে দেখিওনা। অবজ্ঞার কুটিল কটাক্ষে আমার মাকে অবমানিত করিওনা। উঁহাকে আদর কর প্রণাম কর, উঁহারই চরণে আত্মনিবেদন কর, সকল সংশয় সকল জ্বালা দূরীভূত হইবে। তুমি বিদ্যা অবিদ্যার পরপারে উপনীত হইয়া জন্মজীবন সার্থক করিতে পারিবে।

দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা ॥ ৬ ॥

এবমবিদ্যাং নিরূপ্য তৎপ্রসবান্ পরিচায়য়িতুমাদৌ প্রধানাং সন্ততিমস্মিতামাহ দৃগিতি। দৃক্শক্তিঃ পুরুষ আত্মা। দর্শনশক্তির্বুদ্ধিরেতয়োরেকাত্মতা তাদাত্ম্যমিব নতু বাস্তবং তাদাত্ম্যমিতীবশব্দার্থঃ। সর্ব্ববিশেষ-বিচ্ছেদেন মামহং জানাম্যহমস্মীতি বা প্রত্যয়ধারৈবাস্মিতেতি তন্নামকঃ ক্লেশ ইত্যর্থঃ। মুমুক্ষূণামিব যোগিনামনুভাব্যোঽয়মতএব চ দেবীমাহাত্ম্যে স্মৃতিত্বেনোপবর্ণিত ইতি।

পূর্ব্বোক্তরূপে অবিদ্যার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া ঋষি এক্ষণে তাহার সন্তানগণের পরিচয় দিতেছেন। প্রথমেই প্রধান সন্ততি অস্মিতার কথা বলিলেন—দৃক্শক্তি এবং দর্শনশক্তি এই উভয়ের যেন একাত্মতাই অস্মিতা। দৃক্শক্তি—পুরুষ, আত্মা এবং দর্শনশক্তি বুদ্ধি, এই

উভয়ের যখন একাত্মতা হয়—তাদাত্ম্য হয়, যেন অভিন্নরূপেই প্রকাশ পায়, তখন সেই যে অভিন্নভাবে প্রকাশ, তাহাকে অস্মিতা কহে। সূত্রে একটী ইব শব্দের প্রয়োগ আছে, উহার তাৎপর্য্য এই যে, বাস্তবিক তাদাত্ম্য নহে, যেন তাদাত্ম্যের মতন হইয়াই প্রকাশিত হয়। আত্মা সর্ব্বথা নির্লেপ বস্তু, তাহা কখনও বুদ্ধির সহিত তাদাত্ম্য ভাব প্রাপ্ত হইতেই পারে না; অথচ বুদ্ধিসত্ত্ব যখন অতিশয় নির্ম্মল হয়, তখন উহাতে প্রতিবিম্বিত আত্মস্বরূপটী অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হয়, তাই বুদ্ধিকেই আত্মারূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে। চতুর্দ্দিকে স্বচ্ছ কাচের আবরণের মধ্যস্থ উজ্জ্বল আলোটী যে কাচের আবরণ হইতে একান্তভাবেই পৃথক, ইহা দূর হইতে পরিলক্ষিত হয় না। দূর হইতে সেই কাচের আবরণ গুলিকেই আলোকরূপে দেখা যায়। ঠিক এইরূপ যতক্ষণ বুদ্ধির আবরণ সম্যক্‌ভেদ না হয়, ততক্ষণ বুদ্ধিতেই আত্মবোধ হইয়া থাকে। এই যে বুদ্ধিতে আত্মবোধ হওয়া, ইহারই নাম অস্মিতা। "আমি আমাকে জানি" বা "আমি আছি" এইরূপ যে প্রত্যয়ধারা, তাহাই অস্মিতা। প্রতিনিয়ত বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের উদয় হয়, ঐ বিশেষ জ্ঞানগুলির সঙ্গেও জড়িতভাবে এই অস্মিতা আছে, কিন্তু তাহাকে অস্মিতা বলা হয় না, অহঙ্কার নামেই তাহার পরিচয় হয়। যত রকম জ্ঞানেরই উদয় হউক, সকল জ্ঞানের সঙ্গেই "আমি" এই ভাবটী জড়িত আছে। যখন অন্য সর্ব্বপ্রকার বিশিষ্টতা দূরীভূত হইয়া যায়, কেবল আমিময় হইয়াই জ্ঞানটী প্রকাশ পায়, তখন তাহার নাম হয় অস্মিতা। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ ক্লেশের মধ্যে ইহা অন্যতম ক্লেশ। এবং ক্লেশস্বরূপ বলিয়াই দেবীমাহাত্ম্যে এই অস্মিতা শুম্ভ-দৈত্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা মুক্তিকামী যোগী, মাত্র তাঁহারাই এই ক্লেশ অনুভব করিতে পারেন। অন্যের পক্ষে ইহা ক্লেশদায়ক হইলেও তাহারা ইহা বুঝিতে পারে না। অস্মিতা প্রভৃতিকে যোগশাস্ত্রে কেন ক্লেশ বলা হইল, তাহা পঞ্চদশ

সূত্রে ঋষি নিজেই বলিবেন, সুতরাং এ স্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এই অস্মিতা-ক্ষেত্রে উপনীত হইলে অর্থাৎ চতুর্থ সম্প্রজ্ঞাত যোগলাভ হইলে, সাধক দেখিতে পায়—মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি করণসমূহ এবং যাবতীয় দৃশ্যবর্গ, সকলই অস্মিতার বিশেষ বিশেষ ব্যূহ মাত্র। অস্মিতাই গ্রহণ ও গ্রাহ্য রূপ লইয়া এই অপূর্ব্ব বিশ্বলীলা সম্পাদন করিতেছে। এই অস্মিতাই আবার বিভিন্ন দেবদেবী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রিয়তম ভক্তের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতেছে। পূর্ব্বে যে অবিদ্যারূপিণী মহতী পরমেশ্বরী শক্তির বিষয় বলিয়া আসা হইয়াছে, তিনি যখন অপেক্ষাকৃত প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই তিনিই অস্মিতানামে পরিচিত হইয়া থাকেন। শক্তির স্বরূপ সর্ব্বথা অব্যক্তই থাকে। শক্তি যখন কোন কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হয়, তখনই উঁহার প্রকটভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; তাই অবিদ্যার সর্ব্বপ্রথম কার্য্য বা প্রকাশ এই অস্মিতাই ব্যবহারিক-ঈশ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সাধকগণ সাধনা দ্বারা এই ঈশ্বরত্ব পর্য্যন্তই লাভ করিতে পারে। যাবতীয় বিভূতি এই অস্মিতা-ক্ষেত্র হইতেই আবির্ভূত হয়। যে সাধক এই অপূর্ব্ব ঈশ্বরমহিমা সমূহকেও তুচ্ছ করিয়া শুদ্ধ সত্তার দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে, কেবল তাহার নিকটই আত্মা স্বকীয় স্বরূপটী প্রকটিত করেন। কিন্তু সে অন্য কথা—

सुखानुशयी रागः ॥ ७ ॥

द्वितीयं प्रसवमाह सुखेति। सुखमनुस्मृत्य शेत इति सुखानुशयी। यथाहि "यो वै भूमा तत् सुखम्"। सुखहनीयं खमिति निरुक्तिः, खं चित्ताकाशमित्यर्थः। तदनुस्मरणपूर्ब्बक आत्मनोऽन्यत्र सुखस्य सम्भोगाय सन्धानाय वा योऽभिलाषः स राग स्तत्रामकः क्लेश इत्यर्थः ॥ ७ ॥

এই সূত্রে অবিদ্যা জননীর দ্বিতীয় প্রসব রাগের বিষয় বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—সুখানুশয়ী রাগ। সুখ কি? যাহা ভূমা যাহা মহৎ অসীম, তাহাই সুখ। একমাত্র আত্মাই সুখস্বরূপ বস্তু। আত্মার সন্নিহিত হইলে চিত্তাকাশ সুবহনীয় হয়। সুবহনীয় খ, ইহাই সুখ শব্দের নিরুক্তি। খ শব্দের অর্থ চিত্তাকাশ। চিত্তাকাশে যখন সেই ভূমা-স্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব পরিগৃহীত হয়, তখন চিত্ত সুবহনীয় হয়; তাই আত্মার একটী নাম সুখ। এই সুখকে অনুস্মরণ করিয়া যে শয়ন করে—অবস্থান করে, তাহাকে সুখানুশয়ী বলে। আমাদের অন্তরে যে রাগ-নামক একটী বৃত্তি আছে, তাহা এই সুখানুশয়ী বৃত্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যাহা যথার্থ সুখ স্বরূপ বস্তু, তাহার একটা অস্ফুট স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া নাম রূপ প্রভৃতি বাহ্য বস্তুতে সেইরূপ সুখের সম্ভোগ করিবার বা সন্ধান করিবার অভিলাষ উপস্থিত হয়, ইহারই নাম রাগ। ঋষি ইহাকে সুখানুশয়ী শব্দে নির্দ্দেশ করিলেন।

আত্মাই একমাত্র ভূমা বস্তু, সুতরাং আত্মাই সুখ। এই সুখ জীব মাত্রেরই স্মরণীয় বস্তু; কারণ আত্মার সামান্য স্মৃতি জীব মাত্রেরই আছে। সেই স্মৃতির বশেই প্রত্যেক জীব জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সুখের সন্ধানে ধাবিত হয়, এবং রূপ রস প্রভৃতি বিষয় সমূহকেই সুখ স্বরূপ মনে করিয়া তাহার সম্ভোগ অথবা সন্ধান করিবার জন্য লালায়িত হয়, এই যে সুখের লালসা ইহারই নাম রাগ। জীব যতদিন ভূমা স্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে না পারে, ততদিন কিছুতেই এই রাগের নিবৃত্তি হয় না। আত্মার স্মৃতিই জীবকে জন্মের পর জন্ম ধরিয়া সুখের সন্ধানে ছুটাইয়া লইয়া যাইতেছে। জীব যে বিষয় সম্ভোগে সম্যক্ পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, ঐ আত্ম-স্মৃতিই তাহার একমাত্র হেতু। বাহ্যবস্তুতে সুখ না থাকিলেও জীব কিরূপে উহাতে সুখের আস্বাদ পায়, তাহা সাধন-সমর গ্রন্থে বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে।

দেখ সাধক, যে রাগকে বন্ধনের হেতু বলিয়া অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাক, সেই রাগই তোমাকে দিনের পর দিন তোমাকে পূর্ণতার দিকে লইয়া চলিয়াছে। এই রাগরূপে অবিদ্যা জননীর প্রকাশকে যতদিন ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিবে, ততদিন ইহার মোহ হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। ঐ রাগকেই মা বলিয়া ইষ্ট বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর, দেখিবে—রাগের যে ক্লেশরূপতা, তোমার নিকট হইতে তাহা অচিরে অপসৃত হইয়া যাইবে।

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ॥ ৮ ॥

তৃতীয়ং প্রসবমাহ দুঃখেতি। দুঃখমনুস্মৃত্য শেতে ইতি দুঃখানুশয়ী। তথাহি যঃ পর আত্মনোঽন্যস্তদস্বং তদ্ দুঃখম্। উক্তঞ্চ সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্। দুর্ব্বহনীয়ং খমিতি নিরুক্তিঃ। দুঃখানুস্মরণপূর্ব্বিকা পরাংস্তদ্বশতাং বা পরিত্যক্তুমিচ্ছা দ্বেষ স্তন্নামকঃ ক্লেশ ইত্যর্থঃ।

এই সূত্রে অবিদ্যা জননীর তৃতীয় প্রসব দ্বেষের বিষয় বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—দুঃখানুশয়ী দ্বেষ। দুঃখকে অনুস্মরণ করিয়া যাহা শয়ন করে—অবস্থান করে, তাহার নাম দ্বেষ। দুঃখ কি? যাহা পর অর্থাৎ আত্মা হইতে অন্য, তাহাই অস্ব এবং তাহাই দুঃখ। শাস্ত্রও সর্ব্ববিধ পরবশতাকেই দুঃখ নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন। দুর্ব্বহনীয় যে খ, তাহাই দুঃখ। ইহা দুঃখ শব্দের নিরুক্তি। চিত্ত যতক্ষণ আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুকে গ্রহণ করে, ততক্ষণ সে দুর্ব্বহনীয়ই থাকে, ততক্ষণই সে দুঃখানুভব করে। জন্ম জন্মান্তর হইতে পুনঃ

পুনঃ দুঃখ ভোগ করিয়া অর্থাৎ অনাত্মবস্তুর পরিগ্রহ-জনিত প্রতিকূল বেদন সম্ভোগ করিয়া জীব দুঃখবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞই থাকে। সেই পূর্ব্বানুভূত দুঃখের অনুস্মরণ করিয়া তাদৃশ দুঃখকে বা দুঃখের উপায় সমূহকে পরিহার করিবার ইচ্ছা জীবের স্বতঃই সঞ্জাত হয়। এই যে দুঃখ পরিহারের ইচ্ছা, ইহারই নাম দ্বেষ।

জীব মাত্রেরই স্বভাব এই যে, যেস্থলে আত্মবুদ্ধি বা আত্মীয় বুদ্ধি হয়, সেই স্থলেই অনুরাগবান্ হয়। আর যেস্থলে তাহার বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হয় অর্থাৎ পর বুদ্ধি উপস্থিত হয়, সেই স্থলে বিদ্বেষবান্ হয়। যাহা পর তাহা অল্পই হইবে, অল্পে কখনও জীব পরিতৃপ্ত হইতে পারে না; তাই পরকে বা পরবশতাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা জীব মাত্রেরই দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে পরবশতা-পরিজিহীর্ষা, ইহাই দ্বেষনামক বৃত্তি।

দেখ সাধক, আপাততঃ দ্বেষকে কত অনিষ্টকারী বলিয়া মনে হইয়া থাকে। কিন্তু এই দ্বেষই তোমার অনাত্মবোধকে দূর করিয়া আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় স্বরূপ হইয়া, তোমাকে দিন দিন আত্মার দিকেই অগ্রসর হইবার সুযোগ প্রদান করিতেছে। ইহা অবিদ্যা জননীরই বিশেষ অভিব্যক্তি। অবিদ্যা যে মা, ইহা যতদিন স্বীকার করিতে না পারিবে, ততদিনই এই অবিদ্যার সন্তানগণ এই রাগ দ্বেষ প্রভৃতি বৃত্তি-নিচয় তোমাকে বন্ধনের পর বন্ধন করিতে থাকিবে। ততদিনই ইহারা ক্লেশরূপে উপস্থিত হইয়া তোমায় ব্যথিত করিবে। তুমি যতদিন অনাত্মবুদ্ধিতে বিচরণ করিবে—সজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদ দর্শন করিবে, ততদিন ইহাদের—এই রাগ দ্বেষের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। দেখ, সকলই আত্মা, দেখ, সকলই তাঁর বৃত্তিসারূপ্য, দেখ, সকলই অবিদ্যা জননীর লীলা বিলাস, তুমি অল্পকাল মধ্যেই এই দুর্ব্বার মোহ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ ९ ॥

चतुर्थमाह सन्तानं स्वरसेति। स्वरसवाही स्वाभाविक वहन शीलो न पुनरागन्तुक इतिभावः। विदुषोऽपि श्रुतानुमित-ज्ञानवतोऽपि नतु कृतसाक्षात्कारासम्प्रज्ञातस्य। तथा यथा मूढस्य तथेति भावः। रूढः प्रसिद्धो दृढमूल इति यावत् दृश्यत इति शेषः। कोऽसावित्याह अभिनिवेशः—अभितो निविश्यत इत्यभिनिवेशः स्वसत्ताविलयाशङ्कारूपः क्लेशः इत्यर्थः। सूचितमनेन सर्व्वेषामेव जन्मान्तर-स्मरणमिति ॥ ९ ॥

এইবার চতুর্থ সন্তানের কথা বলা হইতেছে। এই সন্তানের নাম অভিনিবেশ—স্বসত্তা বিলয়াশঙ্কা। "অভিতো নি বিশ্যতে"—যাহা সর্ব্বতোভাবে প্রাণী মাত্রেরই অন্তরে নিবিষ্ট হইয়া আছে তাহাই অভিনিবেশ, তাহা আর কিছু নহে—স্বকীয় অস্তিত্ব বিলোপের আশঙ্কা। জীব মাত্রেরই মরণত্রাস আছে, উহা সকলেরই অন্তরে নিহিত। কখনও লব্ধবৃত্তিক হইয়া খুব ঘনভাবে প্রকাশ পায়, আবার কখনও বা গৌণভাবে অবস্থান করে। এই যে মৃত্যুভয় ইহাই অভিনিবেশ।

এস্থলে ঋষি দুইটী বিশেষণের দ্বারা এই অভিনিবেশের স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটী বিশেষণ—স্বরসবাহী। স্বরসবাহী শব্দের অর্থ স্বাভাবিকভাবেই বহনশীল। আগন্তুক কোন ভাব বিশেষ নহে। জীব মাত্রেই জন্মাবধি কোনরূপ শিক্ষা বা উপদেশ ব্যতীত এই অভিনিবেশ ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকে। এইজন্যই অভিনিবেশকে স্বরসবাহী বলা হয়। আবার এই স্বাভাবিক মরণত্রাসরূপ অভিনিবেশই জন্মান্তরের বিদ্যমানতা স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করিয়া দেয়। এই যে অভিনিবেশ ইহা পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিনামক বৃত্তি। পূর্ব্বানুভূত মরণকে স্মরণ করিয়াই এই অভিনিবেশ বৃত্তির

উদয় হয়। যাঁহারা জন্মান্তরের অস্তিত্বে সংশয় করেন, তাঁহারা জীবের এই স্বাভাবিক মরণত্রাসকে অবলম্বন করিয়াই সে সংশয় নিরাশ করিতে পারিবেন।

অপর বিশেষণ—"বিদুষোঽপি তথা রূঢ়ঃ"। যথা মূঢ়স্য তথা বিদুষোঽপি দৃঢ়মূল ইত্যর্থঃ। যাহারা মূঢ়—অজ্ঞান, আত্মা যে নিত্য বস্তু এই জ্ঞান যাহাদের নাই, তাহাদের মরণত্রাস যেরূপ দৃঢ়মূল অর্থাৎ অতি দৃঢ়ভাবে চিত্তে অবস্থিত, ঠিক সেইরূপই যাহারা বিদ্বান—জ্ঞানী, তাহাদেরও মৃত্যুভয় প্রসিদ্ধই আছে। অর্থাৎ অভিনিবেশ ক্লেশ জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়ের পক্ষেই তুল্য। এস্থলে জ্ঞানী শব্দে মাত্র পরোক্ষজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। যাঁহারা শাস্ত্র এবং গুরুমুখ হইতে আত্মার নিত্যত্ববিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়া তদ্‌বিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, এইরূপ যে জ্ঞানী, তাঁহাদেরও মৃত্যুভয় থাকে। কিন্তু যাঁহারা অপরোক্ষজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ অর্থাৎ যাঁহারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মৃত্যুভয় থাকিতেই পারে না; যেহেতু, তাঁহারা আত্মা ব্যতীত, মরণনামক কোন কিছুর অস্তিত্বই খুঁজিয়া পান না। বিভূতিপাদে অপরান্ত-জ্ঞানবিষয়ক সূত্রে ইহা বিস্তৃতভাবে পাওয়া যাইবে।

সাধক! দেখিতে পাইতেছ—এই অভিনিবেশ মানুষকে কত ভীত ও সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে! প্রাণ খুলিয়া কোন কিছু ভোগ করিবার সাধ্য নাই, স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার উপায় নাই, প্রতিপদক্ষেপেই ঐ মৃত্যুভয় আসিয়া বাধা জন্মায়, ইহাই ক্লেশ। কিন্তু আর একদিক দিয়া দেখ—অবিদ্যা জননীর এই সন্তানটীও অন্যান্য সন্তানের ন্যায়ই আমাদের কত মঙ্গল সাধন করিতেছে। জীবের উদ্দাম গতিকে সংযত করিয়া অনন্ত বাসনার প্রবাহকে নিরুদ্ধ করিয়া দিনের পর দিন, জন্মের পর জন্ম কেবল মুক্তির দিকেই আকর্ষণ করিতেছে ঐ অভিনিবেশ বা মৃত্যুভয়। দেখ, ঐ অবিদ্যা মা-ই অভিনিবেশরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া আমাদের অন্তরে

দৃঢ়মূল প্রবিষ্ট হইয়া কল্যাণদায়িনী জননীর মতই আমাদিগকে মুক্তিমন্দিরে লইয়া যাইবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন। একবার কল্পনা দৃষ্টিতে এই বিশ্ব হইতে মৃত্যুভয়কে অপসারিত করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে— ইহা জীবের কি অপরিসীম কল্যাণ সাধন করিতেছে। এইরূপে মায়ের আমার যে পাঁচটী মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম, উহারা সকলেই একদিকে ক্লেশ অন্যদিকে মঙ্গল লইয়াই প্রতিনিয়ত আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে। দেখ—মা আমার একদিকে খড়গ-মুণ্ডধরা কালী, অন্যদিকে বরাভয়করা শ্যামা। একটা আশঙ্কা স্বতই উদিত হইবে যে, অবিদ্যা যদি মাই হয়, তবে ঋষি ইহাকে ক্লেশ আখ্যা দিলেন কেন? কেবল অবিদ্যা নহে, অস্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ, এগুলিও যোগশাস্ত্রে ক্লেশ নামে পরিচিত হইল কেন? ইহার প্রথম উত্তর এই যে, ইহাদিগের ক্লেশরূপতা সাধারণ মানবের অনুভব যোগ্যই হয় না। যাঁহারা নির্ম্মল নিস্তরঙ্গ পরমানন্দময় আত্মসত্তার সন্ধান পাইয়াছেন, যাঁহারা যোগস্বরূপের সন্ধান পাইয়াছেন, মাত্র তাঁহারাই অবিদ্যা প্রভৃতির ক্লেশদায়কত্ব অনুভব করিতে পারেন। অপরিচ্ছিন্ন আনন্দের সন্ধান পাইলে, তবে ত পরিচ্ছিন্নতার দুঃখ অনুভূত হইতে পারে! মিলনানন্দ ভোগ করিলে, তবে ত বিরহের জ্বালা অনুভব হয়! আর মিলনের পরের যে বিরহ, তাহা যাতনাদায়ক হইলেও, তাহার মধ্যে একটা অব্যক্ত তৃপ্তি আছে। প্রিয় সাধক! তুমি যদি এই অবিদ্যা প্রভৃতির ক্লেশ-স্বরূপতা সত্যসত্যই অনুভব করিয়া থাক, তবে ত তোমার জীবন ধন্য হইয়া উঠিতেছে, কারণ অচিরকাল মধ্যেই তুমি এই ক্লেশের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবে। আর যদি এখনও অবিদ্যা মা আমার তোমার নিকট ক্লেশরূপিণী মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ না করিয়া থাকেন, তবে কাতরপ্রাণে প্রার্থনা কর। মা কৃপা করিয়া তোমাকে একবার ক্লেশ কর্ম্মাদির অতীত আনন্দমাত্র স্বরূপে অবস্থানের সুযোগ প্রদান করিলে, তারপর বুঝিতে পারিবে মায়ের ক্লেশস্বরূপ মুর্ত্তিটী

কেমন। তৎপূর্ব্বে তোমরা যতই ক্লেশ বলিয়া চিৎকার করনা কেন, উহা প্রকৃত ক্লেশ নহে বাক্যমাত্র, অথবা সংসার পীড়নের যাতনা মাত্র, অভাব অভিযোগের উৎপীড়ন মাত্র। প্রকৃত ক্লেশ আত্ম-স্বরূপের সন্ধান পাইবার পূর্ব্বে আসিতেই পারে না। সে যাহা হউক, ঋষি অবিদ্যাদির ক্লেশরূপত্ব বর্ণনা করিয়া তোমাকে উহার স্বরূপ বুঝাইতেই চেষ্টা করিয়াছেন।

আচ্ছা, আর একদিক্ দিয়া পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার উত্তর দেওয়া যাইতেছে:—সত্য সত্যই যতদিন অবিদ্যাকে জননী বলিয়া বুঝিতে না পারিবে, সত্যসত্যই যতদিন বৃত্তিগুলিকে দ্রষ্টার বিশিষ্ট প্রকাশরূপে ধরিতে না পারিবে, ততদিন ঐ অবিদ্যা, অস্মিতা প্রভৃতি ক্লেশস্বরূপ নিয়াই তোমার নিকট উপস্থিত হইবে। তোমার নিকট যতদিন বিজাতীয় ভেদ লইয়া বৃত্তিসমূহের আবির্ভাব হইবে, ততদিন উহাদের ক্লেশদায়কত্বই প্রতিভাত হইবে। তোমার দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত কর, স্বগতভেদ দর্শন কর, দ্রষ্টারই বৃত্তিসারূপ্য দর্শন কর, অচিরকাল মধ্যে উহাদের ক্লেশস্বরূপতা বিদূরিত হইয়া যাইবে। সত্যসত্যই যদি জীবনকে সুখময় করিতে চাও, সত্যসত্যই যদি অবিদ্যা মায়ের ক্লেশদায়িনী মূর্ত্তির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাও, তবে সর্ব্বভাবে সর্ব্ব বস্তুতে কেবল মাকেই দেখ। এইরূপ দর্শনের ফলেই তুমি ক্লেশ কর্ম্মাদি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে। ঐ ক্লেশরূপিণী মা-ই তোমাকে ক্লেশের অতীত অবস্থায় লইয়া যাইবেন।

ते प्रतिप्रसव-हेया सूक्ष्माः ॥ १० ॥

अथ द्वाभ्यामेषां हानोपायं दर्शयति त इति। ते पञ्च क्लेशाः सूक्ष्मा बीजभावापन्ना वासनारूपा इति यावत्। प्रतिप्रसवहेयाः

প্রতিপ্রসবেন দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবস্থান প্রযত্নরূপাভ্যাসবলেনাসত্তানিশ্চয়রূপেণ হৈয়া, হানব্যা সূক্ষ্মাখ্যাঃ। জ্ঞানোদয়ং বিনা অজ্ঞানং নহি প্রসবাস্তু বীজীভূতা ন নশ্যন্তি ইতি॥ ১০॥

এই দশম এবং পরবর্ত্তী একাদশ এই দুইটী সূত্রে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চক্লেশের হানোপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম ও ব্যক্ত ভেদে ক্লেশের অবস্থা দুই প্রকার। এই সূত্রে ক্লেশের সূক্ষ্মাবস্থার এবং পরসূত্রে ব্যক্ত অবস্থার হানোপায় বলা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—প্রতিপ্রসবের দ্বারা সেই ক্লেশ সমূহের সূক্ষ্মভাব হেয় হয়। অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চক্লেশের যে বীজভাবাপন্ন অবস্থা, অব্যক্ত অবস্থা, সাধারণ কথায় যাহাকে বাসনা বলা হয়, তাহা প্রতিপ্রসবের দ্বারা বিনষ্ট হয়। প্রতিপ্রসব কি? অসত্তা জ্ঞান। ক্লেশের সত্তাই নাই, এই জ্ঞানই সূক্ষ্ম ক্লেশ বিনাশের একমাত্র অব্যর্থ উপায়। দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান-বিষয়ক প্রযত্নের প্রভাবে একমাত্র দ্রষ্টারই সত্তা নিশ্চয় হইয়া যায়। "চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুরই সত্তা নাই, থাকিতে পারে না," এইরূপ প্রজ্ঞা যত সুদৃঢ় হইতে থাকে, ততই চৈতন্য ব্যতীত বস্তুর সত্তাবিষয়ক জ্ঞান বিলয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপ যে অসত্তানিশ্চয় অর্থাৎ অনাত্মবস্তু কিছু নাই, এইরূপ যে দৃঢ় জ্ঞান, ইহারই নাম প্রতিপ্রসব। ইহাই সূক্ষ্ম ক্লেশ নিবারণের পক্ষে একমাত্র প্রতীকার। জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুতেই অবিদ্যার বিনাশ হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানই অজ্ঞানের প্রতিপ্রসব। অজ্ঞান দূর হইলে অবিদ্যার যে চারিটী সন্তানের বিষয় ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহারা সুতরাংই বিনষ্ট হইয়া যায়। অবিদ্যা বলিতে পৃথক কিছু নাই, সকলই বিদ্যা সকলই আত্মা, এইরূপ সুদৃঢ় জ্ঞানই অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশের হানোপায়। সাধক! যদি তুমি অবিদ্যার ক্লেশদায়িনী মূর্ত্তি দেখিবার সৌভাগ্য

লাভ করিয়া থাক, তবে শুধু দেখ—উহা বাস্তবিক নাই, উহার বাস্তবিক কোন সত্তাই নাই, সত্তা একমাত্র আত্মারই। ইহাই একমাত্র প্রতীকার। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা দ্বারা অবিদ্যার সূক্ষ্ম অবস্থা কখনও দূরীভূত হইবে না।

ध्यानहेयास्तद् वृत्तयः ॥ ११ ॥

तद्वृत्तयः तेषां क्लेशानां या वृत्तयः स्थूलरूपाः शोक मोहादि रूपेणाविर्भावास्ताध्यानहेया ध्यानेन प्रत्ययैकताननतया द्रष्टुः सारूप्य दर्शनेन हेया स्त्याज्याः एवञ्च वीजकार्य्यरूपाणां सूक्ष्म स्थूलानां पञ्चक्लेशानामीश्वर-प्रणिधान-फलकेन क्रियायोगेन क्षीणीकृताना-मभ्यासवलेनैवातितीव्रेन निरोध स्ततोऽसम्प्रज्ञात-योगोदयेन समूलं निवृत्तिरिति ॥ ११ ॥

ঋষি বলিলেন,—সেই ক্লেশ সমূহের যে বৃত্তি অর্থাৎ স্থূলরূপে আবির্ভাব, যাহা শোক মোহাদিরূপে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হয়, সেইগুলি ধ্যানের দ্বারা হেয় হইয়া থাকে। ধ্যান কি—প্রত্যয়ের একতানতারূপে দ্রষ্টার যে সারূপ্য দর্শন, তাহাকেই এস্থলে ধ্যান বলা হইয়াছে। বৃত্তিসমূহ যে দ্রষ্টারই সারূপ্য মাত্র, ইহা পুনঃ পুনঃ দর্শন করিলে, বৃত্তিসমূহের ক্লেশদায়কত্ব বিদূরিত হইয়া যায়। এইরূপেই ধ্যানের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ক্লেশ সমূহের স্থূলরূপের অর্থাৎ বৃত্তি সমূহের বিনাশ হয়। এই দুইটী সূত্রের স্থূল মর্ম্ম এই যে, বীজ ও কার্য্যরূপে অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত যে অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চ ক্লেশ, তাহারা ঈশ্বর প্রণিধানাত্মক ক্রিয়াযোগের দ্বারা ক্ষীণীকৃত

হইয়া অতিতীব্র অভ্যাসবলে নিরুদ্ধ হইয়া যায়। অতঃপর অসম্প্রজ্ঞাত যোগের উদয় হইলে উহাদের সমূলে নিবৃত্তি হইয়া থাকে। স্বগত ভেদের দর্শন হইলেই বিজাতীয় প্রত্যয়রূপ ক্লেশসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়।

क्लेशमूलः कर्म्माशयो दृष्टादृष्ट-जन्मवेदनीयः ॥ १२ ॥

का नोहानिः क्लेशानामहान इत्याह क्लेशेति। क्लेशाः प्रागुक्ताः मूलं यस्य स तथाभूतः कर्म्माशयः कर्म्मणां त्यागग्रहणात्मकानामाशय आशेरते जीवा अस्मिन्निति आशयो धर्म्माधर्म्मरूपो बीजाधार उत्पद्यत इत्यर्थः। अस्त्वेवं किन्तेनेत्याह दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयो दृष्टे जन्मनि अस्मिन्नेव जन्मनि वेदनीयोऽनुभवनीय स्तथाऽदृष्टेऽपि जन्मनि वेदनीयो जन्मान्तरानुभवनीय इत्यर्थः। क्रममुक्तिमार्गगतानां स्थूलजन्माभावेऽपि तत्र तत्र देवादिलोके गतिरेवादृष्टजन्मेति तत्रैव वेदनीयः कर्म्माशयो न तु कदापि निष्फल उक्तञ्चावश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म्म शुभाशुभमिति ॥ १২ ॥

ক্লেশ সমূহের হান না হইলে কি হানি হয়, তাহাই এই দ্বাদশ সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। সমূলে যদি ক্লেশ সমূহের হান না হয়, তবে ঐ ক্লেশসমূহ মূলে থাকিয়া কর্ম্মাশয় গঠিত করে। কর্ম্মের অর্থাৎ ত্যাগ গ্রহণাত্মক ব্যাপার সমূহের যাহা আশয়, তাহাকে কর্ম্মাশয় বলে। জীব সমূহ ইহাতে সম্যক্‌রূপে শয়ন করে অর্থাৎ অবস্থান করে; তাই ইহার নাম আশয়। এক কথায় আশয় শব্দে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বীজাধার বুঝায়। জীবমাত্রেই এই ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বীজাধারে অবস্থান করে। ক্লেশ হইতে কর্ম্ম হয়, কর্ম্ম হইতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মরূপ কর্ম্মের বীজ সঞ্চিত হয়। আবার সেই বীজ হইতে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়,

কর্ম্ম হইতে পুনরায় বীজ সঞ্চিত হয়। এইরূপে অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশ মূলে থাকিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে কর্ম্মাশয় রচনা করে। জীব অনাদিকাল হইতে এই আশয়ে অবস্থান করিতেছে।

কর্ম্মাশয় যে আছে, তাহা কিরূপে জানা যায়? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্যই সূত্রে "দৃষ্টাদৃষ্ট জন্ম বেদনীয়" এই পদটীর প্রয়োগ হইয়াছে। দৃষ্টজন্মবেদনীয় অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্মেই অনুভবনীয়। অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অর্থাৎ জন্মান্তরে অনুভবনীয়। প্রথমে দৃষ্ট জন্ম বেদনীয় বলা হইতেছে। কর্ম্মাশয় যে আছে, তাহা প্রত্যেক জীবের বর্ত্তমান জীবন পর্য্যালোচনা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। জীব সমূহ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কত আশা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছে, কত সৎ অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে, কত ধর্ম্ম বা অধর্ম্মরূপ কর্ম্মবীজ সঞ্চয় করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহা দেখিয়া বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, এই সকলের মূলে এমন একটা কারণ আছে, যাহা আছে বলিয়াই এইরূপ কর্ম্মের পর কর্ম্ম বাসনার পর বাসনা আশার পর আশা ফুটিয়া উঠিতেছে। সেই যে কারণ সেই যে আধার, যাহা হইতে এ সকলের বিকাশ, তাহারই নাম কর্ম্মাশয়। সুতরাং কর্ম্মাশয় নাই, ইহা কোনমতেই বলা যায় না। বর্ত্তমান জীবনের কর্ম্মগুলি দেখিলে—প্রত্যেক মনোবৃত্তির ইন্দ্রিয়বৃত্তির দিকে লক্ষ্য করিলে ইহাদের আবির্ভাব স্থান বা মূল স্বীকার করিতেই হয়। আবার কেবল বর্ত্তমান জন্মেই নহে, জন্মান্তরেও ঐরূপ কর্ম্মসমূহের বিকাশ হইয়া থাকে, সুতরাং অদৃষ্ট জন্মেও ঐ কর্ম্মাশয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। দৃষ্ট জন্মের কর্ম্ম এবং বাসনা সমূহের বৈচিত্র্য দর্শন করিয়াই অদৃষ্ট জন্ম নিরূপিত হইয়া থাকে। যাহারা অধ্যাত্মজগতে এখনও শিশু, তাহারাই জন্মান্তর স্বীকার করিতে বা জন্মান্তরের অস্তিত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। এ বিষয়ে ভারতভূমি জগতের শীর্ষ স্থানীয়। এ দেশের নিতান্ত অশিক্ষিত কৃষক পুত্রও জন্মান্তরে বিশ্বাসবান্। এতদ্দেশীয় জনগণের

মধ্যে যাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে জন্মান্তরের অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয় করে বা কুতর্ক করে, তাহারাও অন্তরে অন্তরে জন্মান্তর স্বীকার করে এবং অনুভব করে। দৃষ্ট জন্মের মতই অদৃষ্ট জন্ম বিদ্যমান রহিয়াছে সুতরাং ইহজীবনের বা জন্মান্তরের কর্ম্ম ও বাসনা দ্বারাই "কর্ম্মাশয়" স্বীকৃত হইয়া থাকে। প্রত্যেক মানুষই ধীরভাবে তাঁহার নিজ নিজ চিন্তা ভাব বৃত্তি কার্য্য ও তাহার ফলগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারেন—ঐ সকল যেন অজ্ঞেয় ক্ষেত্র হইতে বেশ সুনির্দ্দিষ্ট ভাবেই ফুটিয়া উঠিতেছে ও মিলাইয়া যাইতেছে। সেই যে অব্যক্ত স্থান তাহারই নাম কর্ম্মাশয়।

একটা কথা জিজ্ঞাসা হইতে পারে—যাঁহারা ক্রম মুক্তির পথে চলিয়াছেন অর্থাৎ বিদেহভাব বা প্রকৃতিলয় প্রাপ্ত হইয়া দেবযান মার্গে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের কর্ম্মাশয় থাকে কিনা। হ্যাঁ থাকে, মুক্তি বা কৈবল্যপদ প্রাপ্তির পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্তই কর্ম্মাশয় থাকে। তবে সে কর্ম্মাশয় সাধারণ জীবের কর্ম্মাশয় অপেক্ষা সমধিক ক্ষীণতা প্রাপ্ত এবং শুদ্ধসত্ত্বগুণাত্মক। যত ক্ষীণই হউক এবং যত জ্ঞানময়ই হউক, কিছু থাকে, সেই কর্ম্মাশয়টুকুই দেবযান মার্গস্থ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ ভোগের হেতু হইয়া সেখানেও অদৃষ্টজন্মবেদনায় কথাটার সার্থকতা সম্পাদন করে।

सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ १३ ॥

प्रागुक्तमेव प्रपञ्चयति सतीति। सति—सत्तावच्छिन्नता स्थाने विद्यमाने इत्यर्थः। मूले—क्लेशरूपे अविद्यामात्ररूपे वा। तद्विपाकस्तस्य परिणामो भवत्येव। कीदृशः स इत्याह—जात्यायुर्भोगाः, जाति-

मनुष्यत्वादि तत्रापि ब्राह्मणत्वान्त्यजत्वादि, आयुर्जीवनकालः स्वल्पो दीर्घो वा, भोगा विषयेन्द्रिय-संस्पर्शरूपाः ॥ १३ ॥

এই সূত্রে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মাশয়ের কথাই বিশেষরূপে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—মূলের সত্তাবিষয়ক জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলে, তাহার পরিণামস্বরূপ জাতি আয়ু এবং ভোগ হইবেই। মূল শব্দে যদিও পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশকেই বুঝায়, তথাপি কেবল অবিদ্যাকেই মূল বলিলেও কোন ক্ষতি হয় না; কারণ অস্মিতা প্রভৃতি অবিদ্যারই সন্তানমাত্র। সূত্রে উক্ত হইয়াছে—"সতি মূলে", ইহার সাধারণ অর্থ-"মূল থাকিলে"। এই "মূল থাকিলে" কথাটীর তাৎপর্য্য এই যে, "মূল আছে" এইরূপ জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলে। মূল—অবিদ্যা, আত্মস্বরূপবিষয়ক-অজ্ঞান। যতদিন আত্মস্বরূপ প্রকাশিত না হয়, অর্থাৎ দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান না হয়, ততদিন অবিদ্যা আছেই। এই যে অবিদ্যার অস্তিত্বপ্রতীতি, ইহাই মূল। এই মূল হইতেই পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মাশয় গঠিত হয় এবং তাহারই বিপাক বা পরিণামস্বরূপ জাতি আয়ু এবং ভোগসমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে। জাতি—মনুষ্যত্বাদি, তন্মধ্যে আবার ব্রাহ্মণত্ব অন্ত্যজত্ব প্রভৃতি। আয়ুঃ—জীবনকাল, স্বল্প অথবা দীর্ঘ, ভোগ—বিষয়েন্দ্রিয় সংস্পর্শ। এই যে তিনটী, ইহারাই কর্ম্মাশয়ের বাহ্যপ্রকাশ, অর্থাৎ যতদিন এই জাতি আয়ুঃ ও ভোগ আছে, ততদিনই বুঝিতে হইবে—ইহাদের মূলস্বরূপ কর্ম্মাশয় বিদ্যমান আছে।

এস্থলে জাত্যায়ুর ভোগ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ জাতি, ইহা একপ্রকার সংস্কারবিশেষ, জন্ম হইতেই এই সংস্কার আত্মপ্রকাশ করে। আত্মার জাতি নাই, জড় দেহেরও জাতি নাই, কিন্তু দেহাত্মবোধবিশিষ্ট জীবের জাতি সংস্কার অত্যন্ত স্ফুটরূপে

বিদ্যমান। এই জাতি সংস্কার হইতেই, স্থূল শরীর আরব্ধ হয়, সেইজন্য ইহাকে শরীর-আরম্ভক সূক্ষ্ম সংস্কার বলা হয়। জন্ ধাতু হইতে জাতি শব্দ নিষ্পন্ন, জন্মই জাতির পরিচায়ক। যে জাতীয় পিতা মাতা হইতে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে সন্তান সেই জাতীয় হয়, অর্থাৎ উক্ত সন্তানের কর্ম্মাশয় হইতে যেরূপ জাতির বিকাশ হওয়া উচিত, ঠিক সেইরূপ জাতীয় পিতামাতার সন্তানরূপেই তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। জন্মান্তরীয় গুণকর্ম্মই মানুষের বর্ত্তমান জাতির প্রতি কারণ।

যাঁহারা বলেন—সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় মনুষ্যদিগের মধ্যে কোনরূপ জাতিভেদ ছিল না, পরে গুণকর্ম্মবিভাগ অনুসারে মনুষ্যকর্ত্তৃকই ইহা পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাদের সহিত আমরা কিছুতেই একমত হইতে পারি না। আমরা জানি—জাতি নিত্যপদার্থ, ন্যায়শাস্ত্র জাতির লক্ষণ বলিয়াছেন—যাহা নিত্য অথচ অনেকে সমবেত তাহাই জাতি। এই জগৎ যেরূপ প্রবাহরূপে নিত্য, মনুষ্যদিগের মধ্যে জাতিভেদও ঠিক সেইরূপই নিত্য; সুতরাং ইহা মনুষ্যদিগের পরিকল্পিত নহে। গীতা এবং বেদাদিশাস্ত্রে জাতিভেদ পরমেশ্বরকর্ত্তৃকই পরিকল্পিত হইয়াছে, এইরূপ বহু উক্তি আছে। জাতি ও বর্ণ একার্থবোধক নহে। জাতি স্থূল-শরীরারম্ভক সংস্কার, আর বর্ণ সূক্ষ্মশরীরারম্ভক সংস্কার। একই জাতিতে বিভিন্ন বর্ণ থাকিতে পারে। একই ব্রাহ্মণজাতিতে ব্রাহ্মণাদি চতুরবর্ণই থাকিতে পারে। আবার একই শূদ্রজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় বিদ্যমান থাকিতে পারে। গুণকর্ম্ম সমূহের সাধারণ উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতায় অর্থাৎ সূক্ষশরীরগত সাধারণ পরিবর্ত্তনে জাতির কখনও পরিবর্ত্তন হয় না। জন্মকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থূলশরীরনিষ্ঠ জাতিনামক পদার্থ সমভাবেই বিদ্যমান থাকে। উৎকট তপস্যার প্রভাবে এবং পারিপার্শ্বিক অনুকূল অবস্থার তীব্র সহায়তায় বর্ত্তমান জীবনেই অন্য জাতি প্রাপ্তি হইতে পারে। এ বিষয় চতুর্থ পাদে সূত্রকার নিজেই জাত্যন্তর পরিণাম

বিষয়ক স্পষ্ট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। যতদিন সূক্ষ্ম দেহের অর্থাৎ বর্ণ নামক সংস্কারের সম্যক্ পরিবর্ত্তন সাধিত না হয়, ততদিন জাতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা একান্তই অস্বাভাবিক। জাতি ও বর্ণের এই সূক্ষ্ম রহস্য নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া নানারূপ প্রতিকূল মতবাদিগণ মধ্যে মধ্যে সনাতন হিন্দু সমাজের নানারূপ বিপ্লব উপস্থিত করেন; কিন্তু যিনি শাশ্বতধর্ম্ম-গোপ্তা, যিনি ব্রহ্মণ্যদেব, যিনি লোকস্থিতি রক্ষার্থ সেতুরূপে অবস্থিত, তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব উপায়ে সনাতনধর্ম্ম ও সমাজকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মানুষমাত্রকেই এই জাতিসংস্কাররূপ বন্ধন অর্থাৎ ক্লেশকে অবনত শিরে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। যাঁহারা মুক্তি-কামী পুরুষ, যাঁহারা সমাজ-শৃঙ্খলার ঊর্দ্ধে অবস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উক্ত জাতি সংস্কারের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য একমাত্র আত্মারই শরণাগত হয়েন। আত্মস্থ হইয়া থাকিতে পারিলে আর দেহাত্মবোধজন্য জাতিসংস্কাররূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যতদিন দেহ আছে, ততদিন ব্যুত্থিত অবস্থায় জাতি প্রতীতি থাকিবেই।

দ্বিতীয়, আয়ুঃ। আয়ুঃ শব্দের অর্থ জীবনকাল, প্রারব্ধ কর্ম্মগুলির ভোগ পরিসমাপ্ত করিতে যতটা সময়ের আবশ্যক, সেই পরিমাণ সময়কে আয়ুঃ বলা হয়। কর্ম্মাশয়গত কর্ম্মবীজ সমূহের অল্পত্ব বা বহুত্ব অনুসারে এই আয়ুর পরিমাণ স্বল্প বা দীর্ঘ হইয়া থাকে।

তৃতীয় ভোগ। ভোগ শব্দের অর্থ বিষয়েন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের সহিত প্রতিনিয়ত যে স্থূল বা সূক্ষ্মবিষয় সমূহের প্রতিনিয়ত সংযোগ সঙ্ঘটিত হইতেছে, ইহারই নাম ভোগ। এই জাতি, আয়ু ও ভোগ, ইহা কর্ম্মাশয়েরই পরিণাম বা বাহ্যবিকাশ মাত্র। যতদিন কর্ম্মাশয় আছে অর্থাৎ কর্ম্মাশয়ের সত্তা বিষয়কবোধ বিদ্যমান আছে, ততদিন কিছুতেই এই জাত্যায়ুঃ ভোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। তাই ঋষি বলিলেন—

"সতি মূলে তদ্বিপাকঃ"। যদিও আত্মজ্ঞান লাভের পর বিদেহ-কৈবল্য লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মাশয় এবং তৎফল জাত্যায়ুঃ ভোগের বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হয়, তথাপি তত্ত্বদর্শিপুরুষগণের নিকট উহা কখন সত্তাবৎ বস্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হয় না, এবিষয় অনেক আলোচনা ইতিপূর্ব্বে হইয়াছে, পরেও উপযুক্ত অবসরে আলোচিত হইবে।

প্রিয় সাধক! যতদিন আমরা অবিদ্যাকে মা না বলিয়া আত্মা না বলিয়া ব্রহ্ম না বলিয়া অন্য কিছু হেয় বস্তুরূপে দর্শন করিব বা বুঝিব, ততদিন ঐ অবিদ্যাই কর্ম্মাশয়রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া জাতি আয়ু ও ভোগরূপ ফলপ্রদান করিবে। কিন্তু গুরুকৃপায় ঋষিকৃপায় আমরা শিখিয়াছি, বুঝিয়াছি—অবিদ্যা আমাদের মা। যিনি আত্মা, তিনিই অবিদ্যারূপে প্রকাশিত হইয়া বৃত্তিসারূপ্য লইয়া এই বিশ্বলীলা সম্পাদন করিতেছেন; সুতরাং আমাদের কর্ম্মাশয় যেরূপ জাতি যেরূপ আয়ু এবং যেরূপ ভোগই প্রদান করুক না কেন, আমরা সর্ব্বভাবের মধ্য দিয়া একমাত্র সত্তা ও প্রকাশস্বরূপ আত্মাকেই দেখিব, এবং তাহারই ফলে উক্ত ত্রিবিধ ফলদায়ক কর্ম্মাশয়ের হাত হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিব।

ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्य-हेतुत्वात् ॥ १४ ॥

विपाकस्य वैविध्यं दर्शयति त इति। ते जात्यायुर्भोगाः ह्लादपरितापफलाः, ह्लादो मनसः प्रीतिरूपः, परितापो मनसः सन्तापरूपः, तौ फलं येषां ते तथोक्ताः। कुत एवमित्याह पुण्यापुण्य-हेतुत्वात्, पुण्यं पवित्रकारकं ज्ञानविकाशसहायकत्वात्, अपुण्यं तद्विपरीतं,

ज्ञानावरकत्वात्। ते पुण्यापुण्ये हेतू कारणे येषां ते, तेषां भाव स्तस्मादिति। पुण्य-कर्म्मारम्भा जात्यायुर्भोगाः ह्लादफलाः, अपुण्यकर्म्मा-रम्भास्तु परितापफला इति निष्कर्षः।

জাত্যায়ুর্ভোগরূপ বিপাক দ্বিবিধ। হ্লাদফলক এবং পরিতাপ-ফলক। পুণ্য এবং অপুণ্যরূপ দুইপ্রকার হেতুবশতই ফলেরও এই দুই প্রকার ভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে বিপাক অর্থাৎ জাত্যায়ুর্ভোগ পুণ্যকর্ম্মারব্ধক, তাহা মানুষকে সুখী করে; তাই উহাকে হ্লাদফলক বলা হয়। আর যে বিপাক অপুণ্যকর্ম্মারব্ধক তাহা মানুষকে দুঃখময় করিয়া থাকে, তাই তাহা পরিতাপফলক। এস্থলে পুণ্যাপুণ্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা অসঙ্গত হইবে না। পূ ধাতুর অর্থ পবিত্র করা। যাহা মানুষকে পবিত্র করে তাহাই পুণ্য। পবিত্র শব্দে একমাত্র জ্ঞানকেই বুঝায়। "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে" একথা ভগবান্ নিজেও বলিয়াছেন। অতএব যেরূপ কার্য্য বা চিন্তার ফলে মানুষ আত্মজ্ঞান লাভের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, তাহাই পুণ্য। তাহার বিপরীত যাহা, তাহা অপুণ্য। যেরূপ কার্য্য বা চিন্তার ফলে মানুষের জ্ঞানলাভের পথ কিছু দিনের জন্য নিরুদ্ধ থাকে, তাহা অপুণ্য নামে কথিত হয়। এই তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বলা হয়—যাহাতে প্রাণের প্রসার হয় তাহা পুণ্য, এবং যাহাতে প্রাণের সঙ্কোচ হয়, তাহা পাপ। দেশভেদে সম্প্রদায়ভেদে আচারভেদে এই পাপ-পুণ্যবিষয়ক যে বিভিন্নরূপ সংস্কার পরিদৃষ্ট হয়, তাহা ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধেই প্রযুজ্য; কিন্তু অধ্যাত্মজগতে যাহা পুণ্য—যাহা সত্য অহিংসা, অস্তেয় প্রভৃতি তাহা সকল দেশে সকল কালেই পুণ্যরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। আবার অসত্য হিংসা স্তেয় প্রভৃতি সকল কালে সকলদেশেই পাপরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

এই অসত্য হিংসা স্তেয় প্রভৃতি যত রকমের পাপ, তাহা বিজাতীয় ভেদজ্ঞান হইতেই সঞ্জাত হয়। যে যতটুকু স্বগত-ভেদের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, জগৎকে আত্মীয়রূপে—স্রষ্টারই বৃত্তিসারূপ্যরূপে দর্শন করিবার পথে যে যতটুকু অগ্রসর হইতে পারে, সে তত বেশী পুণ্যবান্ হইবেই। যেহেতু, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত অসত্য প্রভৃতি পাপবিকাশের অবসরই থাকে না। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"আত্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্ম-হত্যা ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি করিলেও পাপ হয় না।" কথাটা শুনিতে অযৌক্তিক মনে হইতে পারে, বাস্তবিক তাহা নহে। প্রথম কথা ঐরূপ পাপ জ্ঞানিপুরুষদিগের পক্ষে একান্তই অসম্ভব; কারণ চিত্ত শুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানলাভ হয় না। অপুণ্য প্রবৃত্তি থাকিতে চিত্ত শুদ্ধ হইতেই পারে না। সুতরাং জ্ঞানী কখনও পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেই পারে না। তবে যদি প্রবল প্রতিকূল প্রাক্তন কর্ম্ম বশে লোকবিরুদ্ধ কোন অপুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান কদাচিৎ কোন জ্ঞানিপুরুষকর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াও পড়ে, তবে তাহাতে তাঁহার কোনরূপ পাপস্পর্শ করিতেই পারেনা। জ্ঞানী পুরুষ সর্ব্বত্র আত্মদর্শী—স্বগত ভেদমাত্র অবলম্বন করিয়াই জ্ঞানীর ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। অতএব সর্ব্বত্র স্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্য দর্শনকারীর পক্ষে কোন কার্য্যই পাপজনক হইতে পারে না। যাহারা কর্ম্মসমূহকে করে অর্থাৎ অহংবোধে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই পাপ বা পুণ্যের অধিকারী হয়। আর যাঁহারা কখনও কর্ম্ম করে না, যাহাদের কর্ম্ম স্বতঃই অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহারা ঐ দ্বিবিধ সংস্কার হইতে অনেক উচ্চে অবস্থান করেন। পাপ ও পুণ্য চিত্তেরই সংস্কারবিশেষ, আর জ্ঞান তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, সুতরাং জ্ঞানে কখনও পাপ বা পুণ্য স্পর্শও করিতে পারে না।

সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত জাতি আয়ু এবং ভোগের মূলে যদি পুণ্য কর্ম্ম অর্থাৎ সুকৃতি থাকে; তবে উন্নত জাতি, দীর্ঘ-আয়ু এবং আনন্দময় ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর যদি অপুণ্য কর্ম্ম

থাকে, তবে নীচ জাতি, অল্প আয়ু এবং দুঃখময় ভোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। কর্ম্মাশয়ের পুণ্যাপুণ্যত্ব হেতুই ফলের এই বিলক্ষণতা লক্ষিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে কর্ম্মাশয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক। কর্ম্মাশয় কি ভাবে গঠিত হয়। এক জন্মকৃত যাবতীয় কর্ম্মসংস্কার হইতেই কি পরজন্মীয় কর্ম্মাশয় গঠিত হয়, অথবা বহুজন্মসঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কার লইয়া একটী কর্ম্মাশয় গঠিত হয়, এইরূপ প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে উদিত হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে "গহনা কর্ম্মণোগতিঃ" কর্ম্মের গতি অতি গহন। অসংখ্য জীব, অসংখ্য বাসনা এবং অসংখ্য প্রকারের বাসনা; সুতরাং কর্ম্মাশয় সম্বন্ধে একটা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা দুরূহ। জীবভেদে কর্ম্মাশয় বিভিন্ন বলিয়াই এইরূপ একটী সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায় না। তবে একটা সাধারণ নিয়ম আছে—যে কর্ম্মগুলির বেগ অতি তীব্র, যে কর্ম্মসংস্কারগুলি ফলোন্মুখী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা পুঞ্জীকৃত হইয়াই অব্যবহিত পরজন্মীয় কর্ম্মাশয় গঠিত হয়। পুষ্পবৃক্ষে অসংখ্য কোরক বিদ্যমান থাকিলেও সায়ংকালে কোরকগুলির অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়—আগামী কল্য প্রভাতে কোন কোরকগুলি পুষ্পরূপে পরিণত হইবে। সেইরূপ স্ফুটনোন্মুখ সংস্কার গুলিকে সজ্জীভূত করিয়া একত্র বিন্যস্ত করাই একটী কর্ম্মাশয় গঠন করা। তাহা যে কেবল একটী জন্মকৃত কর্ম্মবীজ হইতেই হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। হইতে পারে কদাচিৎ এক জন্মকৃত কর্ম্মবীজ হইতেও একটী কর্ম্মাশয় গঠিত হয়; কিন্তু সাধারণ নিয়ম তাহা নহে। বহু পূর্ব্ব জন্ম হইতে ফলোন্মুখী কর্ম্মবীজ গুলিকে একত্র সজ্জীভূত করিয়া একটী কর্ম্মাশয় গঠন করাই সাধারণ নিয়ম। অবশিষ্টগুলি সঞ্চিত থাকে। আবার উপযুক্ত অবসরে উপযুক্ত দেশকাল পাত্রের সমবায় ঘটিলে সেইগুলি হইতে কর্ম্মাশয় গঠিত হইয়া থাকে। আবার বর্ত্তমান কর্ম্মাশয় হইতে

যে জাত্যায়ুঃ ভোগরূপ কর্ম্মগুলি ফুটিয়া উঠে, সেইগুলি হইতেও ভবিষ্যৎ কর্ম্মাশয়ের বীজ সংগ্রহীত হয়। এইরূপে প্রারব্ধ সঞ্চিত এবং আগামী রূপ ত্রিবিধ কর্ম্মবীজই পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর হেতু হইয়া থাকে এবং উহা হইতেই বিভিন্ন রূপ কর্ম্মাশয় গঠিত হয়। আর যিনি এই কর্ম্মসমূহের শৃঙ্খলা বিধান করেন, কোনটীর পর কোনটী ফুটিবে—তাহা স্থির করিয়া দেন ও তদনুসারে পরিচালনা করেন, তিনি ঈশ্বর, তিনি মা, তিনি আরাধ্য, তিনিই অবিদ্যা। এই কর্ম্মাশয়ের গঠন ও উহাকে ফলোন্মুখী করণ প্রভৃতি কার্য্যের নিয়ন্তা একমাত্র ঈশ্বরই। যখন কোন মানুষ ভোগ ব্যতীত কর্ম্ম ফলের ক্ষয় করিবার জন্য লালায়িত হয়, অথবা স্বল্প ভোগেই কর্ম্ম বীজ ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহাতে সাধকের লক্ষণ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ সে মানুষ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভগবানের শরণাগত হইতে আরম্ভ করে। এবং এইরূপ শরণাগত ভাব হইতেই ক্রমে জ্ঞানের উদয় হয়—অসম্প্রজ্ঞাত যোগের সন্ধান পাওয়া যায়। তখন মানুষ যাবতীয় কর্ম্মসংস্কারের পরপারে চলিয়া যায়। কর্ম্মাশয়রূপ বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অদ্বয় বোধরূপ মুক্তির হিরণ্ময় মন্দিরে প্রবেশ করে এবং চিরকালের মত কর্ম্মাশয় ও তজ্জন্য বিভিন্ন জাতি, অল্পাধিক আয়ু এবং সুখ দুঃখ ভোগ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। ইহাই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা। এবং এইজন্যই সুদুর্ল্লভ মনুষ্য জীবন লাভ। কিন্তু এ সকল অন্য কথা।

परिणामतापसंस्कारदुःखै र्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्व्वं विवेकिनः ॥ १५ ॥

ह्लादफला अपि दुःखाय जात्यायुर्भोगाश्चतुर्णामित्याह परिणामेति। विवेकिनः सदसद्विचारनिपुणस्य सर्व्वं भाग्यजातं ह्लादफलकमपीतिभावः। दुखं दुःखदायकं नास्तिदुःखरहितं विषयसुखमित्यर्थः।

ফল এব মিথ্যা-পরিণাম-তাপ-সংস্কার-দুঃখৈ গুণবৃত্তি-বিরোধাচ্চ। দুঃখমিতি পরিণামাদীনাং প্রত্যেকেনৈবান্বয়স্তথাহি পরিণামদুঃখতা স্বর্গাদিনামপ্যস্তি কিমুতৈহিকসুখানাম্। তদুক্তম্—ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তীতি। ভোগমাত্রস্য পরিণামঃ পরিসমাপ্তিরস্তীতি ভোগকালেঽপি ভবিষ্যদ্বিনাশ-শঙ্কয়া সুখস্যাপি দুঃখরূপতা। এবং সুখভোগকালে দেহেন্দ্রিয়-মনঃসু উদ্বেলনাত্মকঃ সংক্ষোভোজায়ত ইতি তাপদুঃখতা। তথা “ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥” ইতি ভূয়োভোগতৃষ্ণাজনকত্বাৎ সংস্কার-দুঃখতা। ন কেবলমেতৈর্দুঃখৈঃ সর্ব্বমেব দুঃখমপিচ গুণবৃত্তি-বিরোধাৎ। গুণানাং সত্ত্বাদীনাং যা বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখমোহাত্মিকাস্তাসাং বিরোধাৎ পরস্পরাভিভাব্যাভিভাবক-ধর্ম্মাদিত্যর্থঃ তথাহি সত্ত্বগুণজন্য-সুখোদয়কালেঽপি রজস্তমসী তদভিভবিতুং প্রযতেতে এবমন্যত্রাপি বোধ্যম্। এতদ্ধি গুণবৃত্তিবিরোধদুঃখং যোগিনামেব প্রত্যক্ষং ভবতি॥ ১৫॥

পূর্ব্বসূত্রে হ্লাদফলক এবং পরিতাপফলক জাত্যায়ু ভোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা সাধারণ উপদেশ। এই সূত্রে কিছু বিশেষ উপদেশ আছে—যাহারা চক্ষুষ্মান্ বিবেকী তাহাদের নিকট হ্লাদফলক জাত্যায়ু ভোগও দুঃখময়রূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। ঋষি বলিলেন—পরিণাম দুঃখ, তাপ দুঃখ, সংস্কার দুঃখ এবং গুণবৃত্তির বিরোধিতা বশতঃ বিবেকীর নিকট সকলই দুঃখরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। “দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ” বাক্যটির আর একপ্রকার অর্থ হইতে পারে—সর্ব্বরূপে যাহা কিছু প্রতীতিগোচর হয়, তাহা বিবেকীর নিকট দুঃখই। যাহারা বিবেকী সদসৎ বিচারনিপুণ, তাহাদের নিকট দুঃখ ত দুঃখই, সুখও দুঃখ ব্যতীত অন্য কিছু নহে; যেহেতু সুখও পূর্ব্বোক্ত পরিণামাদি চতুর্বিধ দুঃখ দ্বারা সম্ভিন্নই থাকে।

প্রথম পরিণাম দুঃখ—ভবিষ্যৎ বিনাশের আশঙ্কাজনিত দুঃখ। ইহা স্বর্গভোগকালেও থাকে। যাহা স্বর্গ, যেখানে জরা নাই, মৃত্যু নাই, রোগ নাই, শোক নাই, অভাব নাই, অভিযোগ নাই, সেখানেও "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" এই আশঙ্কাটী সর্ব্বদাই হৃদয়ে জাগিয়া থাকে। সুদুর্ল্লভ স্বর্গসুখেরই যখন এইরূপ পরিণাম—দুঃখময়তা বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন পার্থিব সুখের নশ্বরতা বিষয়ে বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় তাপদুঃখ। সুখদায়ক ভোগ্যবিষয় সমূহের ভোগকালেও দেহেন্দ্রিয় মনে একপ্রকার উদ্বেলন বা সংক্ষোভ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির বা মনের যে প্রশান্তভাব তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং সুখের ভোগকালেও তাপদুঃখ বিদ্যমান থাকে। একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলেই এই তাপদুঃখতা সকলেই অনুভব করিতে পারে।

তৃতীয় সংস্কার দুঃখ। ভোগ্যবিষয় সমূহের পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতে করিতে তাদৃশ ভোগের সংস্কার উপচিত হইতে থাকে। কাম্যবিষয়ের বহুধা ভোগের দ্বারা কখনও কামনার নিবৃত্তি হয় না বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় উহা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ঐ ভোগ-তৃষ্ণাজনক সংস্কার হইতেই পুনঃ পুনঃ ভোগস্পৃহা বর্দ্ধিত হয়; সুতরাং সুখের ভোগকালেই পুনরায় ভোগের সংস্কার সঞ্চিত হওয়ার জন্য যে দুঃখ, তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। ইহারই নাম সংস্কার দুঃখ।

চতুর্থ গুণবৃত্তি বিরোধ। গুণ—সত্ত্ব রজঃ তমঃ। ইহাদের যে বৃত্তিবিরোধ অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিবার স্বাভাবিক প্রযত্ন, তাহা বিষয়ের ভোগকালেও বিদ্যমান থাকে। সত্ত্বগুণজন্য সুখের ভোগ কালেই রজস্তমোগুণ তাহাকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে, অর্থাৎ কোনভোগই বেশ পূর্ণভাবে বা সম্যক্‌ভাবে সম্পন্ন হইবার উপায় নাই। চিত্তের চাঞ্চল্যই সুখ-ভোগের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। যত বড় ভোগই হউক, যত

প্রিয়তম ভোগই হউক, চিত্ত চাঞ্চল্যই সে ভোগের পূর্ণতার বিরোধী রূপে সতত বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাই গুণবৃত্তি বিরোধ। এই সূক্ষ্মতম দুঃখ কেবল যোগিগণই অনুভব করিতে পারেন।

দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানই প্রকৃত সুখ বা প্রকৃত ভোগ, তদ্‌ব্যতীত আর যাহা কিছু তাহা বিক্ষেপাত্মক বলিয়াই দুঃখ। যতদিন কি সুখ কি দুঃখ, সকলই বিজাতীয় ভেদরূপে প্রতিভাত হয়, ততদিন উহা দুঃখদায়ক থাকিবেই; কিন্তু যখন উহাদের মধ্যে সমত্বকে দর্শন করা যায়, অর্থাৎ দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্যটী ফুটিয়া উঠে, তখন উহার দুঃখময়ত্ব বিদূরিত হইয়া যায়। অবশ্য স্বগতভেদরূপে এই প্রত্যক্ষ বিষয়সমূহকে ভোগ করিতে গেলেও কিঞ্চিৎ দুঃখের স্পর্শ থাকে, তাহা একমাত্র কৈবল্যপদবী আরোহণেই বিনষ্ট হয়। ফলতঃ এরূপ একটু দুঃখের সংস্রব জীবনকালে থাকে বলিয়াই সাধকগণের জীবন মধুময় হয়। পরম প্রেমাস্পদের সহিত ক্ষণে মিলন ক্ষণে বিরহ, ক্ষণে সুখ ক্ষণে দুঃখ, ক্ষণে যোগ ক্ষণে বিয়োগ, এইটী থাকে বলিয়াই বাহিরে ভক্তিরসের একটা মধুর অভিষেক থাকে। ইহা যে কেবল সাধকেরই রস পরিপুষ্ট করে তাহা নহে, তাহার বিশ্বস্ত সহচরগণকেও মধুময় করিয়া তোলে। যোগীদিগের মধ্যেও যাহারা ভক্তিমান, যাহারা এই মিলনবিরহরসের অধিকারী, তাহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী, একথা স্বয়ং ভগবান্‌ও গীতাশাস্ত্রে উপদেশ দিয়াছেন।

সাধক! দুঃখরূপে যাহা তোমার নিকট আসে, তাহাত দুঃখই, পরন্তু সুখরূপে ইষ্টবিষয়সমূহের সংযোগরূপে যে ভোগসমূহ উপস্থিত হয়, তাহাকেও যতদিন বিজাতীয় ভেদ দৃষ্টিতে দেখিবে, ততদিন উহার মধ্যেও পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ দুঃখ পূর্ণভাবেই উপস্থিত থাকিবে। তুমি যদি এই সুখ দুঃখের ধাঁধা হইতে, এই দ্বন্দ্বের হাত হইতে যথার্থ পরিত্রাণ পাইতে চাও, তবে সমত্বের সন্ধান কর। দেখ, কোন্ সমবস্তু সুখ ও দুঃখ উভয়ত্রই তুল্যরূপে বিদ্যমান। আর কিছু দেখিতে না পাও অবিদ্যা জননীকে দেখিতে পাইবেই। দেখ, মা-ই সুখরূপে

আসেন, আবার মা-ই দুঃখরূপেও আসেন। এইরূপ দর্শন যেদিন সত্য হইবে, সুদৃঢ় হইবে, সেইদিনই তুমি বশীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্য লাভ করিয়া যোগপথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

हेयं दुःखमनागतम् ॥ १६ ॥

दर्शितं दुःखमेव सर्व्वं, तत्र किं नाम हातुं योग्यमित्याह हेयमिति। अनागतमनुपस्थितं भविष्यदिति यावत्। दुःखं सुखदुःखोभयरूपं हेयं हातुं योग्यं भवतीति शेषः। प्रारब्धस्य भोगारम्भादतीतस्य च भोगेनातिवाहितत्वान्न हेयत्वं सम्भवतीति ॥ १६ ॥

সকলই দুঃখ, ইহা বুঝিতে পারিলেও "সকল" পরিত্যাগ করা ত একেবারেই অসম্ভব; তাই ঋষি বলিলেন—অনাগত দুঃখই হেয় অর্থাৎ পরিত্যাগ করিবার যোগ্য। অনাগত—অনুপস্থিত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ যে দুঃখ, তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলস্বরূপ যে দুঃখ, তাহার ভোগ ত আরম্ভ হইয়াই গিয়াছে, সুতরাং তাহার হেয়ত্ব সম্ভাবিত নহে। আর অতীত যে দুঃখ, তাহাও ভোগের দ্বারা অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহারও আর পুনরায় ভোগের আশঙ্কা নাই। অবশিষ্ট একমাত্র ভবিষ্যৎ দুঃখ, তাহা যাহাতে উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা আবশ্যক। দুঃখ শব্দে কিন্তু সুখ ও দুঃখ উভয়ই বুঝিতে হইবে। যাহা অতীত হইয়াছে তাহার অনুশোচনা করিবে না। বর্ত্তমানে যাহা ভোগ হইতেছে, তাহার আর প্রতীকার নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে সুখ দুঃখরূপ দ্বন্দ্বে নিপতিত হইতে না হয়, তাহারই প্রযত্ন একান্ত প্রয়োজন। ইহাই এই সূত্রের তাৎপর্য্য।

দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥

বিদিতে হি মূলে সমূল মুচ্ছেত্তুং শক্যত ইতি হেয়মূলং নিরূপয়তি দ্রষ্টেতি। দ্রষ্টা চিদ্রূপঃ পুরুষঃ, দৃশ্যং বুদ্ধিসত্ত্বং তত্রৈব হি পর্য্যবস্যন্তে বিষয়া ইতি। এতদুভয়ো র্যঃ সংযোগঃ সম্বন্ধজ্ঞানমজ্ঞানমিত্যর্থঃ। স হেয় হেতু হেয়স্যানাগতদুঃখস্য হেতুমূলং কারণমিতি যাবৎ। ইদমত্রাব-গন্তব্যং—ন চাস্তি দ্রষ্টুঃ স্বরূপে কিঞ্চিৎ দৃশ্যং ন বা তৎসংযোগঃ। তত্রাহু—যদা সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তদা কেন কিং পশ্যেদিতি। এবঞ্চ নাত্মানং জানামীত্যজ্ঞানমেব দৃশ্যানাং জনয়িতৃ সংযোজয়িতৃ চ। তেন হ্যনাত্মন্যাত্মখ্যাতি রূপায়া অবিদ্যায়া এব হেয়হেতুত্বং। তস্মাচ্চাবিদ্যৈব সর্ব্বানর্থমূলমিতি। ফলতস্তু নেয়ং তাবৎ পরিচীয়তে যাবৎ দ্রষ্টৃ-দৃশ্যসংযোগরূপেনাত্মানং পরিচায়তীতি হেয়হেতুঃ সংযোগ ইত্যুক্তং বস্তুতো স্ব তস্য হেতুরবিদ্যেতি ॥ ১৭ ॥

মূল বিদিত হইতে পারিলে সমূলে উচ্ছেদ করা যায়, এইজন্য এই সূত্রে হেয়মূল নিরূপিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের যে সংযোগ, তাহাই হেয়হেতু। পূর্ব্বে অনাগতদুঃখকেই হেয় বলা হইয়াছে, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগই সেই হেয়ের মূল। দ্রষ্টা—চিদ্রূপ পুরুষ, দৃশ্য—বুদ্ধিসত্ব; যাবতীয় দৃশ্য বুদ্ধিতেই পর্য্যবসিত হয়। এই উভয়ের যে সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞান, তাহাই হেয়মূল। বাস্তবিক পক্ষে ত শুদ্ধবোধ স্বরূপ দ্রষ্টার সহিত কখনও দৃশ্য সমূহের বা বুদ্ধিসত্ত্বের সংযোগ হয় না বা হইতে পারে না, অথচ ঐরূপ সংযোগ সম্বন্ধ প্রতীতিগোচর হয়, ইহাই অজ্ঞান। এই অজ্ঞানটীই হেয় দুঃখের মূল। সাধককে এই মূলের সহিত দুঃখের উচ্ছেদ করিতে হইবে, সেইজন্যই ঋষি এখানে দুঃখের মূল দেখাইয়া দিলেন।

দ্রষ্টার স্বরূপে দৃশ্য বলিতে কিছু নাই, অথবা দৃশ্যের সহিত সংযোগও নাই; কারণ তাহা "একমেবাদ্বিতীয়ং" স্বরূপ বস্তু। উপনিষদ্‌ও বলেন—যখন দৃশ্যসমূহ আত্মাই হইয়া যায় অর্থাৎ আত্মায় প্রলীন হইয়া যায়, তখন কাহাদ্বারা কি দর্শন করিবে; সুতরাং আত্মস্বরূপে দৃশ্য বা তৎসংযোগ থাকিতেই পারে না। তবে যে সংযোগ বলা হইল, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বাস্তবিক সংযোগ না থাকিলেও সংযোগের প্রতীতি হয়। এই যে প্রতীতি, ইহাই অজ্ঞান বা অবিদ্যা। এই অজ্ঞানই যাবতীয় দৃশ্যের জনক ও সংযোজক। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে। আমরা মুখে বলি—"আমার শরীর, আমার মন"। ইহাতে বেশ বুঝা যায়—যে শরীর ও মন হইতে "আমি" পৃথক্ বস্তু। কিন্তু শরীরে ও মনে রোগ ও দুর্ব্বাক্য দ্বারা পীড়া উপস্থিত হইলে, অমনি আমরা অনুভব করি—"আমি পীড়িত, আমি অপমানিত"। মাত্র শরীরও মনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট যে রোগ বা অপমান, তাহার সহিত "আমি"র কিন্তু বাস্তবিক কোন সম্বন্ধই নাই; তথাপি আমরা সর্ব্বদাই আমাদিগকে ঐরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্টই মনে করি। এই যে দ্রষ্টা আমির সহিত দৃশ্য দেহ মন প্রভৃতির সংযোগ প্রতীতি, ইহাই অজ্ঞান। "আমার শরীর" একথা যদি সত্য হয়, তবে "আমি রুগ্ন" একথা মিথ্যা হওয়া উচিত। আবার "আমি রুগ্ন" একথা যদি সত্য হয়, তবে "আমার শরীর", একথা বলাই চলে না, "আমি শরীর" এইরূপ বলাই উচিত; কিন্তু তাহা ভ্রমেও আমরা বলিনা। অথচ এই সত্য মিথ্যা মিশ্রিত যে ভাব, তাহাই আমাদের জীবন। সত্য—সত্যই, তাহা কখনও মিথ্যার সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না, আর মিথ্যা—মিথ্যাই, তাহাও কখনও সত্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে না। অথচ এই সত্য মিথ্যার সংযোগই আমাদের জীবন বা আমাদের সত্তা। এই সংযোগেরই অপর নাম অবিদ্যা বা অজ্ঞান। এই অবিদ্যাকে ততদিন কিছুতেই জানা যায় না, যতদিন ইনি দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগরূপে নিজেকে পরিচিত না

করেন ; তাই সূত্রে অবিদ্যা শব্দের প্রয়োগ না করিয়া দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগকেই হেয়হেতু বলা হইয়াছে। পরে "তস্য হেতুরবিদ্যা" এই সূত্রে অবিদ্যাকেই স্পষ্টরূপে হেতু বলা হইবে। এক্ষণে সেই অবিদ্যার স্বরূপটী ভালরূপ পরিচয় করাইয়া দিবার জন্যই ঋষি এই সংযোগের কথাটী বলিলেন। পূর্ব্বে যে অনাত্মায় আত্মখ্যাতিরূপ অবিদ্যার স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, এস্থলে এই সংযোগ শব্দে তাহাই স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইল।

प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं
भोगापवर्गार्थं दृश्यम् ॥ १८ ॥

दृश्यं विवृणोति प्रकाशेति। प्रकाशक्रियास्थितिशीलं तत्राहि प्रकाशोऽस्मितानुभवः सत्त्वगुणधर्म्मः, क्रिया रञ्जनात्मिका विशिष्टाभिव्यक्तिरूपेति रजोगुणधर्म्मः, स्थिति र्नियमनं विष्टतिरिति तमोगुणधर्म्म स्ताः प्रकाशक्रियास्थितयः शीलं स्वाभाविकं रूपं यस्य तत् तथाविध मित्यनेनास्य सूक्ष्मं स्वरूपं दर्शितम्। भूतेन्द्रियात्मकं भूतानि स्थूलसूक्ष्माणि, इन्द्रियाणि—बुद्धिपर्य्यन्तानि करणानि आत्मा अभिव्यक्त स्वरूपो यस्य तत् तथाभूतमित्यनेनास्य स्थूलमभिव्यक्तरूपं दर्शितम्। भोगापवर्गार्थं—भोगापवर्गौ बन्धमोक्षौ अर्थः प्रयोजनं यस्य तत् तथाभूतं दृश्यम्।

एतेनैतदुक्तं भवति—दृश्यं नाम न किञ्चित् स्थिरं वस्तु किन्तु अलातचक्रमिव स्थिरत्वेन प्रतीयमान मतीव चञ्चलं क्रियामात्रं द्रष्टुरेव सत्तया सत्तावत् प्रकाशेन च प्रकाशितं व्यवहारमात्रं नतु स्वतन्त्रं किञ्चित्। अविद्यावानेव दृश्यापेक्षया निर्मुक्तस्य द्रष्टुर्बन्धमोक्षौ पश्यतीत्यस्य भोगापवर्गार्थता। प्रागुक्ता वृत्तिरेव दृश्यमविद्याजननी-

लीनमविज्ञातसमानं । तथाच—सर्व्वं ह्येतद् यदयमात्मा । स एव सर्व्वं यद्भूतं यच्च भाव्यमित्यादि । द्रष्टुः साक्षाद्दर्शनप्रयत्नकरणाभ्याम-वच्छेनास्य दृश्यस्य सर्व्वथा विलय उक्तः ।

এই সূত্রে প্রসঙ্গপ্রাপ্ত দৃশ্যের স্বরূপ নির্ণীত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীল ভূতেন্দ্রিয়াত্মক ভোগাপবর্গার্থ দৃশ্য। তিনটী বাক্যের দ্বারা দৃশ্যের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীল। প্রকাশ—অস্তিত্বের অনুভব। "আছে" এইরূপ যে অনুভব, তাহাই প্রকাশ, ইহা সত্বগুণের ধর্ম্ম। ক্রিয়া—ভাবরঞ্জনাত্মক ব্যাপার। কোনরূপ বিশিষ্ট অভিব্যক্তির নামই ক্রিয়া, ইহা রজোগুণের ধর্ম্ম। স্থিতি—নিয়মন বিধৃতি। ধারণ করাই স্থিতি। ইহা তমোগুণের ধর্ম্ম। এই যে প্রকাশ ক্রিয়া এবং স্থিতি, ইহাই যাহাদের শীল অর্থাৎ স্বাভাবিক রূপ, তাহাই দৃশ্য। এই পরিচয়ের দ্বারা দৃশ্যের সূক্ষ্মরূপত্ব প্রদর্শিত হইল। কোন একটী দৃশ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তু সন্নিহিত হইলেই তাহার অস্তিত্ব, তদ্‌বিষয়ক একটী বিশিষ্টতা এবং উহার অবস্থান, এই তিনটী প্রত্যয় হইয়া থাকে। উহারাই প্রখ্যা বা প্রকাশ, প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া ও স্থিতি নামেও কথিত হইয়া থাকে। ইহারাই আবার অস্তি ভাতি ও প্রিয় নামে পরিচিত হইয়া থাকে। সে কথা পরে বলিব।

দ্বিতীয় বাক্য ভূতেন্দ্রিয়াত্মক। স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতকে লক্ষ্য করিয়া ভূত শব্দ এবং বুদ্ধি পর্য্যন্ত করণবর্গকে লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্রিয় শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে। এই ভূত ও ইন্দ্রিয় হইতেছে আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ যাহার, তাহাই দৃশ্য। দৃশ্য বলিতে ভূত বা ভৌতিক বস্তুরূপ গ্রাহ্য এবং করণবর্গ রূপ গ্রহণ, এই উভয়কেই বুঝায়। এই দুইটী ব্যতীত আর দৃশ্য বলিতে কিছুই নাই। প্রথম বাক্যে দৃশ্যের সূক্ষ্ম স্বরূপ এবং এই দ্বিতীয় বাক্যে দৃশ্যের স্থূল স্বরূপ পরিব্যক্ত হইল।

তৃতীয় ভোগাপবর্গার্থং। এই বাক্যদ্বারা দৃশ্যের প্রয়োজন বর্ণিত হইল। ভোগ এবং অপবর্গ অর্থাৎ বন্ধ এবং মোক্ষ, ইহাই দৃশ্যের অর্থ—প্রয়োজন।

পূর্ব্বোক্ত অনবলাপ্য তিনটী বাক্যের দ্বারা দৃশ্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাদ্বারা বেশ স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারাযায়—দৃশ্য কোন স্থির বস্তু নহে। স্থির ভাবে প্রতীয়মান হইলেও উহা অলাত-চক্রের ন্যায় অতিশয় চঞ্চল ক্রিয়ামাত্রই। দ্রষ্টার সত্তায়ই সত্তাবিশিষ্ট এবং দ্রষ্টার প্রকাশেই প্রকাশময় এক প্রকার ব্যবহার ব্যতীত দৃশ্যসমূহ অন্য কিছুই নহে। উহারা যত স্থিরভাবেই প্রতীয়মান হউক, উহা প্রতীতিমাত্রই, সেই প্রতীতি ক্রিয়াত্মিকা; সুতরাং চঞ্চল। দৃশ্যের মধ্যে যে স্থিতি ধর্ম্ম আছে, সে স্থিতিও ক্রিয়া বিশেষই। প্রকাশ ও ক্রিয়ার স্থিতিকেই স্থিতি কহে, উহা কোন স্থির বস্তু নহে। সুতরাং আমরা যখন বলি—"জগৎ আছে" তখন বুঝিতে হয়—জগদ্রূপ একটা ব্যাপার বা ব্যবহার, "আছে" অর্থাৎ সত্তার উপরে প্রতিভাত হইতেছে। সেইরূপ যখন বলি—"আমি আছি" তখন উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, যাহা "আছে" বা অস্তিত্ব অর্থাৎ সত্তা, তাহার উপর "আমি" নামক এক প্রকার ব্যপার বা ব্যবহার প্রতীয়মান হইতেছে। বাস্তবিক কিন্তু জগৎ নামে কোন বস্তু নাই, আমি নামেও কোন বস্তু নাই। কতকগুলি ব্যাপারের নাম জগৎ, কতকগুলি ব্যবহারের নাম আমি। বেদান্ত-শাস্ত্র যে জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করেন, তাহার তাৎপর্য্য ইহাই। ইহা যে কেবল বেদান্তশাস্ত্রেরই মত, তাহা নহে; সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রও এই কথাই বলিয়াছেন। শুধু বলিবার ভঙ্গীর বিভিন্নতা। ঐ প্রকাশ প্রবৃত্তি ও স্থিতি কথার দ্বারাই দৃশ্যের বস্তুত্ব বা পৃথক্ অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভাবেই নিরাকৃত হইয়াছে। যাহা সত্য, তাহা চিরকাল সকল শাস্ত্রেই সত্য-রূপে প্রকাশিত হয়; সুতরাং শাস্ত্রসম্বন্ধে বিশেষতঃ দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে যে মতের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, উহা অধ্যেতৃগণের

প্রতিভার বিলক্ষণতা মাত্র। সে যাহাহউক, আর একটি কথা। ঋষি বলিলেন, ভোগাপবর্গার্থ দৃশ্যের প্রয়োজন—দ্রষ্টার ভোগাপবর্গ-সাধন। নিত্যমুক্ত নিত্যনিরপেক্ষ দ্রষ্টার এই যে ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজন, ইহা অবিদ্যাবানের দৃষ্টিতেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অবিদ্যাবানের জন্যই শাস্ত্র, উপদেশ, সাধনা যতকিছু বিদ্বানের জন্য নহে। যতক্ষণ অবিদ্যা আছে, ততক্ষণই দৃশ্য আছে। এই দৃশ্য কেন আছে—আমার প্রিয়তমের ভোগের জন্য, তিনি এই বহুভাবের মধ্যে বিরাজ করিয়া অপূর্ব্ব লীলারস ভোগ করেন আবার যখন তাঁহার ইচ্ছা হইবে, তখন এই দৃশ্যসমূহকে সম্যক্ বিলয় করিয়া স্বস্থ হইবেন, অপবর্গ প্রাপ্ত হইবেন। ইহা সাধকগণের বুঝিবার সুবিধার জন্যই। তত্ত্বতঃ কিন্তু দ্রষ্টার বন্ধনও নাই মুক্তিও নাই। তবে ঐরূপ প্রতীতি হয় মাত্র। যদি সত্যসত্যই দ্রষ্টার কোনরূপ বন্ধন থাকিত, তবে তাহা চিরসত্যরূপেই থাকিত; কারণ দ্রষ্টা সত্যবস্তু, তাহাতে যাহা কিছু থাকে, তাহা সত্যই হয়। দ্রষ্টার যথার্থ বন্ধন থাকিলে জীবের আর মুক্তি বলিতে কিছু থাকিত না, বা কোন কালেই সম্ভব হইত না; সুতরাং বন্ধন দ্রষ্টার নাই। অবিদ্যাবান্ জীবকর্ত্তৃকই দ্রষ্টাতে বন্ধন পরিকল্পিত হয় মাত্র। আবার বন্ধনই যদি না থাকে, তবে মুক্তিও থাকিতে পারে না; কারণ মুক্তি বলিলেই বন্ধনের অপেক্ষা থাকে। এইরূপে বন্ধমুক্তিহীন দ্রষ্টার বন্ধ মোক্ষ পরিকল্পনার জন্যই দৃশ্যের প্রয়োজন; তাই ঋষি দৃশ্যকে ভোগাপবর্গার্থ বলিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

সাধক লক্ষ্য করিও—পূর্ব্বে যাহাকে বৃত্তি বলা হইয়াছে, সেই বৃত্তিই দৃশ্য। অন্য কিছু নহে। দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্যই দৃশ্য; তাই শাস্ত্র দ্রষ্টাকেই দৃশ্যরূপে স্থানে স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। দৃশ্য বা বৃত্তি অবিদ্যাজননীর লীলাবিলাস মাত্র। এই যাহা কিছু, এ সকলই আত্মা। এই যাহা কিছু আছে ছিল বা হইবে, সে

সকলই আত্মা, ইত্যাদি ভূরি ভূরি শ্রুতিবাক্যে দৃশ্যকে দ্রষ্টার সারূপ্যই বলা হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই সারূপ্যদর্শনের অভ্যাসে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, তাহার নিকট এবং কেবল তাহার নিকটই দৃশ্য সমূহ সম্যক্ বিলয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, দ্রষ্টার স্বরূপ উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

বিশেষাবিশেষ-লিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণ-পর্ব্বাণি ॥১৯॥

পুনরপি দৃশ্যমেব বিশিনষ্টি বিশেষেতি। দৃশ্যং স্বরূপতোগুণত্রয় মেব তৎপরিণামরূপত্বাত্তস্যেতি। গুণা হি নাম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপস্য দ্রষ্টুরেব লীলাবিলাসরূপা মহিমান স্তথাহি সত্তামাত্র-স্বরূপোঽয়ং দ্রষ্টা যদা বিশেষেণৈবাত্মসত্তা মনুভবতি তদা স সত্ত্বগুণ ইত্যাখ্যায়তে। এবং চিন্মাত্রস্বরূপোঽয়ং নিরঞ্জনঃ পুরুষো যদা প্রবৃত্তিরঞ্জিত ইবাভাসতে তদা স এব রজোগুণ ইত্যভিধীয়তে। তথানন্দমাত্র-স্বরূপোঽয়মাত্মা যদা প্রবৃত্তিজন্যং বিশিষ্টমিবানন্দ মনুভবতি তদা স এব তমোগুণ ইত্যভিধামধিগচ্ছতীতি। নহি গুণিনমন্তরেণ গুণানাং সত্তা সম্ভবতো-ত্যেষাং স্বতন্ত্রতা স্বয়স্তেনৈব নিরাকৃতাস্তি। অস্তু নাম, প্রকৃত-মনুসর্য্যতে। গুণপর্ব্বাণি—গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং পর্ব্বাণি অবস্থা বিশেষা ইত্যর্থঃ চত্বারীতি শেষঃ। কানি চ তানীত্যাহ বিশেষাদীনি। তথা হি বিশেষাঃ—পঞ্চমহাভূতানি জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ মনইতি। অবিশেষাঃ—পঞ্চতন্মাত্রান্যহঙ্কার এক ইতি ষট্। লিঙ্গমাত্রং মহত্তত্ত্বং। অলিঙ্গং প্রধানং গুণানাং সাম্যাবস্থারূপা প্রকৃতিরিত্যেতচ্চতুর্বিংশতি তত্ত্বাতিরিক্তং ন কিঞ্চিদ্দৃশ্যমিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

এইসূত্রেও দৃশ্যের বিষয় বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দৃশ্যসমূহ স্বরূপতঃ গুণত্রয়ই ; যেহেতু যাবতীয় দৃশ্য ত্রিগুণেরই পরিণাম। গুণত্রয় বলিতে আমরা বুঝিয়াছি—সচ্চিদানন্দস্বরূপ দ্রষ্টার লীলাবিলাসরূপ মহিমা। সত্তামাত্রস্বরূপ সেই দ্রষ্টা যখন বিশিষ্ট ভাবে যেন আত্ম সত্তানুভব করেন, তখন তাঁহারই নাম হয় সত্ত্বগুণ এইরূপ চিন্মাত্র-স্বরূপ নিরঞ্জন পুরুষ যখন নিজেকে যেন ভাবরঞ্জিতের ন্যায় অনুভব করেন, তখন তাঁহারই নাম হয় রজোগুণ। এবং আনন্দমাত্র স্বরূপ সেই পরমাত্মা যখন ভাব রঞ্জনাময় হইয়া যেন বিশিষ্ট আনন্দের অনুভব করেন, তখন তাঁহারই নাম হয় তমোগুণ। সুতরাং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মাই লীলাময় হইয়া সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম পরম-পুরুষেরই নাম ত্রিগুণ। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটী, শাস্ত্রে "গুণ" নামে অভিহিত হইয়াছে। এই গুণ শব্দটীর দ্বারাই উহাদের পৃথক্ সত্তা নিরাকৃত হইয়াছে। গুণী ব্যতীত গুণ থাকিতে পারে না। গুণীকে আশ্রয় করিয়াই গুণের প্রকাশ হয়, গুণীর সত্তায়ই গুণের সত্তা ; সুতরাং গুণ কোন স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট বস্তু হইতেই পারে না। গুণ ও মহিমা একই কথা। আত্মার মহিমাই গুণত্রয়। অথবা আত্মা যখন মহিমময় তখনই তাঁহার নাম ত্রিগুণ। সে যাহাহউক, এইবার আমরা সূত্রের অর্থ আলোচনা করিতেছি—ঋষি বলিলেন, বিশেষ অবিশেষ লিঙ্গমাত্র এবং অলিঙ্গ, এই চারিটী গুণপর্ব্ব। পর্ব্ব শব্দের অর্থ অবস্থাবিশেষ। গুণত্রয় কত প্রকার অবস্থায় পরিণত হয়—কত প্রকারে প্রকাশিত হয়, তাহাই এ সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। সাধারণ কথায় পর্ব্বশব্দে পাব বুঝায়, যেমন বাঁশের পাব। ঠিক তেমনই বিশেষ অবিশেষ লিঙ্গমাত্র অলিঙ্গ গুণত্রয়ের পাব। বাঁশের সকলগুলি পাবই যেরূপ বাঁশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে, ঠিক এইরূপ বিশেষ অবিশেষ প্রভৃতি গুণত্রয় ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

এইবার বিশেষ অবিশেষ প্রভৃতির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

বিশেষ—পঞ্চ মহাভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ এবং মন এই একাদশটী। অবিশেষ—পঞ্চতন্মাত্র এবং অহঙ্কার এই ছয়টী। লিঙ্গমাত্র—মহৎতত্ত্ব। অলিঙ্গ—প্রধান, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে যোগসূত্রকার বিশেষ অবিশেষ লিঙ্গমাত্র এবং অলিঙ্গ, এই যোগার্থবাচক সংজ্ঞাদ্বারা নির্দ্দেশ করিলেন। যে তত্ত্বগুলি অপেক্ষাকৃত স্থূল অর্থাৎ বিকার মাত্র, যাহাদিগকে প্রায় সকলেই বিশেষভাবে অনুভব করিতে পারে, তাহারাই বিশেষ নামে অভিহিত। যে তত্ত্বগুলি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম, যাহারা মাত্র সাধকগণেরই অনুভবগম্য, তাহারা অবিশেষ নামে অভিহিত। যে তত্ত্বটী আত্মার অতি সন্নিহিত বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-রূপে আত্মার পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ, তাহারই নাম লিঙ্গমাত্র। ''লিঙ্গ্যতে পরিচীয়তে আত্মা অনেন ইতি লিঙ্গম্।" একমাত্র মহৎতত্ত্বই আত্মসত্তা অনুভব করিতে সমর্থ; তাই ইহা লিঙ্গমাত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আর যে তত্ত্বটীর কোন প্রত্যক্ষ লিঙ্গ (পরিচয়) নাই অথচ সত্য, অনুমানদ্বারা যাহার সত্তা জানা যায়, তাহার নাম অলিঙ্গ।

ঋষি দৃশ্যের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া যে চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক তত্ত্বের উল্লেখ করিলেন, তদ্‌ব্যতীত দৃশ্য বলিতে অন্য কিছু নাই। এই তত্ত্ব সমূহেরই অন্য নাম দৃশ্য। দৃশ্যকে তত্ত্ব বলা হয় কেন, তাহা বলিতেছি—তৎ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। ওঁ, তৎ, সৎ, এই তিনটি শব্দ ব্রহ্মেরই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। গীতাশাস্ত্রে স্বয়ং ভগবান্‌ও ইহা বলিয়াছেন। যেরূপ মনুষ্যের ভাবকে মনুষ্যত্ব কহে, ঠিক সেইরূপ তৎ এর যে ভাব, তাহাকে তত্ত্ব কহে। তত্ত্ব শব্দের অর্থ ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ দ্রষ্টৃত্ব। যাহা দৃশ্য তাহা যে দ্রষ্টারই ভাবমাত্র, ইহা বুঝাইবার জন্যই দৃশ্যসমূহকে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বলা হয়। দ্রষ্টা পুরুষ, তত্ত্ব নহে, তিনি স্বয়ং তৎ। অলিঙ্গ অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে ক্ষিতি পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি প্রকার ভাব নিয়া তৎ অর্থাৎ দ্রষ্টাই প্রকাশিত হন, তাই ইহাদের নাম তত্ত্ব।

ক্ষিতিতত্ত্ব শব্দের অর্থ—ব্রহ্মের ক্ষিতি আকারীয় প্রকাশ, জল-তত্ত্ব শব্দের অর্থ—ব্রহ্মের জল আকারীয় প্রকাশ, এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে। যাঁহারা গুণত্রয়কে বা তত্ত্বসমূহকে জড় পদার্থ নামে অভিহিত করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য জড়ত্ব খ্যাপন নহে, চৈতন্যের জড় আকারীয় অভিব্যক্তি খ্যাপন উদ্দেশ্যেই তাঁহারা ঐরূপ বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে এক অদ্বয় ব্রহ্ম ব্যতীত জড় নামে কোন পৃথক বস্তু নাই। এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকারে জড়-আকারে আত্মমহিমা প্রকাশ করিতে গিয়াই তিনি জড় নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। "এতাবান্ অস্য মহিমা" ইহাই তাঁহার মহিমা। যিনি তৎ, তাঁহার তত্ত্ব হওয়াই অপূর্ব্ব মহিমা। ব্রহ্ম যেখানে স্বগতভেদময়, দ্রষ্টা যেখানে বৃত্তি-সারূপ্যময়, পুরুষ যেখানে লীলাময়, সেইখানেই আত্মা মহিমময়রূপে প্রকটিত। আর "অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ" যিনি পুরুষ, তিনি ইহা হইতে অর্থাৎ মহিমা হইতেও জ্যায়ান্। তিনি তত্ত্বাতীত লীলাতীত বাক্যমনের অগোচর। ঋষি অব্যবহিত পরসূত্রেই তাঁহার কথাও বলিবেন।

প্রিয়তম সাধক! আশাকরি তোমরা ঋষিবাক্য শ্রবণ করিয়া এইবার দ্বৈত অদ্বৈত, জড় চৈতন্য প্রভৃতি তর্কের বিষয়ীভূত পদার্থগুলি নিঃসংশয়ে মীমাংসা করিয়া লইতে পারিবে। ওগো, তোমরা কখনও তর্ক করিয়া বা অন্বেষণ করিয়া ব্রহ্মকে বুঝিতে যাইও না, যাহা কিছু তোমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তাহাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপে অকপট ভাবে দর্শন কর, উহাঁরই চরণে আত্মনিবেদন কর, তাঁহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য কাতর প্রাণে প্রার্থনা কর, ব্যাকুলতার সহিত প্রতীক্ষা কর। তাঁহারই কৃপায় তাঁহাকে লাভ করিয়া তুমি নিশ্চয় ধন্য হইতে পারিবে।

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥২০॥

এবং দৃশ্যং নিরূপ্য দ্রষ্টারমপি নিরূপয়িতু মুৎসহতে দ্রষ্টেতি। দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ প্রকাশমাত্রঃ চিতিশক্তিমাত্র ইতি যাবৎ। নিরাকৃতা মাত্রশব্দেন সজাতীয়াদিভেদা ধর্ম্মধর্ম্মিভেদা বা। শুদ্ধোঽপি নির্ব্বিকারোঽপি, বিকারস্ত্ববিদ্যাকৃতোঽস্তীত্যপিকারার্থঃ। তদ্দর্শয়তি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ—প্রত্যয়েন বৌদ্ধেন ধিয়েত্যর্থঃ, অনুপশ্যঃ—অনুভাব্যসত্তাকঃ। অলং নাম বিমলা হি ধী দ্রষ্টৃসত্তানুভবায় চিৎপ্রতিবিম্বরূপত্বাদ্ধিয়ঃ। ততশ্চ প্রত্যয়মপ্যনুপশ্যতীবদ্দ্রষ্টা বুদ্ধেঃ প্রতিসম্বেদিরূপত্বাৎ তস্য। অপিচাত্রাবগন্তব্যং—যদা তু স যততে দ্রষ্টৃসত্তানুভববান্ প্রত্যয়শ্চিতে-রপ্যাবরণায় তদা স্বয়মেব নশ্যতি সমুদিতো ভবতি চ দ্রষ্টা শুদ্ধ ইতি। উক্তঞ্চ—"যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ' ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দৃশ্যের সবিস্তার নিরূপণ পূর্ব্বক ঋষি এইবার দ্রষ্টার স্বরূপ নিরূপণ করিতে উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে দ্রষ্টার স্বরূপ নির্ণেয় নহে, তথাপি ইঙ্গিতে আভাসে যতটা পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে, ঋষি তাহারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া উপনিষদ্ যত চেষ্টা করিয়াছেন, পতঞ্জলি ঋষি সুদৃঢ় যুক্তিপূর্ণ অনবলাপ্য সংক্ষিপ্ত বাক্যে সে চেষ্টার সম্যক্ সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। ঋষি বলিলেন—দ্রষ্টা দৃশিমাত্র, তিনি শুদ্ধ হইলেও প্রত্যয়ানুপশ্য। প্রিয় সাধক! ধীরভাবে বুঝিতে চেষ্টা কর। দ্রষ্টা—দৃশিমাত্র। দৃশিমাত্র শব্দের অর্থ—প্রকাশমাত্র বোধমাত্র চিতিশক্তি মাত্র। এস্থলে মাত্র শব্দটীর দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইল—দ্রষ্টাতে সজাতীয় বিজাতীয় বা স্বগত, কোন প্রকার ভেদই নাই, অথবা কোনরূপ ধর্ম্ম-ধর্ম্মী শক্তি-শক্তিমান্ ভেদও নাই। তিনি অদ্বয় স্বপ্রকাশ বস্তু, তিনি দৃশিমাত্রই অন্য কিছু নহেন।

দৃশি শব্দের অর্থ প্রকাশ। এই দৃশিমাত্র কথাটীর দ্বারাই দ্রষ্টার যাহা স্বরূপ তাহা অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অতঃপর ঋষি বলিলেন—"শুদ্ধোঽপি" তিনি শুদ্ধ হইলেও। শুদ্ধ শব্দের অর্থ নির্ব্বিকার। যাহা বিকারী যাহা সংহত তাহাই অশুদ্ধ। দ্রষ্টা অসংহত অদ্বয়, কোনরূপ বিকার অর্থাৎ অশুদ্ধতা তাঁহাতে কোন রূপেই থাকিতে পারে না; সুতরাং তিনি যে শুদ্ধ একথা আর বলিতে হয় না। কিন্তু "শুদ্ধোঽপি" "শুদ্ধ হইলেও" এই বাক্যটীর মধ্য দিয়া একটু যেন অশুদ্ধতা একটু যেন বিকার আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হয়, এমনই একটা ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। ঋষি এস্থলে "অপি" শব্দটীর প্রয়োগ করিয়া সেই অবিদ্যাকৃত বিকারের কথাটী স্মরণ করাইয়া দিলেন। দ্রষ্টা শুদ্ধ নির্ব্বিকার এ বিষয়ে কোন বিপ্রতিপত্তি কাহারও নাই, তথাপি সাধক গণের দৃষ্টিতে যেন একটু অশুদ্ধতার লেশ প্রকাশ পায়। মনে রাখিও, যাহারা সাধক নহে—যোগী নহে, তাহারা কিন্তু ইহার কিছুই বুঝিতে পারিবে না। এই অবিদ্যাকৃত যে অশুদ্ধতা, ইহাও মাত্র যোগিগণেরই অনুভবগম্য। সে যাহাহউক, সেই অশুদ্ধতাটুকু কি, তাহাই ঋষি তৃতীয় বাক্যে নির্দ্দেশ করিলেন—প্রত্যয়ানুপশ্য।

প্রত্যয় শব্দের অর্থ বুদ্ধি, অনুপশ্য শব্দের অর্থ অনুভাব্য-সত্তাক। বুদ্ধিদ্বারা যাঁহার সত্তা অনুভব করা যায়, তিনি প্রত্যয়ানুপশ্য। বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে দ্রষ্টার সত্তা—দৃশিমাত্রের অস্তিত্বটুকু অনুভব করিতে পারে। দ্রষ্টা শুদ্ধ হইয়াও এইরূপে বুদ্ধি দ্বারা অনুভাব্য-সত্তাকরূপে অর্থাৎ বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপে প্রতিপন্ন হন; তাই তাঁহাকে প্রত্যয়ানুপশ্য বলা হয়। এই গেল এক দিকের কথা, আবার অন্যদিক দিয়াও তিনি প্রত্যয়ানুপশ্য। প্রত্যয়কে অর্থাৎ বুদ্ধিকে যেন তিনি দর্শন করেন। চৈতন্যস্বরূপ দ্রষ্টার প্রতিবিম্ব সম্পাতেই বুদ্ধি যেন চৈতন্য-ময় হইয়া একদিকে বিষয়সমূহের প্রকাশ করিতে এবং অন্যদিকে দ্রষ্টার সত্তা অনুভব করিতে সমর্থ হয়। বুদ্ধি চৈতন্যেরই প্রতিবিম্ব

স্বরূপ বস্তু, তথাপি ভাষায় প্রকাশ করিবার সময়ে বুদ্ধিতে চিৎপ্রতিবিম্ব-সম্পাত এইরূপই বলিতে হয়। সে যাহা হউক, বুদ্ধিদর্পণে পুরুষের প্রতিবিম্ব সম্পাত হয় বলিয়াই পুরুষকে বুদ্ধির প্রতিসম্বেদী বলা হয়। প্রত্যয়ানুপশ্য দ্রষ্টা এবং বুদ্ধির প্রতিসম্বেদী পুরুষ একই কথা। বুঝিতে পারিলে সাধক! একদিকে আত্মা প্রত্যয়ের দ্বারা অনুপশ্য, অন্যদিকে আত্মাকর্ত্তৃক প্রত্যয় অনুদৃষ্ট। একদিকে বুদ্ধি দ্বারা আত্মার সত্তা অনুভব যোগ্য হয়, অন্যদিকে আত্মা স্বকীয় সত্তা ও প্রকাশ রূপ প্রতিবিম্ব দ্বারা বুদ্ধিকে দর্শন করেন। এই যে পরস্পর দৃষ্টিবিনিময়—এই যে উভয়ের ঈক্ষণ, ইহাই প্রত্যয়ানুপশ্য। ইহাই বৈষ্ণবশাস্ত্রে রাধাকৃষ্ণের পরস্পর নয়নকোণে দৃষ্টিবিনিময় রূপে—"আড় নয়নে ঠাড়াঠাড়ি" রূপে বর্ণিত ও চিত্রিত হইয়াছে। ইহাই অন্যান্য শাস্ত্রে লক্ষ্মীবিষ্ণু হরগৌরী প্রভৃতি রূপে বর্ণিত হইয়াছে। দর্শন-শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভও এই প্রত্যয়ানুপশ্য দ্রষ্টাই। হিরণ্য অর্থাৎ আত্মা গর্ভে অর্থাৎ অন্তরে যাঁহার, তিনি হিরণ্য গর্ভ। ঐ বুদ্ধিতে চিৎপ্রতিবিম্ব সম্পাত এবং বুদ্ধিদ্বারা অনুভবযোগ্য সত্তা। উহাই প্রত্যয়ানুপশ্য দ্রষ্টা। তিনিই আবার অরূপ হইয়াও ভক্ত-চিত্তানুসারিণী বিভিন্ন দেবদেবী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সাধকগণের পরম কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। তিনি যদি কেবল শুদ্ধই হইতেন, কেবল দৃশিমাত্রই হইতেন, তবে আর সাধনা উপাসনা কিংবা শাস্ত্রাদির কোন প্রয়োজনই থাকিত না। তিনি শুদ্ধ হইয়াও প্রত্যয়ানুপশ্য, তিনি নির্গুণ হইয়াও সাধকের নিকট সগুণ, তিনি সর্ব্বভাবাতীত হইয়াও বুদ্ধিগ্রাহ্য।

যদিও ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি অন্যান্য তত্ত্বগুলিও আত্মারই প্রকাশে প্রকাশিত আত্মারই সত্তায় সত্তাবান্, তথাপি উহারা কখনও আত্মার সত্তা অনুভব করিতে পারে না। যাঁহারা মনদ্বারা বা ইন্দ্রিয়দ্বারা আত্মাকে দর্শন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সে চেষ্টা কখনও সার্থক হইতে পারে না। আত্মা একমাত্র প্রত্যয়ানুপশ্যই বুদ্ধি-গ্রাহ্যই।

সে যাহা হউক, আমরা ইতি পূর্ব্বে "শুদ্ধোঽপি" এই কথাটীর মধ্য দিয়া যে একটুখানি অশুদ্ধতার আভাস পাইয়াছিলাম, আশা করি শ্রীমান্ পাঠক এইবার তাহা সম্যক্ অবধারণ করিতে পারিয়াছেন। যাহা শুদ্ধ নির্ব্বিকার অদ্বয় বস্তু, তাহার সত্তা নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা অনুভব যোগ্য, ইহা দ্বারা কিছু অশুদ্ধতা কিছু বিকার সূচিত হয়। আবার অদ্বিতীয় পুরুষ বুদ্ধিকে দর্শন করেন, ইহাতেও কিঞ্চিৎ অশুদ্ধতা লক্ষিত হয়। ঐ টুকুকে লক্ষ্য করিয়াই ঋষি বলিলেন—"শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।"

তাহা হইলে সত্যই কি নির্ব্বিকার পুরুষে কিঞ্চিৎ বিকার আছে? না, বিন্দুমাত্র বিকার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই যে প্রত্যয়ানুপশ্য কথাটীর মধ্য দিয়া বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগরূপ বিকার সূচিত হইল, উহা বাস্তবিক বিকার নহে, বাক্যমনের অতীত বস্তুকে—পুরুষকে—বিশুদ্ধ সত্তাস্বরূপ বস্তুকে বুঝাইয়া দিবার জন্যই—ধরাইয়া দিবার জন্যই ঐরূপ বলা হইয়া থাকে। অবিদ্যাবস্থায়ই ঐরূপ বিকার প্রতীত হয়। নিজের চক্ষুর সম্মুখে কালীমাখা কাচ ধরিয়াই উজ্জ্বল সূর্য্যকে মলিন করিতে হয়। শুন সাধক, বুঝিতে চেষ্টা কর—যখন বুদ্ধি বেশ নির্ম্মল হয় অর্থাৎ শুদ্ধ অস্মিতারূপে প্রকাশিত হয়, তখন সে আত্মার সত্তা অনুভব করিতে পারে। উহা কিন্তু যথার্থ সত্তা নহে, সত্তার আভাস বলিলেই ঠিক হয়। বুদ্ধি যে সেই সত্তারই একটু ছায়া-মাত্র ইহা সে সময়ে পরিগৃহীত হইতে থাকে। এইরূপ কিছুক্ষণ (দুই চারি পল মাত্র) ঐ অস্তিত্ব প্রতীতিকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেই পূর্ণভাবে সত্তার প্রকাশ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ সত্তা ও চৈতন্য যে অভিন্ন তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আর বুদ্ধিও তৎক্ষণাৎ একেবারে বিলয় প্রাপ্ত হয়। তখন বুদ্ধি বলিতে—আত্মার সত্তা অনুভব করিতে আর কেহই থাকে না। তখন কেবল আত্মাই—অদ্বয় চৈতন্যময় পুরুষই প্রকাশিত হইতে থাকেন। ইহাকেই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে। সে যাহা হউক, আবার পরক্ষণেই কিন্তু বুদ্ধির উদয় হয়, তখন পুনরায়

সেই বুদ্ধিমাত্র পুরুষের সত্তাটুকুই গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। ঐরূপ চেষ্টার ফলে বুদ্ধি আবার বিলয় প্রাপ্ত হয়। পরক্ষণে আবার বুদ্ধি ফিরিয়া আসে। এই যে বুদ্ধির পরপারে অবস্থিত পুরুষের প্রকাশ ও বুদ্ধির অন্তরালে অবস্থান, এই যে মিলন ও বিরহ, ইহাই বৃন্দাবনের নিত্যলীলা। সাধকগণ জীবনকালে এই অপূর্ব্ব লীলারসেরই আস্বাদন করিয়া থাকেন। ক্ষণে ক্ষণে মিলন আবার ক্ষণে ক্ষণে বিরহ, সে কি অপূর্ব্ব আনন্দ! তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। যতদিন প্রারব্ধ কর্ম্ম সম্যক্ ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, যতদিন বিদেহ কৈবল্য লাভ না হয়, ততদিন এইরূপ লীলারসেরই আস্বাদ গ্রহণ করিতে হয়। তারপর আর লীলা নাই, সুতরাং মিলন নাই বিরহও নাই। তখন—কেবল শুদ্ধ অদ্বয় শান্তি! সে যে নিত্য-নিরঞ্জন! ওগো, সে কথা ত বলিতে পারিতেছি না! হে আমার প্রিয়তম সাধক বৃন্দ! বুঝিতে পারিলে কি এইবার দ্রষ্টার স্বরূপ? ওগো, তিনি দৃশিমাত্র, তিনি শুদ্ধ, তিনি শুদ্ধ হইলেও প্রত্যয়ানুপশ্য।

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা ॥ ২১ ॥

দৃশ্যপ্রয়োজনমাহ তদিতি। তদর্থ এব পুরুষার্থ এব দ্রষ্টু-র্ভোগাপবর্গ-সাধনায়ৈবেত্যর্থঃ। দৃশ্যস্য পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয়-পরিণামরূপস্য আত্মা স্বরূপো ভবতীতি শেষঃ। সংহতত্ব পরার্থত্বাদ্ধি ইতি ভাবঃ। এতদুক্তং ভবতি—পুরুষস্য দ্রষ্টুরবিদ্যাজন-ভোগাপবর্গ রূপ-প্রয়োজনসাধনার্থং দৃশ্যমিতি ॥ ২১ ॥

এই সূত্রে দৃশ্যের প্রয়োজন নিরূপিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন— পুরুষার্থের জন্যই দৃশ্যের স্বরূপ। পুরুষের প্রয়োজন দুইটী, এক

ভোগ অপর অপবর্গ। ইহাকেই তদর্থ বা পুরুষার্থ বলা হয়। এই পুরুষার্থ-সিদ্ধির জন্যই দৃশ্যের প্রয়োজন। দৃশ্যসমুহ যেহেতু গুণত্রয়ের পরিণাম রূপ সংহত বস্তু, সেই হেতুই তাহার নিজের কোন প্রয়োজনই থাকিতে পারে না। এ জগতেও দেখা যায়, যাহা কিছু সংহত অর্থাৎ সম্মিলিত বস্তু, তাহা সর্ব্বত্রই পর-প্রয়োজনের জন্য হইয়া থাকে; ঠিক এইরূপই দৃশ্যসমূহ পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্যই পরিকল্পিত হইয়া থাকে। মহর্ষি পতঞ্জলি দেব এই সূত্রের দ্বারা ইহাই প্রকাশ করিলেন যে, দৃশ্যসমূহ যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে স্থূল স্বতন্ত্র বস্তুরূপে পরিলক্ষিত হয়, তথাপি উহাদের কোন স্বতন্ত্রতা বা স্থূলত্ব নাই। দৃশিমাত্র—শুদ্ধ-পুরুষের যে অবিদ্যাকল্পিত ভোগ ও অপবর্গরূপ ব্যবহার, তাহাই দৃশ্য। দৃশ্য সমূহ ব্যবহার ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

ইতিপূর্ব্বে দ্রষ্টাকে যে প্রত্যয়ানুপশ্য বলা হইয়াছে, এই দৃশ্য সিদ্ধিই তাহার প্রয়োজন। যেখানে দৃশ্য নাই, সেখানে দ্রষ্টাও প্রত্যয়ানুপশ্য নহেন। তিনি সেখানে "শুদ্ধোঽপি" নহেন—সর্ব্বথা শুদ্ধ দৃশিমাত্র। যতক্ষণ দৃশ্য আছে, ততক্ষণই দ্রষ্টা প্রত্যয়ানুপশ্য। প্রিয় সাধক! এই সকল রহস্য বিশেষ অবধানের সহিত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিও।

कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य-साधारणत्वात् ॥२२॥

निष्पन्नप्रयोजनस्य किं स्याद् दृश्यस्येत्याह कृतार्थमिति। कृतार्थं प्रति निष्पन्न-भोगापवर्ग-प्रयोजनं द्रष्टारं प्रति, नष्टमपि स्वतन्त्रसत्ताऽभावात् अदर्शनं गतमपि दृश्यमनष्टमविरतव्यापारं विद्यत इतिशेषः। कुत एवमित्याह—तदन्यसाधारणत्वात् तस्मात् कृतार्थपुरुषादन्ये ये प्राकृतास्तेषु साधारणत्वाद् दृश्यरूपेणैवविद्यमानत्वादित्यर्थः। एतदुक्तं भवति—जीवन्मुक्तस्यापि प्रारब्धकर्म्मदर्शनादपरे प्राकृतास्तत्रापि दृश्य-

मस्तीति मन्यन्ते, स तु कृतार्थः क्वचिदपि न दृश्यसम्बन्ध मात्मनः पश्यति चिरविलयादविद्याया इति ॥ २२ ॥

পূর্ব্ব সূত্রে বলা হইয়াছে পুরুষের ভোগাপবর্গ সাধনের জন্যই দৃশ্যের প্রয়োজন, যেস্থলে সে প্রয়োজন পরিনিষ্পন্ন হইয়াছে, সেস্থলে দৃশ্যের অবস্থা কিরূপ হয়,তাহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। ঋষি বলিলেন—কৃতার্থ পুরুষের প্রতি দৃশ্য সমূহ নষ্ট হইলেও অনষ্টবৎই থাকে; যেহেতু, অপর প্রাকৃতজনগণের নিকট সাধারণরূপে অর্থাৎ দৃশ্যরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

এ সূত্রে কৃতার্থ শব্দে জীবন্মুক্ত পুরুষের কথাই বলা হইয়াছে। যখন কোন ব্যক্তি যাবতীয় ভোগের পরপারে অবস্থিত অপবর্গলাভে সমর্থ হয় অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত যোগে উপনীত হয়, তখনই তাহাকে কৃতার্থ বলা হইয়া থাকে। কৃত অর্থাৎ নিষ্পন্ন হইয়াছে অর্থ—ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজন যাঁহার, তিনি কৃতার্থ। এই কৃতার্থপুরুষের নিকট দৃশ্য নষ্ট; যেহেতু তিনি সত্তাস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া অনাত্মবস্তুর অস্তিত্ব বিষয়ক প্রতীতি হইতে চিরতরে মুক্ত হইয়া যান। "আছে" বলিতে যে একমাত্র দ্রষ্টাকেই বুঝায়, আত্মা ব্যতীত আর যে কিছু "আছে" পদের ভাগীই হইতে পারে না, এই জ্ঞানালোকের লাভ হওয়াতে কৃতার্থের প্রতি দৃশ্যের সত্তা একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়।

তার পর ঋষি বলিলেন—"নষ্টমপি অনষ্টং" নষ্ট হইলেও অনষ্টবৎ থাকে। কেন থাকে, "তদন্য সাধারণত্বাৎ" তাহা হইতে অর্থাৎ কৃতার্থ পুরুষ হইতে অন্য যে সকল প্রাকৃতজন, তাহাদের নিকট ঐ দৃশ্য সাধারণভাবেই যথাপূর্ব্ব বিদ্যমান থাকে। যাহারা কৃতার্থ নহে, যাহাদের অবিদ্যার খেলা—ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজন পরিসমাপ্ত হয়

নাই, তাহাদের নিকট দৃশ্য সমূহ স্বতন্ত্র সত্তাবৎ বস্তুর ন্যায়ই প্রতিভাত হইতে থাকে। তাৎপর্য্য এই যে—কৃতার্থ পুরুষের নিকট দৃশ্য সমূহ বিনষ্ট হইলেও প্রারব্ধকর্ম্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার দৃশ্য সম্বন্ধ দেখিয়া প্রাকৃতজনগণ মনে করে "এই কৃতার্থ ব্যক্তিও আমাদেরই মতন দৃশ্য সমূহকে দর্শন বা ভোগ করিতেছেন"। বাস্তবিক কিন্তু জীবন্মুক্ত পুরুষ ক্ষণকালের জন্যও আত্মায় দৃশ্য সম্বন্ধ কল্পনাও করিতে পারেন না; যেহেতু, যোগলাভের সঙ্গে সঙ্গেই অবিদ্যার চিরতরে বিলয় হইয়া যায়। তাই ঋষি বলিলেন—"কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপি অনষ্টম্"। যতদিন বিদেহ কৈবল্য লাভ না হয়, ততদিন কৃতার্থ পুরুষের নিকট দৃশ্য সমূহ সত্তার আভাসমাত্র লইয়া উপস্থিত হয়। যাহা প্রকৃত সত্তা নহে, অথচ সত্তার মতনই প্রতীতিগোচর হয়, তাহাকে সত্ত্বাভাস কহে। "নষ্টমপি অনষ্টম্" কথাটীতে এই সত্তাভাসকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আত্মা যে কোনঅবস্থায়ই সদ্বিতীয় নহেন, আত্মার যে কোনঅবস্থায়ই ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজন নাই, তিনি যে সর্ব্বাবস্থায়ই নিত্যশুদ্ধ নিত্যনির্ব্বিকার, এইরূপ অনুভব হওয়ার পরও, যত দিন প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলস্বরূপ স্থূলদেহের পতন না হয়, তত দিন দৃশ্যসম্বন্ধ অতি অকিঞ্চিৎকররূপে—সত্তাভাসমাত্ররূপে বিদ্যমান থাকিলেও জীবন্মুক্ত পুরুষ কখনও আত্মার স্বদ্বিতীয়ত্ব ভ্রমে নিপতিত হন না, হইতেও পারেন না। তাহার নিকট দৃশ্য নষ্টই হইয়া যায়। কিন্তু অপর প্রাকৃতজনগণ তাহাতেও দৃশ্য-সম্বন্ধ দর্শন করিয়া থাকে; তাই কৃতার্থপুরুষের নিকট দৃশ্য নষ্ট হইয়াও যেন অনষ্টবৎই থাকে। বিদেহকৈবল্যের নিকট সর্ব্বথা নষ্টই হইয়া যায়।

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥২৩॥

কথমনয়োঃ সংযোগ ইত্যাহ স্বেতি। স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বং দৃশ্যং স্বামী দ্রষ্টা। স্বশক্তিঃ পরিণামঃ, স্বামিশক্তিঃ প্রকাশঃ, এতয়োঃ সংযোগ ইতরেতরাধ্যাসরূপঃ স্যাদিতিশেষঃ। কস্মাদিত্যাহ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ—স্বরূপস্য দৃশিমাত্রস্য যা উপলব্ধিঃ সাক্ষাৎকারঃ সা যস্য হেতুঃ প্রয়োজনমস্যেত্যর্থঃ। ইদমত্রাবগন্তব্যং—দৃশিমাত্রঃ প্রকাশশক্তিমাত্রঃ স্বামী পুরুষো লীলয়াত্মবিস্মৃত ইব পরিণামাত্মিকাং স্বকীয়াং মবিদ্যাশক্তিং স্বীকরোতি, অয়মেব স্বস্বামিশক্তি-সংযোগঃ। তদা শক্তিঃ শক্তিমাংশ্চেতি দ্বিধাত্মনঃ স্বরূপং বিলোকয়তীব দ্রষ্টা। লীলাবসানেতু বিশুদ্ধস্বরূপোপলব্ধিং কুরুতে। তদা দৃশ্যস্যবিলয়ঃ সংযোগস্যচাবসানঃ। অতএবোচ্যতে—সংযোগ এব স্বরূপোপলব্ধৌ হেতুরিতি ॥ ২৩ ॥

ইতি পূর্ব্বে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগের বিষয় বলা হইয়াছে, এই সংযোগ কেন হয়, তাহা এই সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—স্বরূপ উপলব্ধির জন্যই স্বশক্তির ও স্বামিশক্তির সংযোগ হইয়া থাকে। এস্থলে স্ব শব্দের অর্থ—দৃশ্য এবং স্বামী শব্দের অর্থ—দ্রষ্টা। স্বশক্তি—পরিণাম, এবং স্বামিশক্তি—প্রকাশ। প্রতিনিয়ত পরিণাম প্রাপ্ত হওয়াই দৃশ্যের স্বরূপ, সেই জন্যই স্বশক্তি শব্দের অর্থ পরিণাম বলা হইয়াছে। দ্রষ্টী শক্তি ও প্রকাশশক্তি একই কথা। এস্থলে দুইটী শক্তির উল্লেখ হইয়াছে। একটী পরিণামশক্তি অপরটী প্রকাশশক্তি, এই উভয়ের সংযোগ হয়। কিরূপ সংযোগ? "ইতরেতরাধ্যাস" রূপ, অর্থাৎ পরিণামশক্তিতে প্রকাশশক্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া, পরিণামটী প্রকাশময় হয় আবার প্রকাশ-

শক্তিতে পরিণামশক্তি আরোপিত হইয়া প্রকাশটাও যেন পরিণামময় হইয়া উঠে। ইহারই নাম—"ইতরেতরাধ্যাস", ইহারই নাম—দ্রষ্টা ও দৃশ্যেরসংযোগ।

এস্থলে আমরা দুইটী শক্তির উল্লেখ দেখিয়া যেন ভ্রমে পতিত না হই। শক্তি দুইটী নহে একটী মাত্রই। একমাত্র প্রকাশশক্তিই যখন কার্য্য বা দৃশ্যসমূহকে প্রকাশ করে, তখন সে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া এক দিকে পরিণামশক্তি রূপে দৃশ্য সাজিয়া দাঁড়ায়, আবার অন্যদিকে প্রকাশশক্তি রূপে ওই পরিণাম শক্তিরূপ দৃশ্যের সত্তা ও প্রকাশ প্রদান করে। এইরূপে একই স্বামী একই দ্রষ্টা একই প্রকাশশক্তি প্রকাশ ও পরিণাম রূপ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া থাকে। বুঝিতে পারিলে না সাধক! আচ্ছা দেখ,—তোমার একটী মাত্র কল্পনাশক্তি, সে শত সহস্র প্রকারের কল্পনা অর্থাৎ দৃশ্য সৃষ্টি করিতেছে, আবার সমকালেই সেই সকল দৃশ্যের দ্রষ্টা অর্থাৎ ভোক্তাও সাজিতেছে। এইরূপেই একই প্রকাশ শক্তি যুগপৎ পরিণাম ও প্রকাশ উভয়রূপে—উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ, উভয়রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। শক্তি কখনও জড় হয় না অথবা জড় পদার্থে কখনও শক্তি থাকে না। প্রকাশ অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপ বস্তুই শক্তি। একমাত্র চিতিশক্তিই পরিণাম স্বরূপে আত্ম-প্রকাশ করিতে গিয়া জড়ের আকারে প্রতীতি গোচর হইয়া থাকেন। আদিবিদ্বান্ কপিল ঋষি প্রণীত সাংখ্যশাস্ত্রে দুইটী শক্তিই পরমার্থরূপে স্বীকৃত হইয়াছে, একথা যাহারা বলিতে উদ্যত হন, আমাদের মনে হয়, এখনও তাঁহাদের নিকট ঋষিবাক্যের যথার্থ অভিপ্রায় প্রতিভাত হয় নাই। যাহা শাস্ত্র যুক্তি ও অনুভববিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত, তাহা কখনও তত্ত্বদর্শী ঋষিদিগের অভিপ্রেত হইতে পারে না। আবার ভগবান্ বেদব্যাস প্রণীত বেদান্ত শাস্ত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মে কোনও রূপ অশুদ্ধতার স্পর্শ হইবার আশঙ্কায় যাঁহারা ব্রহ্মকে শক্তি-হীন বলিতে গিয়া জড় পদার্থ রূপে—মাত্র বাচনিক জ্ঞানগম্য বস্তুরূপে চিত্রিত করিতে প্রয়াস পান, তাঁহারাও এই পতঞ্জলি-প্রোক্ত "স্বস্বামি

শক্ত্যোঃ” কথাটির মধ্যদিয়া ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপের পরিচয় পাইতে পারেন। কিন্তু এ সকল অন্য কথা।

একই প্রকাশশক্তির যে দ্বিবিধ অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশ ও পরিণামরূপ শক্তিদ্বয়ের পরস্পর অধ্যাস, ইহা কেন হয়? কেন স্বশক্তি ও স্বামি-শক্তির সংযোগ হয়, তাহার উত্তর দিতে গিয়া ঋষি বলিলেন—“স্বরূপ উপলব্ধিহেতু” স্বরূপের উপলব্ধির জন্যই এই স্বস্বামিশক্তির অর্থাৎ প্রকাশ ও পরিণামশক্তির পরস্পর সংযোগ স্বীকার করা হয়। দ্রষ্টার স্বকীয় স্বরূপ উপলব্ধির জন্যই দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যের সংযোগ হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসা হইতে পারে—যিনি দ্রষ্টা, যিনি প্রকাশ স্বরূপ বস্তু, তিনি কি স্বস্বরূপের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত? নতুবা স্বরূপ পরিচয়ের জন্য তাহাকে কেন পরিণামশক্তির সহিত সংযোগ স্বীকার করিতে হয়? এ জিজ্ঞাসার উত্তর ঋষি পরবর্ত্তি সূত্রেই ব্যক্ত করিবেন।

তস্য হেতুরবিদ্যা ॥ ২৪ ॥

সংযোগী হেতুং নির্দ্দিশতি তস্যেতি তস্য স্ব-স্বামিশক্তি-সংযোগস্য হেতুঃ কারণং অবিদ্যা পূর্ব্বোক্তলক্ষণা মহতো লীলাশক্তিঃ। কেবলং জ্ঞানমেব যস্য স্বরূপং তস্য যা অবিদ্যা অজ্ঞানং সা লীলৈব। যথাহি লোকে কশ্চিত্ প্রবীণো বুদ্ধিমান্ বাত্সল্যাতিশয়েন শিশুনা পৌত্রেন ক্রীড়াং কুর্ব্বন্ স্বকীয়জ্ঞানগৌরবমবিস্মরন্নেবাজ্ঞায়িতঃ পৃষ্ঠে তমারোপয়তি তথেয়মবিদ্যা পরমপুরুষস্য লীলৈব। কথয়তি চ ব্রহ্মসূত্রং লীলাকৈবল্যতো বিশ্বসৃষ্টিমিতি ॥ ২৪ ॥

———

এই সূত্রে সংযোগের হেতু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহার অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্ব-স্বামিশক্তি-সংযোগের হেতু অবিদ্যা। অবিদ্যা কি, তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অবিদ্যা মহতী লীলাশক্তি। কেবল জ্ঞানই যাঁহার স্বরূপ, তাঁহার যে অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান, তাহাকে লীলাই বলিতে হইবে। জ্ঞানস্বরূপ দ্রষ্টায় যখন "আমি আমাকে জানিনা" এই ভাবটী প্রকাশ পায়, তখনই তাহাকে অবিদ্যা বলে। আমি বলিতে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মাই লক্ষিত হয়। তিনি যখন "জানিনা" ভাবে ভাবিত হন, তখনই তাঁহার নাম হয় লীলাশক্তিময় আত্মা। এই যে "জানিনা" ইহা যথার্থ জানিনা হইতেই পারে না, যেহেতু "জানা"ই তাঁহার স্বরূপ; সুতরাং বলিতে হইবে—ঐ যে "জানিনা", উহার তাৎপর্য্য—চক্ষু বাঁধিয়া না দেখার মত "যেন জানিনা", বাস্তবিক "জানিনা" নহে। এই যে জানা স্বরূপের না জানা, ইহারই নাম অবিদ্যা; তাই অবিদ্যাকে লীলাই বলিতে হয়। এ জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়—কোন প্রবীণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অতিশয় বাৎসল্য বশতঃ শিশুপৌত্রের সহিত খেলা করিতে গিয়া স্বয়ং অশ্ব হইয়া পৌত্রকে পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। এইরূপ ভাবকেই লীলা বলে। এই লীলা-বিলাসকালে অর্থাৎ অশ্বসাজ-গ্রহণকালে উক্ত প্রবীণ-ব্যক্তির স্বাভাবিক যে জ্ঞানগৌরব, তাহার বিন্দুমাত্র অপচয় বা বিস্মৃতি ঘটে না। "চক্ষু না বাঁধিলে চোর চোর খেলা চলে না।" বাস্তবিক পক্ষে দ্রষ্টার স্বরূপোপলব্ধির অভাব কখনও হয় নাই হইতে পারে না; তথাপি ঐ চক্ষু বাঁধারূপ অবিদ্যার বশে অর্থাৎ স্বেচ্ছাকৃত লীলার বশে তাদৃশ অভাব কল্পনা করিয়া, সেই কল্পিত অভাবকে দূর করিবার জন্যই এই দ্রষ্টা দৃশ্যের সংযোগ—এই স্ব-স্বামি-শক্তির সংযোগ স্বীকৃত হইয়া থাকে। ব্রহ্মসূত্রে স্বয়ং ব্যাসদেবও লীলা কৈবল্যবশেই বিশ্ব সৃষ্টির বিষয় বলিয়া গিয়াছেন। আশা করি সাধক! এইবার পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা বিদূরিত হইল।

এইবার অবিদ্যা সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা করা যাইতেছে। "আমি আমাকে জানিনা" স্বরূপ যে অবিদ্যা, ইহারই সাংখ্যশাস্ত্র প্রসিদ্ধ নাম অব্যক্ত বা প্রকৃতি। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, দেখ, ঐ অবিদ্যাও ত্রিগুণময়ী। "জানিনা" ভাবটীর উদয় হইলেই "জানা" স্বরূপটী আবৃত হইয়া পড়ে, এই আবরণের নাম তমোগুণ। আবার জানিনা হইলেই জানার জন্য একটা বেগ অর্থাৎ চেষ্টা আরম্ভ হয়; এই যে বিক্ষেপ, ইহারই নাম রজোগুণ। আর ঐরূপ চেষ্টা হইতে যে একটু একটু করিয়া বিশিষ্টভাবে জানা আরম্ভ হয়, তাহারই নাম সত্ত্বগুণ। ইতিপূর্ব্বে যে প্রখ্যা-প্রবৃত্তি-স্থিতিশীল অব্যক্তকে দৃশ্যের মূল বলা হইয়াছে, দেখ সাধক, সেই অব্যক্ত বা প্রকৃতিই এখানে অবিদ্যা নামে কথিত হইয়াছে। অব্যক্ত বা প্রকৃতি শব্দ উচ্চারণ করিলেই সাধারণতঃ একটা জড়পদার্থের ভাব অন্তঃকরণে ফুটিয়া উঠে, সেই ভাবটী যাহাতে যোগীর অন্তরে স্থান না পায়, সেইজন্যই যোগদর্শনের ঋষি তাহাকে অবিদ্যা আখ্যায় পরিচিত করিলেন। অবিদ্যা অর্থাৎ "না জানা" বলিলেই সঙ্গে সঙ্গে "জানা" বস্তুটীর স্মরণ হইয়া থাকে; কারণ, না জানাও এক প্রকার জানাই—অজ্ঞানও এক প্রকার জ্ঞানই। সুতরাং অবিদ্যা শব্দটীতে জ্ঞানকে অর্থাৎ চৈতন্যকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। যিনি বিদ্যা—যিনি চিতিশক্তি রূপিণী জননী, তিনিই যে অবিদ্যারূপে আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, এই তত্ত্বটী সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই সাধক স্বকীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। স্বশক্তি বা পরিণাম শক্তিরূপে যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ঐ অবিদ্যাই। ঐ আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিরই অন্য নাম পরিণামশক্তি। এই পরিণামশক্তি প্রকাশশক্তির সত্তায়ই সত্তালাভ করে অর্থাৎ সত্তাভাস লইয়া প্রকাশ পায়; তাই ইহাকে প্রকাশশক্তির অর্থাৎ দ্রষ্টারই লীলা বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতি বলিলেও দ্রষ্টারই প্রকৃতি বুঝায়। দ্রষ্টার অর্থাৎ আশ্রয়ের নিরপেক্ষ হইয়া প্রকৃতি নামে কোন কিছু কোনকালেই থাকিতে পারে না। লীলা,

শক্তি, ইচ্ছা, প্রকৃতি, অবিদ্যা, এই শব্দগুলি পরস্পর ভিন্ন হইলেও উহাদের অর্থ অভিন্নই। শক্তি কখনও জড়পদার্থ হয় না হইতে পারে না। চিতিশক্তিই শক্তি,উহা বিভিন্ন সংস্কারের মধ্য দিয়া বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হইতে গিয়াই জড়শক্তির ন্যায় প্রতীয়মান হন মাত্র; সুতরাং অবিদ্যা যে চিতিশক্তিরূপা জননীই এ বিষয়ে কোন সংশয়ই হইতে পারে না।

তবে উহার হেয়ত্ব বলা হইল কেন? যতদিন অবিদ্যাকে চিতিশক্তি হইতে পৃথক্‌রূপে জড়রূপে জানা যায়, ততদিন উহা হেয়ই বটে। ততদিন ত ঠিক অবিদ্যার স্বরূপ জানা যায় না। ততদিন উহা জড়রূপে দুঃখদায়করূপেই প্রতীত হইতে থাকে, কাযেই সমস্ত শাস্ত্র উহাকে হেয়রূপেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু যখন বুঝিতে পারা যায়—অবিদ্যা সেই চিতিশক্তিরই—সেই চৈতন্যময়ী জননীরই স্বেচ্ছাকৃত বিশিষ্ট প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তখন আর অবিদ্যার হেয়ত্ব বা উপাদেয়ত্ব কিছুই থাকেনা। অবিদ্যার স্বরূপটী ভাল রূপ বুঝাইয়া দিবার জন্যই উহার হেয়ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। যেখানে হেয়ত্ব থাকে সেখানে সুতরাং উপাদেয়ত্বও থাকে। সাধকের যতদিন ঐ হেয়োপাদেয় বুদ্ধি খুব সুদৃঢ়, ততদিনই তাহার নিকট হেয়ত্ব অংশ স্পষ্ট ভাবে উপস্থিত করা প্রয়োজন। ঐ অংশটী ধরিতে পারিলেই উপাদেয় অংশের প্রতি সাধকের লক্ষ্য পড়ে, তখন সে দেখিতে পায়—যাহা উপাদেয় তাহাও হেয়রূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে। এইরূপে ধীরে ধীরে সাধক ক্রমে হেয়োপাদেয় বুদ্ধির পর পারে চলিয়া যায়। অবিদ্যা যে হেয়ও নহে উপাদেয়ও নহে, এই সত্যতথ্যটী সাধকহৃদয়ে সম্যক্‌ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই উহার হেয়ত্ব প্রতিপাদনে শাস্ত্রকারগণের এত প্রযত্ন। সে যাহা হউক, প্রিয়তম সাধক! তুমি জানিয়া লও—একমাত্র মা-ই আছেন, তিনি দৃশমাত্র চিতিমাত্ররূপে বাক্য মনের অগোচর হইয়াও অবিদ্যারূপে মহতী-লীলা-শক্তিরূপে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করিতেছেন। মা ছাড়া কোথাও কিছু নাই। হেয়রূপেও মা,উপাদেয়রূপেও মা, আবার হেয়োপাদেয়ের অতীতরূপেও

মা-ই, অন্য কেহ নহে। অন্য কেহ নাই, অন্য কিছু নাই, কেবল মা-ই আছেন। ওরে, যতদিন "আমি" আছে, ততদিন তাঁকে মা বলিয়াই ডাকিতে হইবে, মা বলিয়াই দেখিতে হইবে। আমিটাই যে মাতৃত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি। পুত্র থাকে বলিয়াইত মা! যখন পুত্র নাই, তখন মাও নাই। ওরে, আমি কথাটী বলা মাত্রই ত মায়ের কোলে সন্তানের ছবি ফুটিয়া উঠে। মহতী চিতিশক্তির অঙ্কে আমিরূপা একটী বিশিষ্ট সত্তা অভিব্যক্ত হইয়াছে; তাই ত "আমি" এই শব্দটা—এই বোধটা প্রকাশ পাইতেছে। হে আমার আমিসমূহ, হে আমার স্নেহের সন্তানসমূহ, তোমরা মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াও, মাকে দেখিতে পাইবে। জীবন ধন্য হইবে। অবিদ্যা বলিয়া অজ্ঞান বলিয়া উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিও না। চিতিশক্তি যখন লীলাময়ী হন, তখন তাঁহারই নাম হয় অবিদ্যা। তোমাদের অন্তরে যাহা ব্যষ্টি প্রাণশক্তিরূপে বিকাশ পাইতেছে, বিশ্বে যাহা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়শক্তিরূপে মহতী প্রাণশক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহারই নাম অজ্ঞান বা অবিদ্যা। উনিই ঈশ্বরী—উনিই নিয়ন্ত্রী, উনিই যোগমায়া জননী। উহাঁতে আত্মসমর্পণ কর, প্রণিধান কর, তোমার যোগলাভ হইবে। তুমি মুক্ত হইবে।

तदभावात् संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम् ॥२५॥

हानमाचष्टे तदिति। तदभावात् तस्या अविद्याख्याया लीलाया अभावात् संयोगाभावः संयोगः प्रागुक्तस्तस्याभावः सुतरामित्यर्थः। तदेव हानमित्युच्यते योगशास्त्रेषु। तत् तदा दृशेः प्रकाशस्वरूपस्य द्रष्टुः कैवल्यं केवलीभावः स्वरूपावस्थानमित्यर्थः। न चास्ति लीला-समकालेऽपि कैवल्याभावः कैवल्यस्वरूपत्वाद्द्रष्टुरित्यवधेयम् ॥२५॥

হান কি, তাহাই এই সূত্রে বলা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহার অভাবে সংযোগের অভাব হয়, ইহারই নাম হান, তখন দৃশিমাত্রস্বরূপ দ্রষ্টার কৈবল্য হয়।

তাহার অভাব বলিতে এস্থলে অব্যবহিত পূর্ব্বসূত্র বর্ণিত অবিদ্যার অভাব বুঝিতে হইবে। অবিদ্যানামক লীলাশক্তির অভাব হইলেই সংযোগের অভাব সুতরাং সিদ্ধ হইয়া যায়। প্রকাশশক্তি ও পরিণামশক্তির যে পরস্পর অধ্যাসরূপ সংযোগ স্বীকার করা হয়, একমাত্র অবিদ্যা বা লীলাই তাহার হেতু, সেই হেতু বিনষ্ট হইলে সংযোগরূপ কার্য্য থাকিতেই পারে না। কারণের অভাবে কার্য্যের অভাব অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—প্রকাশশক্তি-স্বরূপ দ্রষ্টা অবিদ্যার বশে অর্থাৎ লীলার ছলে পরিণামশক্তিস্বরূপ দৃশ্য সাজিয়া উভয় শক্তির সংযোগ সাধন করেন অর্থাৎ যুগপৎ পরস্পর অধ্যস্ত হইয়া থাকেন। এই যে সংযোগ ইহা ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ লীলা থাকে। লীলা পরিত্যাগ করিলে আর সংযোগ থাকিতেই পারে না। এই যে লীলাপরিত্যাগ-জন্য সংযোগাভাব, ইহারই যোগশাস্ত্র প্রসিদ্ধ নাম "হান"। যোগিগণ এই সংযোগাভাবকে হান নামেই অভিহিত করিয়া থাকেন। তখন দ্রষ্টার কৈবল্য হয়। কৈবল্য শব্দের অর্থ কেবলীভাব—অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থান। দ্রষ্টা যখন লীলাময়, তখন তাহার সহিত দৃশ্যসংযোগ বিদ্যমান, যখন লীলাপরিত্যাগ করিয়া স্বস্থ, তখন তিনি কৈবল্য প্রাপ্ত।

সাধক! তুমি এরূপ আশঙ্কা করিও না যে, লীলাসমকালে বুঝি দ্রষ্টার কৈবল্যের অভাব ছিল তাহা নহে, দ্রষ্টা সর্ব্বকালেই স্বস্থ সর্ব্বকালেই কৈবল্য প্রাপ্ত। তবে আমাদের নিকট যতদিন লীলাময় রূপে অবিদ্যাচ্ছন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, ততদিন তিনি যেন কৈবল্যচ্যুত রূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকেন। যতদিন আমরা তাঁহার এই লীলাময় অবস্থাটী দেখিতেই ভালবাসি, ততদিন কল্পতরু তিনি

সেইরূপেই প্রকাশিত হন। তারপর যেদিন সত্য সত্যই তাঁহার লীলাতীত স্বরূপটী দেখিবার অভিলাষ হয়, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তেই আমরা দেখিতে পাই, তিনি নিত্যস্বস্থ নিত্যকৈবল্যপ্রাপ্ত নিত্যনির্ব্বিকার। এই কৈবল্যই মানবজীবনের চরম এবং পরম লক্ষ্য। যতদিন "হান" না হয়, যতদিন লীলাপরিত্যাগ না হয়, ততদিন এই কৈবল্যের আশা নাই। কি উপায়ে এই হান সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা পরে বলা হইতেছে।

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥২৬॥

হেয়ং হেয়হেতুর্হানং হানোপায় ইতি চতুর্ব্যূহং যোগশাস্ত্রং তত্রাবশিষ্টং হানোপায়মাচষ্টে বিবেকেতি। অবিপ্লবা বিপ্লবরহিতা সংশয়-বিপর্য্যয়াদি ভাবনারহিতা যা বিবেকখ্যাতি র্বিবেকস্য বৌদ্ধপ্রত্যয়স্য—দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽদ্বিতীয়ঃ পুরুষোঽস্তীত্যেবং রূপস্য খ্যাতিঃ প্রকাশ উদয় ইতি যাবৎ। সা এব হানোপায়ঃ হানস্য প্রাগুক্তসংযোগাভাবরূপস্য উপায়ো ভবতীতি শেষঃ। তদুক্তং "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" বুদ্ধৌ সত্তামাত্রানুভূতিরেব বিদিক্রিয়ার্থঃ ॥ ২৬ ॥

হেয়, হেয়হেতু, হান এবং হানোপায়, এই চতুর্ব্যূহ যোগশাস্ত্র। তন্মধ্যে প্রথম তিনটীর বিষয় ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে, অবশিষ্ট হানোপায়টী এই সূত্রে উপদিষ্ট হইতেছে। ঋষি বলিলেন—অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতিই হানোপায়। অবিপ্লবা শব্দের অর্থ—সংশয় এবং বিপর্য্যয় ভাবনারূপ বিপ্লবরহিত। বিবেক খ্যাতি—নির্ম্মল বুদ্ধি সত্ত্বের প্রকাশ। দৃশিমাত্র শুদ্ধ অদ্বিতীয় পুরুষ আছেন, এইরূপ

প্রত্যয়ের উদয় হওয়াকে বিবেকখ্যাতি কহে। ইহাই হানোপায় নামে যোগশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। হান কি, তাহা পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে। সেই হানের উপায় এই অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি, এই সংশয় ও অবিশ্বাসশূন্য দ্রষ্টার অস্তিত্ব-বিষয়ক প্রত্যয়।

অধিকাংশ মানুষেরই "ঈশ্বর আছেন" এইরূপ জ্ঞান আছে। ঐ জ্ঞান অনুমান মাত্র, উহা অবিপ্লবা নহে। ঐরূপ প্রত্যয় নিয়তই সংশয় এবং বিপর্য্যয় ভাবনা দ্বারা কলুষিত। "ঈশ্বর থাকিতেও পারেন" এইরূপ সংশয় এবং "ঈশ্বর নাই" এইরূপ বিপর্য্যয় ভাবনা বা অবিশ্বাস সাধারণ মানুষের থাকে। হয়ত কেহ কেহ মনে করেন—তাহাদের ভগবৎ-সত্তাবিষয়ক জ্ঞান সুদৃঢ়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রতিকূল অবস্থায় নিপতিত হইয়া উৎপীড়িত হইতে থাকিলে সে দৃঢ়তা প্রায়ই থাকে না, তখন আবার বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হয়। আরও খুলিয়া বলিলে বলিতে হয়—যতক্ষণ মন আছে, ততক্ষণ অবিপ্লবা খ্যাতি একেবারেই অসম্ভব; কারণ মনই পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয় এবং বিপর্য্যয় ভাবনারূপ অবিশ্বাসকে উপস্থিত করিয়া থাকে; সুতরাং মনের বিলয় না হইলে খ্যাতি অর্থাৎ পুরুষের সত্তাবিষয়ক প্রত্যয় কখনও অবিপ্লবা হইতেই পারে না। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে—নির্ম্মল বুদ্ধিসত্ত্বকেই বিবেক-খ্যাতি কহে। নির্ম্মল শব্দের অর্থ, মনের সহিত সংযুক্ত না থাকা। শ্রবণ অধ্যয়ন অনুমান বা প্রতিভাজন্য যে জ্ঞান, তাহাকে বিবেক খ্যাতি বলে না। খ্যাতি শব্দের অর্থ—প্রকাশ, উদয়। যেরূপ বুদ্ধির উদয় হইলে সত্তাস্বরূপ দ্রষ্টার প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহাই বিবেক-খ্যাতি। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, তাঁহাকে—সেই অদ্বয় আত্মাকে জানিতে পারিলেই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। পুরুষকে জানা অর্থে নির্ম্মল বুদ্ধিতে পৌরুষীয় সত্তানুভব। ইহাই বিবেক খ্যাতি।

প্রিয়তম সাধক! হয়ত তুমি জিজ্ঞাসা করিবে—বিবেক খ্যাতি হইলে কেন "হান" হইবে—কেন দ্রষ্টৃদৃশ্য-সংযোগ থাকিবে না। শুন বলিতেছি—অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি হইলে সত্তাবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান

লাভ হয়। সত্তা—অস্তিত্ব যে একমাত্র দ্রষ্টারই, দ্রষ্টা ব্যতীত অন্য কিছুর যে সত্তাই নাই, থাকিতে পারে না, এইরূপ সুদৃঢ় প্রত্যয় উদিত হইলে আর অবিদ্যা বলিতে কিছু থাকে না, সুতরাং দৃশ্য বলিতেও কিছু থাকে না। অতএব দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগাভাবরূপ “হান” অনায়াস সিদ্ধরূপেই লাভ হইয়া থাকে ; তাই যোগদর্শনের ঋষি অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতিকেই হানের উপায়রূপে নির্দ্দেশ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ষোড়শ ও সপ্তদশ সূত্রে হেয় কি এবং হেয়হেতু কি, তাহা বর্ণিত হইয়াছে, আর এই দুইটী সূত্রে হান কি এবং হানের উপায় কি, তাহা বর্ণিত হইল। যদিও অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশের ব্যাখ্যানাবসরে তাহাদের হেয়ত্ব এবং হানোপায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তথাপি পুনরায় অতি বিশদ ও সূক্ষ্মভাবে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্যই এই চতুর্ব্যূহ যোগ শাস্ত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। স্থূণা-নিখনন-ন্যায়ে সূক্ষ্মবিষয় সমূহের পুনঃ পুনঃ আলোচনাই সাধকগণের পক্ষে বিশেষ হিতকর হইয়া থাকে ; তাই যাঁহারা যথার্থ সাধক, তাঁহারা অধ্যাত্মতত্ত্বসমূহে পুনরুক্তি দোষ কখনই দেখিতে পান না।

तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७ ॥

हानोपायां प्रपञ्चयति तस्येति। तस्य हानोपायस्य विवेकख्यातेरित्यर्थः। प्रान्तभूमिः प्रकृष्टोऽन्तः प्रान्तः पर्य्यन्तः परिसमाप्तिरिति यावत्। प्रान्ता भूमयोऽवस्था यस्याः सा तादृशी प्रज्ञा प्रकृष्टं ज्ञानं सप्तधा सप्तप्रकारा भवतीति शेषः। तद्यथा शुभेच्छा सुविचारणा तनुमानसा सत्त्वापत्तिरसंसक्तिः पदार्थाभाविनी तुर्य्यगा चैतेषां विशेषलक्षणानि यथायोग्यमुन्नेयानीति ॥ २७ ॥

এই সূত্রে পূর্ব্বোক্ত হানোপায় প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন —তাহার প্রান্তভূমিপ্রজ্ঞা সাত প্রকার। তাহার—বিবেকখ্যাতিরূপ হানোপায়ের। প্রান্তভূমি—পর পর অবস্থা, এই পদটী প্রজ্ঞার বিশেষণ। সপ্তধা—সাত প্রকার। প্রজ্ঞা প্রকর্ষতাপ্রাপ্ত জ্ঞান। সেই বিবেকখ্যাতিরূপ হানোপায়ের পর পর সাত প্রকার অবস্থা আছে। ইহাই সপ্তভূমিকা প্রজ্ঞা নামে কথিত হয়। সেই সাতটি অবস্থা যথা, শুভেচ্ছা সুবিচারণা তনুমানসা সত্তাপত্তি অসংসক্তি পদার্থাভাবিনী এবং তূর্য্যগা। ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, এস্থলে পুনরায় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ মানুষের শুভ ইচ্ছা উপস্থিত হয়। পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর নাম অশুভ, এই অশুভ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অর্থাৎ মুক্তিরূপ শুভলাভ করিবার ইচ্ছা হয়। ইহাই হানোপায়ের প্রথম অবস্থা বা প্রথম প্রান্তভূমি। এই ইচ্ছার তীব্রতা বা মৃদুতা অনুসারে গতিরও যে তারতম্য হয়, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। "তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ" ইত্যাদি সূত্রে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রান্তভূমি—সুবিচারণা। বৃত্তিসারূপ্যপ্রাপ্ত পুরুষে বিচরণ করার নাম সুবিচারণা। কেবল শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন জন্য যে বাচনিক তর্ক ও বিচার উপস্থিত হয়, তাহা কখনও বিবেক খ্যাতির অবস্থা হইতে পারে না; কারণ তাহাতে তনুমানসারূপ তৃতীয় অবস্থা আনয়ন করিতে সমর্থ হয় না। প্রথম অবস্থা শুভেচ্ছা হইতেই এই বৃত্তি-সারূপ্যপ্রাপ্ত ব্রহ্মে বিচরণ করিবার অবস্থা উপনীত হয়। আমরা ইহার নাম রাখিয়াছি—সত্যপ্রতিষ্ঠা। যতদিন ঠিক ঠিক সত্যপ্রতিষ্ঠা আরম্ভ না হয়, ততদিন বুঝিতে হইবে যথার্থ শুভেচ্ছা উদিত হয় নাই, অর্থাৎ প্রথমভূমিকাও লাভ হয় নাই।

তৃতীয় তনুমানসা। সুবিচারণা হইতেই ইহার আবির্ভাব হয়। যে পরিমাণে ব্রহ্মে বিচরণ হইতে থাকে, সেই পরিমাণেই মন ক্ষীণ হইতে থাকে। কারণ ঐরূপ বিচরণ করার নাম বুদ্ধিযোগ। বুদ্ধিযোগের

অনুশীলনের দ্বারা বুদ্ধিই পরিপুষ্ট এবং নির্ম্মল হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে মন দিন দিন সংশয় বিপর্য্যয় প্রভৃতি ভাব পরিত্যাগ করিতে থাকে ; কাযেই উহার ক্ষীণতা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

চতুর্থ সত্তাপত্তি। সত্তা অর্থাৎ অস্তিত্বকে পাওয়ার নাম সত্তাপত্তি। আপত্তি শব্দের অর্থ—সম্যক্‌প্রাপ্তি। মন তনুতা প্রাপ্ত হইলেই বুদ্ধির স্বাভাবিক স্থৈর্য্য প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহার ফলে সে পুরুষের সত্তা পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ অস্তিত্ব বলিতে যে একমাত্র দ্রষ্টাকেই বুঝায়, তাহা বুদ্ধি তখন সম্যক্ অবধারণ করিতে পারে। এইটি বিবেকখ্যাতির চতুর্থ অবস্থা।

পঞ্চম অসংসক্তি। সংসক্তির অর্থাৎ আসক্তির অভাবই অসংসক্তি। যে পরিমাণে পূর্ব্বোক্ত সত্তাপত্তি অবস্থাটি দৃঢ়ভূমিক হইতে থাকে, সেই পরিমাণেই আত্মা ব্যতীত "অন্য কিছু আছে" এই জ্ঞান পরিক্ষীণ হইয়া যায় ; সুতরাং অনাত্মবস্তুর প্রতি যে আসক্তি অর্থাৎ হেয়োপাদেয় বুদ্ধি, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়।

ষষ্ঠ পদার্থাভাবিনী। আত্মা ব্যতীত অন্য পদার্থের একেবারেই অভাব বিষয়ক প্রজ্ঞার নাম পদার্থাভাবিনী। চতুর্থ পঞ্চম ভূমির পরিপাক অবস্থায় সর্ব্বদা একমাত্র আত্মসত্তাই প্রতিভাত হইতে থাকে। এ অবস্থায় বুদ্ধিতে আত্মা ব্যতীত অন্য কোন পদার্থেরই সত্তা প্রতিভাত হয় না।

সপ্তম অবস্থা তূর্য্যগা। তূর্য্য শব্দের অর্থ চতুর্থ, চতুর্থ অবস্থা প্রাপ্তির নাম তূর্য্যগা। জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি, এই তিনটি অবস্থা মানুষের স্বাভাবিক। ইহা ছাড়া আর একটি অবস্থা আছে, তাহাকে তুরীয় বা তূর্য্য অবস্থা কহে, ইহা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ নামে অভিহিত হয়। এই অবস্থায় উপনীত হইলে জীব আর পুনরাবর্ত্তন করে না। জীব তখন ব্রহ্মই হইয়া যায়। যোগশাস্ত্রে ইহাই "দৃশেঃ কৈবল্যম্" নামে কথিত হইয়াছে। হানোপায়ের বা বিবেকখ্যাতির এই সাত প্রকার অবস্থা প্রথম হইতেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যোগী মাত্রেরই ইহা হইয়া

থাকে। প্রাচীন ভাষ্যকারগণ সপ্তধা প্রান্তভূমি প্রজ্ঞার অন্য সাত প্রকার অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তি রাবিবেকখ্যাতেঃ ॥ ২৮ ॥

অধুনা প্রজ্ঞালাভোপায়ং প্রস্তৌতি যোগাঙ্গেতি। যোগাঙ্গানুষ্ঠানাৎ যোগাঙ্গানাং বক্ষ্যমাণলক্ষণানামনুষ্ঠানাৎ শ্রদ্ধয়া যথাধিকারমনুশীলনাদশুদ্ধিক্ষয়ে—অশুদ্ধির্নাম মলাবরণবিক্ষেপরূপা, তথাহি নাস্ত্যাত্মেতি মলং ন ভাতিচেত্যাবরণং, কর্ত্তব্যমতঃ সুখস্বরূপস্যাত্মনোঽন্বেষণমিতি বিক্ষেপঃ। এতদ্রূপায়া অশুদ্ধেঃ ক্ষয়ে সতি জ্ঞানদীপ্তির্জ্ঞানস্যাত্মস্বরূপাবগতে দীপ্তিরুজ্জ্বলতা ভবতীতি শেষঃ। কিং যাবদিত্যাহ—আবিবেকখ্যাতেঃ। আ ইত্যভিবিধৌ প্রাগুক্তবিবেকখ্যাতিপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ।

ইদমত্রাবগন্তব্যং—সপ্তধা প্রান্তভূমিপ্রজ্ঞায়াঃ ভূমিঃ শুদ্ধিক্ষয়েচ্ছাজ্ঞানদীপ্তি-চিকীর্ষা বা শুভেচ্ছা নাম। বহির্লক্ষণমস্যা যোগাঙ্গানুষ্ঠানমিতিভাবঃ। অপিচ নাস্তি ন ভাতিরূপং যদজ্ঞানং তদপি জ্ঞানমেব কিন্তু দীপ্তিহীনং, যোগাঙ্গানুষ্ঠানাত্তস্য দীপ্তির্ভবতীতি।

এইবার প্রজ্ঞালাভের উপায় প্রস্তাবিত হইতেছে, ইতিপূর্ব্বে যে অভ্যাস বৈরাগ্য ও ঈশ্বরপ্রণিধানাত্মক ক্রিয়াযোগরূপ উপায়ের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাই বিস্তৃতভাবে এস্থলে বর্ণিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত উপায়গুলির কার্য্যকরী অবস্থাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইবে। ঋষি বলিলেন—যোগাঙ্গ সমূহের অনুষ্ঠান হইতে অশুদ্ধি ক্ষয় হয়, অশুদ্ধি

ক্ষয় হইলে বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্ত জ্ঞানদীপ্তি হইয়া থাকে। যোগাঙ্গ কি, তাহা পরে বিশেষ লক্ষণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে। সেই বক্ষ্যমাণ যোগাঙ্গ সমূহের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অনুষ্ঠান—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাধিকারে যথাযোগ্য অনুশীলন। ঐরূপ অনুশীলনের ফলে অশুদ্ধি ক্ষয় হয়। অশুদ্ধি কি ? মল আবরণ ও বিক্ষেপ। "আত্মা নাই" এইরূপ যে ভাব, ইহাই মল। "আত্মা প্রকাশিত হইতেছেন না" এইরূপ যে ভাব, তাহাই আবরণ। অতএব "সুখস্বরূপ আত্মার অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য" এইরূপ যে ভাব, তাহাই বিক্ষেপ নামে কথিত হয়। ইহাই অশুদ্ধি, যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে এই অশুদ্ধি ক্ষয় হয়।

জগতের অধিকাংশ লোকই পূর্ব্বোক্ত মলাবরণ-বিক্ষেপরূপ অশুদ্ধিযুক্ত। এই যে জগৎময় প্রাণিমাত্রকেই সুখের সন্ধানে ছুটিতে দেখা যায়, বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হয়—যেন দেহেন্দ্রিয় মনের সুখ বিধানের জন্যই ঐ ছুটাছুটি হইতেছে; কিন্তু চক্ষুস্মান্ ব্যক্তি দেখিতে পান—সকলে আত্মার অন্বেষণেই ছুটিতেছে। সুখ যে আত্মারই স্বরূপ! অনাত্মবস্তুতে সুখ নাই বলিয়াই জীব জগদ্ ভোগ করিয়া তৃপ্তি পায় না সুখ পায় না; সুতরাং জগৎময় যে সুখের অন্বেষণ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা তত্ত্বতঃ আত্মারই অন্বেষণ। ইহাই বিক্ষেপ। এই বিক্ষেপের কারণ—আত্মার অপ্রকাশ। সুখস্বরূপ আত্মা প্রকাশিত হন না বলিয়াই তাঁহার সন্ধান করিতে হয়। এই যে অপ্রকাশ ভাব ইহাই আবরণ। আবার যিনি স্বপ্রকাশ সর্ব্বব্যাপী পূর্ণ আত্মা, তিনি প্রকাশিত হন না, একথাই বা কিরূপে হয় ? হাঁ। হইতে পারে—যে ব্যক্তি আত্মার সত্তা স্বীকার করে না বা করিতে পারে না, তাহার নিকট আত্মা চিরদিনই অপ্রকাশ থাকেন। এত সুপ্রকাশ হইয়াও নাস্তিক্যবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির নিকট আত্মা অপ্রকাশিতই থাকেন। এই যে নাস্তিক্যভাব ইহারই নাম মল। মুখে অনেকে হয়ত বলেন, স্বীকারও করেন—"হ্যাঁ ঈশ্বর আছেন", কেহ কেহ উহা অন্তরেও কথঞ্চিদ্ বিশ্বাস করেন বটে, কিন্তু ঐ যে আস্তিক্যবুদ্ধি বা বিশ্বাস, উহা এত ক্ষীণ

এত অল্প যে তাহা প্রায় নাস্তিক্যবুদ্ধিরই সন্নিহিত বলা যায়। "ঈশ্বর আছেন" এই জ্ঞান যাহার আছে, সে কখনও সুখ দুঃখে বিচলিত হয় না, কোন নিন্দিত কার্য্য করিতে পারে না; সুতরাং যখন দেখিতে পাই—কেহ নিন্দিত কর্ম্ম করিতে পশ্চাৎপদ নহে, জাগতিক সুখ দুঃখে বা প্রতিকূল অবস্থায় বিহ্বল হইতেও ভুল করে না, অথচ মুখে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক বাক্য লহরীর বিরাম নাই, তখনই বুঝিতে পারি—সেরূপ ব্যক্তির আস্তিক্যবুদ্ধি হয় নাই; চিত্তে মল আছে। আরে, অস্তিত্বে যাঁর বিশ্বাস হয়, সে অভয় আনন্দে নিত্যই প্রতিষ্ঠিত থাকে, ইহার অন্যথা হয় না। কিন্তু এ সকল অন্য কথা।

পূর্ব্বোক্ত মল আবরণ এবং বিক্ষেপরূপ অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে জ্ঞানদীপ্তি হইতে থাকে। আত্মস্বরূপ অবগতির নাম জ্ঞান, তাহার উজ্জ্বলতা হইতে থাকে। কি পর্য্যন্ত দীপ্তি হয়? বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্ত; নির্ম্মল বুদ্ধিসত্তায় আত্মসত্তাবিষয়ক অনুভব পর্য্যন্ত জ্ঞানদীপ্তি হইয়া থাকে। মানুষের সাধনা বা প্রযত্নের ফল এই পর্য্যন্তই।

এই সূত্রে আরও জ্ঞাতব্য আছে পূর্ব্বে যে সপ্তধা প্রান্তভূমি প্রজ্ঞার কথা বলা হইয়াছে, তাহার প্রথম ভূমি শুভেচ্ছারই অপর নাম অশুদ্ধিক্ষয়েচ্ছা অর্থাৎ জ্ঞানদীপ্তি করিবার ইচ্ছা। যে ব্যক্তির এইরূপ ইচ্ছার উদয় হয়, তাহার বাহ্য লক্ষণরূপে যোগাঙ্গ সমূহের অনুষ্ঠান হইবেই। যতদিন দেখিতে পাওয়া যায় শুভেচ্ছা আছে, কিন্তু যোগাঙ্গানুষ্ঠান নাই, ততদিন বুঝিবে—উহা যথার্থ ইচ্ছা নহে; ইচ্ছার পূর্ব্বাভাষ মাত্র। ইচ্ছা থাকিলে কার্য্য হইবেই।

আর একটী কথা এই যে, "নাস্তি ন ভাতি" রূপ যে অজ্ঞান, তাহাও জ্ঞানই, তবে দীপ্তিহীন। জ্ঞানের এই যে দীপ্তিহীনতা, ইহাকে দূর করিয়া দীপ্তিশীলা করিবার জন্যই যোগাঙ্গসমূহের অনুষ্ঠান। অজ্ঞানের দীপ্তি হয় না, অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানেরই দীপ্তি হয়, অজ্ঞান চিরতরেই বিনষ্ট হইয়া যায়।

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान-
समाधयोऽष्टावङ्गानि ॥ २९ ॥

योगाङ्गान्यभिदधाति यमेति। यमनियमादयः पारिभाषिका वक्ष्यन्ते स्वैरेव सूत्रैः। शब्दमात्रप्रतिपाद्यास्तर्थाः सुगमास्तथाहि यम इति कायमनसोरुच्छृङ्खलता-निवृत्तिरूपः संयमः। नियम इति तत्तत्-कर्म्म-निष्पादक-पौर्व्वापर्य्यमितिकर्त्तव्यता च। आसनमिति तत्तत्-कर्म्म-सम्पादनानुकूलाङ्गसंस्थानविशेषः। प्राणायाम इति प्राणस्यै-वायामो विस्तारः। प्रत्याहार इतीन्द्रियाणामन्यतः प्रत्याहरणम्। धारणेति तत्र तत्र पुनः पुनश्चित्तनियोगः, ध्यानमिति धारणा परिपाको-ऽविच्छिन्नचित्तनियोगरूपम्, तथा समाधिरिति अर्थमात्र-निर्भासरूपः। एतानि योगाङ्गानि सर्व्वकर्म्मारम्भकानि भवन्ति। न तत्र दृश्यते चक्षुरुन्मिषन्निमिषन्नपि लोके न किञ्चिदपि कर्म्मान्तरेण योगाङ्गानि सम्पद्यते क्वचिदिति सर्व्व एव प्राणिनो ज्ञानतोऽज्ञानतो वा सर्व्वकर्म्मसु सर्व्वथानु-तिष्ठन्ति योगाङ्गानि। एवञ्च प्रतिकर्म्म योगाङ्गालोकनक्षमाः कीर्त्त्यन्ते योगिन इति। तत्त्वतो योगिनोऽपरेऽपि प्राकृता योगचक्षुर्विहीनेति।

प्रागुक्ताभ्यास-वैराग्यवतामेतानि वहिर्लक्षणानि स्वतएवाविर्भवन्ति समासन्नत्वाद्योगस्य। न च निरवयवरूपस्य द्रष्टुः स्वरूपस्य कथमङ्गा-नीति वाच्यमविद्याकृतान्येतान्यङ्गत्वेनोपवर्णितानि एवञ्च समाधेरपि योगाङ्गेषु परिपठितत्वादस्य योगत्वं केचिदुक्तं तन्नाचक्षणिकमिति ॥२९॥

এই সূত্রে ঋষি যোগাঙ্গসমূহের নাম উল্লেখ করিলেন। যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান এবং সমাধি, এই আটটী যোগাঙ্গ। পরে পৃথক পৃথক সূত্রে এ সকলের লক্ষণ উক্ত হইবে। আমরা এ স্থলে ঐ সকল শব্দের দ্বারা সাধারণ ভাবে যাহা বুঝিতে পারা যায়, তাহাও বুঝিতে চেষ্টা করিব। যম শব্দে শরীর এবং মনের

যে অস্বাভাবিক উচ্ছৃঙ্খলতা, তাহার সংযম বুঝা যায়। যে কোন কার্য্য করিবার সময়ই স্বাভাবিক ভাবে এইরূপ সংযম উপস্থিত হয়। সংযম ব্যতীত কার্য্যের আরম্ভই হয় না, যদিও তাহা অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী, তথাপি যেরূপ কার্য্য অনুষ্ঠানের জন্য যতটুকু সংযতভাব আবশ্যক, ততটুকু সংযমকেও যোগাঙ্গরূপ যম বলা যায়। নিয়ম শব্দে বুঝিতে হইবে—অভীষ্টকর্ম্ম-নিষ্পাদক পৌর্ব্বাপর্য্য বা ইতিকর্ত্তব্যতা। "ইহা করিয়া ইহা করিতে হইবে" ইত্যাদি প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানের যে নিয়ম পদ্ধতি, তাহাকেই নিয়ম বলা যায়। আসন শব্দে বুঝিতে হইবে—যেরূপ কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির যেরূপ বিন্যাস করা আবশ্যক, তাহাই সেই কর্ম্মের পক্ষে আসন। প্রাণায়াম শব্দে প্রাণের বিস্তার বুঝিতে হইবে। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। বিভিন্ন কর্ম্মে বিভিন্ন প্রকারে বা পরিমাণে প্রাণসত্তার প্রসার বা সংকোচ হইয়া থাকে, ইহাই প্রাণায়াম। প্রত্যাহার শব্দে বুঝিতে হইবে—ইন্দ্রিয় সমূহের প্রত্যাহরণ অর্থাৎ অন্যদিকে পরিধাবিত ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ পূর্ব্বক অভীষ্ট কর্ম্মে নিয়োগ করা। ধারণা শব্দে বুঝিতে হইবে,—অভীষ্ট কর্ম্মে পুনঃ পুনঃ চিত্ত নিয়োগ করা। ধ্যান শব্দে ধারণার পরিপাক অবস্থা বুঝায় অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে অভীষ্ট বিষয়ে চিত্ত নিয়োগ করাই ধ্যান। আর সমাধি শব্দে একেবারে তন্ময়তা—ধ্যেয় বিষয়ে আত্মহারা হওয়া বুঝায়। এইরূপে আটটী যোগাঙ্গই যথাসম্ভব প্রতিকর্ম্মে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, কর্ম্মমাত্রই যোগ, প্রত্যেক কর্ম্মের আরম্ভ হইতে পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত এই যমনিয়মাদি সমাধি পর্য্যন্ত পর পর ঠিক আটটী অঙ্গই অজ্ঞাতভাবেও অনুষ্ঠিত হইয়া যায়। সকলেরই হয়। ইহা এত স্বাভাবিক যে, ইহার অন্যথা কখনই হইতে পারে না। তবে যাঁহারা চক্ষুষ্মান্ কেবল তাঁহারাই ইহা লক্ষ্য করিতে পারেন এবং সেইজন্যই তাঁহারা যোগী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আর যাহারা সাধারণ মানুষ, তাহারা প্রতিনিয়ত প্রতিকর্ম্মে এইরূপ স্বাভাবিক যোগের অনুষ্ঠান করিলেও, তাহারা তাহা দেখে না

বুঝিতে পারে না বলিয়াই যোগীপদবাচ্য হয় না। তবে কথা এই যে, এইরূপ স্বাভাবিক যোগাঙ্গ সমূহের অনুষ্ঠানে মানুষ এত অভ্যস্ত এবং এত অল্পক্ষণ মধ্যে ঐ গুলির অনুষ্ঠান হইয়া যায় যে, প্রত্যেকটীকে পৃথক্ পৃথক্ভাবে বেশীক্ষণ লক্ষ্য করিয়া ধরাও দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়ে। ধারণা ধ্যান সমাধি, এই তিনটীই কর্ম্মসম্পাদনের অতি সন্নিহিত অনুষ্ঠান। একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলে সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। সে যাহা হউক, আমরা এস্থলে পারিভাষিক যোগাঙ্গের বিষয়ই বিশেষভাবে আলোচনা করিব। পতঞ্জলিদেব যেভাবে যোগাঙ্গ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই আমরা লক্ষ্য করিয়া চলিব। এই পর্য্যন্ত এখানে বলিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে,—পূর্ব্বে যে অভ্যাসবৈরাগ্যের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহারই বাহ্যলক্ষণ এই যোগাঙ্গ। যদি কেহ অভ্যাসপরায়ণ ও বৈরাগ্যপরায়ণ হন, তবে তাঁহার পক্ষে এই যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান অনিবার্য্যভাবেই উপস্থিত হইয়া থাকে।

একটী আশঙ্কা হইতে পারে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—যোগ নিরবয়ব স্বরূপ। দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানই যোগ, যাহা সম্পূর্ণ নিরবয়ব স্বরূপ, তাহার অঙ্গ কিরূপে হইবে? এই আশঙ্কার উত্তর এই যে, অবিদ্যাপ্রভাবেই এইরূপ অঙ্গসমূহ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। যতক্ষণ সাধনা আছে, ততক্ষণ ত অবিদ্যার মধ্যেই অবস্থান করিতে হয়।

আর একটী কথা এই যে, এস্থলে সমাধিকেও যোগাঙ্গরূপে উল্লেখ করায় বেশ বুঝিতে পারা যায়—যাঁহারা যোগ শব্দের অর্থ সমাধি বলিয়াছেন, তাঁহারা উহার লাক্ষণিক অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বেও একথা বলা হইয়াছে।

অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ ৩০ ॥

অষ্টাঙ্গেষ্বাদ্যং নিরূপয়তি যমমহিংসেতি॥ হিংসা প্রাণবিয়োগ-ফলক-ব্যাপার স্তদ্রাহিত্যমহিংসা। বাঙ্মনো-ব্যবহারাণামেকরূপত্বং সত্যম্। লোভশূন্যতা অস্তেয়ম্। বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্। ভোগ-সাধনানামনঙ্গীকারঃ অপরিগ্রহঃ। এতে পঞ্চযমাঃ কায়মনসোঃ সংযমনাৎ।

আধ্যাত্মিকাস্তু কথ্যন্তে—দ্বেষবুদ্ধিরাহিত্যমহিংসা,"যদিদং কিঞ্চ তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে।" উপাদেয়বুদ্ধিরাহিত্যমস্তেয়ং, বৃত্তিসারূপ্যাপন্নে ব্রহ্মণি বিচরণং ব্রহ্মচর্য্যম্। শরীরসম্বন্ধাস্বীকারোঽপরিগ্রহঃ। বিস্তরস্তু ক্রমশো বর্ণ্যতে ॥ ৩০ ॥

পূর্ব্বোক্ত আটটী অঙ্গের মধ্যে প্রথম অঙ্গ যম কি, তাহাই এই সূত্রে বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ, এই পাঁচটীর নাম যম। হিংসা প্রাণবিয়োগ-ফলক ব্যাপার, তাহা না করা অহিংসা। বাক্য মন এবং ব্যবহার, এই তিনের একরূপত্বই সত্য। লোভশূন্যতা অস্তেয়। বীর্য্যধারণ ব্রহ্মচর্য্য। ভোগসাধন দ্রব্যসমূহের পরিগ্রহ না করাকে অপরিগ্রহ কহে। এই পঞ্চবিধ যম শরীর এবং মনের সংযম বিধান করিয়া স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগের হেতুস্বরূপ হয় বলিয়াই ইহারা যোগাঙ্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ইহাদের আধ্যাত্মিক স্বরূপ নির্ণয় করা যাইতেছে। কেবল প্রাণবিয়োগ-ফলকব্যাপার পরিত্যাগকেই অহিংসা বলা যায় না, বিদ্বেষবুদ্ধি পরিত্যাগই যথার্থ অহিংসা। সত্য শব্দে কেবল কায় মন ও ব্যবহারের একরূপতা না বুঝিয়া শ্রুতি সত্য শব্দে যাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করাই কর্ত্তব্য। শ্রুতি বলেন "এই

যাহা কিছু, তাহা সকলই সত্য"। তাৎপর্য্য এই যে যিনি সত্যস্বরূপ আত্মা, তিনি ত বৃত্তিসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া "এই যাহা কিছু"রূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন; সুতরাং সকলই সত্য। অস্তেয় শব্দে কেবল লোভশূন্যতা মাত্র না বুঝিয়া একেবারে উপাদেয় বুদ্ধিরাহিত্য পর্য্যন্ত বুঝিয়া লইলেই ভাল হয়। সকলই যখন আত্মা, তখন আর গ্রহণ করিবার কি আছে, এইরূপ ভাবই যথার্থ অস্তেয়। ব্রহ্মচর্য্য শব্দে কেবল বার্য্যধারণ মাত্র না বুঝিয়া বৃত্তিসারূপ্যপ্রাপ্ত ব্রহ্মে বিচরণ পর্য্যন্ত বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। এইরূপ অপরিগ্রহ শব্দেও শরীরের সহিত সম্বন্ধ অস্বীকার করা পর্য্যন্তই বুঝা প্রয়োজন। এই সকলের বিস্তৃত বিবরণ পরে পাওয়া যাইবে।

एते जातिदेशकाल-समयानवच्छिन्ना सार्व्वभौमा महाव्रतम् ॥ ३१ ॥

एतेषां महाव्रतत्वमाह एत इति। एते अहिंसादयः पञ्च यदा जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना अतएव सार्व्वभौमा भवेयुस्तदा महाव्रतमुच्यते। तथाहि जातिषु ब्राह्मणादिषु, देशेषु पुण्यतीर्थेषु, कालेषु पुण्यतिथिषु, समयेषु देवब्राह्मणसाध्वीगवादि-मर्य्यादारक्षणादिषु, यदि अहिंसादयः अवच्छिन्ना न भवन्ति, तदा सार्व्वभौमाः सर्व्वासु भूमिषु जातिदेशकालसमयेषु प्रयुक्ता इत्यर्थः। एवञ्च महाव्रतमुच्यत इति शेषः ॥३१॥

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ যমের মহাব্রতত্ব এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। ঋষি বলিলেন—ইহারা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ যম যদি জাতি-দেশ কাল এবং সময়ের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলেই উহা

সার্ব্বভৌম যমরূপে পরিণত হয়, এই অবস্থায়ই উহা মহাব্রত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জাতি—ব্রাহ্মণাদি, দেশ—পুণ্যতীর্থাদি, কাল—সংক্রান্তি গ্রহণ প্রভৃতি পুণ্যদিন, সময় দেব ব্রাহ্মণ সাধ্বী এবং গবাদির মর্য্যাদা রক্ষণ, কেবল এই সকল স্থলেই অহিংসাদি অবচ্ছেদ প্রাপ্ত না হইয়া যদি সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হয়, তবেই তাহা সার্ব্বভৌম হয়। খুলিয়া বলিতেছি—কেহ যদি অহিংসা সত্য অস্তেয় প্রভৃতি যমগুলিকে পূর্ব্বোক্ত জাতি দেশ বা কালাদিতেই নিবদ্ধ রাখেন, অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ জাতিকে হিংসা করিব না, পুণ্যতীর্থে হিংসাদি করিব না, পুণ্যদিনে হিংসাদি করিব না, অথবা দেবতা ব্রাহ্মণ সাধ্বী স্ত্রী কিংবা গাভী প্রভৃতি যদি বিপন্ন হয়, তবে তাহাদের মর্য্যাদা রক্ষার স্থল ব্যতীত অন্যত্র হিংসাদি করিব না, এইরূপ একটা নিয়মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইয়া যদি কাহারও সর্ব্বকালে সর্ব্বভূতেই অহিংসাদি সম্যক অনুষ্ঠিত হয়, তবে সেইরূপ অহিংসা প্রভৃতিই সার্ব্বভৌমতা প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বভূমিতে অর্থাৎ সার্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাবস্থায়ই প্রযুক্ত হয় বলিয়া ঐরূপ যে সার্ব্বভৌম অহিংসাদি, তাহা মহাব্রত নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

চিত্তের সর্ব্বথা শুদ্ধির জন্যই এই মহাব্রত প্রয়োজন, তাই ঋষি অহিংসাদির এই মহাব্রতত্ব উল্লেখ করিলেন। যাহারা যথার্থ মুমুক্ষু, তাহাদের জন্যই এই মহাব্রত বিহিত হইয়াছে। হয়ত কেহ আশঙ্কা করিবেন যে, তবে বুঝি মুমুক্ষু ব্যক্তির সম্মুখে দেবতা ব্রাহ্মণ সাধ্বী স্ত্রী কিংবা গবাদির মর্য্যাদা লঙ্ঘন হইলেও, তাহারা হিংসাদি না করিয়া নীরবে সেই মর্য্যাদা লঙ্ঘন সহ্য করিয়া যাইবেন। না, তাহা নয়, যাঁহারা যথার্থ মুমুক্ষু, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহাদের সম্মুখে যদি এরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, তবে তাঁহাদের সেই ঈশ্বর প্রণিধানের বলেই কোনরূপ হিংসাদির অনুষ্ঠান না করিয়াও কোন অলৌকিক শক্তিপ্রভাবেই পূর্ব্বোক্ত দেব ব্রাহ্মণাদির মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়া থাকে। স্থূল কথা এই যে, যাহারা যথার্থভাবে মহাব্রত পালনে উদ্যত, ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদের সে ব্রত পালনে সহায় হন।

শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ৩২ ॥

দ্বিতীয়ং যোগাঙ্গং নিয়মমুপদিশতি। শৌচং কায়মনসোঃ পবিত্রতা, সন্তোষঃ দুঃখেষ্বপ্যক্ষুব্ধচিত্ততা, তপোব্রতোপবাসাদিকং, স্বাধ্যায়োঽধ্যয়নং বেদাদিশাস্ত্রস্য, ঈশ্বরপ্রণিধানং পরমেশ্বর আত্মনিবেদনম্, এতানি নিয়মা নিয়ম্যন্তে চিত্তমেভিরিতি নিয়মা উচ্যন্তে। অধ্যাত্ম-দৃষ্ট্যাতু—শৌচ মাত্মজ্ঞানং, সন্তোষোঽভাববোধনিবৃত্তিঃ, তপো বুদ্ধিতত্ত্বং, স্বাধ্যায় আত্মানুসন্ধানং, ঈশ্বর প্রণিধানং কৃতব্যাখ্যানং বিস্তরস্তু পরত্র বক্ষ্যতে ॥ ৩২ ॥

এই সূত্রে দ্বিতীয় যোগাঙ্গ নিয়মের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রণিধান, ইহারাই নিয়ম। শৌচ—শরীর এবং মনের বিশুদ্ধতা। মৃদ্ জলাদি দ্বারা শরীর শুদ্ধি এবং সৎচিন্তা দ্বারা মনঃশুদ্ধি হইয়া থাকে। সন্তোষ—দুঃখ উপস্থিত হইলেও চিত্তের কোনপ্রকার ক্ষোভ না হওয়া। তপঃ—উপবাস, এবং চান্দ্রায়ণাদি ব্রত প্রভৃতি। স্বাধ্যায়—বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন। ঈশ্বরপ্রণিধান—পরমেশ্বরে আত্মনিবেদন। ইহারাই নিয়ম। এই সকল কার্য্যদ্বারা চিত্ত নিয়মিত বা শৃঙ্খলিত হয় বলিয়াই ইহাদের নাম নিয়ম হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে শৌচ প্রভৃতির অর্থ কিরূপ প্রতিভাত হয়, এক্ষণে তাহাই বলা হইতেছে। শৌচ শব্দের অর্থ—আত্মজ্ঞান। সন্তোষ শব্দের অর্থ—অভাববোধের নিবৃত্তি। তপঃ শব্দের অর্থ—বুদ্ধিতত্ত্ব। স্বাধ্যায় শব্দের অর্থ—আত্মানুসন্ধান এবং ঈশ্বরপ্রণিধান শব্দের অর্থ—পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ, এ সকলের বিস্তৃত বিবরণ পরে পাওয়া যাইবে।

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৩ ॥

যদাপক্রিয়তে চিত্তং পূর্ব্বাভ্যাসবশাদ্ যম নিয়ম বিরোধিভি- র্হিংসাদিভিস্তদা কিং কর্ত্তব্যমিত্যাহ বিতর্কেতি। বিরুদ্ধং তর্ক্যন্তে ইতি বিতর্কা—দেশকালপাত্রবিশেষে প্রযোজ্যা ইত্যেবংরূপা যোগব্যাঘাতকা স্তেষাং বাধনে বাধাপ্রদান বিষয়ে প্রতিপক্ষভাবনং বক্ষ্যমাণমুপায়ো ভবতীতি শেষঃ ॥৩৩॥

পূর্ব্বকৃত অভ্যাসের প্রভাবে যখন চিত্ত যম নিয়মের বিরুদ্ধ হিংসাদির দ্বারা অপহৃত অর্থাৎ আকৃষ্ট হইবে, তখন কি করা উচিত, তাহাই এই সূত্রে বলা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—বিতর্ক সমূহকে বাধা দিবার জন্য প্রতিপক্ষ ভাবনা করিতে হইবে। বিরুদ্ধ তর্কের নাম বিতর্ক। এমন অনেক সময় অনেক ঘটনা উপস্থিত হইতে পারে, যখন যম নিয়মের বিরুদ্ধ হিংসা অসত্য অব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির অনুষ্ঠান যেন অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, যখন ঐরূপ প্রতিকূল অবস্থা উপস্থিত হইবে, তখন প্রতিপক্ষ ভাবনা করিতে হইবে। ঐরূপ প্রতিপক্ষ ভাবনা দ্বারাই বিতর্ক সমূহ বিদূরিত হইয়া থাকে। প্রতিপক্ষ ভাবনা কিরূপ, তাহা পরসূত্রে বলা হইতেছে।

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃত কারিতানুমোদিতা লোভ ক্রোধ মোহ পূর্ব্বকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৪ ॥

প্রতিপক্ষভাবনং দর্শয়তি বিতর্কেতি। বিতর্কা হিংসাদয়ঃ যম নিয়ম বিরোধিন ইত্যর্থঃ। কৃত কারিতানুমোদিতাঃ স্বয়ং কৃতা অন্যেন কারিতা

ন্যথান্যকৃতা অপ্যনুমোদিতা ইত্যেবং ত্রিধা। কথমেবংস্যাদিত্যাহ লোভ-ক্রোধমোহপূর্ব্বকাঃ। লোভঃ কায়মনসোস্তৃপ্তিসাধনেচ্ছা, ক্রোধঃ প্রতিহতকামপরিণামঃ। মোহ আত্মানাত্মাবিবেকরূপঃ। যদ্যপি "তেষাং মোহঃ পাপীয়ান্ নামূঢ়স্যেতরোৎপত্তে" রিত্যনেন মোহস্যৈব মুখ্যহেতুত্বমুচিতং তথাপি ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। কামঃ ক্রোধস্তথালোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেদিতি ক্রোধলোভয়োরপ্যুক্তত্বঃ। নাত্র কামস্য ক্রোধবীজরূপত্বাৎ পৃথগুক্তিরিতি। এতেষাং পুনর্ব্বৈগতারতম্যং দর্শয়তি—মৃদুমধ্যাধিমাত্রাঃ কৃতব্যাখ্যানা এতে। অথ ফলং শ্রাবয়তি—দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা দুঃখং প্রতিকূল বেদনং, অজ্ঞানমাত্মজ্ঞান-হীনতা, তে দুঃখাদীনি অনন্তফলে অপরিচ্ছিন্নফলে যেষাং বিতর্কানাং তে তথোক্তা ইতি প্রতিপক্ষ ভাবনং প্রতিপক্ষাণাং যোগানুকূল যমনিয়মা-দীনাং ভাবনমনুচিন্তনমনুশীলনঞ্চ যথাযোগ্যং বিতর্কবাধনায়ালং ভবতী-ত্যর্থঃ। এতেনানয়োর্যমনিয়মযোর্যোগাঙ্গত্বে হেতুরপ্যুপন্যস্ত ইতি।

এই সূত্রে প্রতিপক্ষভাবনার বিষয় বলা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—হিংসাদি বিতর্কসমূহ লোভ ক্রোধ বা মোহ পূর্ব্বক মৃদু মধ্য বা অধিমাত্রায় যদি কৃত কারিত কিংবা অনুমোদিত হয়, তবে উহারা অনন্ত দুঃখ ও অজ্ঞানরূপ ফল প্রসব করে, ইহা বিবেচনা করিয়া বিতর্ক সমূহের প্রতিপক্ষ যে যম নিয়ম সমূহ, তাহারই ভাবনা করিবে। ইহাই প্রতিপক্ষ ভাবনা। বিতর্ক শব্দে যম নিয়ম বিরোধি হিংসাদি বুঝায়, ইহা পূর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যায়ও বলা হইয়াছে। কৃত কারিত ও অনুমোদিত শব্দের অর্থ বলা হইতেছে, কৃত—স্বয়ং কৃত, কারিত—অনুমতি দ্বারা অন্যকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত, অনুমোদিত—অন্যকর্ত্তৃক কৃত, কিন্তু তাহাতে অনুমোদন করা। এই তিন প্রকারে হিংসাদি বিতর্কের অনুষ্ঠান হইতে পারে। কেন এরূপ হয়, তাহার উত্তর দিতে গিয়া ঋষি বলিলেন—

লোভ ক্রোধ এবং মোহ পূর্ব্বক। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ছয়টী রিপুর মধ্যে মোহই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপী; যেহেতু যে ব্যক্তি মোহাচ্ছন্ন নহে, তাহার প্রতি কাম ক্রোধ প্রভৃতি অন্য রিপুগুলির আক্রমণ দেখা যায় না সুতরাং এস্থলে একমাত্র মোহের উল্লেখ করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিত বটে, কিন্তু তথাপি যোগ শিক্ষার্থিগণের বিশেষ অবগতির জন্য ভগবদ্‌গীতা কথিত ত্রিবিধ পাপেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন—কাম ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটী, নরকের দ্বার স্বরূপ; যেহেতু উহার প্রভাবে মানুষের আত্মানুভূতি বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব উহাদিগকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ক্রোধ কামেরই প্রতিহত-পরিণাম-স্বরূপ অবস্থা বলিয়া এস্থলে কামের উল্লেখ হয় নাই, মাত্র ক্রোধ লোভ এবং মোহ, এই তিনটীরই উল্লেখ হইয়াছে, ইহাদের মাত্রার তারতম্য প্রদর্শনের জন্যই সূত্রে মৃদু মধ্য ও অধিমাত্র শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, ইহাদের ব্যাখ্যা ইতি পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

এক্ষণে বিতর্কের ফল কি, তাহাই বলা হইতেছে,—দুঃখাজ্ঞানানন্ত-ফলাঃ। পূর্ব্বোক্তরূপ বিতর্কানুষ্ঠানের ফল—অনন্ত দুঃখ এবং অনন্ত অজ্ঞান। অর্থাৎ যতদিন মানুষ পূর্ব্বোক্তরূপ বিতর্কের অনুষ্ঠান করিবে, ততদিন প্রতিকূল বেদনরূপ দুঃখের হাত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না। আর আত্মস্বরূপ পরিচয় রূপ জ্ঞানও লাভ করিতে পারিবে না, যোগ লাভ করিয়া শাশ্বতী শান্তির ক্রোড়ে অবস্থান করিবারও যোগ্যতা হইবে না। এই সকল বিচার পূর্ব্বক বিতর্কের যাহা প্রতিপক্ষ অর্থাৎ যম নিয়ম অহিংসাদি এবং শৌচাদি, তাহার ভাবনা করিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ অনুচিন্তনের দ্বারা এবং যম নিয়মাদির অনুশীলনের দ্বারা হিংসাদিরূপ বিতর্ককে পরাভূত করিতে হইবে। এই সূত্রোক্ত প্রস্তাবের দ্বারা যম নিয়মাদির যোগাঙ্গত্ব প্রতিপাদিত হইল। অর্থাৎ যোগ লাভ করিতে হইলে যম নিয়মাদির অনুষ্ঠান অবশ্যম্ভাবী।

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎ সন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥

অথেদানীং পূর্ব্বোক্তানাং যমনিয়মানাং লৌকিকমপি ফলং ক্রমশঃ বর্ণয়িতু মুদ্যততে, মুখ্যং তু ফলং যোগাসন্নতৈব। তত্রাদাবহিংসাপ্রতিষ্ঠা ফলমাহাহিংসেতি। সর্ব্বং দ্রষ্টুরেব সারূপ্যমতো নাত্মানমৃতে ঽন্যদ্বস্ত্বস্তি কিঞ্চিদিতি নিশ্চয়বতঃ সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মন ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধিবিহীনতয়া রাগদ্বেষাভাবাদ্ ভবতিহি সুতরামহিংসাপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু কেবল-শ্রুতানুমিত-জ্ঞানবতাং যা তু দৃশ্যতেঽহিংসা পাপভিয়া দুঃখ-ভিয়া বা, সা ন প্রতিষ্ঠাং গতা পরন্ত্বহিংসাসাধনৈব সা। অস্ত্বেবং কিন্তেনেত্যাহ তৎসন্নিধৌ তস্যাহিংসাপ্রতিষ্ঠস্য সন্নিধৌ, বৈরত্যাগঃ—দূরস্থো বৈরায়িতোঽপি তৎ সমীপাগতস্তু নির্ব্বৈরো ভবতীত্যর্থঃ। তথা শাশ্বতিক বৈরিণামপি সর্পনকুলাদীনাং তৎ সন্নিধৌ তৎপ্রভাবপরিপূরিতে দেশে বৈরত্যাগোভবতীতি ॥ ৩৫ ॥

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত যম নিয়মের লৌকিক ফল ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইবে। যম নিয়মের মুখ্য ফল কিন্তু যোগাসন্নতা, অর্থাৎ সাধক যে পরিমাণে উহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবেন, সেই পরিমাণেই যোগের সন্নিহিত হইতে পারিবেন। সে যাহা হউক, এই সূত্রে অহিংসা প্রতিষ্ঠার ফল বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—অহিংসাপ্রতিষ্ঠা হইলে তাহার সন্নিধিতে বৈর ত্যাগ হয়। সকলই দ্রষ্টার সারূপ্য মাত্র; অতএব আত্মা ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নাই, এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হইলে, অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আত্মদর্শী হইলে সাধকের ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধি থাকে না, রাগ দ্বেষও থাকিতে পারে না; সুতরাং অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। ইহাই যথার্থ অহিংসাপ্রতিষ্ঠা। পক্ষান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়—পাপভয়ে বা ভবিষ্যৎ দুঃখ প্রাপ্তির ভয়ে অনেকে হিংসা হইতে বিরত থাকে। এরূপ ব্যক্তিগণের অহিংসা সর্ব্বথা প্রতিষ্ঠিত

নহে, উহা শাস্ত্রাদি শ্রবণ অথবা অনুমান জনিত জ্ঞান জন্য অহিংসার সাধনা মাত্র। আচ্ছা তাহাই হউক, অহিংসাপ্রতিষ্ঠার ফল কি? "তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ" যাহার অহিংসা যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতাত্মদর্শী হইয়াছেন, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র বৈরত্যাগ হইয়া যায়। দূরে অবস্থান কালে হয়ত উক্ত ব্যক্তির প্রতি কাহারও বৈরভাব থাকিতে পারে, কিন্তু সমীপস্থ হইলে আর সে বৈরভাব বিন্দুমাত্র থাকে না। আর একটী কথা আছে—যাহারা নিত্যবৈরী অর্থাৎ অহি-নকুল শার্দ্দূল-মৃগ প্রভৃতি, তাহারাও যদি অহিংসপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির প্রভাব পরিপূর্ণ প্রদেশের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তবে স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁহাদের পূর্ব্ব বৈরবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়। ইহা কেবল কিংবদন্তী নহে—বর্ত্তমানেও প্রত্যক্ষ সত্য।

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् ॥ ३६ ॥

सत्यप्रतिष्ठाफलमाह सत्येति। सत्यप्रतिष्ठायां "यदिदं किञ्च तत् सत्य" तत्र या प्रतिष्ठा संशयविपर्य्ययादि-भावना-रहिता-स्थितिस्तथा-भूतायां सत्यां क्रियाफलाश्रयत्वं—क्रिया दैवं पैत्रं व्यवहारिकञ्च कर्म्म, तत्फलं यथायोग्यं तदाश्रयत्वं भवतीति शेषः। सत्यप्रतिष्ठस्य सर्व्वाः क्रिया निश्चयफलप्रसविन्योभवन्तीति भावः। अपिच क्रियाफलं ज्ञानं, "सर्व्वं कर्म्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते" इत्युक्तेः, तदाश्रयत्वं भवति ज्ञानवान् भवतीत्यर्थः। या तु सत्यभाषणाचरणचिन्तनरूपा सत्यनिष्ठा दृश्यते सा पूर्व्वरूपमात्रं सत्यप्रतिष्ठायाः। उद्दिष्टो धर्म्मवर्गः प्रथमः पुरुषार्थोऽहिंसा सत्यमिति च ॥३६॥

এই সূত্রে সত্যপ্রতিষ্ঠার ফল বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—সত্যপ্রতিষ্ঠা হইলে ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্ব হয়। সত্য কি, এ বিষয়ে শ্রুতি বলেন—এই যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে বা মানসগ্রাহ্যরূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে, এ সকলই সত্য। এ সকল বৃত্তিসারূপ্য-প্রাপ্ত দ্রষ্টাই, অন্য কিছু নহে। এই সত্যে যদি প্রতিষ্ঠা হয় অর্থাৎ সংশয় বা বিপর্য্যয়ভাবনারহিত স্থিতিলাভ হয়, তবে ক্রিয়া-ফলাশ্রয়ত্ব হয়। ক্রিয়া শব্দের অর্থ—শাস্ত্র বিহিত দৈব পৈত্র্য কর্ম্ম এবং কায়মনোব্যাপাররূপ ব্যবহারিক কর্ম্ম। এই যাবতীয় কর্ম্মেরই যথাযোগ্য ফলাশ্রয়ত্ব হয়। অর্থাৎ যে কর্ম্মের যাহা অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে শাস্ত্রাদিতে নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ফল নিশ্চয়ই লাভ হইয়া থাকে। যাবতীয় ক্রিয়ার ফল এক মাত্র সত্য-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিকেই আশ্রয় করে। যদিও দেখিতে পাওয়া যায় ব্যবহারিক কর্ম্মফল অসত্যপরায়ণ ব্যক্তিগণও লাভ করিয়া থাকে, তথাপি আমাদের মনে হয়—ঠিক তাহা নহে; যাহারা সত্যপ্রতিষ্ঠ নহে, তাহারা ব্যবহারিক কর্ম্মেরও সম্যক্ ফল লাভ করিতে পারে না। মনে কর—ভোজন, ইহা ব্যবহারিক কর্ম্ম। যদিও ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ ফল সর্ব্বত্রই সমান দেখা যায়, তথাপি সত্যপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির ভোজনে যে অলৌকিক তৃপ্তিলাভ হয়, অন্যের পক্ষে তাহা একান্ত দুর্ল্লভ। এইরূপ সর্ব্বত্র। তার পর ব্যবহারিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যদি দৈব-কর্ম্ম—পূজা উপাসনা যাগ যজ্ঞাদি কিংবা পৈত্র্যকর্ম্ম—শ্রাদ্ধ তর্পণাদির প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট ভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ সকল কর্ম্মের যাহা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ফল, তাহা একমাত্র সত্য-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিই যথাযথরূপে লাভ করিয়া থাকেন। যাহারা সত্যপ্রতিষ্ঠ নহে, তাহাদের পক্ষে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের ফললাভের আশা সুদূরপরাহত। যেহেতু সংশয় এবং বিপর্য্যয় ভাবনা উপস্থিত হইয়া তাদৃশ ব্যক্তির যাবতীয় কর্ম্মই একটা প্রাণহীন তৃপ্তিহীন অনুষ্ঠান মাত্রে পর্য্যবসিত হয়; কিন্তু সত্যপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির সেরূপ

হয় না। সে সর্ব্ব কর্ম্মের মধ্য দিয়া একমাত্র সত্যস্বরূপ দ্রষ্টাকেই লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করে। আর এইরূপ ভাবে কর্ম্ম সমূহ অনুষ্ঠিত হইলেই কর্ম্মের যাহা যথার্থ ফল—জ্ঞান, তাহা লাভ হইয়া থাকে। কি ব্যবহারিক, কি শাস্ত্রীয়, সকল কর্ম্মেরই সাধারণ ফল—জ্ঞান। ভগবান্ বলিয়াছেন—সকল কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। জীবনব্যাপী লৌকিক বা শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইল, অথচ কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল যে জ্ঞান, তাহা যদি লাভ না হয়, তবে বুঝিতে হইবে "ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্ব" হয় নাই। শাস্ত্রীয় কর্ম্মের প্রতি বর্ত্তমান কালে জনসাধারণের যে অশ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হয়, তাহারও একমাত্র কারণ ঐ "ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্ব" দেখিতে না পাওয়া। সত্য-প্রতিষ্ঠা ব্যতীত ক্রিয়ার ফল লাভ হয় না। মানুষ সত্য হইতে বিমুখ হইয়া পড়িয়াছে, জগৎকে জড় বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছে, কর্ম্মকে জড় রূপেই দর্শন করিয়া থাকে, উহা যে চৈতন্য স্বরূপ দ্রষ্টাই ইহা ধারণাও করিতে পারে না, তাহারই ফলে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম সমূহ প্রাণহীন অনুষ্ঠান মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কেবল শাস্ত্রীয় কর্ম্ম নহে, ব্যবহারিক কর্ম্মগুলিও যথাযোগ্য ফলদানে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞানরূপ অমৃতফল লাভের জন্যই কর্ম্মক্ষেত্রে—দেহে অবস্থান ও নিয়ত নানাবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে, কিন্তু হায়! একমাত্র সত্যপ্রতিষ্ঠার অভাবেই যাবতীয় কর্ম্ম প্রায় নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে। প্রিয়তম সাধক! প্রিয় সন্তানগণ! যদি তোমরা যথার্থ সুখী হইতে চাও, যদি তোমরা কর্ম্মের যথার্থ ফল লাভ করিতে চাও, তবে সত্যপ্রতিষ্ঠার অনুশীলন কর।

অনেকে মনে করেন—ব্যবহারিক সত্যের প্রতি যে নিষ্ঠা, তাহাই সত্যপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বাক্য আচরণ এবং চিন্তা যদি অভিন্ন হয়, তবেই সত্যপ্রতিষ্ঠা হয়। আমরা বলি—উহা যথার্থ সত্যপ্রতিষ্ঠা নহে, সত্যপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বরূপ মাত্র। ব্যবহারিক ভাবে সত্যবাদী হইলেই যে মানুষ ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্ব লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের

ফলও লাভ করিতে পারে, তাহা কিছুতেই বলা যায় না; কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ সত্যপ্রতিষ্ঠায় সিদ্ধ হইলে যে, মানুষ যথার্থ জ্ঞানী হইতে পারে, যথার্থই সর্ব্ব ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বকে লাভ করিতে পারে, তদ্‌বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই।

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्व्वरत्नोपस्थानम् ॥ ३७ ॥

अस्तेयप्रतिष्ठाफलमाहास्तेयेति। सर्व्वं हि वस्तुजातं द्रष्टुरेव सारूप्यमिति निश्चयवानस्तेयप्रतिष्ठो भवितु मर्हति। स्तेयमूल-मनात्मप्रत्ययः, स च नात्मज्ञानादन्यतो नश्यति। अस्तेयमुपादेय-बुद्धि-राहित्यम्, तत्र या प्रतिष्ठा अविकम्पा स्थितिस्तस्यां सत्यां सर्व्व-रत्नोपस्थानं सर्व्वेषु वस्तुषु यानि रत्नानि श्रेष्ठवस्तूनि ज्ञानरूपाणि तेषा-मुपस्थान मुपस्थिति र्भवतीति शेषः। अस्तेयप्रतिष्ठोहि जनः सर्व्वं वस्तु ज्ञानमयं पश्यतीति भावः। श्रुतिरपि ईशावास्यजगद्दर्शन कारिण एव धनगृध्निं निराकरोति। एवञ्च "तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स" इति भगवद्वाक्यार्थमपि सङ्गच्छते। अचौर्य्यं लोभशून्यता चेति यदुक्तमस्तेयं तदस्योपक्रममात्रं। सर्व्वरत्नपदस्य मणिकाञ्चनादिरूपार्थस्तु प्रथमोपदेश एव। उपादेयबुद्धिरहितस्य योगिनः का कथा योगक्षेमवहनस्य। उद्दिष्टोऽर्थवर्गो द्वितीयःपुरुषार्थ इति ॥३७॥

এই সূত্রে ঋষি অস্তেয় প্রতিষ্ঠার ফল বলিলেন—সর্ব্ব-রত্নোপস্থান। যে ব্যক্তি যাবতীয় বস্তুকে দ্রষ্টারই সারূপ্য বোধে দর্শন করিতে অভ্যস্ত, সেই ব্যক্তিই অস্তেয়প্রতিষ্ঠ হইবার যোগ্য। স্তেয়ের মূল

অনাত্মপ্রত্যয়, তাহা কখনও আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত বিদূরিত হইতে পারে না। অস্তেয় শব্দের অর্থ—উপাদেয় বুদ্ধি রাহিত্য, তাহা যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, সংশয়বিপর্য্যয়াদি-ভাবনা রহিত হইয়া যায়, তখন সর্ব্বরত্নের উপস্থান হয়। সর্ব্বের মধ্যে যে রত্ন আছে,—জ্ঞানরূপ যে শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে, তাহা উপস্থিত হয়। "জাতৌ জাতৌ যদ্ধি শ্রেষ্ঠং তদ্ধি রত্নং প্রচক্ষ্যতে" যে জাতিতে যে শ্রেষ্ঠ, তাহাকেই রত্ন বলা হয়। সর্ব্বরূপে যাহা প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ নাম ও রূপ লইয়া যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তু হইতেছে—জ্ঞান। অস্তি ভাতি ও প্রিয়ের উপরই অর্থাৎ জ্ঞানের উপরই নাম রূপ প্রকাশিত হয়; সুতরাং সর্ব্বরত্ন বলিতে সর্ব্বের মধ্যে অনুস্যূত যে জ্ঞান, তাহাই বুঝায়। অস্তেয়প্রতিষ্ঠা হইলে এই রত্নই উপস্থিত হইয়া থাকে। যে রত্ন লাভ করিলে আর কোনও রত্নের অন্বেষণ করিতে হয় না, সে রত্ন জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অস্তেয়প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি এ বিশ্বকে জ্ঞানময় রূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। ইহাই যথার্থ সর্ব্বরত্নোপস্থান। ঈশোপনিষদেও উক্ত হইয়াছে—যে ব্যক্তি "ঈশাবাস্য" করিয়া জগদ্‌ভোগ করিতে সমর্থ হয়, তাহার আর কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা থাকে না। যতদিন অস্তেয়প্রতিষ্ঠা না হইবে, ততদিন ধনের আকাঙ্ক্ষা থাকিবেই। বিষয়গত বিশিষ্টতা রূপ যে ধন, তাহাই পরধন; মানুষ প্রতি মুহূর্ত্তে এই পরস্বাপহারী হইতেছে, স্তেন হইতেছে। যাঁহার ধন তাঁহাকে না দিয়া যাহারা গ্রহণ করে, তাহারা স্তেন অর্থাৎ চোর, একথা ভগবান্‌ও বলিয়াছেন। রূপরসাদি বিষয়ের যে বিভিন্ন নামরূপাদি বিশিষ্টতা, তাহা দ্রষ্টার সত্তায়ই সত্তাবান্, দ্রষ্টার প্রকাশেই প্রকাশবান্, ইহা যাহারা দেখিতে পায় না, তাহারাই স্তেয়-পরায়ণ, কিন্তু যাহারা বৃত্তি-সারূপ্য দর্শনকারী সাধক, তাহাদের অনাত্মপ্রত্যয় বিনষ্ট হওয়ার ফলে ত্যাগ বা গ্রহণ বলিয়া কিছু থাকে না; তাই তাহারা অস্তেয়-প্রতিষ্ঠ পুরুষ। এইরূপ পুরুষেরই জ্ঞানময়ী দৃষ্টি খুলিয়া যায়—

তিনি সর্ব্ববস্তুকেই জ্ঞানস্বরূপ অবলোকন করেন। এইরূপ সর্ব্বান্তরস্থ জ্ঞানরত্নের উপস্থিতির নামই যথার্থ সর্ব্বরত্নোপস্থান।

যাঁহারা অস্তেয় শব্দে মাত্র ব্যবহারিক চুরি না করা কিংবা লোভশূন্যতা মাত্র অর্থ গ্রহণ করেন, তাঁহারা অস্তেয়ের উপক্রম মাত্রই বুঝিয়া থাকেন। আশা আছে—ঐরূপ উপক্রম হইতেই অস্তেয় পদের যথার্থ রহস্য তাঁহারা অবগত হইতে পারিবেন। আর সর্ব্বরত্ন শব্দেও যাঁহারা মণিকাঞ্চনাদিরূপ অর্থ বুঝিয়া থাকেন, তাঁহারাও প্রথম শিক্ষার্থী। যাঁহারা উপাদেয় বুদ্ধিরহিত সাধক, তাহাদের যোগক্ষেম বহন ভগবান্ নিজেই করিয়া থাকেন। ভগবান্ স্বয়ং যেখানে যোগক্ষেম বহন কর্ত্তা, সেখানে অতি তুচ্ছ মণিকাঞ্চনাদি ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় অর্থের যে অভাব হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। আর ইহাও খুবই সত্য যে, যাঁহাদের প্রয়োজন বুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা কখনও অর্থের অভাবে নিপতিত হন না। অপ্রত্যাশিতরূপে ভগবান্ নানাভাবে নানালোকের হাত দিয়া তাহার নিকট প্রয়োজনীয় অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন।

গ্রন্থের আরম্ভ কালে যোগশাস্ত্রকে চতুর্ব্বর্গ-সাধক বলা হইয়াছিল, আশাকরি পাঠক তাহা বিস্মৃত হন নাই। যম ও নিয়মে ধর্ম্ম এবং এই সর্ব্বরত্নোপস্থানে অর্থরূপ প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষার্থের বিষয় উপদিষ্ট হইল। যোগশাস্ত্র যে কেবল মোক্ষার্থীরই অনুশীলনযোগ্য, তাহা নহে—ধর্ম্মার্থসেবীর পক্ষেও ইহা উপাদেয়।

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠাফলমাহ ব্রহ্মচর্য্যেতি। "ব্রহ্মচর্য্যং ব্রহ্মণি দৃষ্টেরি ন্দ্রিয়াদেশ্চাপ্যাপত্তি যত্ চর্য্যং বিচরণং স্বেচ্ছা বিহারস্তদ্ ব্রহ্মচর্য্যং দৃষ্টুঃ

स्वरूपेऽवस्थानस्य स्थितिरूपत्वात् ब्रह्मरूपत्वाच्च न ब्रह्मचर्य्याभिधानं सङ्गच्छते। यदुच्यत उपस्थसंयम इति तदस्योपक्रममात्रम्। तत्र ब्रह्मचर्य्ये या प्रतिष्ठा संशयादिरहिता स्थितिस्तस्यां सत्यां वीर्य्यलाभो भवतीति शेषः। स्वरूपावस्थानसामर्थ्यं वीर्य्यं। "नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः"। संशयाश्रद्धे दुर्ब्बलता चित्तस्य, तद्राहित्यं वीर्य्यमिति। का कथा शारीरवीर्य्यस्यात्मदर्शिनाम्। उद्दिष्टौ धर्म्मकामौ।

এই সূত্রে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার ফল বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন —ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায় বীর্য্য লাভ হয়। ব্রহ্মে বিচরণকে ব্রহ্মচর্য্য কহে। বিশুদ্ধ স্বরূপে বিচরণ একান্ত অসম্ভব, যেহেতু তাহা স্বরূপ-স্থিতিস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপই; সুতরাং সে অবস্থাকে ব্রহ্মচর্য্য বলা যায় না। বৃত্তিসারূপ্য প্রাপ্ত ব্রহ্মে অর্থাৎ সগুণব্রহ্মেই বিচরণ করা সম্ভব, তাই ব্রহ্মচর্য্য শব্দে সগুণ ব্রহ্মে বিচরণ বুঝায়। উপস্থসংযমরূপ যে ব্রহ্মচর্য্যের উল্লেখ আছে, তাহা পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রহ্মচর্য্যেরই উপক্রম মাত্র।

যে ব্যক্তি যথার্থই ব্রহ্মে বিচরণ করিতে অভিলাষী, তাহাকে যে উপস্থসংযমরূপ ব্রহ্মচর্য্যের যথাযোগ্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠা হইলে অর্থাৎ সংশয় বিপর্য্যয় ভাবনা শূন্য অবস্থান লাভ হইলে যোগীর বীর্য্য লাভ হয়। উপনিষদ্‌ও বলেন—বলহীন ব্যক্তি আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। সংশয় এবং অশ্রদ্ধা এই দুইটীই প্রধান দুর্ব্বলতা, ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠা হইলে ঐ দুইটী দুর্ব্বলতা বিদূরিত হয়। সাধক তখন ব্রহ্মসত্তায় পূর্ণ বিশ্বাসবান হইয়া অমিতবীর্য্য হইয়া উঠে এবং সেই বীর্য্য প্রভাবেই পরমাত্মস্বরূপে উপনীত হইয়া ধন্য হয়। যাঁহারা আত্ম-দর্শন প্রয়াসী সাধক, তাঁহাদের শারীরিক বীর্য্যের বিষয় আর বলিবার

কি আছে। বীর্য্য ধারণরূপ ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে শরীর ও মন অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকে এবং উহা সাধনার সহায় হয়; সুতরাং তাহাও যোগমার্গে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই সূত্রে ঋষি ধর্ম্ম ও কামরূপ দুইটী পুরুষার্থের বিষয় উল্লেখ করিলেন। ভগবান্ নিজেও ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ যে কাম, তাহাকেই তাঁহার নিজ স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ধর্ম্মের অবিরোধী অর্থ ও কামের সেবা করিয়াই মানুষ মোক্ষমার্গে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।

অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসম্বোধঃ ॥ ৩৯ ॥

অপরিগ্রহপ্রতিষ্ঠাফলমাহাপরিগ্রহেতি। আত্মনঃ শরীর সম্বন্ধস্বীকারঃ পরিগ্রহস্তদ্রাহিত্যমপরিগ্রহঃ, তস্যস্থৈর্য্যে বিদেহভাবপ্রতিষ্ঠায়ামিত্যর্থঃ। জন্মকথন্তা সম্বো —জন্মনঃ কথন্তা কিংপ্রকারতা কথং কুতঃ কেন কীদৃশং বা জন্ম তদ্বিবরণমিতিভাবঃ। তস্যাঃ সম্বোধঃ সম্যক্ জ্ঞানং প্রত্যক্ষমিব ভবেদিতিশেষঃ। প্রজ্ঞালোকসম্পাতফলমেতত্। ভোগসাধনদ্রব্যানামস্বীকাররূপস্যা পরিগ্রহোপক্রমস্য কা কথা যোগিনাং মুমুক্ষূণাম্। উদ্দিষ্টঃ কামবর্গঃ। দর্শিতা যমানাং সিদ্ধয়ঃ। যে তু জন্মকথন্তা-সম্বোধস্যাতীতানাগতজন্মবৃত্তান্তজ্ঞানরূপমর্থং মন্যন্তে তেষাং সোঽভিমতঃ সংস্কার-সাক্ষাত্-করণাত্ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানমিতি পরেণ বিরুধ্যতে ॥৩৯॥

এই সূত্রে অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ফল বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—অপরিগ্রহ স্থৈর্য্য হইলে জন্মকথন্তা সম্বোধ হয়। আত্মার যে অবিদ্যাজনিত শরীরের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার তাহাই পরিগ্রহ, এইরূপ পরিগ্রহ রাহিত্যই অপরিগ্রহ। এই অপরিগ্রহের যদি স্থৈর্য্য

হয় অর্থাৎ বিদেহভাবটী যদি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, আত্মা যে কোন কালে বা কোন প্রকারেই শরীরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট নহে, ইহা যদি সুদৃঢ় ধারণায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তবেই অপরিগ্রহ স্থৈর্য্য হয়। এইরূপ হইলে জন্মকথন্তার সম্বোধ হয়। কথন্তা শব্দের অর্থ কিং-প্রকারতা। জন্ম ব্যাপারটী যে কিরূপ তাহার সম্যক্ জ্ঞান হওয়াকেই জন্মকথন্তা সম্বোধ বলে। কেন জন্ম হয়, কিপ্রকারে জন্ম হয়, কি হেতু জন্ম হয়, কোথা হইতে জন্ম হয়, কোথায় জন্ম হয়, ইত্যাদি জন্ম সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিবরণ যখন প্রত্যক্ষরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে, তখন তাহাকে জন্মকথন্তা সম্বোধ বলে। পূর্ব্বে যে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার কথা বলা হইয়াছে, সেই প্রজ্ঞার আলোক সম্পাত দ্বারাই এই সকল বিষয় সম্যক্ অবগত হওয়া যায়।

অপরিগ্রহ শব্দের অর্থ দান গ্রহণ না করা অর্থাৎ ভোগসাধন দ্রব্য গ্রহণ না করা রূপ অর্থই সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ আছে। যাঁহারা যোগী যাঁহারা মুমুক্ষু তাঁহারা যে ভোগসাধন দ্রব্য গ্রহণরূপ পরিগ্রহ কখনই করেন না, ইহা বলাই বাহুল্য। ঐরূপ অপরিগ্রহ যথার্থ অপরিগ্রহের পূর্ব্বায়োজন মাত্র।

এসূত্রেও ঋষি কামবর্গের বিষয় উল্লেখ করিলেন। এই পর্য্যন্ত পঞ্চবিধ যমের সিদ্ধি বর্ণিত হইল। হ্যাঁ আর একটী কথা— যাহারা জন্মকথন্তা সম্বোধ শব্দের অর্থ করিতে গিয়া অতীত অনাগত জন্ম বৃত্তান্ত জ্ঞানরূপ অর্থ করেন, তাহাদের সেই অর্থ "সংস্কার সাক্ষাৎকার হইলে পূর্ব্বজন্ম জ্ঞান হয়" এই পরবর্ত্তী সূত্রের সহিত বিরুদ্ধ হয়।

शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः ॥৪০॥

अथ नियमसिद्धयउच्यन्ते शौचादित्यारभ्य, तत्रादौ शौचप्रतिष्ठाफल-माह—शौचात् शौचप्रतिष्ठायामित्यर्थः। शौचमात्मज्ञानं नह्यिज्ञानेन

सद्दृश्यं पवित्रमिह विद्यते। कायमनसोः पवित्रतारूपं शौचन्तदुपक्रम-मात्रं। तत्र शौचे या प्रतिष्ठा संशयादिरहिता स्थितिस्तस्यां सत्यां स्वाङ्गजुगुप्सा स्वाङ्गेषु स्वगतादिभेदेषु जुगुप्सा असत्ताज्ञानरूपा तुच्छतेत्यर्थः। एवञ्च परैरनात्मवस्तुभिरसंसर्गः सम्बन्धाभावो भवतीतिशेषः। नेह नानास्ति किञ्चनेति श्रुतिप्रतिपादित ज्ञानोदयो भवतीत्यर्थः। का कथा स्थूलदेहादौ घृणाऽन्यसंसर्ग राहित्यं मुमुक्षूणाम्। अथवा तेषां घृणैव न शोभते सर्व्वत्रात्मदर्शनादिति ॥ ৪০ ॥

এই সূত্র হইতে নিয়মের সিদ্ধি সমূহ বর্ণিত হইবে, প্রথম শৌচ প্রতিষ্ঠার ফল বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—শৌচ হইতে স্বাঙ্গ জুগুপ্সা হয়, পরের সহিত সংসর্গ হয় না। শৌচ শব্দের অর্থ আত্মজ্ঞান, ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। জ্ঞানের তুল্য পবিত্র বস্তু আর নাই। শরীর এবং মনের পবিত্রতারূপ যে শৌচ, তাহা যথার্থ শৌচের উপক্রম মাত্র। শৌচে প্রতিষ্ঠা লাভ হইলে স্বাঙ্গ জুগুপ্সা হয়। স্বাঙ্গ শব্দে স্বগত সজাতীয় বিজাতীয় ভেদ বুঝায়। এই ভেদের প্রতি জুগুপ্সা হয়—অসত্তাজ্ঞানরূপ তুচ্ছতাবোধ হইয়া থাকে। একমাত্র আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, এইরূপ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলে আত্মার অঙ্গ রূপে পরিকল্পিত স্বগত ভেদের সত্তাও চিরতরেই অস্তমিত হইয়া যায়। ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইলেও প্রারব্ধ ক্ষয় পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রকার ভেদের আভাস প্রতিভাত হয় বটে, কিন্তু উহা সত্তাহীনতা নিবন্ধন অতি তুচ্ছ রূপেই, অতি অকিঞ্চিৎকর রূপেই প্রকাশিত থাকে। ইহাকেই স্বাঙ্গজুগুপ্সা বলে। আবার এইরূপ স্বাঙ্গজুগুপ্সা হইতেই "পরৈরসংসর্গঃ" হয়। পরের সহিত অর্থাৎ অনাত্মবস্তুর সহিত অসংসর্গ হইয়া থাকে। আত্মার সহিত যে অপর কাহারও সংসর্গ

নাই, আত্মা যে সর্ব্বথাই নির্লেপ ও বিশুদ্ধ বস্তু, ইহা প্রতিভাত হইতে থাকে। ইহাকেই পরৈরসংসর্গঃ কহে।

স্বাঙ্গজুগুপ্সা শব্দে স্বকীয় স্থূল শরীরের প্রতি ঘৃণা, এবং পরৈরসংসর্গঃ শব্দে জনসংসর্গরাহিত্য অর্থাৎ নির্জ্জনবাসরূপ অর্থও করা যাইতে পারে। মুমুক্ষু যোগীর পক্ষে এরূপ অর্থের বিষয় বলাই বাহুল্য মাত্র, উহা যোগের উপক্রম মাত্রই। অথবা সর্ব্বত্রাত্মদর্শিগণের কোন কিছুর প্রতি জুগুপ্সা অর্থাৎ ঘৃণা কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না। ঘৃণাও বিদ্বেষ মাত্র, উহাও জ্ঞানের বা শান্তির একান্ত পরিপন্থী।

সত্ত্বশুদ্ধি সৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়-জয়াত্মদর্শন যোগ্যত্বানি চ ॥৪১॥

অপিচ পঞ্চবিশেষ ফলান্যাহ শৌচাৎ সত্ত্বশুদ্ধি প্রভৃতীনি। তথাহি সত্ত্বশুদ্ধিরাত্মনঃ সত্তাবিষয়কং জ্ঞান মাবরণবিক্ষেপজনক তমোরজোভ্যামনভিভূতমিত্যর্থঃ। সৌমনস্যং চিত্তপ্রসাদঃ লব্ধোময়া লব্ধব্য ইত্যেবং রূপম্। ঐকাগ্র্যমেকাগ্রতা একমদ্বিতীয়ং বস্তু এবাগ্রমবলম্বনীয়মাশ্রয়ণীয়মিতি যাবৎ। স্বভাবতো বহুত্বপ্রিয়ং চিত্তং সর্ব্বথা সর্ব্বত্রৈকমেবাশ্রয়ণীয়ত্বেন স্বীকরোতীতি ভাবঃ। ইন্দ্রিয় জয়ঃ—ইন্দ্রিয়াণাং স্বাভাবিকী বিষয়লোলুপতা নিবৃত্তিরিত্যর্থঃ। তথাত্মদর্শন যোগ্যত্ব মাত্মাস্তিত্বানুভবসামর্থ্যং চৈতানি পঞ্চভবন্তি শৌচাদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। পূর্ব্বত্র সূত্রে কায়শৌচফল মত্র তু মনঃশৌচফলমিতি ব্যাখ্যানমপি ন বিরুধ্যতে। তদ্দিষ্টোধর্ম্মোবর্গঃ ॥ ৪১ ॥

শৌচ হইতে আরও পাঁচটী বিশেষ ফল লাভ হয়, এই সূত্রে তাহাই বলা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—সত্ত্বশুদ্ধি সৌমনস্য ঐকাগ্র্য ইন্দ্রিয়জয় এবং আত্মদর্শনযোগ্যতা, এই পাঁচটী শৌচপ্রতিষ্ঠা হইলে লাভ হইয়া থাকে। (১) সত্ত্বশুদ্ধি—আত্মার সত্তাবিষয়ক জ্ঞান যখন আবরণ এবং বিক্ষেপাত্মক তমোরজোগুণকর্ত্তৃক কিছুমাত্র অভিভূত হয় না, তখনই সত্ত্বশুদ্ধি হয়। "আত্মা আছেন" "ঈশ্বর আছেন" ইত্যাদিরূপ বাক্য অনেকেই বলিয়া থাকেন এবং অল্পাধিক বিশ্বাসও করিয়া থাকেন, উহা সত্ত্বগুণের লক্ষণ হইলেও শুদ্ধ সত্ত্বগুণ নহে। অস্তিত্বজ্ঞান যখন অবাধিত হয়—আবরণ রহিত হয়, তখনই বুঝিতে পারা যায়—সত্ত্বশুদ্ধি হইয়াছে। এক কথায় সত্ত্বশুদ্ধি শব্দে বুদ্ধির নির্ম্মলতা বুঝায়, বুদ্ধি যখন অবাধিত ভাবে দ্রষ্টার সত্তা অনুভব করিতে পারে, তখনই উহা নির্ম্মল হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এই সত্ত্ব-শুদ্ধি শৌচ হইতেই আবির্ভূত হয়। কেবল শরীর পবিত্র রাখিলে কিংবা অসৎ চিন্তা পরিত্যাগ করিলেই এই সত্ত্বশুদ্ধি উপস্থিত হয় না। এ জগতে এরূপ অনেক লোক আছেন, যাঁহারা পবিত্র ভাবে থাকেন এবং চিত্তকে কখনও নিন্দিত কর্ম্মদ্বারা বা চিন্তাদ্বারা কলুষিত করেন না; কিন্তু কই, তাঁহাদের ত সত্ত্বশুদ্ধি হয় না! এই জন্যই পূর্ব্বে শৌচ শব্দে আত্মজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে। আত্মজ্ঞান সম্যক্ লাভ হইলে ত সব শেষ হইয়া গেল, তখন আর শাস্ত্র উপদেশ যোগ সাধনা প্রভৃতির কোনই প্রয়োজন থাকেনা, ওরূপ অবস্থাকে শৌচের পরাকাষ্ঠা বলা যায়। আত্মজ্ঞান লাভের অনুকূল যে অনুশীলন, সাধারণতঃ তাহাই শৌচপদবাচ্য এবং এইরূপ শৌচ হইতেই সত্ত্বশুদ্ধি হইয়া থাকে।

(২) সৌমনস্য শব্দের অর্থ চিত্ত প্রসাদ। জীবনে যাহা লাভ করিবার জন্য এজগতে আসিয়াছি, তাহা লাভ করিয়াছি, চিত্তের এইরূপ যে অবস্থা, তাহাই সৌমনস্য।

(৩) ঐকাগ্র্য— একাগ্রতা। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুই যে অগ্র্য অর্থাৎ আশ্রয়নীয়, ইহা সম্যক্ স্বীকার করাই ঐকাগ্র্য। স্বভাবতো বহুত্বপ্রিয় চিত্ত যখন একমাত্র ব্রহ্মকেই সর্ব্বথা আশ্রয়নীয়ত্বরূপে স্বীকার করিয়া লয়, তখনই বুঝিতে পারা যায়—ঐকাগ্র্যরূপ শৌচসিদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। (৪) ইন্দ্রিয় জয়—ইন্দ্রিয় সমূহের যে স্বাভাবিকী বিষয়-লোলুপতা তাহা যখন নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখনই ইন্দ্রিয়জয় হইয়া থাকে। শৌচপ্রতিষ্ঠার ইহাও অব্যর্থ ফল। (৫) আত্মদর্শন যোগ্যতা—আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করিবার সামর্থ্য। ইহাও শৌচেরই ফল। যদিও একমাত্র সত্ত্বশুদ্ধি বলিলেই অপর চারিটী ফলের অবশ্যম্ভাবিতা নিবন্ধন উহাদের অনায়াসলভ্যত্ব প্রতিপাদিত হইত; তথাপি যোগশিক্ষার্থিদিগের চিত্তকে যোগাভিমুখে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিবার জন্য ঋষি একটী বিশেষফলকেই নানা ভাবে পরিব্যক্ত করিলেন। একমাত্র সত্ত্বশুদ্ধি হইলে অর্থাৎ বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলেই যে মন চিত্ত ইন্দ্রিয় প্রভৃতিরও বিশুদ্ধতা হইয়া থাকে, ইহা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্যই ঋষির এই প্রয়াস।

পূর্ব্বসূত্রে কায়শুচির বিষয় এবং এই সূত্রে মনঃশৌচের বিষয় বলা হইয়াছে, এইরূপ প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিতও আমাদের কোন বিরোধ নাই। এই সূত্রেও ঋষি ধর্ম্মবর্গের উপদেশ করিলেন। সত্ত্ব-শুদ্ধি প্রভৃতি ধর্ম্মেরই লক্ষণ।

सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः ॥४२॥

सन्तोष-प्रतिष्ठाफलमाह सन्तोषादिति। अभावबोधनिवृत्तिरेव सन्तोषः स च पूर्णस्य द्रष्टुः स्वरूपावस्थानप्रयत्नात् सम्भवति। सन्तोषात् सन्तोष प्रतिष्ठायामित्यर्थः। सर्व्वथाभावबोध-निवृत्तौ सत्यामनुत्तमः नास्त्युत्तमोयस्मात्ताद्दशो ब्रह्मैवेति भावः। एतेन सर्व्वदुःखनिवृत्तिः

सूच्यते। सुखलाभः भूमात्वेव सुखं तल्लाभो यत्र तादृशो भवतीति शेषः। एतेन परमानन्द प्राप्तिः सूचिता। सार्थकं वा विशेषणमनुत्तम इति। का कथा विषयेन्द्रिय-संस्पर्शजन्य-सुखस्य योगिनामिति। उद्दिष्टः कामवर्गः ॥ ४२ ॥

এইসূত্রে সন্তোষ প্রতিষ্ঠার ফল বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—সন্তোষ হইতে অনুত্তম সুখলাভ হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে অভাববোধ নিবৃত্তিই যথার্থ সন্তোষ। যিনি পূর্ণস্বরূপ দ্রষ্টা তাঁহাতে পুনঃ পুনঃ অবস্থানের প্রযত্ন হইতেই এইরূপ সন্তোষ লাভ হইয়া থাকে। সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত হইলে অর্থাৎ সর্ব্বথা অভাববোধের নিবৃত্তি হইলে সাধক "অনুত্তম" হয়। নাই বটে উত্তম যাঁহা হইতে তিনি অনুত্তম। ব্রহ্মই একমাত্র অনুত্তম বস্তু। শ্রুতি বলেন—ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হইয়া যায়। পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থানের প্রযত্ন হইতেই সাধক ব্রহ্মত্বলাভ করে—অনুত্তম হইয়া যায়। যতক্ষণ অনাত্মবস্তুর প্রতি বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে, ততক্ষণ সন্তোষ-প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। সন্তোষের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা একমাত্র ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তিতেই সম্ভব। ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি এবং অনুত্তম হওয়া একই কথা। এই অবস্থায় সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি হইয়া যায়। আর হয়—সুখলাভ। যাহা ভূমা যাহা মহান্ তাহাই সুখ। অনুত্তম হইতে পারিলেই তাদৃশ সুখের অধিকারী হওয়া যায় অর্থাৎ পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ চরম চরিতার্থতাও উপস্থিত হয়। অনুত্তম এবং সুখলাভ এই দুইটী পদের প্রয়োগ দ্বারা সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ তাৎপর্য্য সূচিত হইয়াছে। সন্তোষপ্রতিষ্ঠা হইতে এই উভয়ের লাভ হইয়া থাকে। অথবা অনুত্তম পদটী সুখলাভের সার্থক বিশেষণও হইতে পারে। উভয়ত্রই তাৎপর্য্য অভিন্ন।

একটী আশঙ্কা হইতে পারে—সন্তোষ হইতে অনুত্তম সুখলাভ হয়,

না—অনুত্তম সুখলাভ হইলে সন্তোষের প্রতিষ্ঠা হয় ? ইহার সমাধান পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে—সাধনাজগতে কার্য্যকারণভাব বীজাঙ্কুরবৎ দুর্নিরূপণীয়। পূর্ণস্বরূপের দর্শন না হইলে অভাববোধ নিবৃত্তি হয় না, আবার অভাববোধ থাকিতেও পূর্ণস্বরূপের সাক্ষাৎকার হয় না। অথচ এই দুইটী যেন যুগপৎ কার্য্য কারণ ভাবেই অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। সে যাহা হউক, আমরা জানি—যেমন যেমন পূর্ণতার আস্বাদন আসিতে থাকে, তেমন তেমনই হৃদয় হইতে অভাব বোধ দূর হইতে থাকে অর্থাৎ সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে।

এস্থলে সুখলাভ বলিতে বিষয়েন্দ্রিয় সংস্পর্শ-জন্য সুখের কথা বলাই বাহুল্য, যোগীদিগের পক্ষে তাদৃশ সুখের কথা বলাই চলে না। তবে সাধারণ লোক বিষয়কে বিষয়মাত্র বোধে ভোগ করিয়া যে সুখলাভ করে, যোগিগণ বিষয়সমূহকে দ্রষ্টারই সারূপ্যবোধে ভোগ করিয়া তদপেক্ষা অনেক উন্নত স্তরের সুখলাভ করিতে সমর্থ হয়, একথা খুবই সত্য। আর একটী সুখের স্থান আছে—পূর্ব্বে যে আনন্দানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগের কথা বলা হইয়াছে, তাদৃশ যোগ সমকালে দেহেন্দ্রিয়াদিতে এক অপূর্ব্ব হ্লাদময় অনুভব উপস্থিত হইয়া থাকে, সেই সুখকে লক্ষ্য করিয়াই এস্থলে অনুত্তম সুখ লাভের কথা বলা হইয়াছে, যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন বিরোধিতা নাই ; কারণ এরূপ আনন্দানুগত যোগ ব্রহ্মস্বরূপে উপনীত হইবার অতি সন্নিহিত অবস্থাই বটে। ব্রহ্মস্বরূপে উপনীত হইলেই সেই সুখের পূর্ণতা হইয়া যায় এবং তখনই সন্তোষের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, বলা যায়।

এ সূত্রেও ঋষি কামবর্গের উপদেশ করিলেন। যদিও আমাদের ব্যাখ্যানুসারে এই সূত্র মোক্ষ প্রতিপাদক রূপেই প্রতিভাত হইয়াছে, তথাপি ইহা কাম পূর্ণতার পরিসমাপ্তি-রূপেই উপদিষ্ট হইয়াছে, এ কথাও বলা যাইতে পারে। অনুত্তম সুখ-লাভ ও পূর্ণকাম একই কথা।

कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः ॥४३॥

तपःप्रतिष्ठाफलमाह कायेति। तपसः तपोनाम बुद्धितत्त्व मित्युक्तं तत्रावस्थानसामर्थ्यात् तपःप्रतिष्ठायामित्यर्थः। अशुद्धिक्षयात् अशुद्धिर्मलावरणरूपा तस्याः क्षयात् कायेन्द्रियसिद्धिः कायस्येन्द्रियाणाञ्च सिद्धिः सफलता सार्थकता भवतीति शेषः। तथाहि सार्थकमिदं देहधारणं यतो न पुनर्जन्मान्तरमिति कायसफलता, अतीन्द्रिय वस्तुलाभाच्च सार्थकतेन्द्रियाणाम्। का कथा मुमुक्षूणामणिमाद्यष्ट-सिद्धीनां दूरदृष्टिश्रवनादिरूपाणां वा सिद्धीनाम्। उद्दिष्ट कामवर्गः ॥४३॥

এই সূত্রে তপঃপ্রতিষ্ঠার ফল বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—তপঃ হইতে অশুদ্ধি ক্ষয় হইয়া কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধি লাভ হয়। তপঃ শব্দের অর্থ বুদ্ধিতত্ত্ব, ইহা পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে। তপোলোকে অবস্থানের সামর্থ্য লাভ হওয়াকেই তপঃপ্রতিষ্ঠা কহে। এইরূপ অবস্থানের প্রভাবে অশুদ্ধি ক্ষয় হয়। অশুদ্ধি—মল এবং আবরণ, ইহাও পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। নির্ম্মল বুদ্ধিসত্ত্বে আত্মবোধ উপসংহরণ করিবার সামর্থ্য উপস্থিত হইলে এবং তাহাতে কিছুকাল অবস্থান করিবার যোগ্যতা লাভ হইলে কায় এবং ইন্দ্রিয় উভয়ের সিদ্ধি হয়—সফলতা হয়, সার্থকতা লাভ হয়। সার্থক এই দেহ-ধারণ, যেহেতু আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। সার্থক এই ইন্দ্রিয়গণ, যেহেতু অতীন্দ্রিয় বস্তুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহাই যথার্থ কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধি। অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি অথবা দূরদর্শন-শ্রবণাদিরূপ সিদ্ধির কথা মুমুক্ষু যোগীর পক্ষে একান্ত নিষ্প্রয়োজন। এ সূত্রেও ঋষি কামবর্গের উপদেশ করিলেন। দেহেন্দ্রিয়ের সার্থকতা লাভই শ্রেষ্ঠ কাম পূরণ।

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতা সম্প্রযোগঃ ॥৪৪॥

স্বাধ্যায়প্রতিষ্ঠাফলমাহ স্বাধ্যায়াদিতি। স্বাধ্যায়ঃ আত্মানুসন্ধানং তৎপ্রতিষ্ঠায়ামিত্যর্থঃ। ইষ্টদেবতা সম্প্রযোগ ইষ্টদেবতয়া স্বস্বাভীষ্ট-দেবতয়া সহ সম্প্রযোগ আদানপ্রদানরূপোভবতীতি শেষঃ। তথাহ্যাত্মানু-সন্ধানমার্গ এব সাক্ষাৎকারোভবতি কালীকৃষ্ণাদীনামভীষ্টদেব-মূর্ত্তীণাং তথা তাভ্যোঽভিলষিতবরলাভরূপঃ সম্প্রযোগশ্চ ভবতি। যেষাং পুনঃ পরমাত্মৈব সাক্ষাদিষ্টদেবতা তেষাং তৎসাক্ষাৎকারো ভবতি সম্প্র-যোগস্তু তত্র জীবভাবস্য সমর্পণং পরমভাবস্যাদানমিতি। ভদ্বিষ্ট-স্তিবর্গঃ ॥৪৪॥

এই সূত্রে স্বাধ্যায়-প্রতিষ্ঠার ফল বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন —স্বাধ্যায় হইতে ইষ্ট দেবতা সম্প্রয়োগ হয়। স্বাধ্যায় শব্দের অর্থ আত্মানুসন্ধান, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই স্বাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত হইলে অর্থাৎ চিত্ত সর্ব্বথা স্বাধ্যায়-পরায়ণ হইলে—প্রতিনিয়ত আত্মানু-সন্ধানে নিরত থাকিলে, ইষ্টদেবতা সম্প্রয়োগ হয়। স্ব স্ব অভীষ্ট দেবতার সাক্ষাৎ লাভ হইয়া থাকে। যাহাদের অভীষ্ট দেবতা কালী কৃষ্ণ প্রভৃতি কোন বিশিষ্ট দেবমূর্ত্তি বিশেষ, তাহারাও এই স্বাধ্যায়ের পথে—আত্মানুসন্ধানের পথে চলিতে চলিতেই ঐ সকল ইষ্টমূর্ত্তির দর্শনলাভ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে অভিলষিত বরলাভরূপ সম্প্রয়োগও হইয়া থাকে। আর যাহাদের সাক্ষাৎ পরমাত্মাই ইষ্ট দেবতা, তাহাদেরও স্বাধ্যায় হইতেই স্বএর লাভ অর্থাৎ পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। সেরূপস্থলে সম্প্রয়োগ শব্দে বুঝিতে হইবে—জীবভাবের সম্যক্ অর্পণ, এবং পরমভাবের পরিগ্রহ। ইহাই যথার্থ সম্প্রয়োগ। জীব মাত্রেরই পরমাত্মা একমাত্র ইষ্ট দেবতা। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সকলেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকেই চায়। যতদিন মানুষ এই রহস্য

অবধারণ করিতে পারে না, ততদিন পরমাত্মা হইতে পৃথকভাবে কালী কৃষ্ণ প্রভৃতি বিশিষ্ট মূর্ত্তিকে অভীষ্ট দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করিতে থাকে। ক্রমে সত্যপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইলে ঐ সকল দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এরূপ দর্শনের ফলে সাধক বুঝিতে পারে— ঐ সকল বিশিষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যিনি আবিভূর্ত হন, তিনি অন্য কেহ নহেন পরমাত্মাই। তখন আর পরম্পরা সম্বন্ধে নহে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই পরমাত্মা ইষ্টদেবরূপে পরিচিত হইতে থাকেন। তখন সাধক পুনঃ পুনঃ স্বকীয় জীব ভাবকে বিসর্জ্জন দিয়া পরম ভাবকে পরিগ্রহ করিবার জন্যই ব্যাকুল হইয়া থাকে।. ধীমান পাঠক! পূর্ব্বে যে ক্রিয়যোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহার রহস্য অবগত হইতে পারিলেই এ সকল তত্ত্ব অতি সহজ রূপে তোমার হৃদয়ে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিবে।

ঋষি এখানেও ত্রিবর্গের বিষয়ই উপদেশ করিলেন। বিভিন্ন দেবমূর্ত্তিরূপ ইষ্টদেবতার সহিত সম্প্রয়োগ হইলে ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গ লাভ হইয়া থাকে।

समाधिसिद्धि रीश्वरप्रणिधानात् ॥४५॥

ईश्वरप्रणिधानफलमाह समाधीति। ईश्वरः पुरुषोत्तमः परमात्मेति यावत्। तत्र प्रणिधानात् प्रणिधानमात्मसमर्पणं तत्प्रतिष्ठायामित्यर्थः समाधिसिद्धिर्भवतीतिशेषः। तथाहि परमेश्वरे समर्पिते विशिष्टात्मबोधे चित्तस्य समाधिपरिणामः स्वत एव सम्पद्यते तदनुग्रहादिति दर्शिता नियमसिद्धयः पञ्च ॥४५॥

এই সূত্রে ঈশ্বরপ্রণিধান প্রতিষ্ঠার ফল বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে সমাধিসিদ্ধি হয়। ঈশ্বরের স্বরূপ

ইতিপূর্ব্বে বিশেষ ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রণিধান শব্দেরও অর্থ পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঈশ্বরে সম্যক্ আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে, তাহা হইতেই সমাধিসিদ্ধি হইয়া থাকে অর্থাৎ চিত্তের সমাধি পরিণাম রূপ সম্প্রজ্ঞাত যোগের আসন্নতম লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। সমাধিসিদ্ধি বলিতে অষ্টাঙ্গ যোগ সিদ্ধিই বুঝাইয়া থাকে; কারণ, যম নিয়মাদি অন্যান্য অবয়ব পরিত্যাগ করিয়া কখনও সমাধি নামক চরম যোগাঙ্গ সিদ্ধ হইতে পারে না। এস্থলে ঋষি অন্যান্য যোগাঙ্গের বিষয় না বলিয়া চরম যোগাঙ্গটীকেই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিলেন। ইহার উদ্দেশ্য আছে—যাঁহারা সত্য সত্যই ঈশ্বর প্রণি-ধানযোগী অর্থাৎ আত্মসমর্পণ যোগী, তাঁহারা ঈশ্বর কৃপায়ই চিত্তের সমাধিপরিণামরূপ অবস্থায় উপনীত হইতে পারেন। যম নিয়ম প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী যোগাঙ্গ গুলির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের আর পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠান করিতে হয় না; অথচ সমাধি আসিলেই এগুলি অজ্ঞাত-সারেও অনুষ্ঠিত হইয়া যায়। কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন—ঈশ্বর প্রণিধান ব্যতীতও সমাধি সিদ্ধ হইতে পারে। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে পূর্ব্বে "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা" এই সূত্রে যে বা শব্দটীর প্রয়োগ আছে, উহা দ্বারা বুঝা যায়, যেন অন্যান্য অনেক উপায় আছে, তন্মধ্যে ঈশ্বরপ্রণিধানও একটী উপায় মাত্র। তাঁহারা বুঝিয়া লইয়া-ছেন—যম নিয়মাদির যথাক্রমে অনুশীলন করিতে করিতেও যথা সময়ে সমাধিতে উপনীত হওয়া যায়; তাহাতে ঈশ্বরপ্রণিধানের কোন প্রয়োজনীয়তাই নাই। এইরূপ ভ্রান্তমত নিরাকরণের জন্য পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ সতর্ক ভাবে ঋষিবাক্য সমূহের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বা শব্দটী যে নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা সেই সূত্রেই বলা হইয়াছে। ঈশ্বরপ্রণিধান ব্যতীত যদি যোগসিদ্ধি সম্ভব হইত, তবে যোগসূত্রকার ঋষি কিছুতেই ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয়, গুরুরূপে ঈশ্বরলাভ, অর্থভাবনরূপ মন্ত্রজপ ও ঈশ্বরপ্রণিধান প্রভৃতি বিষয় নিয়া এত বেশী আলোচনা ও এতগুলি সূত্র রচনা করিতেন না। তিনি ঈশ্বর

প্রণিধানকেই এই যোগ দর্শনের মেরুদণ্ড-স্বরূপ স্থির রাখিয়া অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংস্থাপন করিয়াছেন। অদ্য পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় নাই বা কোন শাস্ত্রাদিতেও উপদিষ্ট হয় নাই যে, কেহ ঈশ্বর প্রণিধান তথা গুরূপস্থান ব্যতীত যোগ লাভে ধন্য হইয়াছেন বা হইতে পারেন।

ঈশ্বর প্রণিধান কথাটী যত সহজ, ইহার অনুশীলন এবং পূর্ণতা তত সহজ নহে, আমরা অনেক সময়েই ভগবানে আত্মসমর্পণ করি বটে, কিন্তু সে কতক্ষণ? যতক্ষণ ঠিক আমার ইচ্ছা গুলিই পূর্ণ হইতে থাকে। যতক্ষণ আমার ইচ্ছার অনুকূলেই ঈশ্বরের বিধান গুলি চলিতে থাকে, ততক্ষণ আমরা প্রত্যেকেই আত্মসমর্পণ যোগী হইতে পারি। কিন্তু যখন দেখিতে পাই—প্রতি পদক্ষেপেই আমার ইচ্ছা প্রতিহত হইতেছে, বিরুদ্ধভাব বিরুদ্ধকর্ম্ম সমূহের দারুণ আঘাত আসিয়া মর্ম্মস্থলকে পুনঃ পুনঃ পরিপীড়িত করিতেছে, তখন আর ঈশ্বরপ্রণিধান থাকে না, তখন আর আমরা আত্মসমর্পণ যোগী হইতে পারি না। তখন মুখে না বলিলেও অন্তরে অন্তরে ঈশ্বরকে আমার অভিপ্রায় অনুবর্ত্তন করিতেই বলিয়া থাকি। ইহা কি ঠিক আত্ম-সমর্পণ? আমরা ভাবের উচ্ছ্বাসে অশ্রুজলে বুক ভাসাইতে পারি, জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে অপরের চক্ষুকে ঝলসাইয়া দিতে পারি কর্ম্মের আড়ম্বরে অপরের চিত্তকে মুগ্ধ করিতে পারি, কিন্তু একমাত্র পরমাশ্রয়ের চরণে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন করিয়া সম্পূর্ণ স্বস্থ হইতে কিছুতেই পারি না; ইহা এমনই দুঃসাধ্যব্যাপার বলিয়া মনে হয়। আমার প্রিয়তমের ইচ্ছাগুলিই যে এই যন্ত্রটার মধ্য দিয়া প্রকাশ হইতেছে, ইহা ঠিক ঠিক অনুভব করিতে পারিলেই মনুষ্যদেহ ধারণ সার্থক হইয়া থাকে। সকল যোগ, সকল বিভূতি, সকল ঐশ্বর্য্য, সকল মহত্ত্ব ঐ প্রণিধানের মধ্যে নিহিত। প্রিয়তম সাধকবৃন্দ! যদি পার প্রণিধানের পথে অগ্রসর হও,যতটুকু অগ্রসর হইতে পারিবে, ততটুকুই লাভ, ততটুকুই সার্থকতা। যে মুহূর্ত্তে প্রণিধান করিবে, অর্থাৎ তুমি যে সর্ব্বতোভাবেই ঈশ্বরের চরণে সমর্পিত, ইহা যে মুহূর্ত্তে অনুভব

করিবে, সেই মুহূর্ত্তটীই জীবনের শুভ মুহূর্ত্ত। ইহা অভ্রান্ত সত্য। একবার কর, হয়ত ব্যর্থকাম হইবে, আবার অগ্রসর হও, আবার ব্যর্থকাম হইবে, এইরূপ বিফলতার মধ্য দিয়াই তুমি যথার্থ আত্ম-নিবেদনে সমর্থ হইবে। যতক্ষণ দেখিতে পাইবে—তোমার কার্য্য গুলির মধ্যে বা চিন্তাগুলির মধ্যে "অহং" ভাবটী অলক্ষিত ভাবেও উঁকি মারিতেছে, ততক্ষণই তোমার সতর্ক হইবার প্রয়োজন। কেবল ভাল ভাল কাজ গুলির বেলায়ই যে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব দর্শন করিবে, তাহা নহে; অতি নিন্দিত অতি সন্তাপজনক কর্ম্মগুলির মধ্য দিয়াও দেখিও—ঐরূপেও তোমার পরমপ্রেমাস্পদ প্রিয়তমই; অন্য কেহ নহে। যখন জগতের দিক হইতে এক একটা তীব্র আঘাত আসিয়া তোমার মর্ম্মস্থানকে দারুণ পীড়া দিবে, তখনও দেখিও—এ আঘাত তোমার প্রিয়তমেরই হাতের স্পর্শ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। জননী যখন শিশু পুত্রকে প্রহার করেন, তখন শিশু মায়ের হাত খানা হইতে বঞ্চিত হয় না বলিয়াই মা মা বলিয়া কাঁদে। আবার যখন এক একটা বড় রকমের নিষ্ফলতা অকৃতকার্য্যতা আসিয়া তোমাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিবে, তখনও দেখিও—ইহাও তোমার প্রিয়তমেরই স্নেহের দান। তিনি নিষ্ঠুর নহেন, হৃদয়হীন পাষাণ নহেন, তিনি মধুময়, তিনি অমৃত-ময়, তিনি প্রেমময়, তিনি করুণাময়, তিনি তোমায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসেন, আর তুমিও তাঁকেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাস। এমনই সম্বন্ধ তাঁহার সঙ্গে তোমার। যোগ যোগ করিয়া চীৎকার করিও না, যোগ করিতে পারিলাম না বলিয়া হতাশ হইও না। যোগ শব্দে অন্যে যে যাহা ইচ্ছা বলুক, তুমি বিয়োগ-বিধুর সন্তান তুমি বুঝিও—যোগ মানেই তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়া। সর্ব্ব কর্ম্মের মধ্য দিয়া সকল অবস্থার মধ্য দিয়া তুমি প্রিয়তমের সহিত যুক্ত হইতে চেষ্টা করিবে, ইহাই ঈশ্বরপ্রণিধান, ইহাই সমাধি সিদ্ধির হেতু। তাই ঋষি বলিলেন—ঈশ্বরপ্রণিধান হইতেই সমাধিসিদ্ধি হয়। সমাধিসিদ্ধি হওয়া এবং যোগসিদ্ধি হওয়া প্রায় একই কথা; কারণ

সমাধিই যোগের অতি সন্নিহিত লক্ষণ। সাধক! তুমি গৃহস্থ হও, সন্ন্যাসী হও, ব্রহ্মচারী হও, যাহাই হওনা কেন; তোমার চিত্ত যতই চঞ্চল দুর্ব্বল ও মলিন হউক না কেন, তুমি পতঞ্জলি-প্রোক্ত যোগ হইতে কোন প্রকারেই বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা করিও না। মানুষমাত্রেই যোগী এবং কর্ম্মমাত্রেই যোগ, ইহা যদি অনুভব করিতে পার, তবে আর তোমার বিফলতার আশঙ্কা কোন অবস্থায়ই আসিতে পারে না। তুমি যদি ঈশ্বরের আশ্রিত না হইয়া অন্য কোথাও থাকিতে, তবে বরং আশঙ্কার কথা ছিল; যখন জ্ঞানে বা অজ্ঞানে জীবমাত্রেই তাঁহাতে সর্ব্বতোভাবে সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে, তখন আর ভয় কি, আত্মসমর্পণ ত আর করিতে হইবে না, নিত্যসিদ্ধ সমর্পণটী শুধু বুঝিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে, প্রতি কর্ম্মে সার্থকতা লক্ষ্য করিতে হইবে। কিন্তু এ সকল অন্য কথা—এই পর্য্যন্ত নিয়মের সিদ্ধিসমূহ বর্ণিত হইল।

স্থিরসুখমাসনম্ ॥৪৬॥

অথ তৃতীয়ং যোগাঙ্গমুপদিশতি স্থিরেতি। স্থিরসুখং স্থিরত্বে জনিতং সুখং প্রশান্ততা যত্র তৎ, আসনমাস্যতে অস্মিন্ ইত্যাসনং হৃদয়মিতিভাবঃ। সমায়াতিহি তত্রাবস্থানে স্থিরত্বজনিতং সুখং চিত্তস্য। তত্রাস্ব—শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মন ইতি। শুচৌ দেশে হৃদয়ে। কা কথাঙ্গসংস্থানবিশেষরূপাণামাসনানাং যোগিনামিতি ॥৪৬॥

এই সূত্রে তৃতীয় যোগাঙ্গ আসনের বিষয় উপদিষ্ট হইতেছে। ঋষি বলিলেন—স্থিরসুখ আসন। স্থিরত্ব জনিত সুখ অর্থাৎ চিত্তের

প্রশান্ততা যেখানে হয়, তাহাই যথার্থ আসন। যেস্থানে অবস্থান করিলে চিত্ত স্থির হয় প্রশান্ত হয়, তাহাই আসন। একমাত্র হৃদয় দেশে অবস্থান করিতে পারিলেই চিত্ত স্থির হয়—প্রশান্ত হয়; কারণ হৃদয়ই পরমস্থির পরমপ্রশান্ত পরমাত্মার বিশিষ্ট অনুভূতি স্থান। যেরূপ বহ্নির সমীপস্থ হইলে শরীর তাপ ও আলোক যুক্ত হইয়া পড়ে, ঠিক সেইরূপ চিত্ত যদি কোনও স্থির প্রশান্ত বস্তুর সন্নিহিত হয়, তবে নিতান্ত অনিচ্ছায়ও তাহাকে স্থির ও প্রশান্ত হইতেই হইবে। তাই আত্মার বিশিষ্ট অনুভূতিকেন্দ্রে হৃদয়দেশে যদি চিত্তকে নিয়া আসা যায়, তবেই কর্ম্মচঞ্চল চিত্ত স্থিরত্বজনিত প্রশান্ততার আভাস পায়। গীতায় ভগবানও বলিয়াছেন—"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থির-মাসনমাত্মনঃ"। শুচৌদেশে শব্দের অর্থ হৃদয়ে। সকল শাস্ত্র হৃদয়-দেশকেই শ্রেষ্ঠ আসন রূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পদ্মাসন স্বস্তিকাসন প্রভৃতি অঙ্গবিশেষের বিভিন্ন সংস্থানরূপ আসন সমূহ প্রথম শিক্ষার্থিগণের পক্ষেই উপদেশযোগ্য। পরসূত্রে ইহা আরও স্পষ্ট হইবে।

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥৪৭॥

আসনপ্রতিষ্ঠালক্ষণমাহ প্রযত্নেতি। প্রযত্নঃ শরীরেন্দ্রিয়চেষ্টারূপস্তস্য শৈথিল্যং শিথিলতা, তথানন্তসমাপত্তিরসীমভাবাপন্নতা চিত্তস্য, এতাভ্যামাসনসিদ্ধির্ভবতীতি শেষঃ। আসনপ্রতিষ্ঠায়াং সত্যামিষালক্ষণাদ্বয়ী সমুপতিষ্ঠত ইতি ভাবঃ।

ইদমত্রাবগন্তব্যং—প্রযত্নশৈথিল্যমপ্যনন্তসমাপত্তেরাবির্ভবতি। সা চ পুনর্দৈনন্দিন সন্ধ্যাবন্দনায়াং পৃথ্বিত্বয়েত্যাদি তদ্বিষ্ণোরিত্যাদ্যাসন-শুদ্ধি-বিষ্ণুস্মরণমন্ত্রার্থানুধ্যানেন ধ্রুবং সম্পদ্যতে ॥৪৭॥

এই সূত্রে আসন সিদ্ধির লক্ষণ কীর্ত্তিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন —প্রযত্নশৈথিল্য এবং অনন্ত সমাপত্তি, এই দুইটী লক্ষণ দ্বারাই বুঝা যায় যে আসন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের যে একটা স্বাভাবিক প্রযত্ন অর্থাৎ কর্ম্মপ্রবণতা আছে, তাহার শিথিলতা হইলেই তাহাকে প্রযত্নশৈথিল্য কহে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গুলি যেন আর কোনরূপ ব্যাপারের জন্য উন্মুখ নহে; একেবারে শিথিল ভাব একেবারে গা ছাড়া ভাব আসিয়া যেন উহাদিগকে কর্ম্মোন্মুখতা হইতে বিমুখ করিয়া দিয়াছে, এইরূপ ভাবকেই প্রযত্ন-শৈথিল্য কহে। অনন্তসমাপত্তি শব্দের অর্থ অসীমভাব প্রাপ্তি। চিত্তের অসীমভাবে ভাবিত হওয়াকেই অনন্ত সমাপত্তি কহে। সম্যক্ প্রকার প্রাপ্তির নাম সমাপত্তি। একটু ভাসা ভাসা ভাবকে সমাপত্তি কহে না, চিত্ত একেবারে আকাশবৎ অসীম ভাবে ভাবিত হইয়া পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় যে, অনন্ত সমাপত্তি হইয়াছে। আসন-প্রতিষ্ঠার এই দুইটীই লক্ষণ, অর্থাৎ ঠিক ঠিক আসনপ্রতিষ্ঠা হইলে এই দুইটী লক্ষণ প্রকাশ পাইবেই। এই দুইটীর মধ্যেও আবার অনন্ত সমাপত্তি যদি হইয়া যায়, তবে প্রযত্নশৈথিল্য হইবেই। তাহার জন্য আর পৃথক্ কোনরূপ উদ্যম প্রয়োজন হয় না। এই অনন্ত সমাপত্তি কিরূপে অনায়াসে লাভ হইতে পারে, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্যই আমাদের দৈনন্দিন সন্ধ্যাবন্দনাদি ব্যাপারে আসনশুদ্ধি এবং বিষ্ণুস্মরণ বা আচমন রূপ দুইটী অনুষ্ঠানের বিধান রহিয়াছে। ঐ দুইটী অনুষ্ঠানের জন্য "পৃথ্বি ত্বয়া" প্রভৃতি এবং "তদ্‌বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি দুইটী মন্ত্র পাঠেরও বিধান আছে। কেবল মন্ত্র পাঠ করিলেই উহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। মন্ত্রের যাহা প্রকৃত অর্থ—তাহার অনুচিন্তন করিলেই মন্ত্র পাঠের সার্থকতা হয়। ঐ মন্ত্রার্থ অনুচিন্তনের ফলেই চিত্তের অনন্ত-সমাপত্তি এবং শরীরেন্দ্রিয়ের প্রযত্নশৈথিল্য হইয়া থাকে; ইহার অন্যথা হয় না। মন্ত্র দুইটীর অর্থ প্রাণময় ভাবে শ্রীগুরুর মুখ হইতে শ্রবণ পূর্ব্বক যথাসম্ভব অনুচিন্তন করিলেই উহা ফলদায়ক হয়।

"পূজাতত্ত্ব" নামক পুস্তকে উহার অর্থ বিশদরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আসন শুদ্ধির মন্ত্রে অনন্তসমাপত্তি এবং বিষ্ণুস্মরণ মন্ত্রে প্রযত্নশৈথিল্য হইয়া থাকে। যাঁহারা মনে করেন,—যোগ করিতে হইলে আমাদের দৈনন্দিন সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি ছাড়া আর একটা কিছু গূঢ় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাদের সেইরূপ ধারণা অপনোদনের জন্যই বিশেষ ভাবে এ সকল কথা লিখিত হইল।

আসন এবং উপাসনা একই কথা। ভগবানের সমীপে উপবেশন করার নাম উপাসনা। আসন শব্দের অর্থও হৃদয় দেশে অবস্থান করা। হৃদয় দেশেই ভগবানের বিশেষ প্রকাশ, অথবা হৃদয় ভগবানেরই একটী নাম। বেদান্ত বলেন—"হৃদি অয়মিতি হৃদয়ম্—পরমাত্মা"। পরমাত্মার সন্নিহিত হওয়াই আসন বা উপাসনা। যত রকম যোগাঙ্গ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে যদি পরমাত্মার সান্নিধ্য না থাকিয়া কেবল কতকগুলি অনুষ্ঠান মাত্রে পর্য্যবসিত হয়,তবে উহারা শত সহস্র বৎসরেও মানুষকে যোগী করিতে পারে না। এইজন্যই ইতিপূর্ব্বে যে যম নিয়ম রূপ দুইটী অপেক্ষাকৃত বহিরঙ্গের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও যাহাতে পরমাত্মসান্নিধ্যের সহায় হয়, এরূপ ভাবেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যোগের অঙ্গ হইলে তবে ত যোগাঙ্গ হয়। দ্রষ্টার—পরমাত্মার স্বরূপস্থিতিই যোগ। যম নিয়ম আসন প্রভৃতি অনুষ্ঠান গুলি যদি সেই স্বরূপস্থিতির পূর্ব্ববর্ত্তি অবস্থারূপে পরিণত হয়, তবেই ত উহার যোগাঙ্গত্ব সিদ্ধ হয়। নচেৎ উহারা কতকগুলি কসরত মাত্রে বা অন্ধপরম্পরা নিয়ম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া যোগকে দুর্জ্ঞেয়ই করিয়া তোলে, আর ভগবানকেও দূর হইতে দূরান্তরে অবস্থিত বলিয়া ঘোষণা করিতে থাকে। সাধক, তুমি যদি একটু লক্ষ্য করিতে পার, একটু যদি সত্যপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইতে পার অর্থাৎ বৃত্তি সারূপ্য অনুভব করিতে যত্ন কর, তবে দেখিবে যাবতীয় যোগাঙ্গ তোমার অনিচ্ছায়ও যেন কি এক অজ্ঞেয় শক্তি প্রভাবে তোমা-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া যাইতেছে।

ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ ॥ ৪৮ ॥

আসনসিদ্ধিফলং বর্ণয়তি তত ইতি। তত আসনপ্রতিষ্ঠায়ামিত্যর্থঃ। দ্বন্দ্বানভিঘাতো দ্বন্দ্বৈঃ সুখদুঃখশীতোষ্ণাদিভিরনভিঘাত অনুৎপীড়নং ভবতীতি শেষঃ। হৃদিস্থস্যানন্তসমাপন্নস্যৈব চিত্তস্যৈবং সম্ভবতীতি ॥ ৪৮ ॥

পূর্ব্ব সূত্রে আসন প্রতিষ্ঠার লক্ষণ বলা হইয়াছে, এই সূত্রে তাহার ফল বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—তাহা হইতে দ্বন্দ্বানভিঘাত হয়। আসনপ্রতিষ্ঠা হইলে অর্থাৎ আসন-সিদ্ধি হইলে, তাহা হইতে সুখ দুঃখ শীত উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব কর্ত্তৃক যে চিত্তের একটা উৎপীড়ন ভাব, তাহা বিদূরিত হইয়া যায়। যতক্ষণ হৃদয়স্থ চিত্ত অনন্ত সমাপন্ন থাকে, ততক্ষণ কোনরূপ অনুকূল বা প্রতিকূল বেদন দ্বারা চিত্ত উদ্বেলিত হয় না। ইহাই আসনপ্রতিষ্ঠার ফল। কেবল অঙ্গ বিশেষের সংস্থান হইতে এরূপ ফল লাভ হওয়া সম্ভব হয় না। চিত্তকে আত্মার সমীপস্থ করাই আসন। এই আসনে যে যতটা প্রতিষ্ঠিত, তাহার নিকট সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব ততই পরাজিত। সাধারণ মানুষের এই আসনপ্রতিষ্ঠা নাই বলিয়াই তাহারা দ্বন্দ্বের উৎপীড়নে অভিভূত হইয়া থাকে। আর সাধকগণ দ্বন্দ্বাতীত বস্তুর সমীপস্থ হয় বলিয়াই দ্বন্দ্ব বাধা হইতে পরিত্রাণ পায়।

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥

চতুর্থং নিরূপয়তি যোগাঙ্গং তস্মিন্নিতি। তস্মিন্ সতি আসনসিদ্ধৌ সত্যাং প্রাণায়ামঃ প্রাণস্যায়ামো বিস্তারঃ পূর্ব্বোক্ত প্রচ্ছর্দ্দন-

विधारणरूपः समायातो भवतीति शेषः। किंतस्य वाह्यलक्षण मित्याह श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणस्यानन्तप्रसारतोपलब्धिलक्षणे स्वतएव श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदो भवति। अस्माभिस्त्वयन्तु प्राण-प्रतिष्ठेत्युपनिषत्प्रसिद्धाभिधानेनापि परिचीयते प्राणायामः ॥৪৯॥

এই সূত্রে চতুর্থ যোগাঙ্গ প্রাণায়ামের বিষয় নিরূপিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহা হইলে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ রূপ প্রাণায়াম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তাহা হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রূপ আসন সিদ্ধি হইলেই প্রাণায়াম আরম্ভ হয়; ইহার বাহ্য লক্ষণ—শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—চিত্তের অনন্ত সমাপত্তি আসন সিদ্ধির লক্ষণ। এই অনন্ত সমাপন্ন চিত্ত হইতেই প্রাণের আয়াম অর্থাৎ প্রসারতা হইতে থাকে। এই অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণ রূপ প্রক্রিয়া প্রভাবে প্রাণের মহাপ্রসার উপলব্ধি-যোগ্য হইতে থাকে। সাধারণতঃ প্রাণ বলিতে যে কেবল হৃদয় দেশে অনুভব যোগ্য একটুখানি অজ্ঞেয় বস্তুমাত্রের ধারণা হয়, তাহা দূর হইয়া যায়, তখন প্রাণই যে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, এইরূপ অনুভব হইতে থাকে।

যোগীর প্রাণময় গ্রন্থি ভেদ হইলেই এই অন্তর বাহির পরিপূর্ণ-কারী অখণ্ড প্রাণ সত্তার অনুভব হইতে থাকে। ইহাই যথার্থ প্রাণায়াম। অবশ্য প্রথম অবস্থায়ই এতটা হয় না, তখন পুনঃ পুনঃ প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণ রূপ কৌশলের সাহায্যে প্রাণের প্রসারতা ধারণা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। কিছুদিন শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলন ও কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিলে প্রাণায়াম স্বতঃই উপস্থিত হয়। যখন চিত্তের অনন্ত সমাপত্তি হয় অর্থাৎ আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তখন প্রাণও অনিচ্ছায়ই অনন্ত প্রসার লাভ করিতে থাকে। একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়।

এইরূপ প্রাণায়ামের বহির্লক্ষণ—শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ। শ্বাস প্রশ্বাসের যে স্বাভাবিক গতি, প্রাণায়াম হইলে তাহা স্বতঃই নিরুদ্ধ হইয়া যায়। যাহারা মাত্র শ্বাস প্রশ্বাসের গতিকে নিয়মিত করা বা নিরুদ্ধ করিবার জন্য বাহ্য প্রচেষ্টা অবলম্বন করিয়া মনে করে, প্রাণায়াম হইতেছে, বুঝিতে হইবে—তাহারা যথার্থ প্রাণায়ামের পূর্ব্ববর্ত্তী আয়োজন মাত্র করিতেছে। প্রাণ শব্দে বায়ু মাত্র বুঝিয়া লওয়া কনিষ্ঠাধিকারীর লক্ষণ। সে যাহা হউক, উপনিষদে যাহা প্রাণ প্রতিষ্ঠা, যোগশাস্ত্রে তাহাই প্রাণায়াম। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত রহস্য অবগত হইতে হইলে "প্রাণ-প্রতিষ্ঠা" নামক পুস্তকখানি অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ॥৫০॥

প্রাণায়ামং বিভজতি বাহ্যেতি। বাহ্যবৃত্তির্বাহ্যেষু বিষয়েষু বৃত্তিঃ প্রাণানুভবরূপা যস্য স তথাভূতঃ প্রথমঃ প্রাণায়ামঃ প্রচ্ছর্দনমিত্যুক্তং। ততোঽভ্যন্তরবৃত্তিরভ্যন্তরেষু ভাবকল্পনাদিষু বৃত্তিঃ প্রাণানুভবরূপা যস্য স তথাভূতো বিধারণমিত্যুক্তং। তথাস্তম্ভবৃত্তির্বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যা-বগাহিনীং প্রাণানুভূতিং বিহায় প্রাণসত্তামাত্রেঽবস্থানরূপ ইত্যর্থঃ। এতত্ত্রয়াত্মকঃ প্রাণায়ামঃ। স চ দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টঃ সন্ দীর্ঘসূক্ষ্মসংজ্ঞো ভবতি। দেশোঽবকাশঃ পদার্থাধারঃ, কালঃ ক্রিয়াধারঃ, সংখ্যা একত্বাদিরূপা, এতত্ত্রিতয়োপলক্ষিতো যদা পরিদৃষ্টঃ প্রাণায়াম স্তদাস্য দীর্ঘসূক্ষ্ম ইতি সংজ্ঞা ভবতি। দীর্ঘকালেন দীর্ঘকালং বা ব্যাপ্য সূক্ষ্মে দেশকালসংখ্যারূপে প্রতিষ্ঠিতো ভবতীতি সার্থকং নাম দীর্ঘসূক্ষ্ম ইতি।

এতেনৈতদুক্তং ভবতি—বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তিরিতি ত্রয়াত্মকঃ প্রাণায়ামো দৈর্ঘকালাভ্যাসপাকেন সূক্ষ্মবিষয়েষু দেশকালসংখ্যারূপেষু ত্রয়েষ্বপিবৃত্তিমান্ ভবতীতি।

———

এই সূত্রে প্রাণায়ামের বিবরণ কথিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—বাহ্যবৃত্তি অভ্যন্তরবৃত্তি এবং স্তম্ভবৃত্তি রূপ প্রাণায়াম। দেশ কাল এবং সংখ্যা বিশিষ্ট রূপে পরিদৃষ্ট হইলে "দীর্ঘ সূক্ষ্ম" এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। প্রাণায়াম প্রথমতঃ ত্রয়াত্মক—বাহ্যবৃত্তি অভ্যন্তর-বৃত্তি এবং স্তম্ভবৃত্তি। বাহ্য বিষয়ে রূপ রসাদি গ্রাহ্য পদার্থ সমূহে যখন প্রাণের অনুভব হইতে থাকে, তখন তাহার নাম বাহ্যবৃত্তি। পূর্ব্বে ইহাই প্রচ্ছর্দ্দন নামে অভিহিত হইয়াছে। পরে অন্তরে অর্থাৎ ভাব কল্পনা কাম ক্রোধাদি বৃত্তি সমূহে যখন প্রাণের অনুভব হয় তখন তাহাকে অভ্যন্তর বৃত্তি বলে। তারপর এই উভয়বিধ বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ বিশিষ্ট বৈশিষ্ট ভাবে প্রাণের অনুভবকে পরিত্যাগ করিয়া যখন কেবল প্রাণ সত্তা মাত্রের অনুভব হইতে থাকে, তখন তাহাকে স্তম্ভ বৃত্তি বলে। প্রথম প্রথম এই তিনটীকে লইয়াই প্রাণায়াম চলিতে থাকে। তারপর দীর্ঘকালে অভ্যাসের পরিপাক হইলে দেশ কাল ও সংখ্যা রূপ সূক্ষ্ম বিষয়ক প্রাণায়াম হইতে থাকে। পদার্থ সমূহের আধার রূপে দেশের এবং ক্রিয়ার আধার রূপে কালের পরিচয় হইয়া থাকে। আর একত্ব দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যাও সূক্ষ্ম রূপেই পরিগৃহীত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বস্তু হইতে এই দেশ কাল ও সংখ্যা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম। এই সকল সূক্ষ্ম বিষয় অবলম্বন করিয়া যখন প্রাণের অনুভব হইতে থাকে, তখন সেইরূপ প্রাণায়ামকে দীর্ঘ সূক্ষ্ম বলা হয়। এইরূপ সূক্ষ্ম প্রাণায়াম দীর্ঘকাল অভ্যাসের পরিণামেই হয়, এজন্য ইহার "দীর্ঘসূক্ষ্ম" নাম সার্থক। অথবা ঐসকল সূক্ষ্ম বিষয় অবলম্বন করিয়া যখন অপেক্ষাকৃত

দীর্ঘকাল ব্যাপক প্রাণের অনুভব চলিতে থাকে, তখনও উহার "দীর্ঘ সূক্ষ্ম" নাম সার্থক।

শুন, আমার প্রাণই অবকাশ রূপে এই যাবতীয় পদার্থের আধার রূপে অবস্থান করিতেছে, এইরূপ অনুভবের নাম দেশবৃত্তি প্রাণায়াম। ঠিক এইরূপ আমার প্রাণই অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল রূপে জগদ্‌ব্যাপারের আধাররূপে অবস্থান করিতেছে, এইরূপ অনুভূতিকে কাল বৃত্তি প্রাণায়াম বলা যায়। আর সংখ্যা রূপে অর্থাৎ ন্যূনাধিক বুদ্ধির নিরাকরণকারী একত্ব দ্বিত্বাদিরূপে যাহা প্রতীত হয়, ঐ যে দেশ এবং কালরূপ আধারে আধেয়রূপে অবস্থিত যে পদার্থের বা ক্রিয়া সমূহের প্রতি লক্ষ্য করিলেই একত্ব দ্বিত্বাদিরূপ প্রতীতি ফুটিয়া উঠে,ঐ সংখ্যা প্রতীতি রূপে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাও আমার প্রাণই অন্য কিছু নহে, এইরূপ যে অনুভব তাহার নাম সংখ্যা-বৃত্তি প্রাণায়াম। এই ত্রিবিধ প্রাণায়ামই "দীর্ঘ সূক্ষ্ম" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রথমে বাহ্য বৃত্তি, পরে অভ্যন্তর বৃত্তি, তৎপর স্তম্ভ বৃত্তি, ইহা প্রাণায়ামের বা প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রথম অবস্থা। স্তম্ভ বৃত্তি সম্বন্ধে পরসূত্রে বিশেষ বলা হইবে। সে যাহা হউক, ঐ প্রথম অবস্থা অতীত হইলেই প্রাণ স্থূল বস্তু ও ভাব পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম বিষয়ক রূপে প্রতীত হইতে থাকে। তখন ক্রমে দেশ বিষয়ক কাল বিষয়ক এবং সংখ্যা বিষয়ক রূপে প্রাণের প্রকাশ হয়। এই রূপ প্রাণায়াম যখন হইতে থাকে, তখন সাধক আনন্দে অধীর হইয়া পড়ে, আত্ম প্রাণের দেশ কাল ব্যাপী প্রসারতা প্রত্যক্ষ হইলে, যে মুক্তির আভাস পাওয়া যায়, তাহাতেই সাধককে আনন্দবিহ্বল করিয়া থাকে। সাধক, তুমি কি বায়ুরোধ রূপ প্রাণায়াম ক্রিয়া অপেক্ষা এই প্রাণায়ামকে উচ্চস্তরীয় জ্ঞানে ইহাতে আরোহণ করিবার জন্য উদ্যত হইবে না?

তখন আত্মার অস্তিত্ব প্রকাশ পাইতে থাকে। সুস্তবৃত্তি প্রাণায়াম বা কেবল প্রাণ সত্তায় অবস্থান রূপ প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইতেই আত্মার আবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। প্রাণ আত্মারই শক্তি বিশেষ—যে শক্তি এই সৃষ্টি স্থিতি ও লয়রূপ ত্রিবিধ ভঙ্গিমা লইয়া প্রকাশ পাইতেছে, সেই শক্তিতে অবস্থান করিতে পারিলেই, শক্তির যিনি আশ্রয়, যাঁহা হইতে এই শক্তির প্রকাশ হয়, তাঁহার দিকে লক্ষ্য নিপতিত হয়; সুতরাং আর "আত্মা নাই বা আত্মা প্রকাশ হন না" এরূপ যে অজ্ঞান-আবরণ, তাহা থাকিতে পারে না। শ্বাস প্রশ্বাসরূপ প্রক্রিয়া বিশেষের দ্বারা অজ্ঞানরূপ আবরণ কখনও দূর হইতে পারে না। যদি কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় যে—বায়ু-ক্রিয়ারূপ প্রাণায়াম করিতে করিতে কাহারও প্রকাশাবরণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উহা ঐরূপ প্রাণায়ামের ফল নহে; সাধকের কাতর-প্রার্থনা ও ভগবৎ-লাভের তীব্র ইচ্ছাই ঐরূপ ফলকে আনয়ন করিয়াছে।

সাধক! আর একটী গূঢ় রহস্য এখানে প্রকাশ করা যাইতেছে—পূর্ব্বে অবিদ্যা শব্দে যে লীলা শক্তির পরিচয় পাইয়া আসিয়াছ, তাহা এই প্রাণ-নামক শক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। যে শক্তি জগদাকারে আকার প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাই প্রাণ। এই প্রাণ-শক্তিতে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই, অর্থাৎ উক্তরূপ প্রাণায়ামসিদ্ধ হইলেই ইহার আশ্রয় ও প্রকাশস্থান যে চিতিশক্তি অর্থাৎ দ্রষ্টা পুরুষ বা আত্মা, তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায়। অজ্ঞানকে ধরিতে না পারিলে অজ্ঞানের আশ্রয় স্বরূপ জ্ঞানকে—কেবল জ্ঞানকে কিরূপে ধরিবে? যদি তুমি যথার্থ কল্যাণকামী পুরুষ হও, তবে কোনরূপ বিচার বিতর্ক না করিয়া ঋষিপ্রদর্শিত উপায়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুশীলন কর, নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ হইবে। ইতিপূর্ব্বে যে প্রত্যক্‌চেতনাধিগমের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও এই প্রকাশাবরণ-ক্ষয়কারী প্রাণপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

धारणासु च योग्यता मनसः ॥५३॥

अपरञ्चाह फलं धारणेति। ततः प्राणायामसिद्धेर्मनसो धारणासु वक्ष्यमाणलक्षणासु (विषयवहुत्वाद्‌बहुवचनं) योग्यता सामर्थ्यं च भवतीति शेषः ॥ ५३ ॥

প্রাণায়াম সিদ্ধির আরও ফল আছে, তাহা এই সূত্রে বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—ধারণাতেও মনের যোগ্যতা হয়। মন যতদিন কোনরূপ স্থির জিনিষের সন্ধান না পায়, ততদিনই তাহার চঞ্চলতা দুর্নিবার থাকে; কিন্তু একবার যদি একটু মাত্রও স্থির জিনিষের আভাস পায়, তখন সে স্বভাবতঃই ধারণার যোগ্য হইয়া উঠে অর্থাৎ কোন একটী বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সংলগ্ন হইবার সামর্থ্য লাভ করে। ধারণার লক্ষণ পরে বলা হইবে। সাধারণতঃ মন যে অন্ধের মত বাহিরের দিকেই আনন্দের সন্ধান করিত, প্রকাশাবরণ ক্ষয় হইলে তাহা বিদূরিত হইয়া যায়। ধারণার যোগ্যতা আসিলেই সাধক অন্তরঙ্গ সাধনার ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহা বিশদভাবেই বলা হইবে।

स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥५४॥

क्रमप्राप्तं पञ्चमनाह योगाङ्गं स्वविषयेति। इन्द्रियाणां लीलामयस्य द्रष्टुर्या रूपादीनां जिघृक्षा स्वादेः तत्तन्नामकानामिन्द्रियाणां तेषां, स्वविषयासम्प्रयोगे—स्वविषया रूपादयः स्तैः सह्वासम्प्रयोगे विषयाभिमुख्येन वर्त्तनाभावे सतीत्यर्थः। प्रायतितरर्थं सम्भवति। चित्तस्वरूपानुकार इव—चित्त स्वरूपमनुकरोतीति स इव। तथाहि

प्राणप्रतिष्ठारूप-प्राणायाम-प्रभावेन यथा [यथा] चित्तं स्थितिपदं लभते, तथा तथेन्द्रियाण्यपि स्व-स्व विषयेभ्यः प्रत्याहृत्य द्रष्टुः सारूप्यरसास्वाद मुग्धानि स्थैर्य्यमाप्नुवन्तीति प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥

এই সূত্রে ক্রমপ্রাপ্ত পঞ্চম যোগাঙ্গ প্রত্যাহারের বিষয় বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—ইন্দ্রিয় সমূহের স্ব স্ব বিষয়ের সহিত অসম্প্রয়োগ হইলে চিত্তস্বরূপের অনুকরণ করার মত হওয়ায় প্রত্যাহার হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় কি? লীলাময় দ্রষ্টার যে রূপ-রসাদি বিষয় গ্রহণের ইচ্ছা, তাহাই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় বলিতে সাধারণতঃ চক্ষুরাদি বিবরগুলির প্রতিই লক্ষ্য নিপতিত হয়, বাস্তবিক উহারা ইন্দ্রিয় নহে, ইন্দ্রিয়ের দ্বার মাত্র। ইন্দ্রিয়সমূহ অহঙ্কার হইতে উদ্ভূত শক্তিপ্রবাহ। রূপ গ্রহণের যে ইচ্ছাশক্তি, তাহাই চক্ষুঃ নামক ইন্দ্রিয়, শব্দগ্রহণের যে ইচ্ছাশক্তি, তাহাই কর্ণ নামক ইন্দ্রিয়। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে বুঝিয়া লইবে। এই ইন্দ্রিয় সমূহের যখন স্ব স্ব বিষয়—রূপ রসাদির সহিত অসম্প্রয়োগ হয়—সম্বন্ধ রহিত হয়, (প্রাণ প্রতিষ্ঠার ফলে এইরূপই হইয়া থাকে) তখন ইহারা চিত্তস্বরূপের অনুকরণ করে। ইহারই নাম প্রত্যাহার। খুলিয়া বলিতেছি—প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠার ফলে চিত্ত নামরূপের আশ্রয়স্বরূপ প্রাণসত্তা মাত্রেই অবস্থান করে, তখন ইন্দ্রিয়গণও বাধ্য হইয়া চিত্তেরই অনুকরণ করিয়া থাকে। চিত্ত যেমন যেমন স্থিতি পদ লাভ করে, ইন্দ্রিয় সমূহও সেইরূপ স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া দ্রষ্টার সারূপ্য রসের আস্বাদে মুগ্ধ হইয়া স্থিতিপদ প্রাপ্ত হয়। ইহাই প্রত্যাহার।

আসল কথা ঐ সারূপ্য-রসাস্বাদ-মুগ্ধতা। দ্রষ্টার—সচ্চিদানন্দের বৃত্তিসারূপ্যটী লক্ষ্য করিতে পারিলে, চিত্ত তাহাতে মুগ্ধ হইবেই; কারণ সে যে রসস্বরূপ আত্মার আভাস, সে যে পরম প্রেমেরই

ছায়া, তাহার সমীপস্থ হইলে নিতান্ত অনিচ্ছায়ও কিছুক্ষণের জন্য চিত্ত মুগ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং চিত্তের একান্ত আশ্রিত ইন্দ্রিয়গণও সেই আনন্দরসের আভাস পাইয়াই বিষয়রস হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া পড়ে। শুনিয়াছি—সুমধুর বংশীধ্বনি শুনিয়া বন্য পশুসমূহ হিংসা ভুলিয়া মুগ্ধ হইয়া অবস্থান করে, ঠিক সেইরূপই আনন্দরসের আস্বাদ পাইয়াই চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণ বিষয়বিমূঢ়ভাব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। যমুনাপুলিনে কদম্বতরুমূলে রাস-রসিকের বংশীধ্বনিতে গোপীকুলের যে গৃহত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এই ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাহার ব্যতীত অন্য কিছু নহে। হৃদয়-বৃন্দাবনস্থ প্রেমময়ের আকর্ষণে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়লোলুপতা যে বিদূরিত হয়, ইহা একান্তই স্বাভাবিক। চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়, উভয়ই যেন আমাদিগকে নিয়ত প্রতারিত করিতেছে বলিয়াই মনে হয়, উহা ভ্রম। উহাদের কোন দোষ নাই। কোনও মধুময় বস্তু পায় না বলিয়াই উহারা আপাতরমণীয় বিষয়সুখে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। যদি উহারা আনন্দ-ঘন সত্তার সন্ধান পায়, তবে উহাদের ঐ বহির্মুখী গতি আপনা হইতেই নিরুদ্ধ হইয়া যায়। মনে রাখিও সাধক, দ্রষ্টার সারূপ্য দর্শনই যোগলাভের একমাত্র উপায়। একমাত্র উহা হইতেই যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার সকলই আগমন করে।

ততঃ পরমাবশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥৫৫॥

ইতি পাতঞ্জলসূত্রে সাধনপাদঃ।

—※—

প্রত্যাহারসিদ্ধিলব্ধফলমুক্ত্বাধ্যায়মুপসংহরতি ততইতি। ততঃ প্রত্যাহারসিদ্ধে রিন্দ্রিয়াণাং পরমা বশ্যতা সংযমবশাক্রান্ততা ভবতীতিশেষঃ। বাহ্যবিষয়ে ব্যাকৃষ্যমানান্যপি প্রত্যাহারপ্রভাবেন স্ববশ্যানি তিষ্ঠন্তি ন কস্মিংশ্চিদপিবিষয়ে লগন্তীতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি যোগরহস্যে সাধনপাদঃ।

এই সূত্রে প্রত্যাহার সিদ্ধির লক্ষণ বর্ণনা করিয়া অধ্যায়ের উপসংহার করা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—তাহা হইতে ইন্দ্রিয়গণের পরমা বশ্যতা হয়। তাহা হইতে অর্থাৎ প্রত্যাহার প্রতিষ্ঠা হইলে, ইন্দ্রিয় সমূহের পরমা বশ্যতা—একান্ত বশীভূততা হইয়া থাকে। ইতি পূর্ব্বে যে বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই ইন্দ্রিয়গণের পরমা বশ্যতা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। প্রত্যাহার সিদ্ধ হইলে রাগ দ্বেষ বশতঃ বিষয়ের ত্যাগ বা গ্রহণ থাকে না, "রাগ দ্বেষ বিমুক্ত ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা বিষয়সমূহে বিচরণ করিয়াও বিধেয়াত্মা ব্যক্তিগণ চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন" ইহা ভগবদ্ গীতার বাক্য। বস্তু মাত্রই দ্রষ্টার সারূপ্য—বিষয় মাত্রই প্রাণ, এইরূপ দর্শন এইরূপ অনুভব পুনঃ পুনঃ করার ফলে, অভ্যাস পরিপাক প্রাপ্ত হইলে, রাগ দ্বেষ বিদূরিত হইবেই। সে অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলেও আর আসক্তি উৎপাদন করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়সংযম বলিতে যাহারা মনে করেন—বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়হইতে আকর্ষণ করা, তাহাদের সহিত আমরা কোনরূপেই একমত হইতে পারি না। ঐরূপ সংযম উপযুক্ত অবসরে নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু বিষয় যে দ্রষ্টাই, এই বুদ্ধিতে বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে, তাহার ফলে চিত্ত ও ইন্দ্রিয় বিষয় রসে আকৃষ্ট না হইয়া দ্রষ্টার রসে মুগ্ধ হয়। ফলতঃ সেই ইন্দ্রিয় সংযমই হইয়া থাকে। উৎকৃষ্টতর রসের আস্বাদ দিতে পারিলেই নিকৃষ্ট বিষয়রসের প্রতি ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ নিবৃত্তি হইয়া যায়। এইরূপ প্রত্যাহারের ফলে ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যবিষয়কর্তৃক পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ আকৃষ্ট হইয়াও স্বস্থ থাকিতে পারে; কারণ, যেখানেই ছুটিয়া যাউক না কেন, আনন্দস্বরূপের আস্বাদ হইতে বঞ্চিত হয় না। এইরূপে ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে বিমুগ্ধ হয় না, লাগিয়া থাকে না, সর্ব্বথা স্বস্থই থাকে।

যোগ দর্শনের সাধন পাদ এই খানেই সমাপ্ত হইল। সাধন অর্থ উপায়। যে যে উপায় অবলম্বন করিয়া যোগস্বরূপে উপনীত হওয়া

যায়, তাহার প্রায় সকলই এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। যদিও ধারণা প্রভৃতি আরও তিনটী সাধন পরবর্ত্তি-অধ্যায়ে উক্ত হইবে; তথাপি উহাকে সাধন না বলিয়া এই প্রত্যাহার পর্য্যন্ত সাধনার ফল বলিলেও কিছু ক্ষতি হয় না। বাস্তবিক তাহাই। এস সাধক! আমরা এইবার পতঞ্জলি দেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তাঁহারই প্রদর্শিত পথে যোগেশ্বরী মায়ের কোলে আরোহণ করিবার যোগ্যতা প্রার্থনা করি। ঋষিকৃপা ব্যতীত মাতৃঅঙ্কে স্থান পাইবার উপায় নাই। ঋষিগণ যে প্রশস্ত পন্থা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আরোহণ করিতে না পারিলে, মুক্তি-মন্দিরে উপনীত হইবার আশা নাই। তাই অবনত মস্তকে পূতনামা পতঞ্জলিদেবের চরণে ভূমিষ্ঠ প্রণামপূর্ব্বক অধ্যায় সমাপ্তি করিতেছি। তিনি আমাদের মধ্যদিয়া আর্যশক্তির অনুপ্রেরণা করুন। আমরা যোগরহস্য অবধারণ করিয়া ধন্য হই।

নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ। নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ।

ইতি যোগরহস্য ব্যাখ্যায় সাধনপাদ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়॥

योगरहस्यम् ॥

—०*:(§):*०—

विभूतिपादः ॥

—(०)—

देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ १ ॥

नमाम्यात्मविभूतये ।

दर्शितानि योगसाधनानि द्वितीयेऽस्मिंस्तु पादे तदुवर्त्मगामिना-माविर्भविष्यमाना आत्मविभूती रूपवर्णयितुमादौ संयमाख्यमवशिष्टं योगाङ्गत्रयं निरूपयन् धारणाभिधानं षष्ठमाह योगाङ्गं देशेति । चित्तस्य देशान्तो देशेषु बन्ध इति । तथाहि देशो नाम वाह्याभ्यन्तर भेदतो द्विधा, वाह्याः—नामरूपात्मकाः स्थूलाः, आभ्यन्तराः—सुख दुःखादयः कामक्रोधादयश्च भावा स्तथा मूलाधारादयोऽनुभवस्थानानि सप्त, प्रणवा-दयोमन्त्राः परमेश्वर नामविशेषाश्च । देशेष्वेतेषु यथाधिकारं यथायोग्यं योबन्धः यत् स्थैर्यं, प्रागुक्ताभ्यासापरनामधेय-सत्यप्राणप्रतिष्ठा व्यपदेशेन पुनः पुनर्द्रष्टृ-सारूप्य-रसास्वादरूप इतिभावः । सा धारणा तदाख्यं योगाङ्गमिति ।

एतेनैतदुक्तं भवति—केवले देशविशेषे हठप्रक्रियाविशेषेण चित्तस्य योबन्धस्तस्य न योगाङ्गत्वं, द्रष्टृसम्बन्धाभावात् किन्तु सच्चिदानन्द स्वरूपस्य द्रष्टुर्यः सत्तादिरूपोरस स्तदास्वादनमुग्धं चित्तं यदावाह्ये ऽभ्यन्तरे वा देशविशेषे पुनः पुनर्लगति तदेव सा धारणेति ध्येयं सुधोभिः । अपिच कृतायां धारणायां प्रत्याहारादीन्युपतिष्ठन्ते स्वतएवाङ्गानिमौलि-ग्रहणेनेव करचरणादीनामिति ॥ १ ॥

আত্মবিভূতিরূপিণী জননী ! তোমাকে প্রণাম । মাগো এই বিভূতি পাদ বড়ই গহন । এখানে আসিয়া অনেক বীর্য্যবান্ সন্তানও বিমূঢ় হইয়া পড়ে, আর আমরা ত নিতান্ত দুর্ব্বল দীন নগ্ন শিশু ; সুতরাং

আমাদের পক্ষে এই দুর্গম বিভূতিরাজ্য অতিক্রম করা যে কত দুরূহ ব্যাপার, তাহা তোমার অবিদিত নহে। তবে ভরসা এই যে, মা তুমি নিজেই গুরুমূর্ত্তিতে করুণাময় বিগ্রহরূপে আমাদের হাত ধরিয়া চলিতেছ। যদি আমরা তোমার হাত ধরিয়া চলিতাম, তবে পদস্খলনের আশঙ্কা খুবই ছিল ; কিন্তু তোমার অবিকম্পিত করুণাময় করধৃত সন্তান বলিয়াই আমরা নিঃশঙ্ক-চিত্তে এই দুর্গম বিভূতিরাজ্য অনায়াসে অতিক্রম করিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছি। মা তুমি আমাদের এই উদ্যম সার্থকতা-মণ্ডিত করিয়া দাও। আমরা নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে আনন্দে তোমার অপূর্ব্ব বিভূতি তোমার অতুলনীয় মহত্ব তোমার অনুপম সৌন্দর্য্য তোমার অচিন্তনীয় লীলাবিলাস দেখিতে দেখিতে মুক্তিমন্দিরে উপনীত হই—তোমাতেই সম্যক্‌ভাবে মিলাইয়া যাই—কৈবল্যযোগী হইয়া জন্মজীবন সার্থক করি। জয় মা জয় মা জয় মা ! জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু !

দ্বিতীয়পাদে যমনিয়মাদি যোগাঙ্গ বা যোগের সাধনসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই তৃতীয়পাদে আত্মবিভূতিসমূহ বর্ণিত হইবে। যোগমার্গে অগ্রসর হইতে থাকিলে প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে অল্পাধিক বিভূতি এই পথের সহচররূপে—অগ্রগতির সূচকরূপে এবং পরবৈরাগ্যের হেতুরূপে স্বতঃই উপস্থিত হইয়া থাকে। গীতা-শাস্ত্রের দশম অধ্যায়ে স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট বিভূতিযোগ এই পতঞ্জলিপ্রোক্ত বিভূতিরই প্রত্যক্ষানুভবরূপ সবিস্তার ব্যাখ্যামাত্র। বিভূতি একমাত্র আত্মার—পরমেশ্বরের। বিভু ব্যতীত আর কোথায়ও বিভূতি নাই, থাকিতে পারে না। এই বিশ্বই যাঁহার অচিন্তনীয় বিভূতি, ক্ষুদ্র মহৎ সকল বিভূতিই তাঁহার। যে সকল সাধক গুরুকৃপায় পূর্ব্বসুকৃতিবশে কৃচ্ছ্রসাধনার ফলে কোনরূপ বিভূতি লাভ করিয়া নিজেকেই বিভূতিসম্পন্ন পুরুষ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা সর্ব্বথা অনুকম্পার পাত্র। আবার যাঁহারা জীবিকার জন্য বা যশোলাভের জন্য লব্ধবিভূতির অপব্যবহার করেন, তাঁহারা ততোঽধিক দয়ার পাত্র

বলিয়াই মনে হয়। যাঁহারা মুমুক্ষু সাধক—যাঁহারা কৈবল্য পদ প্রয়াসী যোগী, তাঁহাদের পক্ষে বিভূতিসমূহ যে পরবৈরাগ্য লাভের পথই সুগম করিয়া দেয়, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই। উপযুক্ত অবসরে এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করা হইবে।

পূর্ব্ববর্ত্তি-পাদে অষ্টবিধ যোগাঙ্গের মধ্যে পাঁচটী যোগাঙ্গ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিভূতি বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে অবশিষ্ট তিনটীর স্বরূপ নির্ণয় করা আবশ্যক ; যেহেতু, ঐ তিনটী ব্যতীত বিভূতি লাভ অসম্ভব। তাই এই অধ্যায়ের প্রথমেই মহর্ষি পতঞ্জলিদেব ধারণা নামক ষষ্ঠ যোগাঙ্গের বিষয় বলিলেন—চিত্তের যে দেশবন্ধ তাহাই ধারণা। দেশ দুই প্রকার—বাহ্য এবং অভ্যন্তর। নামরূপাত্মক স্থূলপদার্থ সমূহ বাহ্যদেশ এবং সুখ দুঃখ হর্ষ শোকাদি কিংবা কামক্রোধাদি বৃত্তি-সমূহ অভ্যন্তর দেশ নামে কথিত হয়। এতদ্ব্যতীত আরও দেশ আছে—যথা, মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধ আজ্ঞাখ্য এবং সহস্রার। ইহারা সাধারণতঃ আধ্যাত্মিক দেশ নামেই পরিচিত হইলেও আভ্যন্তর দেশ মধ্যেই পরিগণিত। আরও আছে—প্রণব, স্ব স্ব ইষ্টমন্ত্র, ভগবানের বিভিন্ন নাম, ইহারাও আভ্যন্তর দেশই বটে। এই সকল দেশের মধ্যে যেরূপ অধিকারীর পক্ষে যেরূপ দেশে চিত্তের বন্ধ হওয়া সম্ভব, তাহার পক্ষে সেইরূপ দেশই বিহিত। পূর্ব্ব কথিত দেশসমূহের মধ্যে যে কোনও দেশে, অথবা অধিকার অবস্থা ও সময় ভেদে সকল দেশেই চিত্তের বন্ধ হইতে পারে। বন্ধ শব্দের অর্থ স্থৈর্য্য। পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষভাগে উক্ত হইয়াছে—প্রত্যাহার হইতেই চিত্তের ধারণা-সামর্থ্য উপস্থিত হয়। একটু একটু ভগবৎ-রসের আস্বাদ পাইলেই ধারণা সম্ভব হয়। অন্যথা কেবল কোনও স্থানবিশেষে বা ভাববিশেষে চিত্তকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিবার চেষ্টায় বিশেষ কিছু ফল হয় না। কারণ এই যে, ঐরূপ হঠপ্রক্রিয়াকৃত প্রত্যাহার বা ধারণা কখনও যোগাঙ্গ হয় না। যোগ বলিতে দ্রষ্টাকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয়। সকল

অঙ্গের সহিতই দ্রষ্টার বিদ্যমানতা বা সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। কেবল অনুষ্ঠানমাত্রই কখনও যোগের অঙ্গ হইতে পারে না। যোগের সহিত যোগ থাকিলে তবেই অনুষ্ঠানগুলি যোগাঙ্গ হইয়া থাকে। অন্যথা প্রাণহীন উদ্দেশ্যহীন কতকগুলি অনুষ্ঠান করিলেই সাধকের আশা পূর্ণ হয় না—যোগ লাভ হয় না। সকল অঙ্গ সকল অনুষ্ঠানই যদি ভগবানের সহিত—দ্রষ্টার সহিত সম্বন্ধময় হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তবে অচিরকাল মধ্যেই সাধকগণ কৃতার্থ হইতে পারেন। জগতে যতপ্রকার সাধন-প্রণালী প্রচলিত আছে, যতপ্রকার উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়, তাহার সকলগুলিই যদি যোগাঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হয়, দ্রষ্টার সহিত অল্পাধিক সম্বন্ধ রাখিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তবে উহারা কখনও নিষ্ফল হয় না। মনে কর—একটী প্রণাম। প্রায় সকল সাধকই ইহা করিয়া থাকেন। ঐ প্রণামটী যদি যোগাঙ্গ রূপে কৃত হয়, তবে প্রণাম কালেই প্রণাম কর্ত্তার চিত্তের অবস্থা শরীরের অবস্থা অন্তরূপ হইয়া পড়ে, একটা সাময়িক কৃতার্থতার ভাব আনিয়া দেয়। অন্যথা সহস্রবার ভূমিতে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিলেও বিশেষ কিছু ফল হয় না। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে। কিন্তু এ সকল অন্যকথা—আমরা ধারণার বিষয় আলোচনা করিতেছিলাম।

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ দ্রষ্টার যে সত্তা প্রকাশ ও আনন্দরূপ রস, সেই রসের মধ্যে যেরূপ চিত্তের পক্ষে যতটুকু রস আস্বাদনের যোগ্যতা আছে, সেইরূপ চিত্তকে ততটুকু রসাস্বাদনের সুযোগ প্রদান করিলে উহা আপনা হইতেই বন্ধ স্বীকার করিয়া লয়। আত্ম রসের আস্বাদেই চিত্ত মুগ্ধ হয়, রস-স্বরূপ আত্মার আভাস মাত্র পাইলেই চিত্ত স্থির হইয়া যায়। আরে, "সর্ব্বত্রই আমার প্রাণ-প্রিয় পরম দেবতা বিরাজ করিতেছেন" এই সত্যকথাটা যদি চিত্ত ঠিক ঠিক মানিয়া লয়, তবে সকল দেশেই চিত্ত লাগিয়া থাকিতে পারে। কি নামরূপাদি বাহ্যদেশ, কি ভাব বৃত্তি প্রভৃতি আভ্যন্তর দেশ, কি মূলাধারাদি আধ্যাত্মিক দেশ, কি প্রণবাদি মন্ত্র বা নাম, সকল দেশেই চিত্ত

বন্ধ হইয়া যায়। যদিও ঐরূপ বন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, তথাপি সাময়িক স্থৈর্য্য নিশ্চয়ই উপস্থিত হয়। আত্ম রসের আভাস অর্থাৎ সাময়িক আস্বাদ পায় বলিয়াই চিত্ত সহজে বশ্যতা স্বীকার করে। পূর্ব্বে যাহা সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা নামে উক্ত হইয়াছে পতঞ্জলি দেব যাহাকে "অভ্যাস" বা বৃত্তিসারূপ্য দর্শন বলিয়াছেন, যাহা ইতিপূর্ব্বে ক্রিয়াযোগ নামে অভিহিত হইয়াছে, সে সকলই এই ধারণা নামক ষষ্ঠ যোগাঙ্গের অনুশীলন ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

দ্রষ্টার দুই রূপ। এক—স্বরূপ, ইহা বাক্য মনের অতীত, অন্য—বৃত্তির সমানরূপ, ইহাতে সকলেরই অধিকার আছে, অতি দুরাচার ব্যক্তিরও আছে। আত্মার এই বৃত্তিসারূপ্য-প্রাপ্তরূপে—বহুরূপে অবস্থানের যে চেষ্টা, তাহাই ধারণা। যতদিন "সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদক" —সর্ব্বত্র পূর্ণ স্বরূপ ব্রহ্মকর্ত্তৃক পরিপ্লাবিত না হয়, ততদিনা "উদপানের"ই প্রয়োজন—ততদিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভাব লইয়াই ব্রহ্মদর্শন করিতে হয়, ইহাই ধারণা। এইরূপ ধারণা করিতে পারিলে প্রত্যাহার প্রভৃতি অন্যান্য যোগাঙ্গগুলি আপনা হইতেই উপস্থিত হইতে থাকে। মস্তক ধরিয়া আকর্ষণ করিলে হস্ত পদাদি অবয়বগুলি আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়।

এস্থলে সাধকগণের অবগতির জন্য মুলাধারাদি সপ্তবিধ আধ্যাত্মিক দেশ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে। ষট্চক্র প্রভৃতি গ্রন্থে এবং বর্ত্তমানে প্রকাশিত নানাবিধ চিত্রে ইহার অনেক প্রচার ও পরিচয় হইয়াছে ও হইতেছে। আমরা জানি—যতদিন কোন তত্ত্বদর্শী গুরুর মুখ হইতে শক্তি ও প্রক্রিয়া সহ ইহা পরিগৃহীত না হয়, ততদিন উহাদ্বারা সাধকের আশা পূর্ণ হয় না। পুস্তক পড়িয়া সাধারণ জ্ঞান মাত্র হয়, শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠান দ্বারা উহা সার্থকতা-মণ্ডিত হয়। অনুষ্ঠান গুরুকৃপা সাপেক্ষ। সে যাহা হউক, মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে ছয়টী বিশিষ্ট অনুভূতি স্থান আছে। নিম্নভাগে যে স্থানে মেরুদণ্ড শেষ হইয়াছে, তাহার নাম মূলাধার। লিঙ্গমূলের

সমসূত্রে স্বাধিষ্ঠান, নাভির সমসূত্রে মণিপুর, হৃদয়ের সমসূত্রে অনাহত, কণ্ঠের সমসূত্রে বিশুদ্ধ এবং ললাটে অর্থাৎ মস্তিষ্কের নিম্নভাগে যে স্থানে আসিয়া মেরুদণ্ডের অগ্রভাগে সংযুক্ত হইয়াছে, তাহার নাম আজ্ঞাচক্র। এতদ্‌ব্যতীত মস্তকে সহস্রার অবস্থিত। ঐ সকল বিশিষ্ট দেশে গুরূপদিষ্ট উপায়ে চিত্তের বন্ধ বা ধারণা অভ্যাস করিতে হয়। যাহারা সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠায় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ প্রচ্ছর্দ্দন-বিধারণরূপ প্রাণায়ামে অভ্যস্ত নহে, তাহাদের পক্ষে এরূপ ধারণা একেবারেই অসম্ভব। তাই পূর্ব্ব হইতে প্রাণায়ামে অভ্যস্ত হইয়া পরে এই সকল আধ্যাত্মিক দেশে চিত্তের বন্ধ বা ধারণা করিতে হয়। ক্রমে উহা হইতে নানারূপ অনুভূতি অলৌকিক দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি বিভূতি বা সিদ্ধি সমুহ আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে। সেই জন্যই ঋষি এই ধারণারূপ ষষ্ঠ যোগাঙ্গ হইতেই বিভূতি পাদের সূচনা করিয়াছেন।

মূলাধারাদি কেন্দ্র বিষয়ে আরও অনেক জ্ঞাতব্য আছে। ক্ষিতি অপ্‌ তেজঃ মরুৎ ব্যোম মন এবং প্রাণ, এই সকল তত্ত্বের বিশিষ্টভাবে অনুভব করিবার পক্ষেও ঐ আধ্যাত্মিক কেন্দ্রগুলিই সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। তারপর সাধক যখন গুরুকৃপায় বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়, তখন দেখিতে পায়—মূলাধার বলিতে ক্ষিতিতত্ত্বীয় বোধ অর্থাৎ স্থূলত্বের অনুভবমাত্রই পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ স্বাধিষ্ঠান বলিতে কেবল জলতত্ত্বীয় বোধ বা রসময়ত্বের অনুভবকেই লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধেও এইরূপ বিভিন্ন তত্ত্বীয় বোধমাত্রই বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ বোধময়ক্ষেত্রে উপনীত হইলে আর পূর্ব্বোক্তরূপ স্থূল আলম্বনের প্রয়োজন হয় না। ধারণা প্রথমতঃ স্থূলবিষয় অবলম্বন করিয়াই চলিতে থাকে, ক্রমে চিত্ত যত নির্ম্মল ও সূক্ষ্ম হইতে থাকে ধারণার অবলম্বনও তত নির্ম্মল ও সূক্ষ্ম হয়। চিত্তের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া যোগোপদেষ্টা গুরুই ধারণার আলম্বন নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥২॥

সম্প্রতি যোগাঙ্গং তত্রেতি। তত্র তস্মিন্ ধারণাবিষয়ীভূতে দেশে, যদা প্রত্যয়ৈকতানতা প্রত্যয়স্য একতানতা অবিচ্ছিন্না ভবেত্তদা ধ্যানমিতি। এবঞ্চ বিন্দুবিন্দুমধুধারেব বিচ্ছিন্নঃ সমজাতীয়ঃ প্রত্যয়-প্রবাহো ধারণা, ধ্যানন্ত্ববিচ্ছিন্নঃ প্রত্যয়প্রবাহ ইতি বিশেষঃ ॥২॥

এই সূত্রে সপ্তম যোগাঙ্গ ধ্যানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহাতে যে প্রত্যয়ের একতানতা, তাহাই ধ্যান নামে কথিত হয়। তাহাতে অর্থাৎ ধারণার বিষয়ীভূত দেশে, ধারণা করিতে করিতে যখন প্রত্যয়ের একতানতা হয়—অবিচ্ছিন্ন ভাবে এক-জাতীয় প্রত্যয় প্রবাহ চলিতে থাকে, তখন তাহাকে ধ্যান কহে। ধারণাকালে বিন্দু বিন্দু মধুধারার ন্যায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন অথচ সম-জাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ চলে, আর ধ্যানকালে একই প্রত্যয়প্রবাহ অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকে। ধারণা হইতে ধ্যানের ইহাই বিশেষত্ব।

ধ্যান সম্বন্ধে এস্থলে কিছু আলোচনা আবশ্যক। সাধারণতঃ "ধ্যান করা" একটী কথা প্রচলিত আছে। বাস্তবিক কিন্তু "ধ্যান" করার মতন কিছু নহে, উহা—হয়। ধারণা করিতে করিতে ধ্যানাবস্থা উপস্থিত হয়। যতক্ষণ চিত্তের তুল্যজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ ধারণাও হয় না। প্রথমক্ষণে চিত্তে যেরূপ স্পন্দন উঠিয়াছিল, দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি পর পর ক্ষণেও যদি ঠিক সেইরূপ স্পন্দন উঠিতে থাকে, তবেই ধারণা হয়। ধারণার পরিপকাবস্থায় ধ্যান আসে; তখন সমজাতীয় স্পন্দনের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা রহিত হইয়া যায়, অবিচ্ছিন্ন ভাবেই প্রত্যয়ধারা উঠিতে থাকে। এইরূপ ধারণা বা ধ্যান কোন মূর্ত্তিবিশেষ অবলম্বনে করা বা হওয়া একান্ত আবশ্যক

ব্যাপার। স্বাভাবিক চঞ্চলতাবশতঃ চিত্ত প্রথমক্ষণে মূর্ত্তির যে অবয়বে বদ্ধ স্বীকার করিয়াছিল, পরক্ষণে তথা হইতে অন্যত্র চলিয়া যায়, তৎপরবর্ত্তিক্ষণে আবার অন্য অবয়বের প্রতি লক্ষ্য নিপতিত হয়। এই জন্যই তুল্যজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহ চলে না। অথচ সাধক হয়ত মনে করিলেন—"আমি একঘণ্টা ইষ্টমূর্ত্তি ধ্যান করিলাম" বাস্তবিক ধ্যান ত দূরের কথা, তাঁহার যে ধারণাও হইল না, ইহাও তিনি লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। বহুবৎসরযাবৎ এইরূপ ব্যর্থ ধারণা ধ্যান করিয়া যখন সাধকের আশা পূর্ণ হয় না, তখন সে অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিয়া থাকে—"ভগবান্ অতি দুর্ল্লভ বস্তু"। ধ্যান কেন, ধারণাও যদি ঠিক ঠিক হয়, তবে তাহাতেই চিত্ত বিশ্রাম লাভ করে—প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত-চিত্তেই ভগবান্ প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন। অতি অল্প লোকেই চিত্তের প্রশান্ততা লাভ করিতে পারেন। প্রতিনিয়ত বিভিন্নরূপ স্পন্দন লইয়া চিত্ত একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, যদি অতি অল্প সময়ের জন্যও চিত্তে তুল্যজাতীয় প্রত্যয়ধারা উঠে, তবে চিত্ত স্বতঃই বিশ্রাম লাভ করে। বিশিষ্ট কোন মূর্ত্তির ধ্যান প্রথমপ্রবিষ্ট সাধকগণের পক্ষে কথঞ্চিৎ উপকারী হইলেও যথার্থ চিত্তপ্রশান্ত করার পক্ষে উহার বিশেষ কোন উপযোগিতা নাই। তাই শাস্ত্রকারগণও বলিয়া থাকেন "যোগারম্ভে মূর্ত্তহরিং অমূর্ত্তমথ চিন্তয়েৎ"।

যাহারা মূর্ত্তিবিশেষ অবলম্বনে ধারণা বা ধ্যানের অভ্যাস করেন, তাঁহারা মূর্ত্তির বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া মাত্র অস্তিত্বের দিকে—সত্তার দিকেই লক্ষ্য রাখিবেন। এবং ঐ সত্তা অবলম্বনেই ধারণা ধ্যানের অনুশীলন করিবেন। এইরূপ করিলে অল্পদিনের মধ্যেই ধারণা ও ধ্যান যে কি, তাহা বুঝিতে পারিবেন, তখন সাধনাও অনেকটা সহজসাধ্য হইয়া পড়িবে। মূর্ত্তির অবয়ব চিন্তা অপেক্ষা উহার মহত্ত্ব বা সত্তা চিন্তাই সমধিক কার্য্যকারী হইয়া থাকে। আর যাঁহারা মূর্ত্তিচিন্তায় অভ্যস্ত নহেন, তাঁহারা প্রথম হইতেই আকাশবৎ

সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যময় সত্তামাত্র অবলম্বনে ধারণা করিবেন। এই উভয় পক্ষেই তুল্যজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ উত্থাপন করা সহজসাধ্য হইয়া থাকে। কোনরূপে যদি তুল্যজাতীয় প্রত্যয়ধারা-রূপ ধারণা অভ্যস্ত হইয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই অচিরকাল মধ্যে প্রত্যয়ের একতানতা-রূপ ধ্যান উপস্থিত হইবে। ধারণার পরিপক্কাবস্থাই ধ্যান। রসস্বরূপ আত্মার একটুখানি সত্তার আভাসমাত্র লইয়া ধারণা আরম্ভ হয়, ক্রমে উহা সত্তার অনুভূতিরূপ রসে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় সাধক আত্মহারাপ্রায় হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে সেই রস আস্বাদন করিতে থাকে, ইহাই ধ্যান।

तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥३॥

अष्टममाह योगाङ्गं तदिति। तदेव ध्यानमेव यदा अर्थमात्र निर्भासं—अर्थमात्रं ध्येयमात्रं, मात्रशब्देन ध्यातृध्याने निवर्त्तते, निःशेषेण भासत इति निर्भासं ध्येयं वस्तु समग्रं प्रकाशते न किञ्चिदप्य प्रकाशं वर्त्तत इति भावः। किञ्च स्वरूपशून्यमिव चित्तस्य यत् स्वरूपं ध्यातृरूपं तेन शून्यमिव, नतु वास्तवं शून्यम् तदापि सूक्ष्मतया विद्यमानत्वादितिभावः, एवञ्च समाधिरिति। ध्याने ध्यातृध्येयध्यानाना मनुभासः समाधौ तु चित्तं ध्येयाकारमेव। आभौतिकादस्मिता पर्य्यन्तं समाधि-विषयो नतु द्रष्टा, चित्तस्याविषयत्वात्तस्येति ॥३॥

এই সূত্রে অষ্টম যোগাঙ্গ সমাধির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহাই (অর্থাৎ ধ্যানই) যখন অর্থমাত্র নির্ভাস হয়, স্বরূপ শূন্যের মতন হয়, তখন সমাধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ধারণার পরিপাক অবস্থা ধ্যান, এবং ধ্যানের পরিপাক অবস্থা সমাধি নামে

অভিহিত হয়। ধ্যান করিতে করিতে দুইটী লক্ষণ প্রকাশ পায়, একটী অর্থমাত্রনির্ভাস, অপরটী স্বরূপ-শূন্য। অর্থমাত্রনির্ভাস শব্দে ধ্যেয়পদার্থমাত্রের নিঃশেষরূপে প্রকাশ বুঝায়। যে বিষয়টী অবলম্বন করিয়া ধ্যান চলিতেছিল, সেই বিষয়টী সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। ধ্যেয়বিষয়ের কোন এক অংশও জ্ঞানের অগোচর থাকে না। সাধারণতঃ যে জ্ঞান লইয়া আমরা জগতে বিচরণ করি, তাহা অতি অল্প ও সঙ্কীর্ণ। মনে কর—একটী ফুল দেখিলাম, ফুলের জ্ঞান হইল। এই জ্ঞান এত সামান্য যে, ফুলের সর্ব্বাংশ আমার জ্ঞানগোচর হইল না। আর যেটুকু জ্ঞানগোচর হইল, তাহাও অন্যান্য জ্ঞানের সহিত সঙ্কীর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইল; যেহেতু পুষ্পজ্ঞান কালেও চিত্তের চঞ্চলতা বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন স্পন্দন দ্বারা চিত্ত কলুষিত হইয়া থাকে। কিন্তু সমাধি অবস্থায় যখন ফুলের জ্ঞান হয়, তখন একদিকে যেমন একমাত্র ফুল ব্যতীত অন্য কোনরূপ জ্ঞান আসিয়া ঐ জ্ঞানকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেয় না, অন্য দিকে তেমনি ফুলের সর্ব্বাংশই যুগপৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ধ্যেয়বিষয়ের এইরূপ অসঙ্কীর্ণ ভাবে যুগপৎ সর্ব্বাংশ প্রকাশ হওয়াই "অর্থমাত্র-নির্ভাস।"

স্বরূপশূন্য শব্দের অর্থ—চিত্তের যে স্বকীয় রূপ অর্থাৎ ধ্যাতৃরূপ, তাহাও শূন্যের মত হয়—ধ্যাতৃরূপটীও যেন থাকে না। বাস্তবিক কিন্তু সূক্ষ্মরূপে ধ্যাতৃরূপটী বিদ্যমান থাকে, অথচ তাহা কার্য্যক্ষেত্রে না থাকার মতনই হয়, তাই সূত্রে "স্বরূপশূন্যমিব" এই 'ইব' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ধ্যানকালে ধ্যাতা ধ্যেয় এবং ধ্যান, এই ত্রিবিধ অনুভাস হইতে থাকে। আর সমাধিকালে ধ্যাতৃ ভাবটী থাকে না—রূপটী শূন্যবৎ হইয়া পড়ে, সুতরাং ধ্যানও থাকে না, অবশিষ্ট ধ্যেয়বিষয়টীই নিঃশেষরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। সমাধিকালে চিত্তই ধ্যেয়াকারে সম্যক্ আকারিত হয়, এবং ধ্যেয়বস্তুর যাহা যথার্থ স্বরূপ; তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

সাধারণতঃ অন্তর বাহির রূপে জ্ঞানের যে দ্বিবিধ প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়, উহা সমাধি অবস্থায় থাকে না। সকলই অন্তররূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অথবা সে অবস্থায় বাহির বলিতে কিছু থাকে না বলিয়াই যাহা থাকে, তাহাকে ঠিক অন্তরও বলা যায় না। তবে বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হয় বলিয়াই অন্তর শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। অন্তর বলিতে বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তর ভাগ বুঝায় না। আমার যাহা আমিত্ব—যাহা হৃদয়, তাহাকেই অন্তর কহে। এই যে আমার শরীর ইন্দ্রিয় মন, ইহারাও আমার অন্তরস্থ পদার্থ। এই যে রূপরসাদি বিষয়সমন্বিত বাহ্য জগৎ, ইহাও আমারই অন্তরে অবস্থিত —আমার আমিত্ব গণ্ডির মধ্যেই অবস্থিত। আমার চিত্ত অর্থাৎ আমিই দ্রষ্টা এবং দৃশ্য উভয় সাজ লইয়া—অন্তর বাহির ভেদজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া এই অপূর্ব্ব সংসার লীলার অভিনয় করিতেছি। সমাধি অবস্থায় এই ভেদজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। দৃশ্য বস্তু অবলম্বনে সমাহিত হইলে, ঐ দৃশ্য যে আমিই, ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে; দৃশ্য বস্তু বিষয়ে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জ্ঞান আর কিছুই নাই। দ্রষ্টাই যে বৃত্তিসারূপ্য লইয়া জগৎ সাজে বিরাজ করিতেছেন, ইহা সমাধি অবস্থায়ই সম্যক্ প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। সমাধি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ জ্ঞান পরোক্ষমাত্র রূপেই থাকে।

আর একটী বিশেষ কথা এই যে—ভূত ভৌতিক পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া অস্মিতা পর্য্যন্তই সমাধির বিষয় হইতে পারে, কিন্তু পুরুষে অর্থাৎ দ্রষ্টার স্বরূপে কখনও সমাহিত হওয়া যায় না; কারণ উহা চিত্তের একান্ত অবিষয়ীভূত বস্তু। চিত্তকে সম্যক্ লয় না করা পর্য্যন্ত পুরুষের স্বরূপ উদ্ভাসিত হয় না। সুতরাং চিত্ত কখনও পুরুষকে স্পর্শ করিয়া ধারণা ধ্যান বা সমাধি লইয়া আসিতে পারে না। অথচ কিন্তু পৌরুষেয় প্রত্যয়ই সমাধির চরম অবস্থা, এ বিষয় ইতিপূর্ব্বে "দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ" ইত্যাদি দ্রষ্টার স্বরূপ-নির্ণয়-সূত্রে বিস্তৃত ভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুনরায় বলিতেছি—নির্ম্মল

বুদ্ধিতে যখন পৌরুষীয় সত্তামাত্র পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তখন ঐ সত্তা অংশটুকুমাত্র অর্থাৎ সত্তার আভাসমাত্র লইয়াই ধারণা ও ধ্যান চলিতে থাকে। যে ক্ষণে পুরুষের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ সত্তা যে চৈতন্যময়ই, ইহাও বেশ উজ্জ্বল ভাবে বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তৎক্ষণাৎ চিত্ত বিলয় হইয়া যায়। এই অবস্থাকেই যথার্থ সমাধি বা চিত্তের বৃত্তি-নিরোধ বলা হইয়া থাকে। আমরা বর্ত্তমানে যে অর্থমাত্র-নির্ভাস রূপ সমাধির বিষয় আলোচনা করিতেছি, উহা দৃশ্যপদার্থ বিষয়ক সমাধি। একথা যেন পাঠকবর্গ ভুলিয়া না যান। অবশ্য দ্রষ্টাও যতক্ষণ সাধকের নিকট দৃশ্য বস্তুরূপেই পরিচিত থাকেন, ততক্ষণ উহাতেও ধারণা ধ্যান কিংবা সমাধির প্রয়াস চলিতে পারে, কিন্তু বুঝিতে হইবে, উহা যথার্থ সমাধি নহে। পুরুষ দৃশ্য নহে—সুতরাং তাহা কোনরূপেই সমাধির বিষয় হইতে পারে না। সমাধি চিত্তেরই এক প্রকার প্রতিলোম পরিণাম মাত্র, পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

त्रयमेकत्र संयमः ॥४॥

पारिभाषिकमाह संयमं योगशास्त्रप्रसिद्धं त्रयमिति। त्रयं धारणाध्यानसमाधिरूपं, एकत्र एकस्मिन् विषये प्रयुज्यमानं संयम इति उच्यते। प्रवर्त्तमानेऽपि समाधौ धारणापर्य्यन्तमवतरति चित्तं पुनर्ध्यानेन समाधिमधिरोहति, इत्थं पुनः पुनरेकस्मिन् विषये प्रवर्त्तते। एष एव हि चित्तस्वभाव इति ॥४॥

এই সূত্রে যোগশাস্ত্র প্রসিদ্ধ পারিভাষিক সংযমের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—একত্র তিনটীর নাম সংযম। একত্র অর্থাৎ কোন একটী মাত্র বিষয়ে যদি পূর্ব্বোক্ত ধারণা ধ্যান এব

সমাধি প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে, তবে তাহাকে সংযম নামে অভিহিত করা যায়। যদিও সমাধি বলিতেই ধারণা ও ধ্যান অবশ্যই বুঝাইয়া থাকে। কারণ ধারণার ঘনীভূত অবস্থা ধ্যান এবং ধ্যানের পরিপাক অবস্থাই সমাধি—তথাপি চিত্তের এমনই স্বভাব যে, কোনও বিষয় অবলম্বনে সমাহিত হইলেও চিত্ত সে অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকে না, পরক্ষণেই ধ্যান অবস্থায় অবতরণ করে। হয়ত পরক্ষণে একেবারে ধারণাতেই নামিয়া পড়ে। আবার পরক্ষণেই ধ্যান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে সমাধি পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। পুনঃ পুনঃ চিত্ত এইরূপ ধ্যান ধারণায় অবতরণ ও সমাধিতে আরোহণ করিতে থাকে। এইরূপ করাই চিত্তের স্বভাব। এইজন্যই এই তিনটীর সাধারণ নাম সংযম রাখা হইয়াছে। একই প্রযত্নে এই তিনটী যথাক্রমে উপনীত হইতে থাকে। কখনও অনুলোমক্রমে কখনও বা বিলোম-ক্রমে। যদি কখনও চিত্ত একেবারেই নামিয়া পড়ে অর্থাৎ ধারণা হইতেও বিচ্যুত হইয়া পড়ে, প্রত্যাহার পর্য্যন্ত অবতরণ করে, তবে আর সংযম হইল না। বিভিন্ন ভূমিতে সংযম প্রয়োগের যে সকল ফল বর্ণিত আছে, এইরূপ ব্যুত্থিত চিত্তকে সে সকল ফল হইতে বঞ্চিতই থাকিতে হয়। অবশ্য দুই চারিবার প্রযত্ন বিফল হইলেই যে চিরদিন বিফল হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই, পুনঃ পুনঃ বিফলতা হইতেই সফলতা উপস্থিত হয়। আর যাঁহাদের চিত্ত ঠিক ঠিক সংযমের যোগ্য হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে ত কোন কথাই নাই।

সাধক! এই সংযমেরই নাম অভ্যাস, এই সংযমকেই ক্রিয়াযোগ বলা হইয়াছে, এই সংযমই সত্যপ্রতিষ্ঠা প্রাণপ্রতিষ্ঠা আনন্দপ্রতিষ্ঠা। সাধনার এইখানেই সূত্রপাত এবং এইখানেই পরিসমাপ্তি। প্রথমত স্থূল বিষয় অবলম্বনে ধারণা আরম্ভ করিতে হয়—অর্থাৎ আমার সম্মুখস্থ এই পদার্থটী যে দ্রষ্টাই—ঈশ্বরই, ইহা ধারণার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতে হয়। ইহাই যোগের সূত্রপাত এবং

এই ধারণা যখন সমাধিতে উপনীত হয়, তখনই যোগ লাভ হয়, জীবন ধন্য হয়। ইহাই পথ—ইহাই সর্ব্ব-সম্প্রদায়সিদ্ধ সুপ্রশস্ত সাধন-মার্গ।

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥৫॥

সংযমজয়ফলং কীর্ত্তয়তি তদিতি। তজ্জয়াৎ সংযমজয়াৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপস্য দ্রষ্টুঃ সত্তামাত্রে প্রয়োগসামর্থ্যাদিতি ভাবঃ। সা এব হি পরাকাষ্ঠা সংযমস্য, প্রজ্ঞালোকঃ প্রজ্ঞা শ্রুতানুমিতজ্ঞানাদ্‌-বিলক্ষণা তস্যা আলোকঃ প্রকাশো ভবতীতি শেষঃ। তেন হি সর্ব্বমিদং নিঃশেষং প্রকাশয়তি ॥৫॥

এই সূত্রে সংযম জয়ের ফল কীর্ত্তিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—তাহার জয় হইতে প্রজ্ঞালোক হয়। তাহার জয় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ধারণা ধ্যান সমাধিরূপ যোগাঙ্গত্রয়ের জয়। এস্থলে জয় শব্দের অর্থ পরাকাষ্ঠা। সচ্চিদানন্দস্বরূপ দ্রষ্টার সত্তাংশ মাত্র লক্ষ্য করিয়া যখন সংযম প্রয়োগের সামর্থ্য হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যোগীর সংযম জয় হইয়াছে, অর্থাৎ সংযমের যাহা প্রয়োজন, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্যকে অবলম্বন করিয়া সংযম আরম্ভ হয়, পরে পরিপাক অবস্থায় দ্রষ্টার স্বরূপ লক্ষ্য করিয়া উহা প্রযুক্ত হইতে থাকে। এবং কেবল ইহাই সংযমের প্রয়োজন। গ্রাহ্যে ও গ্রহণে সংযম প্রয়োগ করিয়া করিয়া বলসঞ্চয় করিতে হয়, পরে উহা গ্রহীতার উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাই যথার্থ সংযমজয়।

এইরূপ সংযমজয় হইতে প্রজ্ঞালোক উদ্‌ভাসিত হইয়া থাকে। শাস্ত্র এবং গুরু মুখ হইতে শ্রুত, কিংবা স্বকীয় প্রতিভাবলে অনুমিত যে

জ্ঞান তাহা পরোক্ষ। ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ যে প্রত্যক্ষ অনুভব-স্বরূপ জ্ঞান, তাহাই শাস্ত্রে প্রজ্ঞা নামে কথিত হইয়া থাকে। এই প্রজ্ঞার আলোক হয় অর্থাৎ প্রকাশ হয়—উদয় হয়। প্রজ্ঞা জীব মাত্রেই বিদ্যমান আছে। কারণ প্রজ্ঞা ব্রহ্মস্বরূপ বস্তু। "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" এই ঋগ্বেদীয় মহা বাক্য হইতেই আমরা ইহা জানিতে পারি। ব্রহ্মসত্তা লক্ষ্য করিয়া ধারণা ধ্যান ও সমাধিরূপ সংযম প্রয়োগ করিতে পারিলে বুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে সত্তাময়ী হইয়া পড়ে অর্থাৎ সাধারণ কথায় যাহাকে আস্তিক্যবুদ্ধি বলে, তাহাই উপস্থিত হয়। তখন আর শত বিরুদ্ধ তর্ক যুক্তি দ্বারাও সে আস্তিক্যবুদ্ধিকে বিমুখ করা যায় না। এই পূর্ণ আস্তিক্যবুদ্ধিকে বা বুদ্ধিসত্বকেই প্রজ্ঞা-লোক বলা হইয়া থাকে। প্রজ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম বুদ্ধিতেই আলোকিত বা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। শাস্ত্রও বলেন—"বুদ্ধিগ্রাহ্যং" "গৃহ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা"। এই যে নির্ম্মল বুদ্ধি ইহাই প্রজ্ঞালোক। এই আলোক যাবতীয় বিষয় সমূহের সর্ব্বতোভাবে প্রকাশক। যে আলোক গ্রাহ্য গ্রহণের অতীত গ্রহীতার সত্তাকেও পরিগ্রহ করিতে পারে, সে আলোক যে দৃশ্যমাত্রেরই নিঃশেষ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য।

तस्य भूमिषु विनियोगः ॥६॥

कथं तज्जयो भवतीत्याह तस्येति। तस्य संयमस्य भूमिषु क्रमोच्चैस्तथा ह्यादौ ग्राह्येषु ततो ग्रहणेषु ततश्च ग्रहीतर्य्येवं विनियोगः कर्त्तव्यस्तेन हि प्रज्ञालोकः प्रकाशते। श्रीगुरुकृपया जितोत्तरभूमिकस्य नाधरभूमिषु पार्थिवभोगसाधनेषु विनियोगो युक्तो मुमुक्षूणाम् ॥६॥

এই সূত্রে কি প্রকারে সংযম জয় হইতে পারে, তাহার উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহার অর্থাৎ সংযমের ভূমিতে বিনিয়োগ করিতে হয়। ভূমি তিন প্রকার—গ্রাহ্য গ্রহণ ও গ্রহীতা। ক্রমে এই সকল ভূমিতে সংযমের বিনিয়োগ অর্থাৎ প্রয়োগ করিতে হয়। প্রথমে গ্রাহ্য পদার্থে সংযম অভ্যাস করিতে হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি—বৃত্তিসারূপ্যদর্শন ও সত্যপ্রতিষ্ঠা একই কথা এবং এই সত্যপ্রতিষ্ঠাই যে সংযমের নামান্তর মাত্র, ইহাও বোধহয় ধীমান্ পাঠকগণের এখন আর অবিদিত নাই। প্রথমে স্থূল জড় পদার্থগুলি অবলম্বন করিয়াই পরমেশ্বর-সত্তার ধারণা করিতে হয়। ক্রমে ঐ ধারণার পরিণামে ধ্যান ও সমাধি উপস্থিত হয়। অতি অল্পমাত্র সমাধি হইলেই বিশোকা জ্যোতির প্রকাশ হয়। তখন ঐ জ্যোতিকে অবলম্বন করিয়াই ধারণা করিতে হয়, এই সময় হইতেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। ঐ ধারণা ক্রমে ধ্যান ও সমাধিতে পরিণত হইয়া প্রজ্ঞালোকরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অবশ্য এই প্রজ্ঞালোকের জন্য কেবল বাহ্য-ভাবে সংযম প্রয়োগই বিহিত নহে, আন্তরভাব সমূহেও সংযমের আবশ্যক। এইরূপে অন্তর বাহির উভয় দিক দিয়া অর্থাৎ অন্তরের বৃত্তিগুলিকে ধরিয়া এবং বাহিরের নাম রূপগুলিকে ধরিয়া পুনঃ পুনঃ সংযমপ্রয়োগ বা সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এইরূপ করিবার ফলে তবে বুদ্ধিতে সংযম প্রয়োগের যোগ্যতা উপস্থিত হয়। এইখানে আসিলে তবে সর্ব্বধীর সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ক্রমে এই সর্ব্বধী হইতে উহার সাক্ষিস্বরূপ দ্রষ্টার প্রতি লক্ষ্য নিপতিত হয়। এই অবস্থাকেই সংযমজয় বা প্রজ্ঞালোক বলে। ইহা শুনিতে সাধারণতঃ যত কঠিন মনে হয়, কার্য্যতঃ তত কঠিন ব্যাপার নহে। তীব্র আগ্রহ, কাতর প্রার্থনা আর গুরুবাক্যে অচল শ্রদ্ধা যদি বিদ্যমান থাকে, তবে এই প্রজ্ঞালোক প্রকাশ অনায়াসেই হইয়া থাকে।

এই আলোকের সাহায্যে পার্থিব ভোগসাধন দ্রব্য গুলিরও

স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে ; তাই অনেকে সেই দিকেই লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ইহা কর্ত্তব্য নহে। যে আলোকের সাহায্যে চিরজীবনের অচ্যুত সখাকে দেখা যায়, যে আলোক আমার পরম প্রিয়তম বস্তুকে দেখাইয়া দেয়, সেই আলোক দ্বারা ক্ষণভঙ্গুর ধন জন যশের প্রয়াসী হওয়া বড়ই দুর্ভাগ্যের পরিচয়। একমাত্র ভগবানের চরণে যাঁহারা যথার্থ শরণাগত, তাঁহারাই এই প্রলোভন হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, অন্যের পক্ষে উহা একান্তই অসম্ভব; কারণ ঐ আলোকদ্বারা দূরস্থিত বস্তু কিংবা ব্যবধানে অবস্থিত বস্তু সমূহও প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকে। এই প্রলোভন ত্যাগ করা বড় সহজ নহে। নিজ জীবনের একটী দিনের ঘটনার বিষয় সাধকবর্গকে জানাইবার কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে পারিলাম না। এ জীবনে প্রজ্ঞালোক বিষয়ক ইহাই সর্ব্ব প্রথম ঘটনা।

কলিকাতা সহরে বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীটে অবস্থিত কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে গভীর রাত্রে একটী দুর্ঘটনা হয়। কোন পুরমহিলা কোন কারণে ত্রিতল ছাদের উপর হইতে নিম্নে পতিত হয়। পতন-সম্ভ্রমে তাহার মস্তকস্থ সোনার ফুলগুলি বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। অনেক লোক তৎকালে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া মহিলাটীর জীবনরক্ষার জন্য চেষ্টা করে। ভগবৎকৃপায় সে জীবন পায়। কিন্তু সোনার ফুলগুলির মধ্যে একটী আর পাওয়া গেল না। ঐ মহিলার কোন নিকট আত্মীয় তখন প্রায়ই এখানে আসিত, শ্রদ্ধা ভক্তিও করিত। সে ঐ সামান্য ফুলটীর বিষয় বলিয়া দিবার জন্য প্রত্যহ অনুরোধ করিতে লাগিল। অনেক দিন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল। কিন্তু শেষে একদিন সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বাধ্য হইয়া প্রজ্ঞালোকের সাহায্যে বলিয়া দিতে হইল "উহা অমুক স্থানে এইরূপভাবে আছে"। বলা বাহুল্য যে, সম্যক্ অপরিচিত স্থান হইলেও সেই ফুলটী কথিত স্থানেই পাওয়া গিয়াছিল। এই ঘটনা হইতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। শিশুর মত মা মা বলিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম।

আর যেন জীবনে এরূপ কার্য্য করিতে না হয় বলিয়া মাতৃচরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। স্নেহময়ী মাও অভয় প্রদান করিয়া আশ্বস্ত করিলেন।

ঠিক এমনই হয়, শক্তি লাভ করা কঠিন নহে। শক্তির অপব্যবহার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই কঠিন। এক মাত্র শরণাগত সন্তানগণের পক্ষেই উহা সম্ভব। কিন্তু এ সকল অবান্তর কথা মাত্র। যাঁহারা মুমুক্ষু, যাঁহারা সত্যসত্যই দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান করিতে প্রয়াসী, তাঁহারা কখনও নিম্নভূমিতে প্রজ্ঞালোক প্রয়োগ করেন না বা করিতে পারেন না। তথাপি ঘটনাচক্রে অনেক ব্যাপার এরূপ হইয়া যায়—অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন নিম্নভূমিতে প্রজ্ঞালোক-প্রযুক্ত হইয়া পড়ে। সেরূপ ক্ষেত্রে বুঝিতে পারা যায়, উহা সেই সর্ব্বশক্তিমানেরই ইচ্ছা মাত্র। পক্ষান্তরে যাঁহারা ত্রৈবর্গিক অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কামের প্রয়াসী, তাঁহারা এই প্রজ্ঞালোক যথেচ্ছ স্থানে প্রয়োগ করিয়া স্ব স্ব অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারেন। কিন্তু ইহার ফলে সে জীবনের জন্য তাহার মুক্তির দ্বার বা প্রিয়তম-সন্দর্শনের দ্বার অর্গলাবদ্ধই থাকে।

ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্ব্বেভ্যঃ ॥৭॥

উক্তেষ্বষ্টসু যোগাঙ্গেষু বহিরন্তরঙ্গত্বং দর্শয়তি ত্রয়মিতি। ত্রয়ং ধারণাধ্যান-সমাধিরূপং পূর্ব্বেভ্যো যমাদিভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ, অন্তরঙ্গং দ্রষ্টুঃ স্বরূপ-সন্নিহিতত্বাদ্ বুদ্ধিব্যাপার-রূপত্বাচ্চ। বহিরঙ্গানি তু শরীরেন্দ্রিয় মনোমাত্রব্যাপাররূপত্বাদ্ বিপ্রকৃষ্টানি। ভগবদ্‌গীতোক্ত বুদ্ধিযোগঃ সংযম এবেত্যুক্তং প্রাগপি। বিনিযুক্তে হি সংযমে যমাদয়ঃ পূর্ব্বরূপা যথাযোগ্যমায়ান্ত্যেব ॥৭॥

পূর্ব্বোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে কোন্‌টী বহিরঙ্গ কোন্‌টী বা অন্তরঙ্গ তাহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। ঋষি বলিলেন—শেষের

তিনটী পূর্ব্ব পাঁচটী হইতে অন্তরঙ্গ। শেষের তিনটী অর্থাৎ ধারণা ধ্যান ও সমাধি। যম নিয়ম আসন প্রণায়াম ও প্রত্যাহার, ইহারা পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচটী। শেষের তিনিটী অন্তরঙ্গ, প্রথম পাঁচটী বহিরঙ্গ। শেষোক্ত ত্রয় অর্থাৎ সংযম—দ্রষ্টার স্বরূপের সন্নিহিত এবং বুদ্ধিব্যাপার-রূপ বলিয়াই অন্তরঙ্গ। আর প্রথম পাঁচটী শরীর ইন্দ্রিয় বা মনের ব্যাপার-রূপ বলিয়াই দ্রষ্টার স্বরূপ হইতে বিপ্রকৃষ্ট, তাই ইহারা বহিরঙ্গ। গীতায় শ্রীভগবানও বুদ্ধিযোগ শব্দে এই সংযমরূপ অন্তরঙ্গ যোগাঙ্গকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, যথাযোগ্যরূপে সংযম বিনিযুক্ত হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী যমনিয়ম প্রভৃতি বহিরঙ্গগুলি আপনা হইতেই প্রাদুর্ভূত হইতে থাকে।

প্রিয়তম সাধক! এ পর্য্যন্ত আলোচনা দ্বারা নিশ্চয়ই তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, সকল দেশের সকল সাধকই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে এই পতঞ্জলিপ্রোক্ত যোগাঙ্গসমূহের কোনও না কোন অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেছে। যাহারা সত্যপ্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত, মাত্র তাহারাই অন্তরঙ্গ সেবী। বহিরঙ্গগুলি তাহাদের নিকট স্বতঃই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। বুদ্ধি দ্রষ্টার অতি সন্নিহিত করণ। যে প্রকার অনুষ্ঠানে বুদ্ধি-বৃত্তির অনুশীলন হয়, বুদ্ধির মলিনতা দূর হয়, সেই প্রকারের অনুষ্ঠান সমূহকেই অন্তরঙ্গ বলা হয়। দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্য অনুভব করিবার প্রযত্ন বা সত্যপ্রতিষ্ঠা এই বুদ্ধিরই অনুশীলন। ধারণা ধ্যান সমাধি, এই তিনটী অনুষ্ঠানই বুদ্ধিক্ষেত্রে নিষ্পন্ন হয়। এই জন্য ইহাকে বুদ্ধিযোগ বলা যায়। বুদ্ধির দ্বারা ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়ার নাম বুদ্ধিযোগ। মন এবং ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য পদার্থসমূহকে জড়পদার্থ রূপেই গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত, ধারণার সাহায্যে তাহাদিগকে চৈতন্যময়রূপে দর্শনের যে প্রযত্ন, তাহাই বুদ্ধিযোগ। এইরূপ অনুশীলনের ফলেই বুদ্ধি নির্ম্মল অর্থাৎ ব্যবসয়াত্মিকা হইয়া উঠে। আর যাহারা সত্যপ্রতিষ্ঠায় বিমুখ তাহাদের বুদ্ধি বহুশাখা হইয়া থাকে। সুতরাং সেরূপ বুদ্ধি দ্বারা ভগবৎ লাভ একান্তই অসম্ভব। এই যে দেশব্যাপী শাস্ত্রীয় কর্ম্মকাণ্ড অর্থাৎ পূজা জপ হোম পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি

অনুষ্ঠান বর্ত্তমানে প্রাণহীন হইয়া—মৃত কর্ম্ম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া সনাতন ধর্ম্মকে গ্লানিযুক্ত করিতেছে, উহার একমাত্র কারণ এই বুদ্ধি-যোগশূন্যতা বা সংযম শূন্যতা। তাই সনির্ব্বন্ধে আমরা সত্যপ্রতিষ্ঠার উপরেই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। সত্যপ্রতিষ্ঠা ও সংযম অভিন্ন। সত্যপ্রতিষ্ঠা হইলেই সকল ক্রিয়া সার্থক হয়। বৃত্তি সারূপ্য অনুভব করিতে না পারিলে শুদ্ধস্বরূপ কখনও অনুভবযোগ্য হইতে পারে না। স্বগত ভেদ যাহার অনুভবে আসে নাই, সে কি একমেবাদ্বিতীয়ং তত্ত্ব পরিগ্রহ করিতে পারে?

তদপি বহিরঙ্গং নির্ব্বীজস্য ॥৮॥

কিঞ্চ তদিতি; তদপি সংযমরূপমন্তরঙ্গমপি নির্ব্বীজস্য প্রাগুক্তা-সম্প্রজ্ঞাতযোগস্যেত্যর্থঃ, বহিরঙ্গং তদাবৃত্তেরপ্যভাবাদিতিভাবঃ। তদুক্তঞ্চ—যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ। যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ, বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টন্তি তামাহুঃ পরমাং গতিমিতি ॥৮॥

পূর্ব্বোক্ত অন্তরঙ্গত্রয়ও অবস্থা বিশেষে বহিরঙ্গ হইয়া থাকে। এই সূত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহাও অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সংযমও নিবীজের পক্ষে বহিরঙ্গই হইয়া থাকে। নির্ব্বীজ শব্দের অর্থ এস্থলে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ। অবিদ্যারূপ জগদ্বীজ যেখানে থাকে না, তাহাই নির্ব্বীজ। যখন অসম্প্রজ্ঞাত যোগ অর্থাৎ দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয়, তখন ধারণা ধ্যান ও সমাধিরূপ অন্তরঙ্গও একান্ত বহিরঙ্গ হইয়া পড়ে। বুদ্ধিরও পরপারে অবস্থিত যে আত্মা, তৎস্বরূপে উপনীত হইলে বুদ্ধিব্যাপাররূপ সংযমের যে কোনই প্রয়োজনীয়তা থাকে না, ইহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য সংযমই সাধককে অসম্প্রজ্ঞাত ক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া দেয়, কিন্তু সে ক্ষেত্রে উপনীত হইলে আর দ্বৈত কিছু থাকে না, সুতরাং সংযমও

তখন প্রয়োজনহীন হইয়া পড়ে। তাই ইহারা নির্বীজের পক্ষে বহিরঙ্গ বলিয়াই কথিত হইয়াছে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—যখন জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনের সহিত বুদ্ধির ব্যাপার পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া যায়, তখনই পরমা গতি লাভ হইয়া থাকে। এইরূপ বুদ্ধির পর-পারে অবস্থিত স্বপ্রকাশ আত্মস্বরূপে অবস্থানের পক্ষে ধারণা ধ্যান এবং সমাধিও বহিরঙ্গ হইয়া থাকে।

ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ ॥৯॥

সংযমফলং নিরোধপরিণামঃ চিত্তস্য তদ্দর্শয়তি ব্যুত্থানেতি। ব্যুত্থান সংস্কারঃ প্রতিনিয়তস্পন্দনবত্ত্বমিত্যর্থঃ। স চ স্বাভাবিকো ধর্ম্মশ্চিত্তস্য, নিরোধসংস্কারস্তদ্বিপরীতঃ। স চাভ্যাসজন্য আগন্তুকো ধর্ম্মঃ স্থৈর্য্যরূপঃ। এতয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ ভবতেতি। তথাহি ব্যুত্থানমভিভূয়াবির্ভবতি নিরোধস্তথা নিরোধং তিরস্কৃত্য সমুদেতি ব্যুত্থানমতএব নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো ভবতি। নিরোধক্ষণমন্বেতি চিত্তমিত্যর্থঃ। ততশ্চ চিত্তস্যৈবৈষ নিরোধপরিণামঃ। এবঞ্চ হ্রাস-বৃদ্ধিশীলঃ কালান্বয়ী নিরোধশ্চিত্তধর্ম্ম এবেতি নাস্য মুখ্যযোগত্ব-মিতি ধ্যেয়ম্ ॥৯॥

পূর্ব্বোক্ত সংযমও যদি অসম্প্রজ্ঞাত যোগের পক্ষে বহিরঙ্গই হয়, তবে উহার প্রয়োজন কি, এ প্রশ্নের উত্তর এই সূত্রে দেওয়া হইয়াছে। সংযমের ফল—চিত্তের নিরোধপরিণাম। ঋষি বলিলেন—ব্যুত্থান-সংস্কার এবং নিরোধসংস্কারের পরস্পর অভিভব প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, অতএব নিরোধক্ষণেও চিত্তের অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকে। ইহাই নিরোধ পরিণাম। চিত্তের যে প্রতিনিয়ত স্পন্দনবত্ত্ব, তাহাকেই ব্যুত্থান সংস্কার বলে। ইহা চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আর নিরোধ

সংস্কার ইহার বিপরীত। ইহা সংযমরূপ-প্রযত্নসাধ্য আগন্তুক ধর্ম্ম, স্থৈর্য্যই ইহার স্বরূপ। এই যে উভয়বিধ সংস্কার, ইহাদের পরস্পর অভিভব ও প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। ব্যুত্থান অর্থাৎ চাঞ্চল্যকে অভিভূত করিয়া নিরোধের প্রাদুর্ভাব হয়। আবার নিরোধ অর্থাৎ স্থৈর্য্যকে পরাভূত করিয়া ব্যুত্থানের আবির্ভাব হয়। স্ব স্ব চিত্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা সাধক মাত্রেরই অনুভবগম্য হইয়া থাকে। নিরোধের এই প্রাদুর্ভাব তিরোভাব হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, "নিরোধক্ষণ চিত্তান্বয়" হয়—অর্থাৎ নিরোধের একটা ক্ষণ বা কাল আছে এবং উহা চিত্তের সহিত অন্বিতও বটে। তীব্র অভ্যাসের ফলে নিরোধের ক্ষণ অর্থাৎ কাল বর্দ্ধিত হয়। আবার অভ্যাস না করিলে উহা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধিশীল কালান্বয়ী যে নিরোধ, তাহার সহিত চিত্তের অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকিবেই, ইহার অন্যথা হইতেই পারে না। সুতরাং নিরোধও ব্যুত্থানের মতই চিত্তের এক প্রকার পরিণাম মাত্র। তবে বিশেষত্ব এই যে, ব্যুত্থান—চিত্তের অনুলোম-পরিণাম, আর নিরোধ—প্রতিলোমপরিণাম।

দ্রষ্টা পুরুষ ক্ষণের অর্থাৎ কালের অতীত চিত্তের অতীত সত্তামাত্র-স্বরূপ বস্তু, সেই জন্যই চিত্তবৃত্তি নিরোধকে কখনও মুখ্যযোগ আখ্যা দেওয়া যায় না। দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগ এবং বৃত্তি-নিরোধরূপ সমাধি, কখনও অভিন্ন হইতে পারে না। তবে সমাধি বা নিরোধকে লক্ষ্য করিয়া যোগশব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে বটে, তাহা লাক্ষণিক।

সাধক! ঐ শুন ঋষি কি বলিলেন—নিরোধও চিত্তেরই পরিণাম মাত্র। উহা কালান্বয়ী হ্রাসবৃদ্ধিশীল, সুতরাং নিরোধ কখনও তোমার জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। চিত্তকে নিরুদ্ধ করিলেই তুমি ধন্য হইবে, ইহা কখনও মনে করিও না। বিশেষ কথা—চিত্তকে নিরুদ্ধ করিতে হইলে একমাত্র দ্রষ্টার স্বরূপেই অবস্থান করিতে হইবে। অন্যথা কোন প্রকারেই উহার নিরোধ হয় না, হইতে পারে

না। শূন্যচিন্তা করা বা অজ্ঞানচিন্তা করাকে নিরোধ বলে না, উহা এক প্রকার স্পন্দ বা ব্যুত্থানই তুমি মুমুক্ষু সাধক, তুমি প্রাণপণ প্রযত্নে চিত্ত নিরোধের দিকে অগ্রসর না হইয়া শুধু স্বরূপস্থিতির প্রযত্ন কর। দেখিবে—চিত্তনিরোধ অনায়াসলভ্য ফলরূপেই উপস্থিত হইবে।

তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥১০॥

নিরোধপরিণামশীলস্য চিত্তস্যাবস্থাং কীর্ত্তয়তি তস্যেতি। সংস্কারাৎ নিরোধসংস্কারপ্রভাবেনেত্যর্থঃ। তস্য চিত্তস্য। পূর্ব্ব-সূত্রস্থক্ষণচিত্তান্বয়ৈকদেশানুকর্ষঃ, সিংহাবলোকনন্যায়েন পরসূত্রস্থস্য বা চিত্তস্যাধিকারঃ। প্রশান্তবাহিতা প্রশান্তং যথাস্যাৎ তথা বহতি নতু চঞ্চলোদ্বেলনস্বভাবো বিগ্রহ ইত্যর্থঃ। ইদমত্রাবগন্তব্যং—ব্যুত্থানে চিত্তস্য দেশকালোভয়ান্বয়িত্বং, নিরোধে তু কেবল কালান্বয়িত্ব-মিতি ॥ ১০ ॥

এই সূত্রে নিরোধপরিণামশীল চিত্তের অবস্থা বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—নিরোধসংস্কার প্রভাবে চিত্তের প্রশান্তবাহিতা হইয়া থাকে। যখন চিত্তের নিরোধসংস্কার বেশ সুদৃঢ় হয়, তখন চিত্ত স্বভাবতঃই প্রশান্ত হইয়া থাকে। আর পূর্ব্বের মত স্পন্দনবহ থাকে না। ব্যুত্থানসংস্কার বহু বহু জন্মার্জ্জিত সংস্কার হইলেও নিরোধসংস্কার অল্প দিনেই স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে। অভ্যাস বলে অর্থাৎ "তত্রাস্থিতৌ যত্নঃ" রূপ উপায়ের সাহায্যে প্রবল ব্যুত্থান-সংস্কারকেও অভিভূত করিয়া নিরোধ সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। দেবীমাহাত্ম্যে এই তত্ত্বই দেবাসুর-সংগ্রামরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এই সূত্রের "তস্য" পদটীর অর্থ করা হইয়াছে "চিত্তস্য"। পূর্ব্ব সূত্রে যদিও চিত্ত শব্দের পৃথক উল্লেখ নাই, তথাপি "ক্ষণচিত্তান্বয়" পদটীর একদেশে যে চিত্ত শব্দ আছে, তাহারই অনুকর্ষ করিয়া

ঐরূপ অর্থ করা হইয়াছে। অথবা পরসূত্রে "চিত্তস্য" এই পদটীর প্রয়োগ দেখিয়া সিংহদৃষ্টি ন্যায়ানুসারে এই সূত্রের "তস্য" পদটীর অর্থ "চিত্তস্য" করা হইয়াছে। প্রশান্তবাহিতা শব্দের অর্থ প্রশান্ত ভাবে বহনশীলতা। চিত্তের ব্যুত্থানশীলতা তিরোহিত হইয়া যায়, একমাত্র নিরোধই অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিতে থাকে বলিয়াই ঋষি নিরোধ-পরিণামশীল চিত্তের অবস্থা প্রশান্তবাহিতারূপেই কীর্ত্তন করিলেন। বিভিন্ন জাতীয় স্পন্দনরূপ ব্যুত্থান না উঠিয়া চিত্তে যখন একমাত্র নিরোধই প্রতিক্ষণে উঠিতে থাকে, তখন চিত্ত যে প্রশান্তবাহী হইয়া পড়ে, ইহাতে আর সংশয় কিছু নাই। তবে একটী কথা এই যে—নিরোধ কালান্বয়ী, যাহা কালান্বয়ী তাহাতে স্পন্দন অর্থাৎ ক্রিয়াশীলতা কিছু থাকিবেই। যদিও সে ক্রিয়াশীলতা সহসা অনুভবগম্য হয় না, তথাপি শুদ্ধ অস্মিতাক্ষেত্রে উপনীত হইলে চিত্তের এই কালান্বয়িত্ব অর্থাৎ সূক্ষ্মতম-স্পন্দন বা অতিক্ষীণ ক্রিয়াশীলতাও ধীমান্ সাধকের প্রতীতি-গোচর হয়। ব্যুত্থানকালে চিত্ত দেশ এবং কাল উভয়ান্বয়ী থাকে, আর নিরোধকালে চিত্ত মাত্র কালান্বয়ী হয়। চিত্ত যখন দেশান্বয়িতা পরিত্যাগ করিতে পারে, নাম রূপের সম্বন্ধ সম্যক পরিত্যাগ করিতে পারে, তখনই সে প্রশান্তবাহী হইয়া পড়ে। "প্রশান্তবাহী" বাক্যটী বড় চমৎকার। প্রশান্ত হইয়াও বহনশীল—ক্রিয়াশীল। ক্ষণের সহিত অন্বয় থাকে বলিয়াই ঐ ক্ষীণভাবে ক্রিয়াশীলতা বিদ্যমান থাকে। ইহা অসম্প্রজ্ঞাত যোগের অতি সান্নিহিত অবস্থা এবং এই জন্যই চিত্তবৃত্তি-নিরোধকে যোগের তটস্থ লক্ষণ বলা হইয়াছে।

সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ ॥১১॥

সমাধিপরিণামোঽপি চিত্তস্যৈতি দর্শয়তি সর্ব্বার্থতেতি। সর্ব্বার্থতা সর্ব্ব-বিষয়-বিষয়তা, তস্যাঃ ক্ষয়স্তিরোভাবস্তথৈকাগ্রতায়া

বক্ষ্যমাণলক্ষণায়া উদয় আবির্ভাব এতৌ লক্ষণৌ লক্ষ্যেতে নিরোধকালে তত্রৈতয়োর্ধর্ম্ময়োস্ত্বেনান্বিতস্য চিত্তস্য সমাধিপরিণামো ভবতি ॥১১॥

— —

পূর্ব্বকথিত নিরোধ পরিণামের ন্যায় সমাধিও যে চিত্তেরই পরিণাম বিশেষ, তাহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। ঋষি বলিলেন—সর্ব্বার্থতা এবং একাগ্রতা, এতদুভয়ের যথাক্রমে ক্ষয় এবং উদয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই উভয়ের সহিত ধর্ম্মিরূপে অন্বিত চিত্তের সমাধি পরিণাম হয়। সর্ব্বার্থতা শব্দের অর্থ—সর্ব্ব-বিষয়-বিষয়তা। চিত্ত যে প্রতিনিয়ত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিচরণ করে—একটি ছাড়িয়া অন্যটি ধরে, ইহারই নাম সর্ব্বার্থতা। চিত্তের নিরোধপরিণামকালে দেখিতে পাওয়া যায়—এই সর্ব্বার্থতার ক্ষয় হইয়া যায় এবং একাগ্রতার উদয় হয়। একাগ্রতা কি, তাহা পরসূত্রে ঋষি নিজেই বলিবেন। সর্ব্বার্থতার ক্ষয় এবং একাগ্রতার উদয়রূপ দ্বিবিধ ধর্ম্মের যাহা ধর্ম্মী—যাহা আশ্রয়, তাহা চিত্ত ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। চিত্তের যেরূপ পরিণাম হইলে উক্ত উভয় ধর্ম্ম পরিলক্ষিত হয়—তাহার নাম সমাধি। তাহাই অর্থমাত্রনির্ভাস-স্বরূপশূন্যবৎ অবস্থা। এই সমাধিও চিত্তপরিণাম মাত্রই, তাই ঋষি বলিলেন—"চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ"। পরবর্ত্তিসূত্রে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতেছে।

—

তত: পুন: শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ
চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণাম: ॥১২॥

একাগ্রতা পরিণামমাহ তত ইতি। তত: সমাধি পরিণামাত্ পুন: শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ, পুন: শব্দোঽব বমিষ্টস্যসূচক:। শান্তোঽ-

তীতঃ, ভদিত উপস্থিতো বর্ত্তমান ইতি যাবত্। এতৌ তুল্যৌ চ তৌ প্রত্যয়ৌ চেতি তুল্যপ্রত্যয়ৌ, দ্বয়োঃ শান্তোদিতয়োঃ সাদৃশ্যমিতিভাবঃ। এব হি চিত্তস্য একাগ্রতা-পরিণামঃ। অত্রাপি চিত্তশব্দপ্রয়োগো বুভুৎসু-দৃষ্টি-সমাকর্ষণায় বিশেষতশ্চিত্তং প্রতি।

অথ কোঽয়ং পরিণাম ইত্যুচ্যতে—অবস্থিতস্য ধর্ম্মিণঃ পূর্ব্বধর্ম্ম-নিবৃত্তৌ ধর্ম্মান্তরোৎপত্তিরিতি পূর্ব্বাচার্য্যঃ। ইদমত্রাবগন্তব্যম্—গুণত্রয়াত্মকস্য-চিত্তস্যানুলোম-পরিণামবত্ প্রতিলোমপরিণামোঽপি দৃশ্যতে। তথাহি নিরোধ ইতি তমসঃ, সমাধিরিতিরজসঃ, একাগ্রতেতি সত্ত্বস্য পরিণামো যোগিভিরেব লভ্যঃ। সূত্রত্রয়েণ স এব দর্শিত স্ত্রিবিধ' প্রতিলোম পরিণামস্তদ্ যথা স্বভাবতোব্যুত্থান ধর্ম্মস্য চিত্তস্য নিরোধরূপাভিনব ধর্ম্মাবির্ভাবান্নিরোধ ইতি ধর্ম্ম পরিণামঃ, সর্ব্বার্থত্ব-লক্ষণস্য চিত্তস্যৈকাগ্রতারূপাভিনবলক্ষণাবির্ভাবাত্ সমাধিরিতি লক্ষণ পরিণামঃ, বিলক্ষণ প্রত্যয়াত্মকস্য চিত্তস্য তুল্যপ্রত্যয়রূপা-ভিনবাবস্থাবির্ভাবাত্তুল্যপ্রত্যয় ইত্যবস্থা-পরিণামশ্চ ॥১২॥

এইসূত্রে একাগ্রতা পরিণামের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহা হইতে (চিত্তের সমাধি পরিণাম হইতে) পুনরায় শান্ত এবং উদিত এই উভয়ই তুল্য প্রত্যয় হইয়া থাকে, ইহাই চিত্তের একাগ্রতা পরিণাম। পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে—সর্ব্বার্থতার ক্ষয় এবং একাগ্রতার উদয় দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, চিত্তের সমাধি-পরিণাম হইয়াছে। আর এই সূত্রে ঋষি সেই একাগ্রতার স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিলেন—তাহা হইতে অর্থাৎ চিত্তের সমাধি-পরিণাম হইতে পুনরায় শান্ত এবং উদিত, এই উভয়ই সমজাতীয় প্রত্যয় হইয়া থাকে; ইহারই নাম একাগ্রতা পরিণাম। ঋষির এই দুইটী বাক্য হইতে এবং এই সূত্রে "পুনঃ" শব্দের প্রয়োগ হইতে আপাততঃ মনে হয়—সমাধি এবং একাগ্রতা, এই দুইটীর মধ্যে যেন

ইতরেতর-ভাব বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ একাগ্রতা হইতে সমাধি আসে, আবার সমাধি হইতে একাগ্রতা আসে। বাস্তবিক সিদ্ধান্ত এই যে, নবমসূত্রোক্ত নিরোধ-পরিণাম, একাদশ সূত্রোক্ত সমাধিপরিণাম এবং এই দ্বাদশসূত্রবর্ণিত একাগ্রতা-পরিণাম, এই তিনটীই পরস্পর অবিনাভাবী, একটী আসিলে অপর দুইটীও উপস্থিত হইবেই; কারণ, চিত্ত ত্রিগুণাত্মক, গুণত্রয় পরস্পর সহভাবী, পরস্পর সহযোগিতা ব্যতীত একটী গুণেরও স্বতন্ত্রভাবে পরিণাম বা ক্রিয়াশীলতা প্রকাশ পায় না। সুতরাং চিত্তের পরিণাম বলিলেই তিনটী পরিণাম বলিতে হইবে। ঋষি সেইজন্যই এস্থলে নিরোধ, সমাধি এবং একাগ্রতা, এই তিনটীকে গুণত্রয়াত্মক চিত্তের ত্রিবিধ পরিণামরূপে বর্ণনা করিলেন। যদিও এই পরিণামত্রয় একান্ত-ভাবেই সহভাবী বলিয়া আপাততঃ মনে হয়—যেন যুগপৎ উহাদের আবির্ভাব হইল, কিন্তু একটু ধীর ভাবে লক্ষ্য করিলে অনুভূতি-সম্পন্ন সাধকগণ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন—ঋষিবর্ণিত-ক্রমেই উহাদের আবির্ভাব হয়, অর্থাৎ প্রথমে নিরোধ পরে সমাধি এবং তাহা হইতে একাগ্রতার উদয় হয়।

এক্ষণে একাগ্রতা কি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। "শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ"। শান্ত এবং উদিত, এই উভয় প্রত্যয় যদি তুল্য হয়, তবেই উহার নাম হয় একাগ্রতা। শান্ত শব্দের অর্থ অতীত, উদিত শব্দের অর্থ উপস্থিত অর্থাৎ বর্ত্তমান। যে প্রত্যয়টী পূর্ব্বক্ষণে উদিত ছিল বর্ত্তমানে অতীত হইয়াছে, সেই প্রত্যয়টী যেরূপ ছিল, বর্ত্তমান ক্ষণে উদিত প্রত্যয়টীও যদি ঠিক সেইরূপই হয়, তবে তাহাকে শান্তোদিত তুল্যপ্রত্যয় কহে, এবং ইহারই নাম একাগ্রতা। এই একাগ্রতা দৃষ্টে সমাধির আবির্ভাব বুঝিতে পারা যায়, আবার সমাধি হইতেই একাগ্রতাপরিণাম প্রকাশ পায়, তাই ঋষি সূত্রে "পুনঃ" শব্দটীর প্রয়োগ করিয়াছেন।

এই সূত্রে আবার "চিত্তস্য" পদটীর উল্লেখ না থাকিলেও উহা

বুঝিতে পারা যাইত, তথাপি বুভুৎসুগণ যাহাতে চিত্তের প্রতি বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া এই পরিণামত্রয় বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহার জন্যই এই পুনরুক্তি। ভ্রমেও যেন কেহ এই ত্রিবিধ পরিণামকে দ্রষ্টার স্বরূপে আরোপ পূর্ব্বক দর্শন না করেন, সেই জন্যই ঋষির এই সতর্কতা।

পরিণাম কি, তাহা পূর্ব্বাচার্য্য কথিত লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে—কোনও অবস্থিত ধর্ম্মীর পূর্ব্বধর্ম্ম নিবৃত্তি পূর্ব্বক যদি ধর্ম্মান্তরের উৎপত্তি হয়, তবে তাহাকে পরিণাম কহে। তুলার সূত্র হওয়া, মৃৎপিণ্ডের ঘট হওয়া, সুবর্ণের কুণ্ডল হওয়া, জলের তুষার হওয়া প্রভৃতি পরিণামের স্থূল দৃষ্টান্ত। চিত্তের পরিণাম দুইপ্রকার, এক অনুলোম, অপর প্রতিলোম। চিত্ত যখন নিম্নাভিমুখী অর্থাৎ ভোগাভিমুখী গতি প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাতে যে পরিণাম পরিলক্ষিত হয়, তাহার নাম অনুলোমপরিণাম। এই অনুলোমপরিণামের বিষয় পর সূত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত হইবে। আবার ঐ চিত্তই যখন নিবৃত্তিমুখী বা মোক্ষাভিমুখী গতি প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাতে যে পরিণাম পরিলক্ষিত হয়, তাহাকে প্রতিলোম পরিণাম কহে। এ পর্য্যন্ত আমরা এই প্রতিলোম পরিণামের বিষয়ই আলোচনা করিতেছি। প্রথমতঃ নিরোধ, ইহা তমোগুণের চরম প্রতিলোম পরিণাম, ঠিক এইরূপ সমাধি রজোগুণের এবং একাগ্রতা সত্ত্বগুণের চরম প্রতিলোম পরিণাম। গুণত্রয়ের পরিণাম প্রাপ্ত হওয়া এইখানেই পরিসমাপ্তি হয়। ইহাই পরিণামের পরাকাষ্ঠা।

নবম সূত্র হইতে যে ত্রিবিধ পরিণামের বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এ স্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে। স্বভাবতঃ ব্যুত্থানধর্ম্ম চিত্তের যে নিরোধরূপ অভিনবধর্ম্মের প্রকাশ, তাহাকে নিরোধনামক ধর্ম্মপরিণাম কহে। এইরূপ সর্ব্বার্থত্বলক্ষণ চিত্তের যে একাগ্রতারূপ অভিনবলক্ষণের প্রকাশ, তাহাকে সমাধিনামক লক্ষণ-পরিণাম কহে এবং প্রতিনিয়ত বিলক্ষণপ্রত্যয়াবস্থ চিত্তের যে তুল্য-প্রত্যয়রূপ অভিনব অবস্থার প্রকাশ, তাহাকে একাগ্রতানামক অবস্থা পরিণাম কহে। চিত্ত যখন প্রবৃত্তিমুখী তখন তাহাতে বুত্থান ধর্ম্ম,

সর্ব্বার্থতালক্ষণ এবং বিলক্ষণ-প্রত্যয়াবগাহিতারূপ অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়, আর যখন নিবৃত্তিমুখী হয়, তখন তাহাতে নিরোধ ধর্ম্ম, সমাধি লক্ষণ এবং একাগ্রতারূপ অবস্থা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আশা করি ধীমান্ পাঠকগণ এইবার চিত্ত পরিণাম বিষয়ক আলোচনায় সম্যক্ নিঃসংশয় হইতে পারিবেন। চিত্তের স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেই চিত্তের অতীত চিৎএর সন্ধান পাওয়া যায়। চিত্তকে যত দিন চিন্ময়ী মা বলিয়া বুঝিতে পারা না যায়, ততদিন মায়ের এই নিরোধ, সমাধি এবং একাগ্রতারূপ ত্রিবিধ ভঙ্গিমা বা লীলা-বিলাস প্রত্যক্ষীভূত হয় না, ততদিন চিত্তের অতীতক্ষেত্রে প্রবেশ করা কেবল বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত থাকে। কিন্তু সে অন্য কথা :—

एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥१३॥

चित्तपरिणामवद् भूतेन्द्रियाणामप्यस्तिपरिणामस्त्रिविधः स उच्यत एतेनेति। एतेन पूर्व्वोक्त-परिणामत्रयव्याख्यानेन भूतेन्द्रियेषु भूतानि स्थूलसूक्ष्माणि, इन्द्रियाण्यन्तःकरणानि तेषु धर्म्मलक्षणावस्थापरिणामा धर्म्मस्य लक्षणस्यावस्थायाश्च स्वाभाविका ये परिणामा उपलभ्यन्ते तेऽपि अकृतव्याख्याना अपि व्याख्याताः, तुल्यतात्पर्य्यतयाकृत-व्याख्याना इत्यवगन्तव्याः। तद्यथा तुषारखण्डस्य सलिलपरिणामः, अत्र काठिन्यस्य तरलत्वमिति धर्म्मपरिणामः, चतुरस्राद्यवयवस्य जलाकारते तल्लक्षणपरिणामः, तथा तुषारावस्थायां प्रतिक्षणं यादृक् परिणाम आसीद् जलावस्थायां तु तदन्यथा दृश्यत इत्यवस्थापरिणाम एवं सर्व्वत्र।

इदमत्रावगन्तव्यं—भूतेन्द्रियाणां गुणवृत्तत्वात् वृत्तस्य च गुणत्रयमयत्वात् स्वाभाविकस्त्रिविधः परिणामः। एवञ्च विषयपरिणाम-

মপেক্ষতে চিত্তপরিণাম ইতি। দৃশ্যতে পুনরস্যাপবাদোঽপি—বিষয়-পরিণামনিরপেক্ষা চিত্তপরিণতিরিতি, তথাহি কাচিৎ যোষিৎ পুত্রস্য জননী পিতুর্দুহিতা ভর্ত্তুর্ভার্য্যা সোদরস্য স্বসা শার্দ্দূলস্য ভক্ষ্যং মাংসপিণ্ড-মাত্রমিতি বিচিত্রপরিণামাশ্চিত্তভেদানাং যুগপদেব ভবতি ॥১৩॥

চিত্তপরিণামের ন্যায় ভূত এবং ইন্দ্রিয়গণেরও ত্রিবিধ পরিণাম আছে, ইহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। ঋষি বলিলেন—ভূত এবং ইন্দ্রিয় সমূহের যে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ ত্রিবিধ পরিণাম পরিলক্ষিত হয়, ইহার দ্বারা অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত পরিণামত্রয় ব্যাখ্যানের দ্বারা তাহাও ব্যাখ্যাত হইল। ভূত শব্দে স্থূল সূক্ষ্ম উভয় এবং ইন্দ্রিয় শব্দে এস্থলে অন্তঃকরণ পর্য্যন্ত বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রতিলোম পরিণামের ন্যায় চিত্তের অনুলোম পরিণামও যে তিন প্রকার, তাহাও এই সূত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়। অপবর্গাভিমুখী চিত্তের ধর্ম্ম, লক্ষণ এবং অবস্থাপরিণাম যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ভোগাভিমুখী চিত্তের অর্থাৎ ভূত-ভৌতিক-পদার্থ সমূহেরও যে সেইরূপ ত্রিবিধ পরিণাম আছে, ইহা একটু লক্ষ্য করিলে সাধক মাত্রেই অবধারণ করিতে পারিবেন। দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী বুঝতে চেষ্টা করা যাইতেছে—তুষার খণ্ডের সলিলপরিণাম; এ স্থলে তুষারের যে কাঠিন্যরূপ স্বভাবিক ধর্ম্ম, তাহা দূরীভূত হইয়া তরলত্বরূপ ধর্ম্মপরিণাম হইয়া থাকে। আবার তুষারখণ্ডের যে চতুষ্কোণাদিরূপ অবয়ব বা লক্ষণ, তাহা অপগত হইয়া জলের আকার প্রাপ্ত হওয়াই লক্ষণ পরিণাম। আর তুষার অবস্থায় প্রতিক্ষণে প্রতি পরমাণুতে যেরূপ পরিণাম হইতেছিল, জল অবস্থায় তাহা হইতে ভিন্নরূপ পরিণাম হইতে থাকে, ইহাই অবস্থাপরিণাম। মনে রাখিও সাধক, যাবতীয় ভূত-ভৌতিক-পদার্থে এবং অন্তঃকরণে ঠিক এইরূপ ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ ত্রিবিধ পরিণাম হইয়া থাকে।

এই সূত্রে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে—কি ভুত ভৌতিক-পদার্থ, কি ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ, সকলই গুণবৃত্ত অর্থাৎ গুণের কার্য্য, ঐ কার্য্য সমূহ ত্রিগুণাত্মক; সুতরাং উহাদের ত্রিবিধ পরিণাম একান্ত স্বাভাবিক। যেহেতু গুণত্রয় স্বভাবতঃই পরিণামশীল, সেই হেতু ভুত এবং ইন্দ্রিয় সমূহেও পরিণাম থাকিবেই। সাধারণতঃ বিষয়ের পরিণামকে অপেক্ষা করিয়াই চিত্তের পরিণাম হইয়া থাকে। মৃৎপিণ্ড দর্শনে চিত্তের যেরূপ পরিণাম হয়, মৃদ্ঘট দর্শনে তদপেক্ষা অন্যরূপ পরিণাম পরিলক্ষিত হয়। সর্ব্বত্রই যে এইরূপ গ্রাহ্যবিষয়ের পরিণামকে অপেক্ষা করিয়াই চিত্তপরিণামের বিভিন্নতা হইয়া থাকে, ইহা বলা যায় না; বহুস্থানে এই নিয়মের অন্যথাও পরিদৃষ্ট হয়—কোনও নারী তাহার পুত্রের জননী, পিতার দুহিতা, ভর্ত্তার ভার্য্যা, সোদরের ভগিনী এবং ব্যাঘ্রের নিকট ভক্ষ্য মাংসপিণ্ডরূপেই পরিচিত হইয়া থাকে। অহো! যুগপৎ বিভিন্ন চিত্তের কি বিচিত্র পরিণাম!

এই সকল বিষয় আলোচনা দ্বারা স্পষ্টরূপেই অবগত হওয়া যায় যে, আমাদের গ্রাহ্য ও গ্রহণ বিষয় সমূহ প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। যদিও আমরা সাধারণ ভাবে উহাদিগকে স্থির পদার্থরূপেই দেখিতে অভ্যস্ত, তথাপি পূর্ব্বকৃত সুকৃতির ফলে যখন কাহারও যোগচক্ষুঃ উন্মেষিত হয়, তখন তাহার নিকট গ্রহণ ও গ্রাহ্য পদার্থ সমূহ অতি চঞ্চল কতকগুলি ব্যাপার মাত্ররূপেই প্রতিভাত হইতে থাকে। সাধারণতঃ আমাদের নিকট যাহা স্থির বস্তুরূপে প্রতীতি গোচর হয়, তাহা পূর্ব্বোক্তরূপ ধর্ম্মপরিণাম লক্ষণপরিণাম এবং অবস্থাপরিণাম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। অনুলোম ও বিলোমক্রমে চিত্তে এই ত্রিবিধ পরিণামই প্রকাশ পাইতেছে। উহাই জীব-জগৎরূপে—গ্রাহ্য ও গ্রহণরূপে প্রকাশ পাইতেছে। প্রিয়তম সাধক, এই সকল সূক্ষ্ম জটিল তত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া ভুলিয়া যাইওনা যে, দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্য বলিতে চিত্তের এই ত্রিবিধ পরিণামই বুঝায়।

শান্তোদিতাব্যপদেশ্য-ধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মী ॥১৪॥

ইদানীং সর্ব্বপরিণামমূলং স্মারয়তি শান্তেতি। যোঽসৌ পরিণামঃ স ধর্ম্ম এব। স চ পুনর্যোগ্যতাবচ্ছিন্না ধর্ম্মিণঃ শক্তিরেব। তস্য একত্বেঽপি ব্যাপারভেদাদ্ ভিদ্যতে ত্রিধা নামতঃ—শান্তোদিতাব্যপদেশ্যা ইতি। তত্র শান্তা যে কৃত্বাব্যাপারানুপরতাঃ, উদিতাঃ সব্যাপারাঃ, অব্যপদেশ্যা ব্যপদেষ্টুমিদন্তয়া নির্দেষ্টুং নশক্যন্তে, সূক্ষ্মাঃ শক্তিমাত্র-রূপেণাবস্থিতা ইতিভাবঃ। এবং ত্রয়ো ধর্ম্মাঃ প্রলয়স্থিতি-সর্গাখ্যেতি কীর্ত্ত্যন্তে। এতান্ ধর্ম্মান্ যোঽনুপততি—স্বসত্তয়া সত্তাবতঃ স্ব চৈতন্যেন প্রকাশবতশ্চ করোতীব স ধর্ম্মী সর্ব্বপরিণামমূলং দ্রষ্টা পুরুষ ইত্যর্থঃ। এবঞ্চাকর্ত্তাপি দিবাকরস্তপতীতিবন্নিরস্ত-সমস্ত-কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ ব্যবহারস্যাত্মনো ধর্ম্ম-ধর্ম্মিত্বেন শক্তি-শক্তিমত্বেন চ ব্যপদেশঃ।

ইদঞ্চাত্রাবগন্তব্যং—শান্তধর্ম্মী শিবঃ, উদিতধর্ম্মী বিষ্ণুরব্যপ-দেশ্যধর্ম্মী প্রজাপতিরিতি, তথৈতৎ ত্রয়াত্মকো হিরণ্যগর্ভ ইতি ব্যষ্টি সমষ্টিতো নামভেদাঃ। সাধকানাং হিতায় ধ্যানবিগ্রহা অপ্যেতে পরি-লক্ষ্যন্তে কিল ॥১৪॥

———

অধুনা সকল পরিণামের মূল স্মরণ করাইবার জন্য ঋষি এই সূত্রের অবতারণা করিলেন। পূর্ব্বে যাহা পরিণাম রূপে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ধর্ম্ম বলিতে—যিনি ধর্ম্মী তাঁহার যোগ্যতাবচ্ছিন্ন শক্তিকেই বুঝায়; সুতরাং শক্তি, ধর্ম্ম ও পরিণাম—অভিন্ন। যদিও উহা—ঐ ধর্ম্ম একটী মাত্রই, তথাপি

ব্যাপারভেদে ত্রিবিধভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই ত্রিবিধ ভেদের যোগশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ নাম—শান্ত, উদিত এবং অব্যপদেশ্য। যাহারা ব্যাপার নিষ্পন্ন করিয়া উপরত হইয়াছে, সেইরূপ ধর্ম্ম সমূহের নাম শান্ত। যাহারা বর্ত্তমান কালেও ব্যাপারবিশিষ্ট আছে, তাহাদিগকে উদিত ধর্ম্ম কহে। আর যাহারা সূক্ষ্মরূপে বা শক্তিরূপেই অবস্থিত আছে, কোনরূপ ব্যাপারবান্ হইয়া ইদংরূপে নির্দ্দেশের যোগ্য হয় নাই, তাহাদিগকে অব্যপদেশ্য কহে। এই ত্রিবিধ ধর্ম্মই অন্যত্র প্রলয়, স্থিতি এবং সর্গ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ ধর্ম্মকে যিনি অনুপতন অর্থাৎ অনুগমন করেন, তিনি "ধর্ম্মানুপাতী"। অনুপতন কি, স্বকীয় সত্তাদ্বারা সত্তাবান্ করা, স্বকীয় চৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত করা। পূর্ব্বোক্ত শান্ত উদিত এবং অব্যপদেশ্য ধর্ম্মের যিনি সত্তাদাতা ও প্রকাশকর্ত্তা, যিনি মূলে না থাকিলে উহার অস্তিত্বই থাকে না, তিনিই উক্ত ত্রিবিধ-ধর্ম্মানুপাতী, তিনিই "ধর্ম্মী" নামে—শক্তিমান্ নামে কথিত হন। তিনিই সর্ব্ব-পরিণামের মূল, তিনিই দ্রষ্টা পুরুষ, তিনিই আত্মা।

এস্থলে ইহাই বিশেষভাবে বুঝিবার বিষয় যে, দ্রষ্টা যাবতীয় পরিণামের—ধর্ম্মের বা শক্তির অতীত ও সম্যক্ অস্পৃষ্ট হইয়াও সর্ব্ব পরিণামের মূলরূপে, সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয়রূপে ধর্ম্মীরূপে, সকল শক্তির আধাররূপে শক্তিমান্রূপেই কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি "দিবাকর তাপ দিতেছেন"। সূর্য্য যে দিবাকে সৃষ্টি করেন বা আমাদিগকে তাপ প্রদান করেন, একথা কিন্তু তত্ত্বতঃ কিছুতেই বলা যায় না। কারণ ঐরূপ কর্ত্তৃত্বে তাঁহার কোন অভিমান বা ইচ্ছা নাই। অথচ ঐ সূর্য্য হইতেই দিবা হয় এবং তাপ আসে, ইহা দেখিয়া আমরা সূর্য্যকে "দিবাকর তাপদাতা" না বলিয়া থাকিতে পারি না। ঠিক এইরূপই এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-প্রপঞ্চরূপে যে পরিণামসমূহ পরিলক্ষিত হইতেছে, যে অবিগাহ্য ধর্ম্মসমূহ প্রকাশ পাইতেছে, যে অচিন্তনীয় শক্তি-বিলাস চলিতেছে, ইহার আশ্রয়—ইহার

প্রেরয়িতা, ইহার একমাত্র আধাররূপে আমরা পুরুষকেই পাইয়া থাকি। তিনি যাবতীয় কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্মের অতীত হইয়াও কর্তা ভোক্তা ও আশ্রয় প্রভৃতি রূপেই ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকেন; তাই ঋষিও তাঁহাকে ধর্ম্মী বলিয়া পরিচয় দিলেন। তিনি যে কি, তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশযোগ্য না হইলেও আমাদের নিকট প্রতিনিয়তই তিনি পরিণামরূপে প্রকাশিত। ব্যাপারের আশ্রয়রূপে তাঁহার সত্তা আমরা অনায়াসেই অবধারণ করিতে পারি। যত শাস্ত্র যত উপদেশ যত উপাসনা, সকলেরই উদ্দেশ্য ঐ বস্তুকে লাভ করা। ধর্ম্মকে বা পরিণামকে ধরিয়াই উহার মূলের সমীপস্থ হইতে হয়।

হ্যাঁ, আর একটী কথা এখানে বলিয়া রাখিতেছি—যোগশাস্ত্রে যাঁহাকে শান্ত-ধর্ম্মী বলা হয়, অন্যত্র তিনিই শিব নামে বর্ণিত হইয়াছেন এবং এইরূপ উদিতধর্ম্মী বিষ্ণু ও অব্যপদেশ্যধর্ম্মী ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আবার সমষ্টিভাবে এই ত্রয়াত্মককে "হিরণ্যগর্ভ" বলা হইয়া থাকে। তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—চিতিশক্তিরূপিণী মহাকালী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নামক তিনটী সন্তান প্রসব করিলেন। আশা করি সাধকগণ এ সকল রহস্য এক্ষণে সহজে মীমাংসা করিয়া লইতে পারিবেন। সাধকগণের হিতের জন্য ঐ ধর্ম্মী পুরুষই আবার বিশিষ্ট বিগ্রহ পরিগ্রহপূর্ব্বক প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন, ইহাতে অস্বাভাবিকতা বা অসম্ভবতা কিছুই নাই। ভক্তিমান্ বিশ্বাসবান্ সাধকের নিকট এইরূপ বিশিষ্টমূর্ত্তির দর্শন অনায়াসেই সিদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু সে সকল অন্য কথা।

প্রিয়তম সাধক! তুমি দেখ, তোমার চিত্তে যত প্রকার বৃত্তি প্রকাশ পাইতেছে ঐগুলির দিকে লক্ষ্য কর। যাহারা বর্ত্তমানে প্রকাশশীল তাহাদের নাম উদিত। যে বৃত্তিগুলি পূর্ব্বক্ষণে প্রকাশিত ছিল এক্ষণে আর নাই, তাহাদের নাম শান্ত, আর যাহারা পরক্ষণে প্রকাশিত হইবে এখনও ঠিক প্রকাশযোগ্য হয় নাই; তাহারাই অব্যপদেশ্য। এই ত্রিবিধ ভঙ্গিমা লইয়া যে মহতী শক্তি প্রতিনিয়ত তোমার

হৃদয়ে আবির্ভূত হইতেছেন, তিনি স্রষ্টা, তিনি জগন্মাতা, তিনি মা, তাঁহাকে দেখ, তাঁহার প্রতি লক্ষ্য কর। দূরে দূরে খুঁজিতে যাইও না। এই বিশ্ব, এই দৃশ্য, এই তোমার স্থূল শরীর, ইহা তোমার চিত্তবৃত্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ঐ বৃত্তি সমূহের মধ্য দিয়া পূর্ব্বোক্ত শান্তোদিতা-ব্যপদেশ্যরূপ ত্রিবিধ শক্তির বিলাস দেখা যাইতেছে। ঐ যে তোমার লীলাময় ভগবান্ ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম-ঠামে তোমার হৃদয় বৃন্দাবনে দাঁড়াইয়া মধুর স্বরে তোমায় ডাকিতেছেন। যাও যাও ছুটিয়া উঁহার দিকে। ঐ যে তিনি তোমার অতি সন্নিহিত হইয়াছেন, আর বাহিরের দিকে ধাবিত হইও না। একবার ফিরিয়া দাঁড়াও, তাঁহাকে দেখ।

क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥१५॥

एकस्माद् धर्म्मिणः कथं बहुधा परिणाम इत्याह क्रमान्यत्वमिति। क्रमान्यत्वं शान्तोदिताव्यपदेश्य-धर्म्माणां यः क्रमः, एकस्य धर्म्मस्यानन्तरोऽन्यो धर्म्म इत्येवं रूपस्तस्यान्यत्वं विलक्षणत्वमेव परिणामान्यत्वे परिणामानां विलक्षणत्वे हेतुः कारणमिति। एवञ्च परपरधर्म्मापेक्षया पूर्व्वपूर्व्वधर्म्मस्यापि धर्म्मित्वं न पुनर्मूलस्य धर्म्मिणो द्रष्टुर्बहुत्वं सूच्यते तेन। यत् पुनरुक्तं क्रमान्यत्वमिति फलतस्तदवस्था परिणामतो न भिद्यते। तथा हि ये खलु धर्म्मपरिणामा लक्षणपरिणामाश्च तेऽप्यवस्था परिणामरूपान् धर्म्मानेव धर्म्मिण आश्रित्य स्वात्मलाभं कुर्व्वन्तीति सर्व्वमवदातम्।

इदमत्राकूतं—चिन्मात्रः पुरुषोऽनाद्यविद्यया विवर्त्तवानेकोऽहमिति सविशेष-प्रत्ययवानिव धर्म्मी एक एव। ततस्तस्यैव "बहुस्याम्"इति बहुधा परिणामो लक्ष्यते महदादि महाभूतान्तः। पुनस्तद् विकार

भौतिका विचित्ररचनाः प्रतिभासन्त इति परमात्मनि धर्म्मिणि बहुत्वे-प्रयुक्ता निरस्ता निरस्ता च विवर्त्तपरिणामविकारवादानामन्योऽन्य विप्रतिपत्तिरिति ।

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে—ধর্ম্মী এক, ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে এক ধর্ম্মী হইতে বহু পরিণাম কি প্রকারে সম্ভব হয়, সেই আশঙ্কা পরিহার করিবার জন্যই এই সূত্রের অবতারণা। ঋষি বলিলেন—ক্রমের অন্যত্বই পরিণামগত বিভিন্নতার হেতু। ক্রম কি—পূর্ব্ব কথিত শান্ত উদিত এবং অব্যপদেশ্য-ধর্ম্মের যে একটির পর একটীর আবির্ভাব, তাহাকেই ক্রম কহে; বর্ত্তমানক্ষণে যে পরিণামটী উদিত, পরক্ষণেই তাহা শান্ত, তৎপরক্ষণেই আবার অপর একটী পরিণাম অব্যপদেশ্যরূপে উন্মুখ হয়। এইরূপ যে একটীর পর একটীর আবির্ভাব ইহারই নাম ক্রম। এই ক্রমের যে অন্যত্ব অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণতা, তাহাই পরিণামগত অন্যত্বের প্রতি হেতু হইয়া থাকে।

খুলিয়া বলিতেছি—প্রত্যেক পূর্ব্ব পূর্ব্বটী সাধারণভাবে ধর্ম্মরূপে পরিচিত হইলেও প্রত্যেক পর পর ধর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া ঐ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মও ধর্ম্মীরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। মনে কর—যাহা অব্যপদেশ্যধর্ম্ম, তাহা বাস্তবিকপক্ষে উদিতধর্ম্মের ধর্ম্মী ব্যতীত অন্য কিছুই নহে এবং ঠিক এইরূপই যাহা উদিতধর্ম্ম, তাহাও শান্তধর্ম্মের ধর্ম্মী ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। অবিরাম এই যে ধারাবাহিক ক্রমে ত্রিবিধ ধর্ম্মপ্রবাহ চলিতেছে, যাহা পরিণামপ্রবাহ বা শক্তিপ্রবাহ-রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে, যাহা সাধারণ কথায় প্রলয় স্থিতি এবং সর্গ-নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহার প্রত্যেক পর পরটি প্রত্যেক পূর্ব্ব-পূর্ব্বটীর ধর্ম্মী। এই প্রকার অনবরত অগণিত ধর্ম্ম ধর্ম্মীর প্রকাশ

পরিলক্ষিত হইলেও যিনি মূল ধর্ম্মী, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই বহু ধর্ম্ম ধর্ম্মীর বিকাশ হইতেছে, যিনি দ্রষ্টা, যিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পুরুষ, তাঁহার কখনও বহুত্ব বিষয়ক আশঙ্কা হইতেই পারে না। কেন পারে না, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আবার এ স্থলেও অন্যভাবে বলা হইতেছে, ধীমান্ পাঠক অবহিত চিত্তে বুঝিতে চেষ্টা কর। ধর্ম্ম-ধর্ম্মী বিকাশের ক্রম বা বহুত্ব দেখিয়া মূলধর্ম্মীর বহুত্ব কল্পনা করা ভ্রম মাত্র; যেহেতু ক্রমের অন্যত্ব বলিতে যাহা বুঝায়, ফলতঃ তাহা অবস্থা-পরিণাম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ইতিপূর্ব্বে লক্ষণ পরিণাম, ধর্ম্মপরিণাম এবং অবস্থাপরিণামরূপে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, একটু ধীর ভাবে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, যাহা আপাততঃ ধর্ম্ম ও লক্ষণ পরিণামরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা বাস্তবিক পক্ষে অবস্থা পরিণামরূপ ধর্ম্মকেই ধর্ম্মীরূপে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়। ঐ পরিণামের সহিত মূল ধর্ম্মী যে পুরুষ, তাহার কোন সম্বন্ধই নাই বা থাকিবার আবশ্যকও নাই। যদিও তাঁহারই সত্তায় এবং তাঁহারই প্রকাশে এই পরিণাম সমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে; তথাপি এই পরিণামগত বহুত্বের প্রতি তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই। প্রতিক্ষণে প্রতি পরমাণুতে অবস্থাপরিণাম স্বাভাবিক ভাবেই বিদ্যমান্ আছে, ঐ অবস্থা পরিণামকে ধর্ম্মী করিয়া প্রতিনিয়ত ধর্ম্ম ও লক্ষণ পরিণাম সাধিত হইতেছে। মনে রাখিও সাধক, পরিণাম কেবল চিত্তেই হইয়া থাকে, চিৎএ নহে। এই কথাটী স্মরণ রাখিতে পারিলেই যাবতীয় সংশয় দূরীভূত হইয়া যাইবে। আর একটা বিশেষ কথা এই যে—মুখে সহস্রবার এই পরিণাম শব্দ উচ্চারণ করিলে বা প্রতিভার সাহায্যে এই পরিণাম রহস্য বুঝিয়া লইলেও যাহারা সাধক তাহাদের প্রাণের পিপাসা নিবৃত্তি হইতে পারে না। সাধক যতদিন বুদ্ধিতত্ত্বে আরোহণ করিতে না পারে—বিজ্ঞানময়ক্ষেত্রে প্রবেশের যোগ্যতা লাভ না করে, ততদিন এ অপূর্ব্ব পরিণাম রহস্য সে কিছুতেই অবধারণ করিতে পারে না। কতবার বলিয়াছি এ জগৎ একটা শক্তিক্রীড়া

মাত্র, ইহাতে বস্তুত্ব কিছুই নাই। এই বিশ্বক্রীড়া বুঝিবার জন্যই যোগশাস্ত্রের ঋষি পরিণাম কথাটীর এত বেশী আলোচনা করিয়াছেন। জগৎটা যে অন্তরই অথবা অন্তরই যে জগৎ আকারে দেখা যাইতেছে, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই এই পরিণামগত বিলক্ষণতা বুঝিতে পারা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিণামকর্তৃক একান্ত অস্পৃষ্ট দ্রষ্টার সন্ধান পাইয়া সাধকের জীবন দিন দিন ধন্য হইয়া উঠে। বৃত্তি-সারূপ্য দর্শন বা সত্যপ্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত ধৈর্য্যের সহিত অগ্রসর হইতে থাকিলে এ সকল গূঢ়তত্ত্ব স্বতঃ উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে। তখন আর ইহা পুস্তকলিখিত কতকগুলি দুরধিগম্য বিষয় বা মস্তিষ্ক ধর্ম্মরূপে থাকিয়া সাধককে বঞ্চিত করে না।

মহর্ষি পতঞ্জলিদেব অনেক প্রসিদ্ধ আশঙ্কার নিরাকরণ করিয়াছেন। ঋষি প্রণীত সূত্র-সমূহ ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে সকল সংশয়ই নিরাকৃত হইয়া যায়। ঋষিবাক্যে কখনও কোন বিপ্রতিপত্তি থাকিতে পারে না। প্রিয়তম সাধক, বুঝিতে চেষ্টা কর—প্রথমতঃ চিন্ময় আনন্দস্বরূপ নির্ব্বিশেষ-সত্তারূপী পুরুষ অনাদি অবিদ্যা বশে "একোহহং"রূপে "এক আমি রূপে" যেন প্রতিভাত হইতে থাকেন, এইরূপ হওয়ার নামই নির্গুণ ব্রহ্মের বিবর্ত্তবান্ হওয়া বা সগুণ হওয়া। একবার স্মরণ কর সেই প্রবীণ বিচারপতি পিতামহের অশ্ব হওয়ার কথা, যিনি স্বরূপতঃ মানুষ, তিনি তাঁহার পৌত্রের নিকট অশ্বরূপে প্রতিভাত হইলেন। ঠিক এই রূপই, যিনি সর্ব্বভাবাতীত চৈতন্যমাত্রস্বরূপ বস্তু, তিনি আমাদের নিকট লীলাময় রূপে প্রকাশিত হইলেন—বিবর্ত্তবান্ হইলেন, সগুণ হইলেন, "একমাত্র আমিই আছি"এইরূপ ভাবে নিজেকে নিজে একটু বিশেষভাবে দর্শন করিলেন। এই যে সত্তামাত্রস্বরূপ বস্তুর "একোহহং" হওয়া, উহাই বিবর্ত্ত নামে কথিত হয়। বিবর্ত্ত কথাটা বুঝিবার জন্য সাধারণতঃ রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হয়। রজ্জু স্বরূপতঃ সর্প না হইয়াও দৃষ্টি-বিমূঢ় ব্যক্তির নিকট সর্পরূপে প্রতিভাত হইতে পারে, পিতামহ

মানুষ হইয়াও কিছুক্ষণের জন্য শিশু পৌত্রের নিকট অশ্বরূপে প্রতিভাত হইতে পারেন। এইরূপ ভাবাতীত অদ্বয় আত্মাও এক আমি রূপে আমাদের জন্য বিবর্ত্তিত হইতে পারেন। এই যে "আমি" ইনিই হইতেছেন—সর্ব্বপরিণামের সাক্ষাৎ হেতু, ইনিই শক্তিমান্, ইনিই লীলাময় ঈশ্বর।

তারপর ঐ লীলাময় ঈশ্বরই—ঐ এক আমিই "বহু হইব" বলিয়া মহত্তত্ত্ব হইতে পঞ্চমহাভূত পর্য্যন্ত পরিণাম প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আপনাকে বহুভাবে অভিব্যক্ত করেন। ইহাই পরিণাম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অন্য রূপে পরিবর্ত্তিত হওয়াই পরিণাম। যিনি ইতিপূর্ব্বে এক আমি ছিলেন, তিনিই এক্ষণে মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্ব পঞ্চতন্মাত্র ইত্যাদিরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন অর্থাৎ পরিণামপ্রাপ্ত হইলেন। এই পরিণামের মধ্যে পূর্ব্বকথিত শান্ত উদিত ও অব্যপদেশ্য এই ত্রিবিধ ভঙ্গিমা পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু এই ভঙ্গিমা যাঁহার প্রকাশে প্রকাশিত, যাঁহার সত্তায় সত্তালাভ করে সেখানে—সেই মূলে কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। তিনি এক অদ্বয় নির্ব্বিকার থাকিয়াও বহুরূপে প্রকাশিত হন।

তারপর আরও নিম্নে আসিয়া এই ভৌতিক বিকারসমূহ পরিলক্ষিত হয়। যাহা এই বিচিত্র সৃষ্টিরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত "একোঽহং"রূপ লীলাময় ঈশ্বরের চরম পরিণাম ক্ষিতি অপ্ তেজ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতেরই বিকার ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইহাই বিকারবাদ নামে প্রসিদ্ধ। সংক্ষেপে আবার বলিতেছি—আত্মা ও অবিদ্যার সম্বন্ধের নাম বিবর্ত্ত, সেই সম্বন্ধ-বিশিষ্ট আত্মার মহাভূত পর্য্যন্ত যে সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন, তাহার নাম পরিণাম আর সেই সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন যখন স্থূলে কোন আকার নিয়া প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, তখন তাহার নাম হয় বিকার। আবার বলি—আত্মা শুদ্ধ অদ্বয় নির্ব্বিকার। বিবর্ত্তবান্ আত্মার নাম শক্তি বা জননী, ঐ শক্তির মহাভূত পর্য্যন্ত শান্ত উদিত ও

অব্যপদেশ্য-ধর্ম্মের বিকাশ বা ত্রিবিধ ভঙ্গিমাই পরিণাম। আর এই সূক্ষ্ম পরিণাম বা শক্তিভঙ্গিমা যখন স্থূলে আসিয়া ভৌতিক বস্তুরূপে প্রকাশ পায়, তখন সেইগুলির নাম হয় বিকার। অতএব শাস্ত্র ও লোকপ্রসিদ্ধ বিবর্ত্ত পরিণাম এবং বিকার, এই তিন বাদই স্বতঃসিদ্ধ। স্বরূপতঃ অন্যথাভাব প্রাপ্ত না হইয়াও অন্যথা ভাবের ন্যায় প্রতীয়মান হওয়ার নাম বিবর্ত্ত, যেমন রজ্জু সর্প। স্বরূপতঃ অন্যথাভাব প্রাপ্তির নাম পরিণাম, যথা সুবর্ণ কুণ্ডল। পূর্ব্ব স্বরূপের বিনাশ পূর্ব্বক অন্য স্বরূপ প্রাপ্তির নাম বিকার, যথা দুগ্ধ দধি। যাহা কার্য্য-কারণ-ভাবের অতীত, তাহার যে কারণভাব প্রাপ্তি, তাহাই বিবর্ত্ত। উপাদান কারণের যে কার্য্য রূপ প্রাপ্তি, তাহাই পরিণাম। আর যাহা স্বরূপতঃ কার্য্যই, তাহার যদি কার্য্যান্তরভাব প্রাপ্তি হয়, তবে তাহাকে বিকার কহে। এই বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া এই তিনটী বাদই অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। ব্রহ্ম স্বয়ং সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বস্তু। তিনি যখন জগৎ কারণরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তাহার নাম হয়—সত্ব রজঃ ও তমোগুণ। এই অবস্থাটীর নাম বিবর্ত্ত। ঐ গুণত্রয় যখন মহাভূত পর্য্যন্তরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে বলা হয়—পরিণাম। আর ঐ পরিণামগুলি যখন পরস্পর মিলিত হইয়া স্থূলে আসিয়া ভৌতিক পদার্থরূপে প্রকাশ পায়, তখন তাহার নাম হয়—বিকার। যাঁহারা যোগচক্ষুষ্মান্ কেবল তাঁহারাই বিবর্ত্ত ও পরিণাম, এই দুইটীর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, অপর সকলে উহা কণ্ঠস্থ রাখে মাত্র। আর যাহারা আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্, তাহারা কেবল ভৌতিক বিকার নিয়াই গবেষণা করিতে সমর্থ।

—•—

परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् ॥१६॥

उक्तः संयमस्य विभिन्नासु भूमिषु विनियोगेन तज्जयात् प्रज्ञालोकः। अथेदानीं विवृणोति विजित-संयमानान्तत स्ततोभूमितोविभूतीना-माविर्भावं प्रायः पादसमाप्तिं यावत्। का नाम विभूतिरात्मन ऐश्वर्य्यं महिमा लीलेति यावत्। सा हि वृत्तिसारूप्यप्रत्यक्षरूपा स्वगत मेवावगाहिन्यनुभूतिरिव। कैवल्य-पदवीप्रतिपत्तये तन्मार्ग परिचायक-त्वेन परवैराग्यसाधकतया च तदाविर्भावः। यथा चोक्तं श्रुतिषु— "अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामीति, अहं मनुरभवम् सूर्य्यश्चेति, अहमन्नमह-मन्नाद इति, वेदैरनेकैरहमेव वेद्य इति, अहमेव सर्व्वं मयि भाति सर्व्वमिति।" यथा श्रीभगवता च स्वयमेव समुपदिष्टमर्ज्जुनाय— अहमात्मा गुडाकेशेत्यादिना विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगदि-त्यन्तेन। यत्तु दृश्यते कामकामिनामभ्युदय-साधकः सिद्धिः कार्य्या-ऽसाधारण इति, न स योगाङ्गात्म विभूतिरन्यथातूर्द्ध्वं वक्ष्यते।

तत्र स्थितिप्रयत्नरूपाभ्यास-निपुणानां समधिगतसंयमसामर्थ्यानां योगिनाम् स्व एवाविर्भवन्ति तत्र तत्र संयमजन्याविभूतयः। तत्रादावतीता नागतज्ञानरूपां विभूतिमाह परिणामेति। परिणामत्रयसंयमात् परिणामत्रयेषु धर्म्मलक्षणावस्थाख्येषु कृतव्याख्यानेषु संयमाद् धारणा ध्यान-समाधिरूप-संयमप्रयोगादित्यर्थः। अतीतानागतज्ञानं तद्रूपा-विभूतिराविर्भवतीति शेषः। तथाहि भूतं भव्यञ्च यत् किञ्चित् तत् सर्व्वं ज्ञानमेवाहमेव नान्यदितिभावः। नहि स्मृतितोऽन्यदतीतं, नचाऽशातोऽन्यदनागतं किञ्चिद् वस्तु विद्यते। एतदुभयं ज्ञान-मेवाहमेव बोद्धप्रत्यय एवेति प्रत्यक्षं भवति मुमुक्षूणामेषैवहि विभूतिर-पूर्व्वेति।

प्राकृतास्त्वतीतानागतं सर्व्वं वस्तुरूपं व्यापाररूपं वा मन्यन्ते। सर्व्वेषामेव वस्तु-व्यापाराणां चित्तपरिणामरूपत्वात् परिणामस्य च त्रिविधत्वात्तत्रैव संयमविनियोगादाविर्भवति स्वरूपज्ञानमतीता-

नागतवस्तु-व्यापाराणामिति । यत्र तु दृश्यते मोक्षमार्गविवरणपराणामग्रगामिनामनिच्छतामप्यायाति भूतभव्यवस्तुव्यापारविवरणज्ञानं तत्राप्ययमेव परिणामत्रय-संयमरूपो न्यायः समुन्नेयः । न तु न्यायविरुद्धं किञ्चिदलौकिकं समायाति योगमार्गेषु । परमेश्वरे कृतप्रणिधानास्तु सर्व्वा विभूतय स्तस्यैवेति पश्यन्ति । ततश्च नैव भ्रश्यते मोक्षपथोऽभिमानत एव मुक्तत्वाप्यवगन्तव्यमिति ॥१६॥

ইতিপূর্ব্বে পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্রে বিভিন্ন ভূমিতে সংযম-প্রয়োগের ফলে সংযমজয় এবং প্রজ্ঞালোকের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সংযমের অঙ্গীভূত সমাধির কথা বলিতে গিয়া চিত্তপরিণামের প্রস্তাব আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই তত্ত্বের ব্যাখ্যা পঞ্চদশসূত্র পর্য্যন্ত করা হইয়াছে। এক্ষণে উপযুক্ত অবসরে সংযমজয়ী সাধকগণের বিভিন্ন ভূমিতে সংযম প্রয়োগের ফলে যে বিভূতি সমূহের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহাই প্রায় অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত বর্ণিত হইবে। বিভূতি কাহাকে বলে? আত্মার যে ঐশ্বর্য্য—আত্মার যে মহিমা—আত্মার যে লীলা, তাহাই যোগশাস্ত্রে বিভূতি আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে বৃত্তি-সারূপ্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই সারূপ্যটী যখন প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকে, তখন তাহাকে অর্থাৎ সেই স্বগত-ভেদাবগাহিনী অনুভূতিকেই বিভূতি বলা হইয়া থাকে। কৈবল্য-পদ-প্রাপ্তির পক্ষে সেই পথের পরিচায়করূপে এবং বিশেষতঃ পরবৈরাগ্যের সাধকরূপেই এই বিভূতিসমূহের আবির্ভাব হইয়া থাকে। বেদাদিশাস্ত্রে এই বিভূতির বিষয় যেরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সাধকগণের অবগতির জন্য এস্থলে তাহার দুই একটী বাক্যের উল্লেখ করা আবশ্যক মনে হইতেছে। "আমি একাদশ রুদ্ররূপে অষ্টবসুরূপে বিচরণ করি" ইত্যাদি, "আমি মনু হইয়াছি সূর্য্য ও হইয়াছি" ইত্যাদি "আমি অন্ন

এবং আমিই অন্নাদ" ইত্যাদি, "সমগ্র বেদের আমিই একমাত্র প্রতিপাদ্য বস্তু" ইত্যাদি, "আমিই সকল এবং আমাতেই সকল" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসমূহ আত্মবিভূতির বিষয় বহুধা উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীভগবানও স্বয়ং গীতাশাস্ত্রে "হে গুড়াকেশ। আমিই আত্মা" ইত্যাদি "আমিই একাংশে এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি" এই সকল বাক্যে সাধকশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে বিভূতিযোগের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং বিভূতি বলিলেই আত্ম-মহিমা বুঝায়। যাহারা কামকামী—যাহারা ঐহিক অভ্যুদয় লাভের প্রয়াসী, তাহাদের মধ্যে যে অলৌকিক শক্তিরূপ সিদ্ধিবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কখনও এই যোগাঙ্গ-বিভূতি-পদবাচ্য হইতে পারে না। যোগাঙ্গ বিভূতি সমূহ যোগীকে দিনের পর দিন কৈবল্যের দিকেই লইয়া যায়—পরবৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়। আর মাত্র অভ্যুদয়সাধক সিদ্ধি সমূহ বিত্ত বা খ্যাতির দিকেই সাধককে লইয়া যায়। এই সকল সিদ্ধির সম্বন্ধে পরে উপযুক্ত অবসরে বলা হইবে। এস্থলে আমরা পূর্ব্বোক্তরূপ যোগাঙ্গ আত্মবিভূতিরই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। ওগো আমার কল্যাণময়ী আত্ম বিভূতিরূপিণী জননী, তুমি আমাদিগের নিকট তোমার এই অপূর্ব্ব লীলাময় অথচ দুরধিগম্য বিভূতিরহস্য সমূহ উদ্‌ভাসিত করিয়া দাও। এস মা আমার, এস যোগরাণী জননী আমার, তোমার চরণে কোটি কোটী প্রণাম করিয়া তোমারই কৃপায় তোমার এই অপূর্ব্ব বিভূতি-রহস্য অবধারণ করিতে অগ্রসর হই। জয় মা জয় মা জয় মা!

যে সকল যোগী স্থিতি-প্রযত্নরূপ অভ্যাস নিপুণ, যাঁহারা সংযম-সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সেই অভীষ্ট ভূমিতে সংযমপ্রয়োগজন্য বিভূতিসমূহ স্বতঃই আবির্ভূত হইয়া থাকে। সেই বিভূতিসমূহের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে অতীতানাগতজ্ঞানরূপা বিভূতির বিষয়ই ঋষি বলিতেছেন—পরিণামত্রয়ে সংযম হইতে অতীত এবং অনাগত জ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয়।

ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্ম লক্ষণ ও অবস্থারূপ ত্রিবিধ পরিণামের বিষয় অতি বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করা হইয়াছে। উহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে অর্থাৎ ধারণা ধ্যান ও সমাধি প্রযুক্ত হইলে, অতীত এবং অনাগত যাহা কিছু সে সকল যে জ্ঞানই—বোধ প্রত্যয়মাত্রই অর্থাৎ আমিই—ইহা প্রত্যক্ষীভূত হয়, ইহাই অপূর্ব্ব বিভূতি। সাধারণ মানুষ অতীত এবং অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যদ্ বস্তু বা ঘটনাগুলিকে নিতান্ত পৃথক্‌রূপেই বুঝিয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা মুমুক্ষু-সাধক, যাঁহারা পরিণামত্রয়ে সংযম করিতে সমর্থ, তাহারা দেখিতে পায়—অতীত বলিতে স্মৃতিব্যতীত আর কিছুই নাই, আর অনাগত বলিতেও আশা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। এই যে স্মৃতি এবং আশা, ইহা স্বরূপত আমিই অন্য কিছু নহে। সাধারণ লোককে ইহা সহস্রবার বুঝাইয়া দিলেও উহারা যে আত্মপ্রত্যয়মাত্রই—জ্ঞানমাত্রই, ইহা কিছুতেই অনুভব করিতে পারে না; কিন্তু যোগী সাধক-পরিণাম-ত্রয়ে সংযমের ফলে ঐ সকলকে জ্ঞানমাত্ররূপেই অর্থাৎ আত্ম-বিভূতিরূপেই দর্শন করিতে সমর্থ হয়। অতীত এবং অনাগত যাবতীয় বস্তু বা ব্যাপার চিত্তের পরিণাম ব্যতীত অন্য কিছু নহে; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ পরিণামে সংযম প্রয়োগ করিলেই উহাদের যাহা যথার্থ স্বরূপ তাহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। চিত্ত প্রতিনিয়তই পরিণামশীল, পরিণামবিহীন চিত্ত কল্পনাও করা যায় না। চিত্তের ঐ পরিণামের মধ্য দিয়াই স্মৃতি ও আশা নামক অতীত এবং অনাগত দুইটী ভাব প্রকাশ পায়; ঐ দুইটী যে আত্মপ্রত্যয়মাত্র, ইহা প্রত্যক্ষ করিবার সামর্থ্যই বিভূতি। যোগশাস্ত্রে ইহাই অতীতানাগত জ্ঞানরূপা বিভূতি নামে বর্ণিত হইয়াছে। স্মৃতিরূপ জ্ঞানবিশেষের নাম অতীত এবং আশারূপ জ্ঞানবিশেষের নাম অনাগত, ইহা যাঁহার প্রত্যক্ষ গোচর হয়, তাহার আর অতীতের জন্য অনুশোচনা করিতে হয় না কিংবা ভবিষ্যৎ প্রাপ্তির আশায় উৎফুল্লও হইতে হয় না, এরূপ সাধক সর্ব্বাবস্থায়ই সন্তুষ্ট ও প্রফুল্ল থাকে। সাধারণ

লোক অতীত সুখ দুঃখের ঘটনাগুলিকে স্মরণ করিয়া অথবা ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের আশা বা আশঙ্কা করিয়া চিত্তকে নানা প্রকারে ক্ষত বিক্ষত করিয়া থাকে। চিত্তের প্রশান্ততা যে কি, তাহা একবার ধারণাও করিতে পারে না। ওঃ তাহাদের জীবন কি অশান্তিময়। সর্ব্বদাই কি বিক্ষেপ! কি উদ্বেগ! কি চঞ্চলতা! কি অধীরতা! তাহা স্মরণ করিলেও বিস্মিত ও দুঃখিত হইতে হয়। আর যাহারা যোগমার্গে অগ্রগমণশীল, যাহারা চিত্তের ধর্ম্মপরিণাম, লক্ষণ-পরিণাম এবং অবস্থাপরিণামের বিষয় বিশেষভাবে অবগত হইয়া উহাতে ধারণা ধ্যান ও সমাধি প্রয়োগ করিতে সমর্থ, তাহারা দেখিতে পায়—পরিণামগুলি জ্ঞানেরই অর্থাৎ আমারই বিভিন্ন স্পন্দনমাত্র; প্রতি মুহূর্ত্তেই উহাদের শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম প্রকাশ পাইতেছে। ইহা সম্যক্‌ভাবে প্রত্যক্ষীভূত হইলে, তখন আর অতীত বলিতে বা ভবিষ্যৎ বলিতে বিশেষ কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সবই যে বর্ত্তমান—অতীতও বর্ত্তমান, অনাগতও বর্ত্তমান, "অতীত আছে, ভবিষ্যৎও আছে," এই "আছে" রূপ বর্ত্তমান সত্তার উপরই অতীত নামক একটা জ্ঞানস্পন্দন এবং অনাগত নামক একটা জ্ঞানস্পন্দন প্রকাশ পায়। ব্যবহারিকক্ষেত্রে ঐ দুইটাই স্মৃতি ও আশা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতীত এবং অনাগত যে জ্ঞানমাত্রই, উহাও যে বর্ত্তমানই, এইরূপ জ্ঞানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ সাধকের নিকট কেবল "বর্ত্তমান"ই থাকে, অতীতের স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের আশা চিরতরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। ওগো, ইহাই বিভূতি। অনেক ভবিষ্যৎ কথা জ্যোতিষিগণও বলিয়া থাকে, অতীত ঘটনা সমূহ ইতিহাসেও লিপিবদ্ধ থাকে, তাহা কি কখনও বিভূতিপদবাচ্য হয়? এরূপ অতীতানাগত জ্ঞানদ্বারা যোগীর কি লাভ হয়? প্রিয়তম সাধক! তুমি মনে রাখিও—বিভূতি বলিতে আত্মবিভূতিই বুঝায়। যে সকল সিদ্ধি তোমার আত্মার—তোমার প্রিয়তমের মহত্ত্ব মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পায় না, তাহা কখনও যথার্থ বিভূতি হইতে পারে না।

কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়—যোগী হয়ত ইচ্ছা করেন না যে, কামকামীদিগের ন্যায় অতীতানাগত বস্তু বা ব্যাপারের বিষয় অবগত হন, তথাপি তাঁহাদের বুদ্ধির নির্ম্মলতা বশত: অনিচ্ছা সত্ত্বেও অতীত এবং ভবিষ্যদ্ বস্তুর স্বরূপ কিংবা ঘটনার বিবরণ সম্যক্ অবগত হইতে পারেন। এরূপ স্থলে বুঝিতে হইবে—সেই যোগীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও পূর্ব্বোক্ত-রূপ পরিণামত্রয়ে সংযম প্রয়োগ হইয়া গিয়াছে।

যোগমার্গে ন্যায়বিরুদ্ধ বা যুক্তিবিরুদ্ধ কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না। সাধারণ লোক যাহাকে অলৌকিক শক্তি বলিয়া বুঝিয়া লয়, যোগীদিগের নিকট তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ পায়। যে ব্যক্তি যত বেশী ঈশ্বর প্রণিধানে সমর্থ, তাহার বুদ্ধি তত নির্ম্মল হয়, বুদ্ধি নির্ম্মল হইলেই, উহার ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যরূপ শ্রেষ্ঠ অবস্থা পূর্ণভাবে বিকাশ পায়। ঐশ্বর্য্য শব্দের অর্থ ঈশ্বরত্ব—অপ্রতিহত প্রভাব, স্বর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব প্রভৃতি। সম্যক্ ভাবে ঈশ্বরপ্রণিহিত ব্যক্তির বুদ্ধি মহতী বুদ্ধির সহিত মিলিত হইয়া যায়; তাই তাহাতে ঈশ্বরধর্ম্মসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে। ইহাতে অস্বাভাবিকতা বা অসম্ভবতা কিছু নাই বা থাকিতে পারে না। ঐরূপ মুমুক্ষু যোগিগণ ঈশ্বর প্রণিধানের ফলে সর্ব্বতোভাবে অভিমানশূন্য হইয়া পড়েন; সুতরাং তাঁহাদের নিকট হইতে যে সকল অলৌকিক শক্তি প্রকাশ পায়, তাহাতে তাঁহারা বিন্দুমাত্রও অভিমান করেন না। ঐ সকল ঐশ্বর্য্য যে একমাত্র পরমেশ্বরেরই, ইহা তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়া সম্যক্ নিরভিমান হইয়া থাকেন।

"ওগো, সিদ্ধি শক্তি ঐশ্বর্য্য বিভূতি অলৌকিক শক্তি; যাহা কিছু বল, তাহা আমার নহে। সকলই তাঁর, আমার পরম প্রিয়তম পরমাত্মার পরমেশ্বরের। আত্মারই বিভূতি—আমার নহে। আত্মাতেই বিভূতি-বিলাস প্রকাশ পায়, তাহাতে আমার কি? আমি শুধু দূর হইতে তাঁহার করুণা তাঁহার মহত্ত্ব দেখিয়া শিশুর মত কাঁদিব মা মা মা।

ঐ সকল সিদ্ধি শক্তিতে আমার বিন্দুমাত্র গৌরব বৃদ্ধি হয় না। আবার উহা না থাকিলেও আমার কিছু হানি নাই। আমি যে আমার মাতৃ-অঙ্কস্থ নগণ্য শিশু। মা আমাকে যখন যে ভাবে যেখানে রাখিবেন তাহাই আমার পক্ষে মঙ্গলজনক।" এইরূপ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাহারা বিভূতি লাভ করেন, তাহাদের আর কোন অবস্থায়ই পদস্খলনের আশঙ্কা থাকেনা। পক্ষান্তরে যাঁহারা সম্যক্ শরণাগত না হইয়াই সিদ্ধির সন্ধান পান, তাঁহাদের পদস্খলনের আশঙ্কা খুবই বেশী, ঐ সকল বিভূতিতে অভিমানযুক্ত হইয়া পড়া একান্তই সম্ভব। লৌকিক দৃষ্টিতে এই অতীতানাগত জ্ঞান এবং অন্যান্য যত-রকমের বিভূতি পরে বর্ণিত হইবে, সে সকলেরই একটা বিশেষ গৌরব আছে। জগতের খ্যাতি ও ধন লাভের পক্ষে উহাদের উপ-যোগিতাও বেশ আছে; তাহা থাকুক। তুমি সাধক! তুমি মাতৃ-চরণে শরণাগত সন্তান। তুমি ওদিক্ দিয়া যাইও না, দেখ—তুমি "আমার" বলিতে কিছু রাখ নাই। সবই মা'র হইয়া গিয়াছে। নিজের ইচ্ছাকে পৃথক রাখিয়া ভগবানের ইচ্ছা হইতে নিজেকে দূরে রাখিবার চেষ্টা কখনও করিও না। দেখিতে পাইবে—লৌকিক ভাবে যাহা বিভূতি নামে খ্যাত, তাহা তোমার নিকটও অল্লাধিক প্রকাশ পাইতেছে। চিত্ত নির্ম্মল হইলেই বিভূতির বিকাশ হয়। উহাতে তোমার কি? উহা যে "আত্ম-বিভূতি"—আত্মার—মায়ের—গুরুর বিভূতি। তুমি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিও—আমি দীন, আমি নগণ্য, আমি বলিতে কিছু নাই, সকলই তিনি, সকলই তাঁর। অকপট চিত্তে যদি ইহা বলিতে ও ধারণা করিতে পার, তবেই সাধক তুমি এই বিভূতিরহস্য অবধারণ করিয়া জন্মজীবন সার্থক করিতে পারিবে।

প্রসঙ্গক্রমেই এত কথা এস্থলে বলিতে হইল। ফলতঃ এই বিভূতি পাদের রহস্য আমরা যেরূপ ভাবে বুঝিয়াছি, যোগেশ্বরী মা আমাদিগকে ইহা যেরূপ ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে কোন

রূপেই পদস্খলনের আশঙ্কা নাই। ভুলিও না সাধক! বিভূতি বলিতে আত্মবিভূতিই বুঝায়—যতক্ষণ আত্মস্বরূপে বিভূতির উদয় না হয়, ততক্ষণ উহা বিভূতিপদবাচ্যই হয় না।

शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात् सङ्कर
स्तत्प्रविभाग-संयमात् सर्व्वभूत-रुतज्ञानम् ॥१७॥

सर्व्वभूतरुत-ज्ञानरूपां विभूतिमाह शब्देति। शब्दार्थ-प्रत्ययानां शब्दस्तदर्थस्तत्प्रत्ययश्च तेषामितरेतराध्यासात् अन्यस्मिन्नन्यधर्म्मावभासतः सङ्करो ज्ञानसाङ्कर्य्यं भवतीत्यर्थः। कृतव्याख्यानः सङ्करः सवितर्कसमापत्तौ। तत् प्रविभागसंयमात्, तेषां शब्दार्थप्रत्ययानां ये प्रविभागाः परस्परविलक्षणा स्तत्संयमात् सर्व्वभूतरुतज्ञानं सर्व्वभूतानामाकीटमनुष्यान्तानां यद्रुतं कण्ठस्वरस्तज्ज्ञान मेवाहमेव नान्यदिति विभूतिराविर्भवति यद्धि नाम ज्ञानं वस्तु तदेव सर्व्वभूतेषु कण्ठस्वररूपेणाप्यात्मप्रकाशं करोतीति प्रत्यक्षीभूतं भवति मुमुक्षूणाम्। यद्वा सर्व्वभूतान्येव रुतानि "शब्दाद्ध्येव खल्विमानिभूतानि जायन्ते, शब्देन जातानि जीवन्ति, शब्दं प्रयन्त्यभि संविशन्तीति" श्रुत्यर्थप्रतिपादितं ज्ञानं समुदेति सैव विभूतिः। त्रिवर्गकामास्तु तिरश्चामभिप्रायं परिज्ञातुं तेषां रुतेषु संयमं प्रयुञ्जन्ति।

এই সূত্রে সর্ব্বভূতরুত-জ্ঞানরূপা বিভূতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—শব্দ, অর্থ এবং প্রত্যয়ের পরস্পর অধ্যাস হইতেই সঙ্কর (জ্ঞান-সাঙ্কর্য্য) হয়, উহাদের যে প্রবিভাগ

(পরস্পর বিলক্ষণতা) তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে সর্ব্বভূত-রুত-জ্ঞানরূপা বিভূতি লাভ হয়। শব্দ ও তাহার অর্থ এবং সেই অর্থানুরূপ প্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞান, এই তিনটী পরস্পর অত্যন্ত বিলক্ষণ। অথচ ইহাদের পরস্পর অধ্যাস হইয়া—একের ধর্ম্ম অন্যটীতে অবভাসিত হইয়া সঙ্কর অর্থাৎ জ্ঞানসাঙ্কর্য্য উপস্থিত হয়। ব্যবহারিক জগতের যাবতীয় জ্ঞানই এইরূপ সঙ্কর-জ্ঞান। যেরূপ রজ্জুর সত্তা বিষয়ক জ্ঞান এবং সর্পের আকার বিষয়ক স্মৃতি, এই উভয় মিলিত হইয়া রজ্জু-সর্প-রূপ ভ্রমজ্ঞানের উদয় হয়, ঠিক সেইরূপ এ জগতের যাবতীয় জ্ঞানই অধ্যাসমূলক হইয়া থাকে। শব্দের ধর্ম্ম অর্থে, অর্থের ধর্ম্ম প্রত্যয়ে অধ্যস্ত হইয়া একপ্রকার সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের উদয় হয়, উহাই জাগতিক জ্ঞানের স্বরূপ। পূর্ব্বে সবিতর্কা-সমাপত্তির ব্যাখ্যানকালে ইহা বিশদ্‌রূপে বিবৃত হইয়াছে। ব্যবহারিক-ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত ঐ জ্ঞান-সাঙ্কর্য্য উপস্থিত হয় বলিয়াই, বিবিক্তভাবে শব্দের স্বরূপ পরিগৃহীত হয় না—বিশুদ্ধ শব্দ যে স্বরূপতঃ কি বস্তু, তাহা ধরিতেই পারা যায় না। যে কোনও একটী শব্দ উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অর্থ ও তদ্‌বিষয়ক প্রত্যয় সংমিশ্রিত হইয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু যাহারা সংযমনিপুণ যোগী, যাহারা প্রাণায়াম প্রত্যাহারে অভ্যস্ত, তাহারা উহাদের প্রবিভাগ—উহাদের পরস্পর বিলক্ষণতা বেশ সুন্দর রূপেই লক্ষ্য করিতে পারেন। সুতরাং ঐরূপ যোগিগণ ইচ্ছা করিলে অর্থ এবং প্রত্যয়ের পরিহার পূর্ব্বক কেবল শব্দমাত্রে সংযম প্রয়োগ করিতে পারেন। ঐরূপ সংযম প্রয়োগের ফলে সর্ব্বভূতরুত-জ্ঞান-রূপা বিভূতির উদয় হয়।

সর্ব্বভূতরুত জ্ঞান কি? সর্ব্বভূত শব্দে কীট অবধি মনুষ্য পর্য্যন্ত সকল প্রাণীই বুঝায়। তাহাদের যে রুত—ধ্বনি অর্থাৎ কণ্ঠস্বর, তাহা জ্ঞানমাত্রই অন্য কিছু নহে। যিনি জ্ঞানরূপে আমিরূপে চৈতন্যরূপে আমার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন, সর্ব্বভূতের কণ্ঠস্বর রূপেও তিনিই আত্মপ্রকাশ করেন, এইরূপ যে প্রজ্ঞালোকানু-

ভূতি, তাহাই বিভূতি। সাধারণ মানুষ ইহা বুঝিতেই পারে না, তাহারা জ্ঞানের এই শব্দ আকারীয় অভিব্যক্তি ধরিতেই পারে না। শব্দকে জ্ঞান হইতে—আত্মবোধ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌রূপেই ধারণা করিয়া লয়; তাই তাহারা অনুকূল শব্দ শ্রবণে উৎফুল্ল আর প্রতিকূল শব্দ শ্রবণে বিমর্ষ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যোগিগণ শব্দার্থ প্রত্যয়ের প্রবিভাগে সংযমের ফলে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন—চতুর্দ্দিক্‌ হইতে যতরকম শব্দ উপস্থিত হয়, সকলই জ্ঞানমাত্র—সকলই "আমি" আমার সত্তাই সর্ব্বভূতরুত রূপে উপস্থিত হইতেছে। এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতির ফলে তাঁহারা স্তুতি নিন্দায় বিচলিত হন না। অনুকূল বা প্রতিকূল শব্দে তাঁহাদের চিত্তের প্রশান্ততা বিনষ্ট হয় না। কর্কশ ও মধুর উভয়বিধ স্বরের মধ্যেই আত্মসত্তার অনুভব করিয়া যোগিগণ সর্ব্বথা সমত্ব অবলম্বন করিতে সমর্থ হন। একমাত্র শব্দই অর্থাৎ সর্ব্বভূতরুতই যে মানুষের সুখ দুঃখ শান্তি অশান্তি স্বর্গ ও নরকের হেতু, ইহা একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। সাধনসমর-গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ডে এই শব্দরহস্য বিশদ্‌ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ঋষিমুখোচ্চারিত এই "সর্ব্বভূতরুত-জ্ঞান" বাক্যটীর আর এক প্রকার অর্থও হইতে পারে। সর্ব্বভূত যে রুতমাত্রই—শব্দমাত্রই এইরূপ জ্ঞান লাভ হওয়াই উক্তরূপ বিভূতি। দেখ সাধক, সর্ব্বভূত অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ, ইহা শব্দব্যতীত অন্য কিছু নহে। শব্দ হইতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি, শব্দেই উহাদের স্থিতি এবং অবসানে শব্দেই উহাদের লয় হয়। শব্দই জীব জগতের স্বরূপ। যত স্থূল বস্তুই হউক, উহা একটী নাম বা শব্দমাত্রই। যাবতীয় নাম বা শব্দ যদি লোপ পায়, তবে আর জগৎ বলিতে কিছুই থাকেনা। শব্দেরই বাহ্য লক্ষণ রূপ। অন্তরে যাহা শব্দ, বাহিরে তাহাই রূপ বা আকার। শব্দ মাত্রেরই অর্থ আছে। ঐ অর্থ ও রূপ একই কথা। শব্দ হইতে অর্থকে পৃথক্‌ভাবে ধরিতে পারা

যায় না বলিয়াই শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থ ও রূপ প্রকাশ পায়। বাস্তবিক পক্ষে শব্দ ও অর্থ দুইটী পৃথক্ পদার্থ নহে। শব্দেরই স্থূলরূপ অর্থ। অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায়, শব্দের শক্তিই অর্থ। শব্দের অন্য নাম পদ, পদের অর্থ বলিয়াই পরিদৃশ্যমান দ্রব্য গুলির নাম পদার্থ। সুতরাং আমাদের নিকট যাহা সর্ব্বভূতরূপে পরিচিত, তাহা বস্তুতঃ "রুত" ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এইরূপ জ্ঞানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই সর্ব্বভূত-রুত-জ্ঞান। ইহাই বিভূতি। এই বিভূতি লাভ হইলে যোগী পরবৈরাগ্যবান্ হইয়া কৈবল্য পদবীতে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হয়। সাধক! গুরুকৃপায় যদি এই বিভূতিলাভ করিতে সমর্থ হও—তবে দেখিতে পাইবে, অনুভব করিতে পারিবে—এই বিশ্ব, এই সর্ব্বভূত রুতমাত্রই—বিভিন্ন শব্দের ঝঙ্কার মাত্রই। বিভিন্ন প্রকারের শব্দই সর্ব্বভূতরূপে প্রকাশ পাইতেছে। দেখ—তোমার এই রক্তমাংসময় দেহটাও বাস্তবিক কোন স্থূল পদার্থ নহে। "দেহ দেহ দেহ" এইরূপ অবিচ্ছিন্ন একটা শব্দের ধারাই দেহের আকারে দেখা যাইতেছে। ওগো, এই বিভূতিলাভ হইলে জগতের স্থূলত্ব কোথায় উধাও হইয়া যায়, পর-বৈরাগ্য আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। সাধক, তুমি কি এই অপূর্ব্ব বিভূতি লাভে ধন্য হইবার জন্য যত্নবান্ হইবে না?

যাহারা কামকামী, তাহারা এই সর্ব্বভূতরুত-জ্ঞানরূপ বিভূতি লাভের জন্য পশু পক্ষী প্রভৃতির ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া সংযম প্রয়োগ করেন। নিপুণতর ভাবে সংযম প্রযুক্ত হইলে উহা হইতে পশু পক্ষী প্রভৃতির অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায়। হায়! তাহারা ইহাকেই বিভুতি মনে করিয়া তুষ্টিলাভ করেন।

संस्कार-साक्षात्करणात् पूर्व्वजातिज्ञानम् ॥१८॥

पूर्व्वजातिज्ञानरूपां विभूतिमाह संस्कारेति। संस्कारा धर्म्माधर्म्म-वासनारूपाः पूर्व्ववर्त्तिन इत्यर्थ स्तेषु संयमप्रयोगात् प्रत्यक्षीभूता भवन्ति ते, तस्माच्च संस्कार-साक्षात्-करणात् पूर्व्वजातिज्ञानं पूर्व्वाश्च ता जातयश्चेति पूर्व्वजातयः पूर्व्व-जन्मानीत्यर्थः। ताः सर्व्वा ज्ञानमेवात्म-मेव—नहि ज्ञानादन्यत् पूर्व्वजातिनामकं किञ्चिदस्ति। तथा परवर्त्ति-संस्कार-साक्षात्-करणात् परजन्मापि ज्ञानमात्रमिति प्रत्यक्षीभूतं भवतीयमेवविभूति र्मुमुक्षूणाम्। जातिरपि संस्कारविशेष एवात-स्तत्रैव संयमोयुक्तो जातिस्वरूप-दर्शनाय। एवञ्च ब्राह्मणादिजाति-भेदो मनुष्याणां पूर्व्वकृतकर्म्मसंस्कारजन्यत्वात् प्रवाहरूपेण सनातन एवेति नतदुच्छेदः सम्भवत्यत्र परमर्षिपदलाञ्छिते कर्म्मक्षेत्रे भारतवर्ष इति। वर्णभेदस्तु सूक्ष्मशरीरात्मक संस्कार जन्यत्वात्तत्-परिवर्त्तनं तपःप्रभावेन सम्भवतीति ध्येयं सुधीभिः ॥१८॥

এই সূত্রে পূর্ব্বজাতিজ্ঞানরূপা বিভূতির বিষয় বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—সংস্কার সাক্ষাৎকার করিলে পূর্ব্বজাতি জ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয়। সংস্কার কি? চিত্ত ক্ষেত্রে মুহুর্মুহু যে বাসনা সমূহ ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহারাই সংস্কার। সংস্কার শব্দের সাধারণ অর্থ দাগ—চিহ্ন। কোনও প্রস্তর ফলকের উপর সূচ্যগ্র-লৌহশলাকা দ্বারা তীব্রভাবে অঙ্কন করিলে যেরূপ অল্লাধিক দাগ পড়িয়া যায়, ঠিক সেইরূপ প্রতিনিয়ত কামকর্ম্মাদির সহিত যুক্ত থাকিবার ফলে চিত্তক্ষেত্রে অসংখ্য প্রকারের সংস্কার উপস্থিত হয়। এই সংস্কারগুলি যেন কোনও অব্যক্ত ক্ষেত্র হইতেই ফুটিয়া উঠে, আবার অব্যক্তেই মিলাইয়া যায়। দৃঢ় সংযম প্রয়োগের ফলে এই অপ্রকটিত সংস্কার

সমূহ প্রত্যক্ষীভূত হয়। এইরূপ প্রত্যক্ষতা হইতেই যোগীর জাতি-জ্ঞানরূপা বিভূতিলাভ হয়। সংস্কার সমূহকে সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। এক পূর্ব্ববর্ত্তী এবং অন্য—পরবর্ত্তী। যে সংস্কারের ফলে বর্ত্তমান দেহ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাকে পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কার বলা যায়। বর্ত্তমান জীবনের কর্ম্মফলে যে সংস্কারগুলি উপচিত হইতেছে, তাহাকে পরবর্ত্তী সংস্কার বলে। ধর্ম্মমূলক ও অধর্ম্মমূলক ভেদে বাসনা সমূহ দুই প্রকারে প্রকাশ পায়; সুতরাং পূর্ব্ব ও পরভাবী সংস্কারসমূহ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মমূলক ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তি-সংস্কারে সংযম প্রয়োগ করিলে পূর্ব্বজাতিজ্ঞান ও পরবর্ত্তি-সংস্কারে সংযম প্রয়োগ করিলে পরজন্মজ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয়।

জাতি ও জন্ম এস্থলে প্রায় একই অর্থের বোধক। জাতি বা জন্ম যে জ্ঞানমাত্রই অর্থাৎ আমিই, ইহা প্রত্যক্ষ হওয়ার নাম জাতিজ্ঞান-রূপা বিভূতি। সাধারণ মানুষ জাতি বলিতে ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি জাতি বিশেষই মনে করিয়া থাকে, আবার জন্ম বলিতেও মাতা-পিতৃ শুক্র-শোণিত-সম্বন্ধ জন্য একটা স্থূলদেহের আবির্ভাব মনে করিয়া থাকে। স্থূলদেহে আত্মবোধ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলেই ঐরূপ ভ্রান্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু যিনি যোগী, যিনি বিজ্ঞানক্ষেত্রে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, তিনি দেখিতে পান—ঐ জাতি ও জন্ম, জ্ঞানেরই এক প্রকার ভাঙ্গমা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। স্বপ্নাবস্থায় আমরা কত বিভিন্ন জন্মগ্রহণ করি; কিন্তু স্বপ্নের অবসানে জাগ্রত কালে সেগুলি সংস্কার মাত্র রূপে—জ্ঞান মাত্ররূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। ঠিক এইরূপ পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী জন্মগুলিও সংস্কার সাক্ষাৎকারী যোগীর নিকট স্বাপ্নিক অবস্থারূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। ইহাই বিভূতি। আমরা মনে করি—আমি অমুক জাতি; তাই আমাদের বিভিন্ন জাতি বিষয়কজ্ঞান প্রকাশ পায়। আমরা মনে করি—পিতা মাতা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; তাই আমাদের জন্মবোধ প্রকাশ পায়। যদি আমরা দেহাত্মবোধ ছাড়িয়া বিজ্ঞানাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, তবে

দেখিতে পাই—জাতি বা জন্ম বলিতে বাস্তবিক কিছু নাই; উহা জ্ঞানেরই বা আমারই এক প্রকার অভিব্যক্তি মাত্র। এই জাতি-জ্ঞানরূপা বিভূতি লাভ হইলে যোগী জাত্যভিমানরূপ সুদৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন।

সূত্রে সংস্কার সাক্ষাৎকার হইতে মাত্র পূর্বজাতি জ্ঞানের বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে, আর আমরা পূর্ব্ব ও পর উভয় জাতি বিষয়ক ব্যাখ্যা করিলাম; আশাকরি ধীমান্ পাঠকগণ ইহাতে সন্দিগ্ধ হইবেন না। ঋষিবাক্য হইতে যেরূপ তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায় এবং সাধনা দ্বারা যাহা উপলব্ধ হয়, তাহাতে ঐরূপ ব্যাখ্যাই সমীচীন। প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণও ঐরূপ ব্যাখ্যাই করিয়া গিয়াছেন। আর একটী তত্ত্ব এই ঋষিবাক্য হইতে পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মসঞ্চিত সংস্কার হইতেই সঞ্জাত। ঠিক এই সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই স্বয়ং ভগবান্ গুণকর্ম্ম-বিভাগ হইতে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগের কথা বলিয়াছেন; সুতরাং জাতিভেদ কখনই মনুষ্যকৃত হইতে পারে না। জাতিভেদ আধুনিক নহে। জগৎ যেরূপ প্রবাহরূপে নিত্য, এই জাতি-ভেদও ঠিক সেইরূপই নিত্য—সনাতন। ইহার উচ্ছেদ এই দেশে—এই ঋষিজনপদ লাঞ্ছিত কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে কদাপি সম্ভব হইতে পারে না। অন্য দেশ কর্ম্মভূমি নহে, ভোগভূমি মাত্র। সে সকল দেশের লোক এখন পর্য্যন্ত গুণকর্ম্মরহস্য সংস্কাররহস্য জন্মান্তরতত্ত্ব প্রভৃতি অতি সূক্ষ্মতম বিষয়গুলি ধারণা করিবার মত ধীশক্তি লাভ করে নাই; তাই তাহারা কেবল ধন ও বিভাগগত জাতিভেদ মাত্রই বুঝিতে পারে; কিন্তু যে দেশের লোকের জন্মান্তর-জ্ঞান মজ্জাগত সংস্কার রূপে প্রতিষ্ঠিত, সে দেশের লোকের মধ্যে ঐ সনাতন জাতিভেদপ্রথা কোন-রূপেই বিনষ্ট হইতে পারে না।

জাতিভেদ ও বর্ণভেদ ঠিক এক কথা নহে, ইহা ইতিপূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। একই ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণই থাকিতে পারে এবং আছে। অন্যান্য জাতি ও বর্ণ সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপই

বুঝিতে হইবে। বর্ণ—সূক্ষ্মশরীর আরম্ভক-সংস্কার হইতে সঞ্জাত হয়; তাই তীব্র তপস্যা প্রভাবে তাহার পরিবর্ত্তন সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু জাতির পরিবর্ত্তন স্থূল শরীর বিদ্যমান থাকিতে কোনরূপেই সম্ভব হয় না। যে সকল যোগী গুরুকৃপায় সংস্কার সাক্ষাৎকার করিয়া জাতিজ্ঞানরূপ বিভূতি লাভে ধন্য হইয়াছেন, যাঁহারা জাতি ও জন্মকে জ্ঞানমাত্ররূপেই অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারাও যতদিন সমাজমধ্যে অবস্থান করিবেন, ততদিন সমাজশৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া জাতি ও জন্মের অকিঞ্চিৎকরতা খ্যাপন পূর্ব্বক দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন অজ্ঞ জীবগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। ঐরূপ করিলে তাহাদের অনিষ্টই সাধন করা হয়। অসময়ে পুচ্ছচ্ছেদন করিলে ভেকশিশুর মৃত্যু অনিবার্য্য।

प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् ॥१६॥

परचित्तज्ञानरूपां विभूतिमाह प्रत्ययस्येति। प्रत्ययस्य विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहिज्ञानं प्रत्ययः स च चित्ततो न भिद्यते, तस्य साक्षात् करणादिति पूर्व्वतोऽनुकर्षः। परचित्तज्ञानं परेषां यानि चित्तानि तान्यपिज्ञानमेवाहमेव। यद्वा परं श्रेष्ठं यत् चित्तं समष्टिरूपं तज्ज्ञानमेवाहमेव नान्यदिति प्रत्यक्षीभूतं भवतीयमेव विभूति योगिनाम्। किमयं चिन्तयत्यधुनेति परिज्ञातुं चित्ते संयमप्रयोगस्तु त्रैवर्णिकाभिप्रेत इति ॥ १६ ॥

এই সূত্রে পরচিত্ত-জ্ঞানরূপা বিভূতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—প্রত্যয়ের সাক্ষাৎকার হইতে পরচিত্ত-জ্ঞানরূপা বিভূতি লাভ হয়। বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী অর্থাৎ সবিশেষ জ্ঞানের নাম

প্রত্যয়। এই প্রত্যয় এবং চিত্ত অভিন্ন; সুতরাং প্রত্যয়ের সাক্ষাৎকার বলিলে চিত্তেরই সাক্ষাৎকার বুঝায়। স্বকীয় চিত্তে সংযম প্রয়োগ করিলে চিত্তের স্বরূপ প্রত্যক্ষীভূত হয়, স্বকীয় চিত্তের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, পরকীয় চিত্তের স্বরূপও পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। একমাত্র জ্ঞানই অর্থাৎ "আমি"ই স্বকীয় এবং পরকীয় চিত্তরূপে প্রতিভাত, এইরূপ অনুভূতি লাভ হওয়াই বিভূতি। ইহা লাভ হইলে যোগী অপরের কোনরূপ বিরক্তিকর ব্যবহারেও বিচলিত না হইয়া স্থির থাকিতে পারেন। চিত্ত যে জ্ঞানেরই বিভিন্ন স্পন্দন মাত্র অর্থাৎ "আমিই যে চিত্ত আকারে আকারিত হই", ইহা প্রত্যক্ষ হইলে যোগীর বৈরাগ্য লাভ অবশ্যম্ভাবী।

অথবা ঋষি-মুখোচ্চারিত "পরচিত্ত জ্ঞান" শব্দটীর অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যে চিত্ত, তাহাকেও পরচিত্ত বলা যায়। যাহা পরমেশ্বরের চিত্ত, যে সমষ্টিভূত চিত্তেরই এক একটী স্পন্দন ব্যষ্টি চিত্তরূপে প্রকাশিত, সেই মহৎ চিত্তই পরচিত্ত। ভক্তের ভাষায় ইনিই জননী মহাশক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। স্বকীয় চিত্তে সংযম প্রয়োগ করিলে এই পরচিত্তের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। ব্যষ্টিকে ধরিতে পারিলেই সমষ্টির সন্ধান পাওয়া যায়। স্বকীয় চিত্তের জ্ঞানরূপতা সাক্ষাৎকৃত হইলে পরচিত্তের জ্ঞানস্বরূপতা সুতরাং প্রত্যক্ষীভূত হয়। মুমুক্ষু যোগিগণের ইহাই যথার্থ বিভূতি। এই বিভূতি লাভ হইলে চিত্তগত বিভিন্ন পরিস্পন্দনে অর্থাৎ সুখ দুঃখ মান অপমান প্রভৃতি কারণে যোগীকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতে হয় না। পরমেশ্বরের চিত্তের সহিত স্বকীয় চিত্তের অভিন্নতা খ্যাতি হইলে সাধকের আর পৃথক্ ইচ্ছার উদ্বেলনও থাকে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাই তাহার চিত্তে ইচ্ছারূপে প্রকাশ পায়। এইরূপ বিভূতির ফলে যোগী যে কেবল সত্যসঙ্কল্প হন, তাহা নহে; পরন্তু পরবৈরাগ্যের পথেও অগ্রসর হইতে সমর্থ হন।

যাহারা কামকামী ত্রিবর্গসেবী, তাহারা অপরের চিত্তগত

অভিপ্রায়টী জানিবার জন্য প্রত্যয়সাক্ষাৎকার করিতে চেষ্টা করেন। উহা অনেকটা আধুনিক “থট্‌রিডিং” নামক বিদ্যাবিশেষ। অপরের মনোভাব বলিয়া দেওয়ার সামর্থ্যকে যোগিগণ কখনও বিভূতি মনে করেন না। তাঁহারা বিভূতি বলিতে আত্মবিভূতিই বুঝিয়া থাকেন। আমার পরম প্রেমাস্পদ আত্মা কোথায় কিরূপ ভাবে মহিমান্বিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, তাহা অবগত হইবার সামর্থ্য লাভ করাই যথার্থ বিভূতি লাভ।

ন চ তৎ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥২০॥

পরচিত্তজ্ঞানং বিশিনষ্টি নচেতি। তৎ পরচিত্তজ্ঞানং সালম্বন-মালম্বনেন সহ প্রত্যক্ষীভূতং ন ভবতীতি শেষঃ। কুত ইত্যাহ তস্যেতি। তস্যালম্বনস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ আলম্বনে সংযমাপ্রয়োগা-দিত্যর্থঃ। যত্র সংযমস্তদ্বিষয়কমেব জ্ঞানং সমুদেতি ॥২০॥

এই সূত্রে পূর্ব্বোক্ত পরচিত্তজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় প্রদান করা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—তাহা (পরচিত্তজ্ঞান) সালম্বন নহে, যেহেতু উহা আলম্বনের অবিষয়ীভূত। প্রত্যয়ের প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে পরচিত্তজ্ঞানরূপা বিভূতি প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু চিত্তের যাহা আলম্বন অর্থাৎ তৎকালে চিত্ত যে বিশেষ ভাবটী লইয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহা অবগত হওয়া যায় না। যে বিষয় অবলম্বনে সংযম প্রযুক্ত হয় মাত্র তদ্‌বিষয়ক স্বরূপই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। প্রত্যয়ে অর্থাৎ চিত্তে সংযম প্রয়োগ করিলে চিত্তের স্বরূপ মাত্রই

উদ্‌ভাসিত হয়, কিন্তু চিত্তের আলম্বন প্রকাশিত হয় না। যদি কাহারও তাৎকালিক চিত্তগত আলম্বন পর্য্যন্তের স্বরূপ অবগত হইবার ইচ্ছা হয়, তবে তজ্জন্য পৃথক্‌ভাবে সংযম প্রয়োগ করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে যে ত্রিবর্গসেবীদিগের পরচিত্তজ্ঞানের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা এই সালম্বন চিত্তজ্ঞানই। তাহারা চিত্তের স্বরূপ অবগত হওয়া অপেক্ষা চিত্তের তাৎকালিক আলম্বন জ্ঞানই বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে। এইরূপে অপরের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া তাহারা অভিলষিত ধন বা খ্যাতি যাহা ইচ্ছালাভ করিতে পারে। আর মুমুক্ষু যোগী চিত্তের আলম্বন অবগত হওয়া অপেক্ষা চিত্তের স্বরূপ-পরিচয় লাভের জন্যই সমধিক সচেষ্ট থাকেন এবং ক্রমে পরবৈরাগ্য ও কৈবল্যপদবী আরোহণ করিয়া জন্ম জীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা সম্পাদন করেন। তবে ইহাও সত্য কথা যে, পূর্ব্বোক্তরূপ মুমুক্ষু যোগিগণ ইচ্ছা না করিলেও অনেক সময়ে পরচিত্তের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। যোগীদিগের অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যায়; সুতরাং অপরের অন্তরের ভাব পরিজ্ঞাত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। সাধকগণের আচার ব্যবহার এবং বাক্যালাপের প্রতি একটু বিশেষ অবধান প্রয়োগ করিলে উহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই ধরিতে পারে। মুমুক্ষু যোগিগণ এইরূপ বিভূতির বিনিময়ে কখনও ধন বা খ্যাতির প্রত্যাশা করেন না। তাঁহারা সুখ দুঃখ স্তুতি নিন্দা প্রভৃতির অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত; সুতরাং পার্থিব কোন প্রলোভনই তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারে না। বিশ্বের কল্যাণ সাধনই তাঁহাদের ব্যবহারিক জীবনের উদ্দেশ্য। সকল বিভূতিই যে ঈশ্বরের বিভূতি, ইহা তাঁহারা সর্ব্বথা প্রত্যক্ষ করিয়া সর্ব্বাবস্থায় সম্যক্ নিরভিমান ও অবিমুগ্ধই থাকেন।

कायरूपसंयमात्तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुः-प्रकाशासम्प्रयोगेऽन्तर्द्धानम् ॥ २१ ॥

अन्तर्द्धानरूपां विभूतिमाह कायेति। कायरूपसंयमात् काये स्थूल-शरीरे यद्रूपं कायावच्छिन्नचिदाभास इत्यर्थः। तत्र संयमात्, तद्-ग्राह्यशक्तिस्तम्भे तस्य कायरूपस्य या ग्राह्यशक्तिर्ग्रहणरूपैरिन्द्रियै-र्यद्ग्राह्यत्वमिति भावस्तस्याः स्तम्भे निरुद्धे सति सुतरां चक्षुः-प्रकाशासम्प्रयोगे चक्षुरितीन्द्रियमात्रोपलक्षकं ततश्चेन्द्रियाणां यः प्रकाशो विषयसंस्पर्शस्तस्यासम्प्रयोगेऽन्तर्द्धानमदर्शनं स्थूलशरीरस्य सिद्ध्यतीति शेषः। चिदाभासेऽवस्थानसामर्थ्यादेवं भवति ग्राह्यशक्ति निरुद्धा ग्रहणशक्तेश्चासम्प्रयोगस्ततश्च न केवलं कायगत-रूपस्यान्तर्द्धानं शब्दस्पर्शादीनामप्यन्तर्द्धानं भवतीति व्यक्तमेव। इयमेवापूर्व्वा विभूति मुमुक्षूणाम्। त्रैवर्गिकास्तवपरेषां चक्षुःप्रकाशं हठेन स्तब्ध्वा स्वकीय-शरीरान्तर्द्धानरूपां सिद्धिं दर्शयति प्राकृतानहो शिशुता ॥ २१ ॥

এই সূত্রে অন্তর্দ্ধানরূপা বিভূতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—কায়রূপে সংযম হইতে তাহার গ্রাহ্যশক্তি স্তম্ভ হইয়া যায়, ঐরূপ হইলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের যে বিষয়প্রকাশ সামর্থ্য, তাহার অসম্প্রয়োগ হয়; সুতরাং অন্তর্দ্ধান সিদ্ধ হইয়া থাকে। কায়রূপ শব্দের অর্থ—স্থূলশরীরাবচ্ছিন্ন চিদাভাস। যাহা চিতের অর্থাৎ চৈতন্যের ন্যায় অবভাসিত হয় অথচ বাস্তবিক চিৎ নহে, তাহাকে চিদাভাস কহে। রূপ ও চিদাভাস প্রায় একই কথা। রূপ বলিতে চৈতন্য-স্বরূপ বস্তুই বুঝায়, ভাষায় তাহার স্বরূপ ঠিক প্রকাশ করা যায় না, তথাপি রূপ যে আছে এবং অনুভূত হইতেছে, ইহা মানুষমাত্রেই লক্ষ্য

করিতে পারে। রূপ আধার, পদার্থ আধেয়। রূপকে অবলম্বন করিয়াই পদার্থ প্রকাশ পায়। রূপ বলিতে সাধারণতঃ আকৃতিকেই লক্ষ্য করা হয়; বাস্তবিক, রূপ ও আকার এক নহে। সুন্দর কুৎসিৎ শব্দদ্বয় রূপের বিশেষণ নহে, উহা আকৃতি বা গঠনেরই বিশেষণ। রূপ রূপই, উহাতে কু-সু নাই। রূপের বিষয় "সাধন-সমর" গ্রন্থে অতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, আমরা কায়রূপ শব্দে স্থূলশরীরাবচ্ছিন্ন চিদাভাসকেই বুঝিয়া লইব। যাহাদের স্বচ্ছ চিদাকাশ প্রকাশিত হইয়াছে অর্থাৎ বিশোকা জ্যোতি উদ্‌ভাসিত হইয়াছে, কেবল তাঁহারাই চিদাভাস কি তাহা বুঝিতে পারিবেন। অন্যের পক্ষে উহার স্বরূপ অবগত হওয়া অসম্ভব। কায় অবলম্বন করিয়া যে রূপের প্রকাশ পায় অর্থাৎ স্থূল শরীরকে আশ্রয় করিয়া যে চিদাভাস প্রকাশিত হয়, তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে স্থূলশরীর-বিষয়ক প্রতীতি থাকেনা, তখন চিত্ত রূপে অর্থাৎ চিদাভাসে মুগ্ধ, সুতরাং শরীর সংস্থানের বিদ্যমানতা অনুভব করা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সূত্রে যে গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভ এবং চক্ষুঃ-প্রকাশা-সম্প্রয়োগ, এই দুইটী পদের প্রয়োগ হইয়াছে তাহাদ্বারা এই ব্যাপারটীই অভিব্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা ঐ দুইটী শব্দের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। স্থূল শরীরের যে গ্রাহ্যত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা শরীরের যে প্রকাশ-যোগ্যতা, তাহা নিরুদ্ধ হওয়ার নাম গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভ। এইরূপে স্থূলশরীরগত গ্রাহ্যশক্তি নিরুদ্ধ হইলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত স্থূলশরীরের যে স্বাভাবিক সম্প্রয়োগ, তাহা সুতরাং নিরুদ্ধ হইয়া যায়। যদিও সূত্রে কেবল চক্ষুঃপ্রকাশেরই অসম্প্রয়োগ বলা হইয়াছে, তথাপি বুঝিতে হইবে ঐ চক্ষুঃ শব্দটী যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষণ—অর্থাৎ স্থূল-শরীরগত গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভ হইলে চক্ষু আর দেহকে দেখে না, কর্ণ উহার শব্দ পায় না, ত্বক্ কোন স্পর্শ গ্রহণ করে না, নাসিকা কোনরূপ গন্ধ পায় না এবং রসনাও আস্বাদ লইতে সমর্থ হয় না। এইরূপ হইলেই অন্তর্দ্ধান সিদ্ধ হয়।

অন্তর্দ্ধান শব্দের অর্থ স্থূলশরীরের অদর্শন। "আমার শরীর আছে" এইরূপ প্রতীতির বিলোপ হইলেই স্থূলশরীরের অন্তর্দ্ধান হয়। সুষুপ্তি কালে শরীরপ্রতীতি থাকে না বটে কিন্তু তাহাকে অন্তর্দ্ধান বলা যায় না; কারণ, তখন আত্মসত্তাবিষয়ক জ্ঞানও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়; কিন্তু এই কায়রূপে চিত্ত সংযত হইলে আত্মসত্তাবিষয়ক জ্ঞান অতি উজ্জ্বলরূপেই বিদ্যমান থাকে। "আমি আছি" অথচ শরীর বলিতে কিছু প্রতীত হইতেছে না, আমি রূপমাত্র—চিদাভাসমাত্র, নাম বা আকৃতি কিছুই প্রতীতি হইতেছে না, এইরূপ যে অবস্থা, তাহারই নাম অন্তর্দ্ধান। নিজের জ্ঞান হইতে অর্থাৎ "আমি আছি" এই জ্ঞান হইতে যদি নিজের শরীরবিষয়ক প্রতীতি অন্তর্হিত থাকে, তবে তাহাকেই অন্তর্দ্ধান বলা হয়। কায়রূপে অর্থাৎ স্বকীয় স্থূল শরীর আশ্রয় করিয়া যে চিদাভাসের প্রতীতি হয়, তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে অন্তর্দ্ধান সিদ্ধ হইবেই; কারণ, ঐরূপ সংযম প্রয়োগকালে স্থূলশরীরগত গ্রাহ্যশক্তি নিরুদ্ধ থাকে; সুতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত স্থূল শরীরের যে সম্প্রয়োগ, তাঁহাও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। স্থূল কথা এই যে, সাধক যখন শরীর-নিরপেক্ষ হইয়া আত্মসত্তা উদ্বুদ্ধ রাখিতে সমর্থ হন, তখনই তাঁহার অন্তর্দ্ধানরূপা বিভূতি প্রকাশিত হয়। মুমুক্ষু সাধকগণ এই অপূর্ব্ব বিভূতি লাভের জন্যই লালায়িত। ক্ষণ-কালের জন্যও এই অন্তর্দ্ধানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হইলে, মুক্তির আস্বাদ পাইয়া সাধক নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন।

যাহারা ত্রিবর্গলিপ্সু, যাহারা ধন ও প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী, তাহারা হঠপ্রক্রিয়াদ্বারা অপরের চক্ষুর প্রকাশশক্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া স্বকীয় শরীরকে, তাহাদের নিকট হইতে কিছু-ক্ষণের জন্য অদৃশ্য রাখিতে প্রয়াস পায়। ইহা এক প্রকার ইন্দ্রজালবিশেষ। যোগের সহিত ঐরূপ অন্তর্দ্ধানের কোন সম্বন্ধ নাই। উহা কখনও আত্মবিভূতি পদবাচ্য হইতে পারে না;

অথচ কোন কোন ত্রিবর্গকামী ব্যক্তি অপরের চক্ষু হইতে স্বকীয় শরীরকে অদৃশ্য রাখিয়া প্রাকৃত জনগণকে বিমুগ্ধ করিয়া থাকেন। হায় এ কি শিশুতা!

থাক্, সে কথা পরিত্যাগ করিয়া আমরা আত্মবিভূতির বিষয়ই আলোচনা করিব। কায়রূপে সংযম্ প্রয়োগ করিলে যেরূপ স্থূল শরীরের অন্তর্দ্ধান সিদ্ধ হয়, ঠিক সেইরূপই যাবতীয় স্থূল-পদার্থাবচ্ছিন্ন চিদাভাসে সংযম প্রয়োগ করিলে উহাদের অন্তর্দ্ধান সিদ্ধ হয়। যে কোন স্থূল পদার্থ অবলম্বন করিয়া দ্রষ্টার স্বরূপ দর্শনের অভিলাষী হইলে সেই পদার্থগত গ্রাহ্যশক্তির স্তম্ভ এবং চক্ষুরাদি গ্রহণশক্তির অসম্প্রয়োগ অনায়াসে নিষ্পন্ন হয়; সুতরাং পদার্থটি অদৃশ্য হইয়া যায়। যাহারা সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত অর্থাৎ দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্য দর্শনে সুদক্ষ, তাহাদের নিকট এই অন্তর্দ্ধানরূপা বিভূতি অনায়াসলভ্যরূপেই আবির্ভূত হইয়া থাকে।

প্রিয়তম সাধক! তুমি ঋষিমুখোচ্চারিত ঐ "কায়রূপ" শব্দটীদ্বারা মাত্র নিজের স্থূলশরীরাবচ্ছিন্ন চিদাভাসকেই বুঝিও না। যে কোন স্থূল পদার্থের রূপে সংযম প্রয়োগ করিলেই যে তাহার অন্তর্দ্ধান সিদ্ধ হয়, ইহা পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া এই অপূর্ব্ব বিভূতির বিষয় জগতের লোককে শুনাইয়া দাও। ইহার ফলে মানবগণের স্থূলের প্রতি আসক্তি বিদূরিত হইয়া যাইবে। যদি কেহ স্বকীয় পুত্র-ভার্য্যাদি কিংবা ধনরত্নাদি স্থূলপদার্থসমূহের রূপকে অবলম্বন করিয়া সংযম প্রয়োগ করে এবং পুনঃ পুনঃ উহাদের অন্তর্দ্ধান দেখিতে পায়, তবে ঐ সকল পদার্থের প্রতি তীব্র আসক্তিরূপ বন্ধন হইতে সে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইতে পারে। তাহার ফলে মানব জাতির পরম মঙ্গলই সাধিত হইয়া থাকে। ওগো! "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" এই একটী মাত্র বিভূতিকেও আয়ত্ত করিতে তোমরা যত্নবান হও, একটু দৃঢ়তার সহিত সত্য-প্রতিষ্ঠা করিলেই ইহা লাভ করিতে পারিবে।

सोपक्रमं निरुपक्रमञ्च कर्म्म तत्संयमा-
दपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा ॥ २२ ॥

अपरान्तज्ञानरूपामाह विभूतिं सोपक्रममिति। इह खलु द्विविधं तावत् प्रारब्धं कर्म्म—सोपक्रमं निरुपक्रमञ्च। तत्र फलायोद्यतमाद्य-मनुद्यतं द्वितीयम्। तत्संयमात् तत्र द्विविधे कर्म्मणि संयमप्रयोगात्। अपरान्तज्ञानं अपरान्तो मृत्युस्तज् ज्ञानमेवाहमेव नान्यदिति प्रत्यक्षी-भूतं भवतीयमेव विभूतिः। उक्तञ्च—"अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाह-मर्ज्जुन" इति। प्रारब्धकर्म्मावसान एवापरान्त स्तत् स्वरूप-परिचयाय तत्रैव संयमो युक्तः। अरिष्टेभ्योवेति पक्षान्तरं दर्शयति। योगविमुखास्तु अरिष्टेभ्यो दीपनिर्व्वाणगन्धग्रहणासामर्थ्यादिरूपेभ्य स्तत्तद्बाह्यलक्षणेभ्यो वा एव सन्निहितमरणं जानाति योगपथा-रोहणायेति ॥ २२ ॥

এই সূত্রে অপরান্তজ্ঞানরূপা বিভূতি বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—কর্ম্ম সোপক্রম এবং নিরুপক্রম, তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে অপরান্তজ্ঞানরূপা বিভূতি লাভ হয়। অরিষ্টসমূহ দ্বারাও সন্নিহিত মরণ কাল জানিতে পারা যায়।

প্রারব্ধ কর্ম্ম দ্বিবিধ,—সোপক্রম এবং নিরুপক্রম। যে কর্ম্মগুলির ফল ভোগ হইতেছে তাহা সোপক্রম, আর যে কর্ম্মগুলির ফল-ভোগ এখনও আরম্ভ হয় নাই তাহা নিরুপক্রম নামে অভিহিত হয়। তাহাতে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ দ্বিবিধ প্রারব্ধ কর্ম্মে সংযম প্রয়োগ করিলে অপরান্ত জ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয়। অপরান্ত শব্দের অর্থ মৃত্যু, তাহা যে জ্ঞানই অর্থাৎ "আমিই"—অন্য কিছু নহে,

এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতির নাম অপরান্ত জ্ঞান। ইতিপূর্ব্বে জন্মও যে জ্ঞানই, তাহা বলা হইয়াছে, আর এই সূত্রে মৃত্যুরও জ্ঞানস্বরূপতা বর্ণিত হইল। গীতাশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—অমৃত এবং মৃত্যু উভয়রূপেই আমি। "আমিই মৃত্যুরূপে প্রকাশিত হই" এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভবের নামই অপরান্তজ্ঞানরূপা বিভূতি। মুখে সহস্রবার বলিলেও ইহা লাভ হয় না। যথানিয়মে প্রারব্ধকর্ম্ম সমূহ অবলম্বনে ধারণা ধ্যান ও সমাধিরূপ সংযমপ্রয়োগেই উহা প্রত্যক্ষ হয়। প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসান ক্ষণই মৃত্যু নামক সংস্কার। সেই সংস্কার যে জ্ঞানই অর্থাৎ আমিই, ইহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সোপক্রম এবং নিরুপক্রম কর্ম্ম-সংস্কারগুলিতে সংযমপ্রয়োগ আবশ্যক; অন্যথা কর্ম্মের অবসান প্রত্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সে যাহা হউক, এই বিভূতি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত "অভিনিবেশ" নামক ক্লেশের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার আশা নাই; তাই মুমুক্ষু যোগিগণ এই অপরান্তজ্ঞানরূপা বিভূতির জন্য অর্থাৎ মৃত্যুর স্বরূপ পরিচয়ের জন্য প্রাণপণ প্রযত্ন করিয়া থাকেন।

মহর্ষি পতঞ্জলি দেব এই সূত্রে "অরিষ্টেভ্যোবা" এই বাক্যটীর দ্বারা আর একটী প্রয়োজনীয় বিষয়ও ব্যক্ত করিলেন। যাহারা যোগী নহে, তাহারাও যদি মৃত্যুর আসন্নকালটী জানিতে পারে, তবে তাহাদের পরম মঙ্গলই সাধিত হয়। মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিলে মানুষমাত্রেরই যাবতীয় বৈষয়িক কর্ম্ম ও চিন্তা পরিত্যাগ করা এবং পরমেশ্বরে চিত্ত সমাহিত করিতে চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। মৃত্যুকালেও যদি ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়, অথবা ভগবৎস্মরণ করিবার সামর্থ্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, মুক্তি অথবা পরজন্মে মুক্তির যোগ্যতা নিশ্চয়ই লাভ হইয়া থাকে। ঋষি এই উদ্দেশ্যেই বলিলেন—অরিষ্টসমূহদ্বারাও অপরান্ত বিষয়ক জ্ঞান হয়। এস্থলে অপরান্ত-জ্ঞান শব্দের অর্থ—মৃত্যুর আসন্নকাল জানিতে পারা, আর অরিষ্ট শব্দের অর্থ—আসন্ন মৃত্যুসূচক লক্ষণ।

এস্থলে পাঠকগণের অবগতির জন্য কতকগুলি অরিষ্ট লক্ষণ বলা হইতেছে। সাধারণতঃ অরিষ্ট তিন প্রকার, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। দৈহিক বা মানসিক বিকারের নাম আধ্যাত্মিক অরিষ্ট। যথা—কর্ণবিবরদ্বয় রুদ্ধ করিয়া অন্তর্নির্ঘোষ শুনিতে না পাওয়া, দীপনির্ব্বাণগন্ধ না পাওয়া, সুহৃদের হিতোপদেশশ্রবণে অনিচ্ছা, অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখিতে না পাওয়া, অঙ্গুলিদ্বারা সম্পিষ্ট নেত্রে জ্যোতির্দর্শন না হওয়া, মলমূত্র বমন করা বা তাদৃশ বমনের স্বপ্ন দেখা ইত্যাদি।

অমানুষ-সত্ত্বাদি-দর্শন প্রভৃতিকে আধিদৈবিক অরিষ্ট কহে। যথা—যমদূতাদি বিকট জীব দর্শন, আকাশে ইন্দ্রজালতুল্য গন্ধর্ব্ব নগরাদি দর্শন ইত্যাদি। তীব্র অভিসম্পাত প্রভৃতিও আধিদৈবিক অরিষ্ট মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। কপোত গৃধ্র কাক পেচক প্রভৃতি পক্ষীর মস্তকোপরি পতন, স্বপ্নে মহিষারোহণ প্রভৃতি আধিভৌতিক অরিষ্ট নামে খ্যাত।

পূর্ব্বোক্ত সকল অরিষ্টই যে প্রত্যেক আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির নিকট প্রকাশ পাইবে তাহা নহে, দুইটী একটী বা ততোধিক লক্ষণ কাহারও প্রকাশ পাইতে পারে। যাহা হউক, কোনও একটীমাত্র অরিষ্ট অর্থাৎ আসন্নমৃত্যুসূচক কোন একটীমাত্র লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই মনুষ্যের কাশীবাস বা যোগাবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কাশীনামক নগরে বাস করাই যথার্থ কাশীবাস নহে; * এ বিষয়ে আচার্য্য প্রোক্ত একটী স্তুতিবাক্যের উল্লেখ করা যাইতেছে :—

মনো নিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ
সা তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা চ।
জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা
সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা॥

---

* নিজবোধরূপ স্বপ্রকাশ ক্ষেত্রে অবস্থান করাই যথার্থ কাশীবাস।

मैत्र्यादिषु वलानि ॥ २३ ॥

अथ मानसिक-वलरूपां विभूतिमाह मैत्रीति। मैत्र्यादिषु मैत्री-करुणामुदितोपेक्षासु संयमप्रयोगादिति शेषः। वलानि मैत्र्यादि-रूपाणि ज्ञानमयानि समायान्ति। शान्तिलिप्सूनामियमेव विभूति-रिति ॥ २३ ॥

এই সূত্রে ঋষি মানসিক বলরূপা বিভূতি বর্ণনা করিতেছেন—মৈত্র্যাদি বিষয়ে সংযম প্রয়োগ করিলে মৈত্র্যাদিরূপ বল আবির্ভূত হয়। মৈত্র্যাদি শব্দের অর্থ মৈত্রী করুণা মুদিতা এবং উপেক্ষা। সুখ দুঃখ পুণ্য এবং অপুণ্য বিষয়ে যথাক্রমে মৈত্রী করুণা মুদিতা এবং উপেক্ষা অবলম্বন করিবার উপদেশ ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। চিত্তের ঐ সকল বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া বারংবার সংযম প্রয়োগ করিলে উহারা সম্যক্ পরিপুষ্টি লাভ করে। যোগী যখন দেখিতে পায়—তাহার স্বভাবই মৈত্র্যাদিময় হইয়া পড়িয়াছে, তখনই সে বুঝিতে পারে—মৈত্র্যাদিবল লাভ হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মানসিক বল আর কিছু নাই। এজগতে যাঁহারা যথার্থ শান্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকেও এই বল লাভের জন্যই প্রযত্ন করিতে হইবে। এ প্রযত্ন কখনও একেবারে নিষ্ফল হয় না। যিনি যতটুকু প্রযত্ন করিবেন, তিনি ততটুকু বল নিশ্চয়ই লাভ করিতে পারিবেন। সে যাহা হউক, এই মৈত্র্যাদিরূপ চিত্তের বলরূপেও যে জ্ঞানই প্রকাশিত অর্থাৎ আমিই যে মৈত্রী করুণা প্রভৃতি শান্তিময়ী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছি, ইহা প্রত্যক্ষ হইলেই সাধক মৈত্র্যাদি বলকেও আত্মবিভূতি রূপে দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন। জ্ঞানের ঐরূপ শান্তি বিধায়িনী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হইলে মানুষ মাত্রেই আনন্দে উৎফুল্ল না হইয়া থাকিতে পারে

না। তখন মানুষ কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন :—

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥

———

वलेषु हस्तिवलादीनि ॥ २४ ॥

शारीरिक वलरूपां विभूतिमाह वलेष्विति। वलेषु हस्तिवैनतेय प्रभृतीनां शारीरिक-सामर्थ्येषु संयमप्रयोगादिति शेषः। हस्तिवलादीनि हस्तिवैनतेय-प्रभृतीनां तुल्यं वलं लभन्ते कामकामिनः, मुमुक्षवस्तु वलं यत् शारीरिकं तदपि ज्ञानमेवाहमेवेति पश्यन्ति य-मेव विभूतिः ॥ २४ ॥

———

এই সূত্রে শারীরিক বলরূপা বিভূতির বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—হস্তী, বৈনতেয় প্রভৃতির বলে সংযম প্রয়োগ করিলে হস্তি-বৈনতেয়-প্রভৃতির তুল্য বল লাভ হয়। যাহারা কাম-কামী, তাহারা জগতের ধন বা খ্যাতির জন্যই ঐরূপ বল লাভের প্রযত্ন করিয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা ঐরূপ শারীরিক বলকেও জ্ঞানরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। "আমিই ত শারীরিক বলরূপেও প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছি" এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতির নামই শারীরিক বলরূপা বিভূতি। যে ব্যক্তির মানসিক বা শারীরিক বল অর্জ্জিত হয় নাই, সে উহাকে আত্মবিভূতিরূপে কখনও দর্শন করিতে পারে না, সেই জন্যই মৈত্র্যাদি বলে এবং হস্তি-বৈনতেয় প্রভৃতির বলে সংযম প্রয়োগ পূর্ব্বক তাদৃশ বল অর্জ্জন করিয়া লইবার উপদেশ আছে। ঐরূপ বল অর্জ্জন করিবার জন্য কিছুকাল ধরিয়া নিত্য নিয়মিতভাবে সংযম

প্রয়োগ করিতে হয়। এক দিন একবার মাত্র সংযম করিলে উহা লাভ হয় না। যদিও মুমুক্ষু যোগিগণের পক্ষে শারীরিক বল অর্জ্জনের বিশেষ কোন উপযোগিতা নাই, তথাপি মানসিক বল অর্জ্জনের উপদেশের সঙ্গেই ঋষি শারীরিক বলেরও উপায় নির্দ্দেশ করিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—এই যোগশাস্ত্র চতুর্ব্বর্গসাধক; সুতরাং যাঁহারা অর্থ-কামসেবী, তাঁহারাও এই শাস্ত্র হইতে অভীষ্ট-লাভের অব্যর্থ উপায়সমূহ পাইতে পারিবেন। যদিও শরীর ক্ষণভঙ্গুর তথাপি দুর্ব্বল শরীর অশেষ প্রকার দুঃখ আনয়ন করে; তাই সাধক অসাধক সকলেরই শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখা প্রয়োজন। কি উপায়ে দেহকে বলশালী করা যায়, তাহাও ঋষিবাক্য হইতেই পাওয়া যায়। সে যাহাহউক আমরা আত্মবিভূতির দিক দিয়াই আলোচনা করিতেছিলাম। শারীরিক ও মানসিক বল যে জ্ঞানই অর্থাৎ "আমিই" এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতিই বিভূতি।

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্ট-জ্ঞানম্ ॥ ২৫ ॥

সূক্ষ্মাদিবস্তু জ্ঞানরূপাং বিভূতিমাচষ্টে প্রবৃত্তীতি। প্রবৃত্ত্যালোক-ন্যাসাৎ প্রবৃত্তিরূপা বিষয়বতী সৈবালোকঃ জ্ঞানময়ত্বাদিতি ভাবঃ। তস্য ন্যাসাদভিমতেষু প্রয়োগাৎ, সূক্ষ্মমাত্রাদিরূপং ব্যবহিতং ব্যবধানেনাবস্থিতং, বিপ্রকৃষ্টং দূরবর্ত্তি যদ্বস্তু, তজ্জ্ঞানমেবাহমেব নান্যৎ। যদ্বা সূক্ষ্মত্ব-ব্যবহিতত্ব-বিপ্রকৃষ্টত্বরূপেণ যদায়াতি প্রতীতি-বিষয়তাং তদপি জ্ঞানমেবাহমেবেতি বিভূতিরাবির্ভবতি। ত্রৈবর্গিকাস্তু স্বমহত্ত্ব-খ্যাপনায় ধনায় বা সূক্ষ্মাদিবস্তুবিবরণং যথাপ্রতিভং কীর্ত্তয়ন্তি ॥২৫॥

এই সূত্রে সূক্ষ্মাদি-বস্তু-জ্ঞানরূপা বিভূতি বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—প্রবৃত্ত্যালোক ন্যাস হইতে সূক্ষ্ম ব্যবাহিত এবং বিপ্রকৃষ্ট বস্তু-জ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয়। প্রবৃত্তি—বিষয়বতী প্রবৃত্তি। ইহার বিষয় ইতি পূর্ব্বে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। সেই বিষয়বতী প্রবৃত্তিই আলোকস্বরূপ; যেহেতু উহা জ্ঞানময়—সর্ব্ব প্রকাশক। ঐ আলোক ন্যাস করিয়া অর্থাৎ অভিমত বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া সূক্ষ্মাদি-বস্তু-জ্ঞানরূপা বিভূতি লাভ করা যায়। সূক্ষ্মশব্দের অর্থ—আকাশাদির ন্যায়। ব্যবহিত শব্দের অর্থ—ব্যবধানে অবস্থিত এবং বিপ্রকৃষ্ট শব্দের অর্থ—দূরবর্ত্তী। এই যে সূক্ষ্মাদি বস্তু, ইহারাও যে জ্ঞানমাত্রই অর্থাৎ "আমিই যে ঐরূপ সূক্ষ্ম ব্যবহিত বা বিপ্রকৃষ্ট বস্তু আকারে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছি,"ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করাই বিভূতি। অথবা ঐ ঋষিবাক্যটীর অন্যপ্রকার অর্থও হইতে পারে—সূক্ষ্মত্ব ব্যবহিতত্ব এবং বিপ্রকৃষ্টত্ব রূপে যাহা প্রতিনিয়ত আমাদের প্রতীতি বিষয় হয়, তাহাও জ্ঞানই অর্থাৎ আমিই। "আমিই সূক্ষ্মত্বাদিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিয়াছি", এই প্রকার প্রত্যক্ষ অনুভূতিই বিভূতি। উহাই আত্মমহিমা—আত্মলীলা। এই বিভূতি লাভ হইলে যোগী অচিরে বৈরাগ্য লাভে সমর্থ হইতে পারেন।

যাঁহারা ত্রৈবর্গিক, তাঁহারা স্বকীয় মহত্ব খ্যাপনের জন্য অথবা ধনের আশায় ঐরূপ সূক্ষ্মাদি বস্তুর বিবরণ স্ব স্ব প্রতিভানুসারে অবগত হইয়া অন্যের নিকট কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ ॥২৬॥

অথ ভুবনজ্ঞানবিভূতিমাহ ভুবনেতি। সূর্য্যে দেবতায়াং সংযমাৎ ভুবনজ্ঞানং ভুবনমিদং যাবৎপ্রতীতিবিষয়ং জ্ঞানমেবাত্মৈব ভুবনরূপেণ প্রকাশিত ইতি প্রত্যক্ষানুভবরূপা বিভূতিরাবির্ভবতি সমূল-

মুক্তেস্তু সংসারাসক্তিমিতিভাবঃ। সূর্য্যস্য ভুবনসবিতৃত্বাত্তত্রৈব সংযমো ভুবনজ্ঞানায়ালম্।

কিঞ্চ ভুবনানি চতুর্দ্দশ সপ্তোর্দ্ধলোকা মুমুক্ষুতো ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠান্তাঃ, সপ্তচাধোলোকা বদ্ধতোজড়ান্তা ইত্যেতৎ সর্ব্বং জ্ঞানমেবাহমেবেতি প্রত্যক্ষানুভূতিরেব ভুবনজ্ঞানরূপা বিভূতিরত্রাপি সূর্য্যে মহাপ্রাণ-দেবতায়াং সংযমো যুক্তঃ "প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতমিতি শ্রুতিঃ॥ ২৬॥

এইসূত্রে ভুবনজ্ঞানরূপা বিভূতি বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—সূর্য্যে সংযম হইতে ভুবন-জ্ঞান-রূপা বিভূতি আবির্ভূত হয়। এস্থলে সূর্য্য শব্দের অর্থ—সূর্য্যদেবতা। যে বিশিষ্ট চৈতন্য সূর্য্যরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি সূর্য্যদেব। তাঁহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে এই পরিদৃশ্যমান ভুবন যে জ্ঞানমাত্রই ইহা প্রত্যক্ষীভূত হয়। যে জীবের যতদূর প্রতীতি বিষয়তা, তাহার পক্ষে ততটাই ভুবন। "এই ভুবনরূপে যে আমিই প্রকাশিত হইয়াছি," ইহার প্রত্যক্ষতা আসিলেই ভুবন জ্ঞানরূপা বিভূতি লাভ হয়। সূর্য্য জগৎ প্রসবিতা; তাই সূর্য্যে সংযম করিলেই ভুবনের যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহা উদ্ভাসিত হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে চতুর্দ্দশ ভুবনের বিবরণ শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আছে। ঊর্দ্ধ সপ্তলোক এবং অধঃ সপ্তলোক। মুমুক্ষু মুমুক্ষুতর মুমুক্ষুতম ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মবিদবর ব্রহ্মবিদ্‌বরীয়ান এবং ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ এই সপ্ত ঊর্দ্ধ লোক নামে খ্যাত। বদ্ধ বদ্ধতর বদ্ধতম মূঢ় মূঢ়তর মূঢ়তম এবং জড়, এই সপ্ত অধোলোক সপ্ত পাতাল নামে খ্যাত। এই চতুর্দ্দশ লোকের নাম চতুর্দ্দশ ভুবন। যাহা জ্ঞানরূপে অহংরূপে নিয়ত প্রকাশিত তিনিই যে এই চতুর্দ্দশ ভুবনরূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন, ইহার প্রত্যক্ষানুভূতিই ভুবনজ্ঞানরূপা বিভূতি। এই বিভূতিলাভ

হইলে যোগীর সংসারাসক্তি চিরতরে সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ভুবন সম্বন্ধে মাত্র ভূগোলশাস্ত্র বর্ণিত বিবরণ অবগত হওয়াকে মুমুক্ষু যোগিগণ কখনও আত্মবিভূতিরূপে গ্রহণ করেন না। যাহাতে আত্মার মহিমা প্রকাশিত না হয়, যাহাতে আত্মলীলা স্ফুরিত হইয়া না উঠে, তাহা কখনও যোগীর পক্ষে বিভূতিরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ ভুবনজ্ঞানরূপা বিভূতি লাভের জন্যও সূর্য্যেই সংযম প্রয়োগ করা আবশ্যক। সূর্য্য প্রাণের অধিপতি দেবতা। আমাদের ব্যষ্টি প্রাণশক্তি সমূহ যে সমষ্টি প্রাণের কল্পিত বিন্দু মাত্ররূপে প্রতীতি গোচর হয়, সেই মহাপ্রাণ দেবতাই সূর্য্য, তাঁহাতে সংযম প্রয়োগ করিলেই চতুর্দ্দশ ভুবনরূপে যাহা প্রকাশিত তাহার স্বরূপ উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে; যেহেতু ভুবন প্রাণেরই বিভিন্ন বিকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এবিষয়ে শ্রুতিও আছে—ত্রিদিবে অর্থাৎ ত্রিভুবনে যাহা কিছু "আছে" রূপে প্রতীয়মান হয়, এসকলই প্রাণদেবতার বশে অবস্থিত। সুতরাং ভুবনের স্বরূপ অবগত হইতে হইলে প্রাণের দেবতা সূর্য্যেই সংযম প্রয়োগ করিতে হইবে।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে ত্রিভুবন, চতুর্দ্দশ ভুবন এবং কেবল ভুবন ইহার মধ্যে বিভিন্নতা কি? তাহার উত্তর এই যে—ভূঃ ভুবঃ এবং স্বঃ, এই তিন লোককেই ত্রিভুবন বলে। সপ্তপাতাল ভূর্লোকের অন্তর্গত, আর সপ্তস্বর্গ স্বর্লোকের অন্তর্গত। এইরূপ ত্রিভুবনই চতুর্দ্দশ ভুবন নামে কথিত হয়। আবার এই চতুর্দ্দশ ভুবনের সমষ্টিও কেবল ভুবন শব্দেই পরিচিত হইয়া থাকে। যাহা আলোকিত হয়—প্রকাশিত হয় অর্থাৎ দৃশ্যরূপে পরিচিত হয়, তাহার নাম লোক। স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণভেদে দৃশ্যসমূহ তিন প্রকার—ইহারাই ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকনামে খ্যাত। সে যাহা হউক, এই লোকসমূহ যে জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নহে, উহারা যে আত্মারই লীলামাত্র, ইহার প্রত্যক্ষতাই বিভূতি।

———

चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम् ॥२७॥

ताराव्यूहज्ञानरूपां विभूतिमाह चन्द्र इति। चन्द्रे देवतायां संयमादिति शेषः। ताराव्यूहज्ञानम् ताराव्यूहा अश्विन्यादि-सप्तविंशतिसंख्यकास्ते ज्ञानमेवाहमेव नान्यदिति विभूतिराविर्भवति। चन्द्रस्याश्विन्यादि ताराव्यूहैर्नियतसम्बन्धाच्चन्द्रे संयमप्रयोगादेव ताराव्यूहानां स्वरूपं समुद्भासते। अतएवोक्तं नक्षत्राणामहं शशीति ॥ २७ ॥

এই সূত্রে তারাব্যূহ জ্ঞানরূপা বিভূতি বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—চন্দ্রে সংযম হইতে তারাব্যূহজ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয়। চন্দ্র শব্দের অর্থ—চন্দ্র দেবতা; ইনি মনের অধিপতি। ইহাঁতে সংযম প্রয়োগ করিলে তারাব্যূহ যে জ্ঞানই, অর্থাৎ "আমিই" অন্য কিছু নহে, এইরূপ প্রত্যক্ষানুভব হইতে থাকে, ইহাই বিভূতি। অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা প্রভৃতি সপ্তবিংশতি তারাব্যূহ। কতকগুলি ব্যূহবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চন্দ্র দেব ইহাদের সহিত নিয়ত সম্বন্ধ বিশিষ্ট; তাই চন্দ্রে সংযম প্রয়োগ করিলেই তারাব্যূহের স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। গীতাশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—"নক্ষত্র সমূহের মধ্যে আমি শশী"।

জ্ঞান অর্থাৎ "আমিই যে চন্দ্ররূপে নক্ষত্ররূপে উদ্ভাসিত" এইরূপ প্রত্যক্ষানুভূতিই বিভূতি। আশঙ্কা হইতে পারে—পূর্ব্বোক্ত ভুবন জ্ঞানরূপা বিভূতি লাভ হইলেই ত যাবতীয় বস্তুর জ্ঞানরূপতা প্রত্যক্ষ হইয়া যায়, তবে আবার এ সকল বিভূতির পৃথক্ভাবে উল্লেখের প্রয়োজন কি? আর পৃথক্ পৃথক্ স্থানে সংযম প্রয়োগেরই বা সার্থকতা কি? এই আশঙ্কার সমাধান এই যে—সত্য বটে একমাত্র ভুবন জ্ঞানরূপা বিভূতি হইতেই সকল বিভূতির স্বরূপ প্রকাশিত

হইতে পারে; কিন্তু উহা সমষ্টিভাবে—মোটা মুটি ভাবে। প্রত্যেকটী ধরিয়া পৃথক্‌রূপে সংযম প্রয়োগ পূর্ব্বক প্রত্যেকটীর স্বরূপ অবগত হইতে না পারিলে পরবৈরাগ্যলাভ দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়ে। যাহাতে সংযম প্রয়োগ করা হয়, তাহার স্বরূপ·ত উদ্‌ভাসিত হয়ই, তদ্‌ভিন্ন উহার সহিত যাহাদের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহাদের স্বরূপও প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আমাদের চিত্ত বিশেষভাবে যে সকল পদার্থের সহিত একান্তভাবে সম্বন্ধ, সেই সকল পদার্থের প্রত্যেকটীকে ধরিয়া উহাদের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিলে তবে চিত্তের ঐ বদ্ধভাব ছাড়িয়া যায়। নচেৎ শুধু স্থূলভাবে যদি জানিয়া রাখা যায় যে "জ্ঞেয় বস্তু মাত্রই আমি বা জ্ঞান" তবে তাহাতে চিত্তের আসক্তি কিছুতেই দূরীভূত হয় না। তাই ঋষি বিশেষ বিশেষ পদার্থের স্বরূপ পরিচয়ের জন্যই বিশেষ বিশেষ বিভূতির উল্লেখ করিলেন।

আর একটী কথা আছে—যখন কোন যোগীর বিভূতি লাভের যোগ্যতা আসে, তখন সে যতদূর পারে বিশেষ বিশেষ ভাবেই—পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই ঐ বিভূতি দর্শনের জন্য লালায়িত হয়। যিনি আমার পরম প্রিয়তম, যিনি আমার প্রাণেশ পরমেশ, তাঁহার লীলা যখন প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, তখন সাধক ব্যষ্টি ভাবে সমষ্টিভাবে বা এতদুভয় ভাবেই লীলা দর্শনের জন্য ব্যাকুল না হইয়া থাকিতে পারে না। যিনি আমার চির বাঞ্ছিত, যিনি আমার পরম প্রেমের আস্পদ, তাঁহাকে আমি যতভাবে যতরূপেই দেখি না কেন, আমার তৃপ্তি কি মিটিতে পারে? "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল।"

দেখ সাধক! পাতঞ্জলের ঋষিও পরমেশ্বরের লীলা বর্ণন করিতে গিয়া আনন্দে উচ্ছাসে সর্বত্র তাঁহারই বিভূতি দর্শনের উপদেশ ও কৌশল শিক্ষা দিতেছেন। কেবল সমষ্টিভাবে নহে, ব্যষ্টিভাবেও যতদূর সম্ভব প্রত্যেকটীর মধ্যে প্রিয়তমের অপূর্ব্ব বিকাশ অপূর্ব্ব বিলাস দেখাইবার জন্য ঋষি কত প্রয়াস পাইয়াছেন। ধন্য সেই ঋষি, যিনি আমাদের মত অজ্ঞানান্ধ জীবের পক্ষেও জ্ঞানময় পরমেশ্বরের

আনন্দলীলা দর্শনের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। এস সাধক, আমরা ঋষি-বাক্যের পুনরুক্তি বা অন্য কোনও প্রকার দোষের বিচার করিতে না গিয়া তিনি কি তত্ত্ব আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহাই দেখিতে চেষ্টা করি, তাহারই আস্বাদন করিতে যত্নবান হই ; তাহাতে একদিকে যেমন ঋষিবাক্যের যথার্থ সফলতা সম্পাদন হইবে অন্যদিকে তেমনই আমাদিগের জীবনও দিন দিন ধন্য হইয়া উঠিবে।

ধ্রুবে তদ্গতিজ্ঞানম্ ॥২৮॥

নক্ষত্রগতি-জ্ঞানরূপামাহ বিভূতিং ধ্রুব ইতি। ধ্রুবে ধ্রুবাখ্যে নক্ষত্রবিশেষে সংযমাদিতি শেষঃ। তদ্গতিজ্ঞানং তেষাং তারাব্যূহানাং গতিবৃত্তবদৈশ-সম্বন্ধঃ সাপি জ্ঞানমেবাহমেব নান্যদিতি প্রত্যক্ষরূপা বিভূতিরাবির্ভবতি। ত্রৈবর্গিকা জ্যোতির্বিদস্তারাব্যূহানাং গতি-পরিমাণ-নির্ণয়ায় যতন্তে। সর্ব্বাস্তারা ধ্রুবেণ বদ্ধা গতিমন্ত্য ইতি ধ্রুবে সংযমাৎ তদ্গতিজ্ঞানমুক্তম্ ॥২৮॥

এইসূত্রে নক্ষত্রগতি-জ্ঞানরূপা বিভূতি বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—ধ্রুবনক্ষত্রে সংযম প্রয়োগ করিলে তদ্গতি-জ্ঞানরূপা বিভূতি লাভ হয়। তদ্গতি শব্দের—অর্থ তারাব্যূহসমূহের গতি। তাহাও জ্ঞানই, অন্য কিছু নহে। জ্ঞান অর্থাৎ "আমিই" যে অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র সমূহের গতিরূপেও প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছি, এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতির নাম নক্ষত্রগতিজ্ঞানরূপা বিভূতি। মুমুক্ষু যোগিগণ কেবল তারা ব্যূহরূপ নহে, ঐ সুদূরস্থিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিরূপেও আত্মবিভূতি

দর্শন করিয়া তাহাতে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। যাঁহারা ত্রৈবর্গিক—জ্যোতির্ব্বিদ, তাঁহারা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তারাসমূহের গতির পরিমাণ নিরূপণ করিবার জন্যই যত্ন করিয়া থাকেন। সমস্ত তারাই ধ্রুবনক্ষত্রের সহিত সম্বন্ধ থাকিয়া গতিশীল হয়, এই জন্যই ঋষি নক্ষত্রগতির স্বরূপ অবগতির জন্য ধ্রুবনক্ষত্রে সংযম-প্রয়োগের উপদেশ দিয়াছেন।

नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम् ॥२८॥

अथाध्यात्मिकीर्विभूतिर्विजिज्ञापयिषयादौ कायव्यूहज्ञानरूपामाह विभूतिं ·भौति ॥ नाभिचक्रे मणिपुराख्येऽनुभूतिकेन्द्रविशेषे संयम-प्रयोगादिति शेषः। कायव्यूहज्ञानं वातादिदोषत्रयसमन्वितस्य सप्त-धातुकस्य हृत्पिण्ड-पक्काशयादि-विविधयन्त्रान्वितस्य प्रत्यक्षीभूतस्यास्य-स्थूलशरीरस्य यथार्थं नाम कायव्यूह इति स चासौ ज्ञानञ्चेति। ज्ञानमिवात्मैव स्थूलशरीराकारेण प्रकाशते इति प्रत्यक्षीभवति योगिनामियमेवविभूतिः। त्रैवर्गिकास्तु भिषजः शारीरसंस्थानस्य दोष-गुणादि-निरूपणाय यतन्त इति ॥२८॥

এ পর্য্যন্ত বাহ্য বিভূতির বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে, অধুনা আধ্যাত্মিক বিভূতিসমূহ বিজ্ঞাপিত হইবে। কায়ব্যূহজ্ঞানরূপা বিভূতি বর্ণিত হইতেছে। এই সূত্রে ঋষি বলিলেন—নাভিচক্রে সংযম করিলে কায়ব্যূহ জ্ঞানরূপা বিভূতিলাভ হয়। নাভিচক্র শব্দে নাভিদেশের সমসূত্রে মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থিত অনুভূতি-কেন্দ্রবিশেষকে বুঝা যায়; ইহার

প্রচলিত নাম মণিপুর। এইস্থানে সংযম প্রয়োগ করিলে কায়ব্যূহ-জ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয়। বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মারূপ ত্রিদোষ-সমন্বিত রসরক্তাদি-সপ্তধাতু-বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড-পক্বাশয়-প্রভৃতি-বিবিধ-যন্ত্র-বিশিষ্ট এই প্রত্যক্ষীভূত স্থূল শরীরের যথার্থ নাম কায়ব্যূহ। ইহাও জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, অর্থাৎ "আমিই স্থূল শরীরের আকারে প্রতীয়মান হইতেছি," এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ হইলেই বুঝিতে পারা যায়—কায়ব্যূহ-জ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হইয়াছে। মুমুক্ষু যোগিগণ এই অপূর্ব্ব বিভূতি লাভের জন্য যথাশক্তি প্রযত্ন করিয়া থাকেন। এই বিভূতিলাভ না হইলে—এই স্থূল শরীর যে জ্ঞানমাত্রই এইরূপ অনুভূতি লাভ না হইলে, সাধকের কৈবল্যপদবীতে আরোহণ করা একান্তই অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাহারা ত্রৈবর্গিক যাহারা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাহারা স্থূল শরীরের দোষগুণাদি বিকার নিরূপণ করিবার জন্য এইরূপ সংযম-প্রয়োগ করিতে যত্ন করেন। যতক্ষণ মানুষের দেহাত্মবোধ সুদৃঢ় থাকে, ততক্ষণ তাহার মন স্বভাবতঃই মণিপুর প্রভৃতি নিম্নস্থিত তিন চক্রে অবস্থান করে; তাই ঋষি কায়ব্যূহজ্ঞানরূপা বিভূতির জন্য নাভিচক্রে সংযম-প্রয়োগের উপদেশ দিয়াছেন।

कण्ठकूपे क्षुत्-पिपासा-निवृत्तिः ॥३०॥

• विभूत्यन्तरमाह कण्ठेति। कण्ठकूपे उपजिह्वाधस्तादिते विवर विशेषे संयमादिति शेषः क्षुत्पिपासानिवृत्तिर्भवति, यावत् संयमं तावत्तु चिराय। एवञ्च क्षुत्पिपासारूपेण प्रतिदिनपरिचिता वृत्तिद्वयी ज्ञानमेवाहमेव नान्यदिति प्रत्यक्षानुभवरूपा विभूतिराविर्भवति मुमुक्षूणां

त्रैवर्गिकास्तु जिह्वातन्तुं छित्वा परिवर्द्धितरसनया खेचरीनाममुद्रया तद्विवरमाच्छाद्य क्षुत्पिपासानिवृत्तिं करोति ॥७०॥

এই সূত্রে অপর একটী বিভূতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—কণ্ঠকূপে সংযম প্রয়োগ করিলে ক্ষুৎপিপাসা-নিবৃত্তিরূপা বিভূতি লাভ হয়। কণ্ঠকূপ শব্দের অর্থ উপজিহ্বা দ্বারা আচ্ছাদিত বিবর-বিশেষ। তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি হয়। যতক্ষণ সংযম প্রয়োগ করা যায় ততক্ষণই ঐ ক্ষুধা ও পিপাসারূপ বৃত্তিদ্বয় নিরুদ্ধ থাকে; কিন্তু চিরকালের জন্য উহাদের নিবৃত্তি হয় না। যাঁহারা মুমুক্ষু যোগী তাঁহারা প্রতিদিন-পরিচিত ঐ দুইটী বৃত্তিকে জ্ঞানরূপেই—আত্মবিভূতিরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। আত্মবোধরূপা জননীই যে সর্ব্বভূতে ক্ষুধারূপে এবং তৃষ্ণারূপে সংস্থিতা, ইহার প্রত্যক্ষ অনুভব হইলে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার পৃথকৃত্ব-প্রতীতি চিরকালের তরে নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইহাই যথার্থ ক্ষুৎপিপাসা-নিবৃত্তিরূপা বিভূতি। যাহাদের উক্তরূপ বিভূতিলাভ হয় নাই, এরূপ সাধারণ জনগণ ক্ষুধা ও পিপাসাকে নিতান্ত আগন্তুক ব্যাপার রূপেই জানে ও তাহার প্রতীকারের জন্য জীবনব্যাপী দুর্ব্বহ কর্ম্মভার বা চিন্তার ভার বহন করিয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বরপ্রণিধানকারী যোগিগণ "অশনায়া-দ্যতীত" আত্মাকেই অশনেচ্ছার মধ্যদিয়া ও পিপাসার মধ্যদিয়া বৃত্তিসারূপ্য-প্রাপ্তরূপে প্রত্যক্ষ করেন এবং এরূপ দুর্ব্বহ কর্ম্ম ও চিন্তার ভার হইতে চির-পরিত্রাণ লাভ করেন।

যাঁহারা ত্রৈবর্গিক তাঁহারা জিহ্বার অগ্রভাগস্থিত বন্ধন-তন্তু ছিন্ন করিয়া খেচরী নামক মুদ্রার সাহায্যে কণ্ঠকূপের আচ্ছাদনপূর্ব্বক ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিয়া থাকেন।

কূর্ম্মনাড্যাং স্থৈর্য্যম্ ॥৩১॥

ইয়মপরা বিভূতিঃ কূর্ম্মেতি। কূর্ম্মনাড্যাং কূর্ম্মাখ্যে নাড়ীবিশেষে, নাড়ী নাম শক্তিপ্রবাহো নতু স্থূলস্নায়ুমাত্রম্। হৃদয়দেশস্থো দ্বন্দ্বোদ্বেলন-স্বভাবঃ শক্তিপ্রবাহো যস্মিন্ কূর্ম্মবৎ সঙ্কুচিতে স্নায়ুমণ্ডলে সঞ্চরতি সা কূর্ম্মনাড়ীত্যাখ্যায়তে, তত্র শক্তিপ্রবাহে সংযমাদিতি শেষঃ। স্থৈর্য্যম্ চেতসঃ কায়স্য চ স্থিরতা ভবতি। এবঞ্চ স্থৈর্য্যস্যাপি জ্ঞানরূপত্বং প্রত্যক্ষীভূতং ভবতি যোগিনামিয়মেব বিভূতিঃ। নৈসর্গিকাস্তু হঠেন তথাবিধং স্থৈর্য্যমাত্রং দর্শয়তি ॥৩১॥

এই সূত্রে আর একটী বিভূতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—কূর্ম্মনাড়ীতে সংযম-প্রয়োগ করিলে স্থৈর্য্যরূপা বিভূতি লাভ হয়। নাড়ী শব্দের অর্থ স্থূল স্নায়ুমাত্র নহে ; স্নায়ু অবলম্বন করিয়া যে শক্তি-প্রবাহ চলিত হয়, সেই শক্তিপ্রবাহকেই নাড়ী কহে। সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বের আঘাতে উদ্বেলন-স্বভাব হৃদয়দেশে অবস্থিত শক্তিপ্রবাহ যে স্নায়ুমণ্ডলকে অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হয়, সেই স্নায়ুমণ্ডল অনেকটা কূর্ম্মের আকৃতির ন্যায় সঙ্কুচিত আকার বিশিষ্ট ; তাই ইহাকে কূর্ম্মনাড়ী বলা হয়। ইহাতে অর্থাৎ সেই শক্তিপ্রবাহে সংযম-প্রয়োগ করিলে শরীরের এবং চিত্তের অস্বাভাবিক স্থৈর্য্য লাভ হয়। মুমুক্ষু যোগিগণ এই স্থৈর্য্য-প্রতীতিকেও জ্ঞানরূপে অর্থাৎ আত্মবিভূতিরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি আমার পরম প্রিয়তম আত্মা, তিনিই যে স্থৈর্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া যোগিগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়েন। ঐ সময়ে জগতের সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে তাহাদের চিত্তের বা শরীরের বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হয় না। কেবল

শরীর ও মনের স্থৈর্য্য মাত্রই কখনও বিভূতি-পদবাচ্য হয় না। যখন স্থৈর্য্যের মধ্য দিয়া "বিমলমচলমলং সর্ব্বধীসাক্ষিভূতম্" বস্তুর প্রত্যক্ষতা আসিতে থাকে, তখনই উহা বিভূতিরূপে সাধককে পরমানন্দ প্রদান করে। ত্রৈবর্গিকগণ হঠপ্রক্রিয়াদ্বারা চিত্তকে হৃদয়-দেশস্থ কূর্ম্মনাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া এই স্থৈর্য্য লাভ করেন বটে, কিন্তু তাহা আনন্দহীন একপ্রকার মূঢ় অবস্থা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। অজগর সর্প এবং গোধা প্রভৃতি প্রাণীরও ঐরূপ স্বাভাবিক স্থৈর্য্যসিদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়।

মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনং ॥৩২॥

অপরামাহ মূর্দ্ধেতি। মূর্দ্ধজ্যোতিষি মূর্দ্ধণি যজ্জ্যোতিস্তত্র আজ্ঞাচক্রস্থেঽতীব লোভনীয়ে স্নিগ্ধশ্যামে জ্যোতিষীত্যর্থঃ সংযমাদিতি শেষঃ। সিদ্ধদর্শনং সিদ্ধানাং কপিলাদীনাং ঋষীণাং গুরুপরম্পরাণাং বিভিন্নদৈবদেবীনাঞ্চ সংস্কারানুরূপাণাং দর্শনং ভবতি। এবঞ্চ সিদ্ধানামপি জ্ঞানরূপত্বমাত্মবিভূতিরূপত্বং প্রত্যক্ষীভূতং ভবতি যোগিনামন্যে তু দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরালবর্ত্তিনাং দৈবযোনি-বিশেষাণাং দর্শনার্থং যতন্ত ইতি ॥৩২॥

এই সূত্রে সিদ্ধদর্শনরূপা বিভূতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—মূর্দ্ধ-জ্যোতিতে সংযম করিলে সিদ্ধদর্শন হয়। আজ্ঞাচক্রস্থিত অতীব লোভনীয় স্নিগ্ধ শ্যাম জ্যোতিকে মূর্দ্ধজ্যোতিঃ কহে। তাহাতে সংযম-প্রয়োগ করিলে সিদ্ধদিগের দর্শন লাভ হয়। সিদ্ধ

শব্দে এখানে কপিলাদি ঋষি গুরুপরম্পরা এবং সংস্কারানুরূপ বিভিন্ন দেব-দেবী-মূর্ত্তি বুঝিতে হইবে। যোগীর প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধবর্গের মধ্যে কাহারও কাহারও দর্শন ঘটিয়া থাকে। মুমুক্ষু যোগিগণ ঐ সিদ্ধবর্গকে আত্মবিভূতিরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি জ্ঞানময় গুরু, যিনি পরম প্রিয়তম আত্মা—তিনিই যে আজ্ঞাচক্রস্থিত পরম রমণীয় শ্যামজ্যোতির মধ্য হইতে বিভিন্ন সিদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করেন, এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ হওয়ার নামই সিদ্ধদর্শনরূপা বিভূতি। ত্রৈবর্গিকগণ অন্তরীক্ষস্থিত সূক্ষ্মদেহধারী বিভিন্ন দেবযোনির দর্শনকেই সিদ্ধদর্শনরূপা বিভূতি মনে করিয়া ঐরূপ দর্শন লাভের জন্য যথাসাধ্য প্রযত্ন করিয়া থাকেন। ঐরূপ দর্শন সাময়িক ভাবে অল্প অল্প বিশ্বাস-বৃদ্ধির হেতু স্বরূপ হয় হটে, কিন্তু উহাতে সাধকের বিশেষ কিছু লাভ হয় বলিয়া মনে হয় না; কারণ, ঐসকল মূর্ত্তি কখনও সাধকের অভীষ্ট পূর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। যতদিন আত্মবিভূতিরূপে সিদ্ধমূর্ত্তি সমূহের দর্শন লাভ না হয়, ততদিন সাধকের মুক্তিমার্গ উন্মেষিত হয় না।

প্রাতিভাদ্ বা সর্ব্বম্ ॥৩৩॥

সর্ব্ব-বিভূতিলাভস্য সাধারণোপায়ং দর্শয়তি। প্রাতিভাৎ সংযমাদি-রূপ-নিমিত্তান্তরমনপেক্ষ্য দ্রাগুৎপন্নং নিঃসংশয়িতং জ্ঞানং সবিশেষং প্রতিভা নাম, সা চ বহ্বী বাল্পতরা বা যথা প্রারব্ধং সর্ব্বেষাং বিদ্যত এব। তত্র সংযমাদিতি শেষঃ, প্রাতিভং নাম তারকং জ্ঞানং সমুদেতি। তারয়তি বিজাতীয়-ভেদজ্ঞানরূপাৎ সুদৃঢ়বন্ধনাদিতি তারকং, তস্মাৎ প্রাতিভাৎ তারকজ্ঞানাৎ, বা শব্দঃ পক্ষান্তরং সূচয়তি। সর্ব্বং জ্ঞাত্ব-

মন্মাত্মকমিদং দৃশ্যজাতং জ্ঞানমেবাহমেবেতি প্রত্যক্ষীভবতীয়মেব বিভূতিঃ। ত্রৈবর্গিকাস্তু পার্থিবাভ্যুদয়-সাধনায় প্রাতিভং স্বাং নিযুঞ্জন্তি ॥ ২২ ॥

ইতিপূর্ব্বে বিশেষ বিশেষ বিভূতি লাভের বিশেষ বিশেষ উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে, এই সূত্রে সর্ব্ববিভূতি লাভের সাধারণ উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ঋষি বলিলেন—প্রাতিভজ্ঞান হইতে সকল বিভূতিই লাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত সংযমাদিরূপ কোন নিমিত্তকে অপেক্ষা না করিয়া সহসা উৎপন্ন যে নিঃসন্দিগ্ধ সবিশেষ জ্ঞান, তাহাকে প্রতিভা কহে। এই প্রতিভা যথাপ্রারব্ধ অল্পবিস্তর মানুষমাত্রেরই আছে। সেই স্বকীয় প্রতিভাতে যথাবিধ সংযমপ্রয়োগ করিলে সর্ব্ববিষয়াবগাহিনী নির্ম্মলা বুদ্ধির উদয় হয়, যোগদর্শনের ঋষি ইহাকেই "প্রাতিভ" শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই প্রাতিভজ্ঞানের অন্য নাম তারক-জ্ঞান। বিজাতীয় ভেদজ্ঞানরূপ সুদৃঢ় বন্ধন হইতে পরিত্রাণ করে বলিয়াই ইহাকে "তারকজ্ঞান" বলা হয়। যোগীর নিকট এই প্রাতিভজ্ঞান ঠিক অরুণোদয়ের মতই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধবোধ-স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগের অতি সন্নিহিত হইলেই এই তারকজ্ঞান সমুদিত হয়। ইহার উদয়ে যোগী সকলই জানিতে পারে, অর্থাৎ সর্ব্বরূপে — গ্রাহ্য ও গ্রহণরূপে যাহা কিছু প্রতীতিগোচর হয়, সে সকল যে জ্ঞানমাত্রই—আমিই, এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব হইতে থাকে। মুমুক্ষু যোগিগণের পক্ষে ইহাই প্রাতিভ জ্ঞানরূপা বিভূতি। যাহারা ত্রৈবর্গিক তাঁহারা পার্থিব আভ্যুদয় সাধনের জন্যই স্ব স্ব প্রতিভাকে সম্যক্ নিযুক্ত করিয়া থাকেন। যাঁহার যেরূপ উৎসাহ ও অধ্যবসায়, তিনি তদনুরূপ অভ্যুদয় লাভও করিয়া থাকেন। মানুষমাত্রেরই কোনও না কোন বিষয়ে বিশিষ্ট প্রতিভা থাকে। সেই প্রতিভাকে লক্ষ্য করিয়া

উহাকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিলে এই প্রাতিভ-জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। স্বকীয় প্রতিভায় সংযম প্রয়োগ করা এবং প্রতিভাকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে যথাযথভাবে উপাসনা করা একই কথা। এইরূপ সংযম বা উপাসনার ফলে মানুষ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা লাভ করিয়া ঐহিক অভ্যুদয় এবং পারত্রিক নিঃশ্রেয়স উভয়ই অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। যাঁহারা প্রাক্তন সুকৃতি বশে এরূপ প্রতিভা লইয়াই জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। সকলের সে সৌভাগ্য লাভ হয় না বটে, কিন্তু এই যোগশাস্ত্রোক্ত উপায় অবলম্বনে প্রযত্ন করিলে মানুষ মাত্রেই যে এই প্রাতিভ-জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

হৃদয়ে চিত্তসংবিৎ ॥৩৪॥

অথ পুরুষজ্ঞানপূর্ব্বরূপং সূচয়তি বিভূত্যন্তরকথনেন হৃদয়ে ইতি। হৃদয়ে ব্রহ্মবেশ্মণি দহর-পুণ্ডরীকে হার্দ্দাকাশ ইতি যাবৎ সংযমাদিতি শেষঃ। চিত্তসংবিৎ চিত্তং সংবিদেবেতি প্রত্যক্ষোভবতি। নহ্যস্তি চিত্তনামকং কিঞ্চিদ্ বস্তু, যদস্তি সা সম্বিদেব পরমাত্মৈব, নান্যদিত্যেবমনুভূতি বিভূতি স্বত্তসম্বিন্নাম ॥৩৪॥

এই সূত্রে পুরুষ জ্ঞানের পূর্ব্বরূপ সূচনা করিবার জন্য চিত্তসম্বিৎ নামক বিভূতির উল্লেখ করা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—হৃদয়ে সংযম করিলে চিত্তসংবিৎ হয়। হৃদয় শব্দের অর্থ ব্রহ্মবেশ্ম দহর-পুণ্ডরীক, প্রচলিত ভাষায় ইহাকে হার্দ্দাকাশ বলা যায়। তাহাতে সংযম করিলে চিত্তসংবিৎরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয়। চিত্ত যে সংবিৎমাত্রই বিশুদ্ধবোধমাত্রই—আমিই, অন্যকিছু নহে, এইরূপ প্রত্যক্ষ

অনুভূতিই চিত্তসংবিৎ নামক বিভূতি। এই বিভূতি মাত্র মুমুক্ষু যোগীরই লভ্য, ত্রৈবর্গিকগণ ইহার সন্ধানও পাইতে পারেন না। পর বৈরাগ্যের পথে বিশেষ ভাবে অগ্রসর না হইলে এ সকল বিভূতি আসে না।

सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्कीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम् ॥ ३५ ॥

परमां विभूतिमाह पुरुषज्ञानरूपां सत्त्वेति। सत्त्वं बुद्धिसत्त्वं कृताभिभवरजस्तमोरूपं, पुरुषो द्रष्टा चिद्रूप एतयोरत्यन्तासङ्कीर्णयोरत्यन्तविलक्षणयोरितरेतरानध्यस्तयोरित्यर्थः। प्रत्ययाविशेषः अविद्याकृता याऽभिन्नप्रत्ययः, स एव भोगः। स च परार्थः परेण पुरुषेण [illegible]। तस्मात् तं भोगं विहायेति भावः, स्वार्थसंयमात् स्वप्रकाशे स्वरूपे चिन्मात्रे संयमप्रयोगात्, पुरुषज्ञानं पुरुषविषया प्रज्ञा समुदेति [illegible]। सत्त्वादिह नाम कैवले पुरुषे नान्वेति संशयविपर्ययरहिता प्रज्ञैव पुरुषज्ञानं, ननु पुरुषस्य ज्ञानक्रियाकर्मत्वम् [illegible] तस्य ज्ञस्वरूपस्य; विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति ॥३५॥

এই সূত্রে পুরুষজ্ঞানরূপা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিভূতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—অত্যন্ত অসঙ্কীর্ণ বুদ্ধি ও পুরুষের যে অভিন্ন জ্ঞান, তাহাই ভোগ। ঐ ভোগও পরার্থ; সুতরাং তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বার্থে সংযম প্রয়োগ করিলে পুরুষজ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয়। সূত্রে যে সব শব্দগুলির প্রয়োগ হইয়াছে, উহার অর্থ

বুদ্ধিসত্ত্ব। রজস্তমোগুণকে অভিভূত করিয়া যখন সত্ত্বগুণ সম্যক্ অভিব্যক্তি লাভ করে, তখন তাহার নাম হয় সত্ত্ব বা বুদ্ধিসত্ত্ব। পুরুষ শব্দের অর্থ চিদ্রূপ দ্রষ্টা। এই যে নির্ম্মল বুদ্ধিসত্ত্ব এবং বিশুদ্ধ বোধরূপ পুরুষ, উভয়ই অত্যন্ত অসঙ্কীর্ণ, অর্থাৎ এই দুইটির মধ্যে একটী অন্যটীতে কোন রূপেই অধ্যস্ত হইতে পারে না। প্রকাশ এবং প্রকাশ্য এই উভয়ের পরস্পর অধ্যাস স্বতঃ কোনপ্রকারেই সম্ভব হয় না; তাই ঋষি বলিলেন—"সত্ত্ব পুরুষয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ"। যদিও এই দুইটী অত্যন্ত অসঙ্কীর্ণ, তথাপি ইহাদের অবিশেষ প্রত্যয় হয়, অর্থাৎ সত্ত্ব এবং পুরুষ পরস্পর সঙ্কীর্ণ ভাবেই—মিলিতভাবেই প্রতীতির বিষয় হয়। অবিদ্যাবশে—পুরুষের স্বরূপ জ্ঞান না হওয়ার জন্যই অত্যন্ত অসঙ্কীর্ণ বুদ্ধি ও পুরুষের সঙ্কীর্ণ ভাব প্রতীতি গোচর হইয়া থাকে; সূত্রস্থ "প্রত্যয়াবিশেষ" পদটী দ্বারা ইহাই বুঝান হইয়াছে। এই যে সত্ত্ব এবং পুরুষের অবিশেষ প্রত্যয়, ইহারই নাম ভোগ। এই ভোগ পরার্থ। পর শব্দের অর্থ পুরুষ। পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই এই অবিদ্যাকৃত ভোগ পরিকল্পিত হয়। এ সকল বিষয় ইতি-পূর্ব্বে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। পুরুষের সত্তায়ই ভোগের সত্তা এবং পুরুষের প্রকাশেই ভোগের প্রকাশ, এইরূপ প্রত্যক্ষানুভব হইলেই ভোগ যে পরার্থ, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এ পর্য্যন্ত যত প্রকার বিভূতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সে সকলই ভোগ মাত্র—পরার্থ মাত্র। এই পরার্থ ভোগকে পরিত্যাগ করিয়া যাহা স্বার্থ, যাহা স্বপ্রকাশ, যাহা স্বয়ং সত্তাস্বরূপ বস্তু, তাহাতে সংযম প্রয়োগ করলে পুরুষজ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয়।

শুন সাধক, খুলিয়া বলিতেছি—বুদ্ধিসত্ত্বে অবস্থান করিবার সামর্থ্য লাভ হইলে, নানাপ্রকার বিভূতি বা প্রিয়তমের লীলাবিলাস প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। এই লীলাময় ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া সাধক কিছুদিন পরমা তৃপ্তি সম্ভোগ করে; তারপর ধীরে ধীরে যিনি লীলাময়, যাঁহা হইতে এই আনন্দময় লীলাবিলাসসমূহ স্ফুরিত হয়, তাঁহার প্রতি

সাধকের লক্ষ্য নিপতিত হয়। তখন ঐ ভোগ বা লীলাদর্শন পরিত্যাগ করিয়া, যাঁহার লীলা তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রযত্ন চলিতে থাকে। সূত্রে ইহাই স্বার্থসংযম শব্দটীর দ্বারা পরিব্যক্ত হইয়াছে। সত্তা স্বরূপ পুরুষের আভাসমাত্র লইয়া বুদ্ধিসত্বের যে অবস্থান, তাহাই এস্থলে স্বার্থসংযম শব্দের তাৎপর্য্য। "অস্মি অস্মি" এইরূপ প্রত্যয় ধারাকে অবলম্বন করিয়া উহার অস্তিত্ব অংশের প্রতি লক্ষ্য ফিরাইলেই পূর্ব্বোক্ত আভাসের সন্ধান পাওয়া যায়, ঐ আভাসকে অবলম্বন করিয়া ধারণা আরম্ভ করিলেই ক্রমে ধ্যান ও সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাই স্বার্থ সংযম। এইরূপ সংযম সিদ্ধ হইলে, তখন সত্তামাত্র স্বরূপ অদ্বিতীয় পুরুষের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রজ্ঞা উদ্‌ভাসিত হয়, ইহারই নাম পুরুষজ্ঞানরূপা বিভূতি। এই বিভূতি কেবল মুমুক্ষু যোগিগণেরই লভ্য। ত্রৈবার্গিকগণ এখানে উপস্থিত হইতে পারেন না।

সত্তা যে একমাত্র পুরুষেই বিদ্যমান, অন্য কোথাও তাহা নাই বা থাকিতে পারে না, এইরূপ নিঃসংশয় সুদৃঢ় জ্ঞানকেই অর্থাৎ প্রজ্ঞাকেই পুরুষজ্ঞান বলা হয়। পুরুষ অজ্ঞেয় বস্তু, তিনি কখনও জ্ঞান ক্রিয়ার কর্ম্ম হইতে পারেন না। তিনি স্বয়ং জ্ঞ স্বরূপ বস্তু। শ্রুতিও বলেন— যিনি স্বয়ং বিজ্ঞাতা, তাঁহাকে কোন প্রকারেই জানা যাইতে পারে না। ঋষি এস্থলে পুরুষজ্ঞান শব্দে যাহা নির্দ্দেশ করিলেন, সাধকগণ তীব্র সাধনাদ্বারা এই পর্য্যন্তই লাভ করিতে পারেন। অতঃপর আর একটী অবস্থা আছে, তাহার বিষয় পরে বলা হইবে। এই যোগশাস্ত্রে যাহা পুরুষজ্ঞান নামে বর্ণিত হইল, পুরাণাদি শাস্ত্রে তাহাই "ইষ্টদর্শন" রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন ইত্যাদি রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ততঃ প্রাতিভশ্রাবণ-বেদনাদর্শাস্বাদ বার্ত্তা জায়ন্তে ॥৩৬॥

অবান্তরফলং কীর্ত্তয়তি তত ইতি। ততস্তস্মাৎ স্বার্থসংযমাৎ প্রাতিভশ্রাবণাদয়ো জায়ন্তে স্বত এবেতি ভাবঃ। তথাহি প্রাতিভশ্রাবণং দিব্যশ্রুতিঃ, প্রাতিভবেদনং দিব্যস্পর্শঃ, প্রাতিভাদর্শো দিব্যদৃষ্টিঃ, প্রাতিভাস্বাদো দিব্যরসানুভব—স্তথা প্রাতিভবার্ত্তা দিব্যঘ্রাণং চ জায়ন্তে। বিষয়েষু সচ্চিদানন্দ-রসাস্বাদ-যোগ্যতৈব জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং দিব্যশক্তিমত্ত্বং সৈববিভূতিঃ। শ্রাবণমিতি দিব্যশ্রুতি-সমর্থস্য শ্রোত্রস্য তান্ত্রিকী সংজ্ঞা। এবং বেদনাদর্শাস্বাদ-বার্ত্তাস্বপ্যূহনীয়মিতি ॥৩৬॥

এই সূত্রে স্বার্থসংযমের অবান্তর ফল বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহা হইতে—স্বার্থসংযম হইতে প্রাতিভ শ্রাবণ আদর্শ আস্বাদ এবং বার্ত্তা আবির্ভূত হয়। পূর্ব্বে স্বার্থ সংযমের বিষয় বিশদ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐরূপ স্বার্থসংযম হইতে যে কেবল "পুরুষ-জ্ঞান"ই হয়, তাহা নহে; আরও অবান্তর ফল অনেক লাভ হয়। তন্মধ্যে এই সূত্রে পাঁচটী প্রাতিভজ্ঞানের উল্লেখ করা হইয়াছে। (১) প্রাতিভ শ্রাবণ—দিব্য শ্রবণ শক্তি, (২) প্রাতিভ বেদন—দিব্য স্পর্শানুভব, (৩) প্রাতিভ আদর্শ—দিব্যদৃষ্টি, (৪) প্রাতিভ আস্বাদ—দিব্যরসাস্বাদন, (৫) প্রাতিভ বার্ত্তা—দিব্য ঘ্রাণ শক্তি। "প্রাতিভ" কি, তাহা ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যে পঞ্চবিধ অনুভব প্রকাশ পায়, তাহারা সকলেই যে সচ্চিদানন্দময় পুরুষেরই বিকাশ, ইহার প্রত্যক্ষতা লাভ হওয়ার নামই প্রাতিভ শ্রাবণাদিরূপ অর্থাৎ দিব্যশ্রুতি প্রভৃতি রূপ

বিভূতি লাভ। সাধারণ মানুষ জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্য শব্দ স্পর্শাদি-মাত্রেরই গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু স্বার্থসংযম-সমর্থ যোগী শব্দস্পর্শাদি বিষয় সমূহকেও আত্মসম্বেদনরূপেই গ্রহণ করিবার যোগ্যতালাভ করে। ইহাই দিব্যশ্রুতি প্রভৃতি রূপ বিভূতি। পুরুষজ্ঞানে উপনীত হইলে এই বিভূতি অনায়াস লভ্য হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে উপনীত হইয়াই সাধকগণ উপনিষদের ঋষির সুরে সুর মিলাইয়া "মধু বাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধব" ইত্যাদি সুমধুর সামগানে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলেন। ওগো, "ঈশাবাস্য" করিয়া জগদ্ ভোগ করিবার সামর্থ্য এই ক্ষেত্রে উপনীত হইলেই সম্ভব হয়।

হাঁ, আর একটি কথা—ঐ যে শ্রাবণ বেদনা আদর্শ আস্বাদ এবং বার্ত্তা, উহারা পাঁচটী সংজ্ঞাশব্দ, যে যোগী পূর্ব্বোক্তরূপে দিব্যভাবে বিষয় সম্ভোগে সমর্থ হয়, তাহার শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহ ঐ সকল নামেই পরিচিত হইয়া থাকে।

তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানেতুসিদ্ধয়ঃ ॥৩৭॥

শ্রাবণাদীনামল্পি তৃষ্ণাকত্বং খ্যাপয়তি ত ইতি। তে প্রাতিভ শ্রাবণাদয়ঃ, সমাধৌ বৃত্তিনিরোধ- বিষয়ে উপসর্গাঃ প্রতিবন্ধকাঃ। তদ্বিষা অপি বৃত্তিরূপত্বাদিতি। ব্যুত্থানে তু বৃত্তিসারূপ্যদর্শন বেলায়াং তু সিদ্ধয়ঃ অলৌকিকত্বাৎ। যদা তু বিজাতীয়মিদং দমনরূপং ব্যুত্থানং তদা নৈব সিদ্ধয় ইতি ॥৩৭॥

পূর্ব্বোক্ত দিব্য শ্রুতি প্রভৃতিরূপ বিভূতিও যে অকিঞ্চিৎকর, তাহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য। ঋষি বলিলেন—তাহারা (পূর্ব্বোক্ত

প্রাতিভ শ্রাবণ প্রভৃতি) সমাধি বিষয়ে উপসর্গ (প্রতিবন্ধক) হয়, কিন্তু ব্যুত্থান কালে উহারা সিদ্ধিই বটে।

যাহা সমাধির প্রতিবন্ধক কেবল ব্যুত্থানকালেই সিদ্ধি, তাহা যত শ্রেষ্ঠই হউক, মুমুক্ষুর নিকট আকিঞ্চিৎকর মাত্র। প্রাতিভ শ্রাবণ প্রভৃতি দিব্য হইলেও—স্বগতভেদ-মাত্রাবগাহী হইলেও উহারা বৃত্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে; সুতরাং বৃত্তি নিরোধরূপ সমাধি বিষয়ে উহাদের কোনরূপ কার্যকারিতা নাই বরং প্রতিবন্ধকই হইয়া থাকে। তাই ঋষি উহাদিগকে সমাধির উপসর্গ বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। ব্যুত্থানকালে উক্ত দিব্য শ্রুতি প্রভৃতি সিদ্ধি স্বরূপই বটে; কারণ উহা অসাধারণ। সাধারণ মানুষ সর্ব্বদা বিজাতীয় ভেদ দৃষ্টি লইয়াই জীবন যাপন করে; সুতরাং স্বগত ভেদাবগাহিনী দৃষ্টি তাহাদের নিকট অলৌকিকই হইয়া থাকে। ব্যুত্থান যখন ঐরূপ সাধারণ ক্ষেত্রেই নামিয়া পড়ে, অর্থাৎ যোগী যখন বিজাতীয় ভেদ জ্ঞানেই বিচরণ করেন, তখন—সে অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত দিব্যশ্রুতি প্রভৃতিও প্রকাশ পায় না; কাজেই সেরূপ ব্যুত্থানে উহারা সিদ্ধিপদ বাচ্যও হয় না। ঋষি যে "ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ" কথাটা বলিলেন, উহার তাৎপর্য্য—স্বগতভেদ দর্শনরূপ ব্যুত্থানকালেই শ্রাবণাদির সিদ্ধি স্বরূপতা, বিজাতীয়ভেদ দর্শনরূপ ব্যুত্থানকালে উহাদের সিদ্ধি স্বরূপতা থাকে না।

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচার সংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ ॥৩৮॥

এবং ব্যাখ্যায় বিভূতীঃ জ্ঞানরূপাঃ ক্রিয়ারূপাঃ ব্যাখ্যাতুং মাহ পরশরীরাবেশমাহ। ইহ খলু হি তত্ত্বদর্শিনা যোগিনা দুষ্কৃতান্যৈ মুক্তাঃ পরাবর্ত্তয়ন্তি, কথং নাম তন্ত্রমাবেশয়েৎ ইত্যাহ বন্ধেতি॥ বন্ধ-কারণ-শৈথিল্যাৎ বন্ধস্য দেহাদ্যবস্থানস্য যৎ কারণমদৃষ্টং তস্য

শৈথিল্যাৎ প্রাগুক্তপুরুষ-বিষয়িন্যাং সমুদিতায়াং প্রজ্ঞায়া দৈবমবশ্যম্ভাবি শৈথিল্যমিতি। তথা প্রচারসংবেদনাচ্চ প্রচারস্যেতস্ততো ধাবনশীলস্য চিত্তস্যেতি ভাবঃ। সংবেদনাৎ স্বস্বরূপেনানুভবাৎ চিত্তস্য পরশরীর আবেশঃ সম্প্রবেশ স্তদ্রূপা বিভূতিঃ প্রকাশত ইতি শেষঃ।

ইদমত্রাবগন্তব্যম্—স্বসাধুশীলতাং পরিহাতুমিচ্ছন্নপ্যশক্তো দুষ্কৃতি ফলানলসন্তপ্তো যস্মায়ান জনোঽশরণং চরণেষু যোগিবরাণান্তদৈব স্বভাবকৃপালবস্তে পরশরীরাবেশবিভূতিবলেন বিদধতি তস্য কল্যাণম্ ন তু সর্ব্বত্রৈব ॥ ৩৮ ॥

এপর্য্যন্ত জ্ঞানরূপা বিভূতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঋষি এক্ষণে ক্রিয়ারূপা বিভূতি বর্ণনা করিবেন। প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায়—যোগিগণ দুষ্কৃত জনগণকে সুকৃতিশালী করিয়া তুলেন। ইহা কিরূপে সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা পরশরীরাবেশরূপা বিভূতি বর্ণন ব্যপদেশে ঋষি বলিতেছেন—বন্ধ কারণের শৈথিল্যহেতু এবং প্রচার সংবেদন বশতঃ পরশরীরাবেশরূপা বিভূতি প্রকাশ পায়। বন্ধ কারণ শৈথিল্য কি? বন্ধের অর্থাৎ দেহাত্মবোধের যাহা কারণ, তাহার শিথিলতা। দেহাত্মবোধের কারণ স্থূলের প্রতি আসক্তি। পূর্ব্ব কথিতরূপে পুরুষ বিষয়ক প্রজ্ঞা লাভ হইলে যোগীর আর ঐরূপ আসক্তি থাকে না; সুতরাং তাহার পক্ষে বন্ধকারণের শৈথিল্য অবশ্যম্ভাবী। আর একটী কথা আছে। প্রচার সংবেদন। প্রচার শব্দের অর্থ ইতস্ততো ধাবনশীল চিত্ত, এবং সংবেদন শব্দের অর্থ তদ্বিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান। চিত্ত যে জ্ঞানস্বরূপ—সম্বিৎ স্বরূপ অর্থাৎ আমিই, এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভবকেই প্রচারসংবেদন বলে। ইতিপূর্ব্বে চিত্তসংবিৎসূত্রে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে। এই দুইটী কারণে অর্থাৎ দেহাত্মবোধের একান্ত শিথিলতা ও চিত্তের স্বরূপ অবগত হওয়ার ফলে যোগী ইচ্ছানুরূপ পরকীয় শরীরে স্বকীয় চিত্তের আবেশ করিতে পারেন। ইহাই পরশরীরাবেশরূপা বিভূতি নামে কথিত হয়। আজ কাল যে হিপ্‌নটিজম্ মেস্‌মেরিজম্ ক্লেয়ার্ ভয়েন্‌স্ নামক বিদ্যা

অধুনাধিক প্রচারিত হইয়াছে, উহা কখনও এই পরশরীরাবেশরূপা বিভূতির মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ উহা যোগজ আত্মবিভূতি নহে। উহা পূর্ব্বকালে সম্মোহনবিদ্যা নামে পরিচিত ছিল। উহার সহিত যোগের কোন সম্বন্ধ নাই, উহা চিত্তের এক প্রকার অনুশীলন মাত্র। ঐরূপ সম্মোহন বিদ্যাদ্বারা কখনও কখনও কোন দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য হইতে পারে, কিন্তু কোন অসাধুশীল ব্যক্তিকে সাধুত্বে উপনীত করা যায় না। পরন্তু প্রজ্ঞাবান্ তত্ত্বদর্শী যোগী স্বকীয় চিত্তকে পরশরীরে আবিষ্ট করিয়া সেখানেও নিজেরই মত সাধুশীলতার প্রকাশ করাইতে সর্ব্বথা সমর্থ হইয়া থাকেন।

এদেশে যে "শক্তি-সঞ্চার" নামক একটা কথা প্রচলিত আছে, তাহাও এই পরশরীরাবেশরূপা বিভূতিই। যাহারা এই শক্তিসঞ্চারকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সহিত আমরা বিতর্ক করিতে যাইব না বটে; কিন্তু উহা যে সত্য সত্যই সম্ভব, একথা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"অভ্যুদয়কামী ব্যক্তি আত্মজ্ঞ পুরুষের অর্চ্চনা করিবেন।" আত্মজ্ঞ পুরুষের অর্চ্চনা করিলে যে প্রণালীতে সেই অভ্যুদয় লাভ হইয়া থাকে, তাহা এই পরশরীরাবেশরূপা বিভূতি বর্ণন প্রসঙ্গে যোগদর্শনের ঋষি যুক্তির দ্বারা দেখাইয়া দিলেন।

এইরূপ শক্তির সঞ্চার বা পরশরীরে চিত্তের আবেশ সর্ব্বত্র সম্ভবপর হয় না। যদি কোন দুষ্কৃতি-সন্তপ্ত ব্যক্তি স্বকীয় অসাধু-শীলতাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াও চিত্তের দুর্ব্বলতা বশতঃ তাহাতে অসমর্থ হইয়া কোন যোগিবরের চরণে অকপটে আত্মসমর্পণ করে, তাহা হইলেই পূর্ব্বোক্তরূপ বিভূতির প্রকাশ হওয়া সম্ভব। জগাই মাধাই উদ্ধারও এই প্রণালীতেই হইয়া থাকে।

———

উদানজয়াজ্জল-পঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ ॥ ৩৯ ॥

দৃশ্যতে হি প্রায়ো যোগিনামনাসক্তিঃ সর্ব্বত্রৈব সা কুতঃ সম্ভবতীত্যাহ উদানেতি। উদানজয়াৎ প্রাণাদীনামন্যতম উদান ঊর্দ্ধগামী বোধপ্রবাহ-বিশেষঃ স চ শারীর ধাতুগত-বোধাধিষ্ঠান-ধারণ-শক্তিরূপ-স্তস্য জয়াৎ লব্ধপ্রজ্ঞস্য স্বতএব জিতস্তিষ্ঠতি সঃ, অস্মিতাব্যূহ-রূপেণানুভূয়মানত্বাৎ। ততশ্চ সংযমং যাবৎ জলপঙ্ককণ্টকাদিষু অসঙ্গো ভবতি যোগী; জলাদীনি ন তথাভূতং যোগিনং বাধন্ত ইতি ভাবঃ। সাধারণোঽয়মর্থঃ, বিশেষস্ত্বত্রভণ্যতে—জলশব্দেন পুণ্যং পঙ্কশব্দেন পাপং, কণ্টকশব্দেন চ সুখদুঃখ উচ্যেতে। এবঞ্চ পুণ্যপাপ-সুখদুঃখাদিরূপেষু দ্বন্দ্বেষু অসঙ্গোভবতি যোগী। প্রজ্ঞা-লাভস্যৈতৎ ফলং। ন কেবলমেতাবদৈহিকং পারত্রিকমপি কীর্ত্তয়তি —উৎক্রান্তিশ্চেতি। উৎক্রান্তিরর্চ্চিরাদিমার্গেণ গমনং ভবপ্রত্যয়ঃ ক্রমমুক্তিরিত্যর্থ। ইহলোভয়লোকজয়িনী বিভূতিরেষা ॥ ৩৯ ॥

দেখিতে পাওয়া যায়—যোগিগণ প্রায়ই অনাসক্ত থাকেন। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়, ঋষি এই সূত্রে তাহাই নির্ণয় করিতেছেন—উদানজয় হইতে জলপঙ্ককণ্টকাদিতে অসঙ্গ এবং উৎক্রান্তিরূপা বিভূতির প্রকাশ পায়। উদান কি, তাহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। প্রাণাদি পঞ্চবিধ শক্তিপ্রবাহের অন্যতম প্রবাহ উদান নামে খ্যাত। ইহা ঊর্দ্ধগামী বোধপ্রবাহরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। শরীরের রস রক্ত প্রভৃতি ধাতুগত বোধের অধিষ্ঠান ও ধারণশক্তিরূপে ইহা অবস্থিত। এই উদানশক্তির জয় হইলে জলাদিতে অসঙ্গ হয়

এবং উৎক্রান্তি সিদ্ধ হয়। যাঁহারা প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই উদানশক্তি স্বতই নির্জ্জিত; কারণ প্রাণাদি অস্মিতার বিশেষ বিশেষ ব্যূহরূপেই অনুভূত হইয়া থাকে। যাহা আমিত্বের ব্যাপ্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়, তাহা আর কখনও স্বতন্ত্র শক্তিরূপে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। এইরূপ উদানজয় হইতে জলাদিতে অসঙ্গ এবং উৎক্রান্তিরূপা বিভূতির প্রকাশ হয়। যতক্ষণ উদানশক্তি-প্রবাহকে অবলম্বন করিয়া সংযম চলিতে থাকে, ততক্ষণ জল পঙ্ক এবং কণ্টকাদি ঐরূপ উদানজয়ী যোগীকে আবদ্ধ করিতে অথবা কোনরূপ পীড়া জন্মাইতে পারে না। ইহা সাধারণ অর্থ। উক্ত জলপঙ্কাদির একটী বিশেষ অর্থ আছে। জল শব্দের অর্থ পুণ্য, পঙ্ক শব্দের অর্থ পাপ, এবং কণ্টক শব্দের অর্থ সুখ দুঃখ। এই তিনটী শব্দের ঐরূপ অর্থও প্রসিদ্ধই আছে। উদানজয়ী যোগী পুণ্য পাপ সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বদ্বারা অভিভূত হন না। ইহাই "জলপঙ্ককণ্টকাদিষু অসঙ্গঃ" বাক্যের তাৎপর্য্য। সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বসমূহের প্রতি বিজাতীয় ভেদবুদ্ধি দূরীভূত হয় বলিয়াই উহারা আর যোগীকে অভিভূত করিতে পারে না। ইহা উদানজয়ীর ঐহিক বিভূতি। আরও আছে—উৎক্রান্তি। ইহা পারত্রিক ফল। উৎক্রান্তি শব্দের অর্থ—অর্চ্চিরাদি মার্গে অর্থাৎ দেবযান মার্গে গমন। ইতিপূর্ব্বে "ভব প্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্" সূত্রের ব্যাখ্যায় এই ক্রমমুক্তির বিবরণ অতি বিস্তৃত ভাবেই আলোচিত হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। উদানশক্তি জিত হয় বলিয়াই অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত-যোগিগণ ক্রমমুক্তির পথে আরোহণ করিতে পারেন। এইরূপে লব্ধপ্রজ্ঞ যোগী উভয়লোক জয়কারিণী বিভূতি লাভে ধন্য হইয়া থাকেন।

समान-जयाज्ज्वलनम् ॥४०॥

दृश्यते च पुनर्योगिनां शारीरदीप्तिः सा कुत इत्याह समानेति। समानजयात् समानो नाम भुक्तद्रव्यस्य समनयनकारिणो शक्तिरूपः स च बोधप्रवाहविशेषः, लब्धप्रज्ञस्यास्मिताव्यूहरूपेणानुभूयमानत्वात् स अतएव जित स्तिष्ठति। ततश्च यावत् संयमं ज्वलनं दीप्ति रौज्ज्वल्यं स्थूलशरीरस्यापि भवतीति शेषः। अन्नपानादीनां समनयन शक्तेर्वैश्वानराग्निरूपत्वात्तत्रैव संयमोयुक्तो ज्वलनायेति ॥४०॥

যোগীদিগের প্রায়ই শারীরদীপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা কিরূপে সম্ভব হইয়া থাকে, ঋষি এই সূত্রে তাহাই নির্ণয় করিতেছেন—সমানজয় হইতে জ্বলনরূপা বিভূতির প্রকাশ হয়। সমান কি? ভুক্তদ্রব্যের সমনয়নকারিণী শক্তির অধিষ্ঠান ও ধারণরূপ বোধপ্রবাহ বিশেষ। এই সমানশক্তি যে অস্মিতারই ব্যূহবিশেষ, এইরূপ প্রত্যক্ষ হওয়ার ফলে লব্ধপ্রজ্ঞ ব্যক্তির নিকট উহা স্বভাবতঃই নির্জ্জিত থাকে। এইরূপ যোগী যতক্ষণ সমানশক্তিতে সংযম করেন, ততক্ষণ তাঁহার জ্বলন হয় অর্থাৎ শারীরিক উজ্জ্বলতারূপ বিভূতি প্রকাশ পায়। অন্নপানাদির সমনয়নকারিণী শক্তিই বৈশ্বানর অগ্নি; সুতরাং উহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে জ্বলন অবশ্যম্ভাবী। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়—যোগীর দেহ স্বাভাবিক দীপ্তিময়, তাহা কোনরূপ বিশিষ্ট সংযমের অপেক্ষা করে না। সর্ব্বদা সাত্ত্বিক ভাবে অবস্থান করিলেই দেহে ঐরূপ দীপ্তি প্রকাশ হয়। এই সমান শক্তিতে সংযম করিলে যে দীপ্তি হয়, তাহা জ্বলন অর্থাৎ

অতিশয় তেজঃপূর্ণ। যোগী যখন ঐরূপ সংযত অবস্থায় থাকেন, তখন তাহার শরীর হইতে এমন একটা ছটা নির্গত হয়, যেন অপরের চক্ষুকে ঝলসাইয়া দেয়। কখনও বা আত্মসংস্থ যোগীর ঐরূপ ছটা পরিলক্ষিত হয়, তাহাও তাহার অনিচ্ছাকৃত সমান সংযমের ফল ভিন্ন অন্য কিছু নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যোগ পথে যাহা কিছু অলৌকিকরূপে পরিলক্ষিত হয়, এই শাস্ত্রে তাহার যুক্তিপূর্ণ উপায়ই প্রদর্শিত হইয়াছে।

श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद्दिव्यं श्रोत्रम् ॥४१॥

अथ योगिनो दिव्यश्रोत्रादिलाभरूपां विभूतिमाह श्रोत्रेति। श्रोत्राकाशयोः श्रोत्रं शब्दग्रहणसामर्थमदिन्द्रियमाभिमानिकं, आकाशोऽनावरण-स्वभावोऽवकाशः, एतयोः सम्बन्धस्तादात्म्यरूप स्तत्र संयमादनयोर्विलक्षणता प्रत्यक्षीभूता भवति। प्रवर्त्तते च तेन दिव्यं श्रोत्रमाकाशनिरपेक्षं वोधमयं श्रोत्रं, श्रोत्रतत्त्वमिति भावः। सूत्रमुपलक्षणार्थमिदं, तथाहि त्वग्वायुसम्बन्धसंयमाद्दिव्यस्पर्शः, चक्षुस्तेजः-सम्बन्धसंयमाद्दिव्यदृष्टिः, रसनासलिलसम्बन्धसंयमाद्दिव्यस्वादः, घ्राणक्षितिसम्बन्ध-संयमाद्दिव्यघ्राणमिति च। नहि पुनरुक्तता प्रातिभश्रावणादिभिर्ग्राह्यग्रहणविषयकत्वेन विलक्षणत्वादिति ध्येयम् ॥४१

এই সূত্রে যোগীর দিব্যশ্রোত্রাদি-লাভরূপা বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—শ্রোত্র এবং আকাশের যে সম্বন্ধ, তাহাতে সংযম করিলে দিব্যশ্রোত্ররূপা বিভূতির প্রকাশ হয়। শ্রোত্র শব্দের অর্থ—শব্দগ্রহণে সমর্থ ইন্দ্রিয় বিশেষ, তাহা আভিমানিক শক্তিপ্রবাহ বা বোধপ্রবাহ। অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণের

অভিব্যক্তি হয় বলিয়া উহারা সকলেই আভিমানিক। "আমি—শব্দময়" "আমি—স্পর্শময়" এইরূপ বোধধারাকে লক্ষ্য করিয়াই আভিমানিক পদটীর প্রয়োগ হয়। অনাবরণস্বভাব অবকাশকে আকাশ কহে, এই উভয়ের অর্থাৎ শ্রোত্র এবং আকাশের যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ, তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে দিব্যশ্রোত্র লাভ হয়। আকাশ এবং কর্ণেন্দ্রিয় পরস্পর অত্যন্ত বিলক্ষণ বস্তু হইলেও আকাশকে অবলম্বন করিয়াই কর্ণ ইন্দ্রিয়ের সত্তা আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়, তাই কর্ণ এবং আকাশকে সম্যক্ অভিন্নভাবেই আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি। বাস্তবিক আমাদের নিকট যাহা শ্রোত্র ইন্দ্রিয়রূপে পরিচিত, তাহা ঐ আকাশ এবং শ্রোত্রের সম্মিলিত অবস্থা। শ্রোত্র এবং আকাশের যে পার্থক্য, তাহা সাধারণ ভাবে লক্ষ্যই করা যায় না; কিন্তু যিনি লব্ধপ্রজ্ঞ যোগী, তাঁহার নিকট ঐ বিভিন্নতা অতি স্পষ্টরূপেই প্রকাশ পায়। কেন প্রকাশ পায় শুনিবে? শ্রোত্র ইন্দ্রিয় অস্মিতার ব্যূহরূপে অনুভূত হয়; কিন্তু আকাশে তাহা হয় না, সুতরাং এই উভয়ের পার্থক্য বেশ স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায়। সে যাহা হউক, এই পার্থক্য যাঁহাদের অনুভূত হয়, মাত্র তাঁহারাই শ্রোত্র এবং আকাশের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন। ঐ সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া সংযম প্রয়োগ করিলে দিব্য শ্রোত্ররূপা বিভূতি প্রকাশ পায়। দিব্যশ্রোত্র কি? আকাশ-নিরপেক্ষ, কেবল বোধময় শ্রোত্র ইন্দ্রিয়, সাধারণতঃ যাহা শ্রোত্রতত্ত্ব নামে অভিহিত হয়, তাহাই দিব্যশ্রোত্র। এই শ্রোত্রতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের নামই দিব্যশ্রোত্ররূপা বিভূতি।

এই সূত্রটি উপলক্ষণার্থক, অর্থাৎ অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে, যথা—ত্বক্ এবং বায়ুর সম্বন্ধে সংযম প্রয়োগ করিলে দিব্যস্পর্শ লাভ হয়। চক্ষু এবং তেজের সম্বন্ধে সংযম হইতে দিব্যদৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে; রসনা এবং

সলিলের সম্বন্ধে সংযম করিলে দিব্যস্বাদের উদয় হয় এবং নাসিকা ও ক্ষিতির সম্বন্ধে সংযম প্রয়োগ করিলে দিব্যগন্ধরূপা বিভূতির উদয় হয়। ইতিপূর্ব্বে যে প্রাতিভশ্রাবণাদির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা শব্দ স্পর্শাদি গ্রাহ্য বিষয়ক, আর এ সূত্রে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ক বা গ্রহণবিষয়ক, সুতরাং তাহার সহিত ইহার পুনরুক্ততা হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত প্রাতিভ শ্রাবণাদি লাভ হওয়ার পর এই দিব্য শ্রোত্রাদির সন্ধান পাওয়া যায়।

कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमात् लघुतुल-समापत्तेश्चाकाश-गमनम् ॥ ४२॥

निर्लिप्तत्वप्राप्तिरूपामाह विभूतिं कायेति। कायः स्थूलशरीरं, आकाशस्तदाधारस्तयोः सम्बन्ध आधाराधेयरूप स्तत्र संयमात्, लघुतुल समापत्तेः स्थूलस्यापि शरीरस्य तुलादिवल्लघुत्वप्राप्तिर्भवति। ततश्चाकाशगमनमाकाशवत् सर्व्वगतत्वनिर्लिप्तत्वप्राप्तिरूपाया विभूते-राविर्भाव इत्यर्थः॥

इदमत्राऽधेयम्—स्थूलशरीरगतपरमाणुभिराकाशस्याधाराधेय सम्बन्धे संयमप्रयोगाद् योगी मांसादिपिण्डमयमपि शरीरमतिलघु-तुलादिवदनुभवति पुनस्तत्रापि तत्स्थतद्भिन्नतारूप-समापत्ति प्रभावेनाकाशवत् सर्व्वव्यापी निर्लिप्तश्च भवतीयं हि विभूतिरिति ॥४२॥

এই সূত্রে ঋষি নির্লেপত্ব প্রাপ্তিরূপা বিভূতির বিষয় বলিতেছেন—কায় এবং আকাশের সম্বন্ধে সংযম প্রয়োগ করিলে, লঘুতুল সমাপত্তি হয়, তাহা হইতে আকাশ গমনরূপা বিভূতি লাভ হয়। কায় শব্দের অর্থ—স্থূল শরীর, আকাশ তাহার আধার। এই উভয়ের যে সম্বন্ধ

—আধারাধেয়রূপসম্বন্ধ, তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে শরীর অতিশয় লঘু হইয়া পড়ে। মনে হয়—যেন তুলার মত হালকা হইয়া গিয়াছে। তখন—সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ অবস্থান করিলেই সমাপত্তি উপস্থিত হয় অর্থাৎ তৎস্থ তদঞ্জনতা প্রাপ্তি হয়। ঐরূপ সমাপত্তি হইতে যোগীর আকাশগমনরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয়। গম্ ধাতুর অর্থ এস্থলে প্রাপ্তি। আকাশগমন শব্দে আকাশবৎ সর্ব্বগতত্ব এবং নির্লেপত্বপ্রাপ্তি বুঝায়। আকাশ যেরূপ বিভু সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বব্যাপী হইয়াও সম্পূর্ণ নির্লেপ, যোগীও আপনাকে ঠিক সেইরূপই প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে থাকেন। ইহাই আকাশ গমনরূপা বিভূতি। যোগী মাত্রেই এই বিভূতি লাভ করিয়া থাকেন।

শুন, "তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং " ইত্যাদি মন্ত্রটীর অর্থ (১) অনুধ্যান পূর্ব্বক সংযত হইতে চেষ্টা করিলে স্থূলশরীরগত প্রতি পরমাণুর সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট আকাশটী বেশ অনুভবে আসিতে থাকে, তখন এই রক্ত-মাংস-পিণ্ডরূপা ভারি শরীরটী তুলাদির ন্যায় অতি লঘু বোধ হইতে থাকে। সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ অবস্থান করিতে পারিলেই সমাপত্তি উপস্থিত হয়। তখন যোগীর আত্মবোধ দেহাদি ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া আকাশে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারই নাম আকাশগমনরূপা বিভূতি। আকাশে আত্মবোধ উপসংহৃত হইলে "আমি সর্ব্বব্যাপী এবং পাপ পুণ্যাদি বা সুখ দুঃখাদির সহিত সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত" এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব আসিতে থাকে। ইহাই যথার্থ আত্মবিভূতি। যাঁহারা আকাশ গমন শব্দে অন্তরীক্ষ লোকে গতিবিধি রূপ অর্থ করেন, তাহাদের সহিত এসকল স্থলে আমরা সম্পূর্ণ একমত হইতে পারি নাই। সহৃদয় পাঠকগণই এবিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ হইবেন।

---

(১) পূজাতত্ত্ব নামক গ্রন্থে এই মন্ত্রের সাধনোপযোগী অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

বহিরকল্পিতা বৃত্তির্মহাবিদেহা ততঃ
প্রকাশাবরণ-ক্ষয়ঃ ॥৪৩॥

তৎফলমাহ বহিরিতি। বহিরকল্পিতা বৃত্তিঃ প্রাগুক্তাকাশগমনাৎ বহিঃ শরীরাদিত্যর্থঃ, অকল্পিতা বৃত্তির্ভবতি। প্রায়ঃ শরীরস্থস্য মনসো বাহ্যবৃত্তিরুদেতি সা কল্পিতেত্যাখ্যায়তে, অকল্পিতা তু শরীর নিরপেক্ষা বাহ্যবৃত্তিঃ সা চ মহাবিদেহা। পরিত্যক্তশরীর-সম্বন্ধস্য ব্যোম্নি সম্প্রতিষ্ঠিতাত্মবোধস্য যোগিনঃ সমুদেতি বৃত্তিরকল্পিতা নাম। এবম্ভূমহাবিদেহাভিধানা বিভূতিঃ। ততো মহাবিদেহাতঃ প্রকাশাবরণ ক্ষয়ঃ প্রকাশস্য স্বপ্রকাশস্বরূপস্যাত্মনো যদাবরণং ন ভাত্যাত্মেত্যেবং রূপং, তস্য ক্ষয়া নিঃশেষেণ ভবতীতি শেষঃ ॥৪৩॥

পূর্ব্বোক্ত আকাশগমনরূপা বিভূতি হইতে কি ফল লাভ হয়, ঋষি এই সূত্রে তাহাই বলিলেন—বহিরকল্পিতা বৃত্তি মহাবিদেহা তাহা হইতে প্রকাশাবরণ ক্ষয় হয়। আকাশবৎ সর্ব্বগতত্ব ও নির্লেপত্ব প্রাপ্তি হইলেই শরীরের বাহিরে অর্থাৎ শরীরকে অপেক্ষা না করিয়াই চিত্তবৃত্তির উদয় হইতে থাকে। ইহাকে অকল্পিতা বৃত্তি কহে। প্রায়শঃ শরীরস্থ চিত্তেই বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে, ইহাকে কল্পিতা বৃত্তি কহে। আর যখন শরীর-নিরপেক্ষ চিত্তবৃত্তি প্রকাশ পায়, তখন তাহার নাম হয়—অকল্পিতা। এইরূপ অকল্পিতা বৃত্তিই মহাবিদেহা নামক বিভূতি। যোগী যখন স্থূল শরীরের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশাত্ম-বোধে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হন, তখনই এই মহাবিদেহা বিভূতির আবির্ভাব হয়। কল্পিতা অকল্পিতা এবং মহাবিদেহা, এই

সংজ্ঞা শব্দ গুলি সার্থক। যতক্ষণ চিত্ত শরীরসংস্থ থাকে, ততক্ষণ যাহা সত্য, তাহার সহিত কতকগুলি কল্পনা মিশ্রিত করিয়া তদাকারীয় বৃত্তির উদয় হইতে থাকে; তাই ইহার নাম কল্পিতা। আকাশাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে বৃত্তি সমূহ প্রকাশ পায়, তাহাতে ঐরূপ কল্পনা মিশ্রিত থাকে না। বৃত্তিগুলি সত্যবস্তুর আভাস লইয়াই প্রকাশ পাইতে থাকে; তাই উহাদের নাম হয় অকল্পিতা। আর মহাবিদেহা বলিতে স্থুলদেহবোধ শূন্য হইয়া আকাশাদিরূপ মহদ্ভাবে অবস্থান করা বুঝায়। সুষুপ্তিকালে বা মূর্চ্ছাকালে দেহবিষয়ক কোন প্রতীতিই থাকে না; কিন্তু আকাশাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত যোগীর আকাশই স্বকীয় দেহরূপে প্রতীত হইতে থাকে। মহৎতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থায় এইরূপ মহাবিদেহা নামক বিভূতি উপস্থিত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, ঋষি বলিলেন —"ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ"। তাহা হইতে প্রকাশাবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তাহা হইতে অর্থাৎ মহাবিদেহারূপ বিভূতি হইতে প্রকাশরূপ বস্তু যে আত্মা, তাহার আবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। "আত্মা আমার নিকট প্রকাশিত হইতেছেন না" এইরূপ যে একটা অজ্ঞানের আবরণ তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়।

শুন, আকাশে আত্মবোধ প্রতিষ্ঠিত হইলেই আকাশেরও যিনি প্রকাশক, তাঁহার দিকে লক্ষ্য নিপতিত হয়। তখন ক্রমে ক্রমে আত্মার সত্তাবিষয়ক আভাস আসিয়া পড়িতে থাকে, অজ্ঞানাবরণ দূর হইয়া যায়। তখন আর সাধক আত্মার অপ্রকাশত্ব স্বীকারই করিতে পারে না। এই সকল বিভূতি মাত্র মুমুক্ষু যোগিগণেরই লভ্য। সংসারে অবস্থান করিয়াও কিরূপে সম্যক্ নির্লিপ্ত থাকা যায়, তাহা এই সকল বিভূতি লাভের পুর্ব্বে সাধারণ মানুষগণ কিছুতেই বুঝিতে পারেনা। রাজর্ষি জনক এই মহাবিদেহরূপ বিভূতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম "বিদেহ" হইয়াছিল। কেবল

পরোক্ষজ্ঞানের ফলে কেহ কখনও সংসারাসক্তি পরিহার করিতে পারে না। এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব আসিলেই অর্থাৎ আকাশাত্ম-বোধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই উহা সম্ভব হইয়া থাকে।

स्थूल-स्वरूप-सूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद् भूतजयः ॥ ४४ ॥

अथ भूतजयमाहाणिमादि-पूर्व्वरूपं स्थूलेति ॥ स्थूल-स्वरूप-सूक्ष्मान्वयार्थवत्त्व-संयमात्—स्थूले नामरूपात्मके घटादौ, स्वरूपे स्थूलोपादाने-मृत्तिकादौ, सूक्ष्मे तन्मात्रे गन्धादौ, अन्वये प्रकाश प्रवृत्ति-स्थिति-रूपे गुणत्रये, तथार्थवत्त्वे निर्लिप्तस्यात्मनोलीला विलासात्मके भोगापवर्गसाधने शक्तिविशेषे च संयमाद् भूतजयः भूतानां क्षित्यादीनां जयः सत्ताभावस्य प्रत्यक्षतारूपो भवतीति शेषः। एवञ्च भूतानां परमार्थस्वरूपोद्भासनमेव भूतजयाभिधान विभूतिरिति।

इदमत्राकूतम्—स्थूलादिष्वर्थवत्त्वपर्यन्तेषु पञ्चसु पुनः पुनः संयम प्रयोगादेवं प्रज्ञा समुदेति यथा जानीयुर्योगिनो नामरूपं तदुपादानं स्थूलं सूक्ष्मं च तत् प्रयोजनं वा न किञ्चिदस्ति परमार्थत इति। स्वरूपाज्ञानरूपिण्या मद्दाशक्तेर्लीलाविलास मात्तमिति च। एवं सञ्जातप्रज्ञस्य भूतविषयिणी हेयोपादेयबुद्धिर्नश्यति। ततश्च सन्त्यपि हि भूतानि नैव सन्तीति यो दृढ़ः प्रत्ययः स भूतजय इति ॥ ४४ ॥

এইসূত্রে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির পূর্ব্বরূপ ভূতজয় বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—স্থূল স্বরূপ সূক্ষ্ম অন্বয় এবং অর্থবত্ত্ব

এই পাঁচটীতে সংযম প্রয়োগ করিলে ভূতজয় হইয়া থাকে। স্থূল—নাম রূপ, যথা ঘটাদি। স্বরূপ—স্থূলোপাদান, যথা মৃত্তিকাদি। সূক্ষ্ম—তন্মাত্র, যথা গন্ধাদি। অন্বয়—প্রকাশ প্রবৃত্তি স্থিতিরূপ গুণত্রয়। সকল পদার্থেই ইহারা অন্বিত; তাই গুণত্রয়কে অন্বয় বলা হয়। অর্থবত্ত্ব—প্রয়োজনবত্ত্ব অর্থাৎ নির্লেপ আত্মার ভোগাপবর্গসাধনরূপ লীলাবিলাস। ভূতাদির ইহাই প্রয়োজন। দৃশ্যবস্তু মাত্রেরই এই পঞ্চবিধ রূপ আছে। ক্রমে ক্রমে ঐ পাঁচটীতে পুনঃ পুনঃ সংযম প্রয়োগ করিলেই ভূতজয় হয়। ভূতসমূহের যথার্থ স্বরূপ উদ্ভাসিত হওয়াই ভূতজয়। ভূত সমূহ যে পরমার্থত নাই, উহাদের যে সত্তাই নাই, ইহার প্রত্যক্ষ হওয়াই ভূতজয় নামক বিভূতি।

স্থূল হইতে অর্থবত্ত্ব পর্য্যন্ত পদার্থের যে পঞ্চবিধ রূপ প্রদর্শিত হইল, সাধক ধীরভাবে উহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটীতে সংযম প্রয়োগ করিলে ক্ষিত্যাদি ভূতগণের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইতে পারেন। একটী রহস্য এই যে, উক্ত পঞ্চবিধ রূপের প্রথমটীতে যথাযথরূপে সংযম প্রযুক্ত হইলে পর পরটীর অবির্ভাব আপনা হইতেই হইয়া থাকে, উহাদিগকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে হয় না। মনে কর—একটী ঘট। ঐ নামরূপাত্মক প্রথম দৃশ্যমান পদার্থে সংযম প্রয়োগ করিলেই উহার স্বরূপ অর্থাৎ স্থূলোপাদান যে ক্ষিতি, তাহা উদ্ভাসিত হইবেই। তখন আবার ঐ অংশে সংযম প্রয়োগ করিলে উহার সূক্ষ্মস্বরূপে গন্ধতন্মাত্র-স্বরূপে উপনীত হওয়া যায়। উহাতে সংযত হইলে সত্ত্ব রজঃ ও তমোরূপ ত্রিবিধ স্পন্দনমাত্র পাওয়া যায়। ইহাই পদার্থের সূক্ষ্ম অবস্থা, ইহারই নাম অন্বয়। ত্রিগুণে উপনীত হইলে তখন ইহার "অর্থবত্ত্ব" প্রতীতি গোচর হইতে থাকে। গুণত্রয় যে স্বরূপের অজ্ঞান হইতে সঞ্জাত আবরণ-বিক্ষেপাত্মক এক প্রকার লীলাবিলাস মাত্র, ইহা প্রত্যক্ষ হইতে

থাকে। এইরূপ স্থূল হইতে কারণ পর্য্যন্ত পদার্থগুলির অবস্থা প্রত্যক্ষ হইলে আর ভূত বলিতে—পদার্থ বলিতে কিছুই থাকে না। ভূতসমূহ প্রত্যক্ষরূপে প্রতীয়মান হইলেও উহারা যে পরমার্থরূপে নাইই, এইরূপ সুদৃঢ় প্রত্যয় উদয় হয়। এবং তখনই এই ভূতজয় নাম্নী বিভূতি যে কি, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ভূতসমূহের যথার্থ স্বরূপ উদ্ভাসিত হইলে, উহাদের প্রতি হেয়োপাদেয় বুদ্ধি চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহাই যথার্থ ভূতজয়। সাধারণ মানুষ ভৌতিক বস্তু সমূহকে পরমার্থ বস্তু জ্ঞানে উহার সংগ্রহ ও রক্ষণাদি ব্যাপারে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করে, কিন্তু ভূতজয়ী যোগী সেরূপ কখনও করিতে পারেন না, বা করেন না। যতক্ষণ জানা না যায় যে, ইহা স্বপ্নমাত্র, ততক্ষণই স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সমূহকে সত্য বোধ হইয়া থাকে এবং তাহার সহিত সংযোগ বিয়োগজনিত চিত্ত বিক্ষোভ উপস্থিত হইতে থাকে। কিন্তু স্বপ্ন যদি একবার ভাঙ্গিয়া যায়, তখন আর স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুর নাশ বা প্রাপ্তি জনিত চিত্তবিক্ষেপ বিন্দুমাত্রও থাকে না। ঠিক এই রূপই যে যোগীর নিকট এই জগৎ-স্বপ্নের স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়াছে, তিনি সমুদয় জগতের আধিপত্য পাইলেও হৃষ্ট হন না, আবার সর্ব্বস্ব বলিতে যাহা, তাহা যদি ধ্বংসও হইয়া যায়, তথাপি বিচলিত হন না। ভূতজয় হইলে যোগীর এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সকল বিভূতি ত্রৈবর্গিকগণের পক্ষে উপাখ্যানমাত্ররূপেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

ততোঽণিমাদি প্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ
তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ॥ ৪৫ ॥

অথাণিমাদি-বিভূতিমাহ তত ইতি। তত তস্মাদ্ভূতজয়া দণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ। অণিমাদয়োঽষ্টৌ, তথাহি অণিমা—পরমসূক্ষ্মত্বং,

লঘিমা—পরমলঘুত্বং, মহিমা—পরমমহত্ত্বং, প্রাপ্তিঃ—সর্ব্বথা সর্ব্ববস্তূনাং প্রাপ্তিঃ, প্রাকাম্যমিচ্ছানভিঘাতঃ, বশিত্বং—ভূতভৌতিক বশ্যতা, ঈশিত্বং—স্থূলসূক্ষ্মাদি-নিয়ন্তৃত্বং, যত্রকামাবসায়িত্বং—পূর্ণকামত্বমিতি। এতেষাং প্রাদুর্ভাবঃ—অহমেবাণিমাদিরূপেণ নিত্যং বিরাজমান ইতি প্রত্যক্ষীভাব ইত্যর্থঃ। বিভূতিরিয়মেব। কায়সম্পৎ তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ পরত্র সূত্রে বক্ষ্যতে।

ইদমত্রাবধেয়ম্—পরিনিষ্পন্ন-ভূতজয়স্য সম্যক্ নির্ম্মলা ভবতি বুদ্ধীরাগদ্বেষ-বিলয়াৎ যোগিনস্তয়া চ নির্ব্বিশেষ সত্তামাত্র মনুভূয়ত আত্মনঃ স্বরূপম্। ততশ্চাণুত্বাদীনা মষ্টানাং পরাকাষ্ঠা ময্যেবেতি সমুদেতি প্রজ্ঞা পারমার্থিকী। ইদমেব হি প্রথিতমষ্টৈশ্বর্য্যং সাধকেষু কিল ॥ ৪৫ ॥

এই সূত্রে অণিমাদি অষ্টবিধ বিভূতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন— তাহা হইতে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ ভূতজয় হইতে অণিমাদির প্রাদুর্ভাব হয় এবং কায় সম্পৎ লাভ হয় ও তদ্ধর্ম্মের অনভিঘাত হয়। অণিমাদি—অষ্ট সংখ্যক, যথা অণিমা—পরম সূক্ষ্মত্ব, লঘিমা—পরম লঘুত্ব, মহিমা—পরম মহত্ত্ব, প্রাপ্তি—সর্ব্বথা সর্ব্ব বস্তুর প্রাপ্তি, প্রাকাম্য—ইচ্ছার অনভিঘাত, বশিত্ব—ভুত-ভৌতিক পদার্থ সমূহের বশ্যতা, ঈশিত্ব—স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণের নিয়ন্তৃত্ব এবং কামাবসায়িত্ব—পূর্ণকামত্ব। ভূতজয় হইতে এই আটটী বিভুতির প্রাদুর্ভাব হয়। আমিই যে অণিমাদিরূপে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছি, এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতির প্রকাশ হওয়াকেই অণিমাদির প্রাদুর্ভাব বলা হয়। ঋষি এস্থলে প্রাদুর্ভাব কথাটি প্রয়োগ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন—অণিমাদি অষ্ট বিভূতি পরমাত্মাতে অর্থাৎ আমাতেই চিরকাল বিদ্যমান আছে এবং থাকিবে। যতদিন বুদ্ধি নির্ম্মল না হয়, যতদিন ভূতজয় না হয়, যতদিন রাগদ্বেষ সম্যক্ বিদূরিত না হয়,

ততদিন ঐ অণিমাদি আমার আত্মস্বরূপ হইলেও বুদ্ধির মলিনতা-বশতঃ উহারা অপ্রত্যক্ষই থাকে। বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে—শ্রীগুরুকৃপায় ধী উন্মেষিত হইলে নির্ব্বিশেষসত্তা মাত্ররূপে আত্মস্বরূপ অনুভূত হইতে থাকে, তখন অণিমাদির সাক্ষাৎকার লাভ হয়। বুদ্ধির মলিনতা বশতঃ যাহা এতদিন অপ্রকট ছিল, তাহার প্রকাশ হওয়াকেই প্রাদুর্ভাব বলা হয়। কেবল অণিমাদি নহে, যাবতীয় বিভূতি ঠিক এইরূপেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। এই সূত্রে যে কায়সম্পৎ ও তদ্ধর্ম্মানভিঘাত বলা হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা পরবর্ত্তি সূত্রে করা হইবে।

এস্থলে অণিমাদি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা অবশ্যক। প্রথমতঃ অণিমা। অণু শব্দের অর্থ—সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম শব্দে আকাশীয়ভাব বুঝায়, সূক্ষ্ম এবং ক্ষুদ্র এক কথা নহে। সাধারণতঃ পরমাণু শব্দে দ্রব্যের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশকে বুঝায় বটে, কিন্তু দর্শন শাস্ত্রে অণু শব্দটী অধিকাংশ স্থলে সূক্ষ্ম অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই সূক্ষ্মত্বের যাহা পরাকাষ্ঠা, তাহার নাম অণিমা। যাহা হইতে আর বেশী সূক্ষ্ম হইতে পারে না, তাহাকে অণিমা কহে। স্থূলদেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন সূক্ষ্ম, মন অপেক্ষা বুদ্ধি সূক্ষ্ম আর বুদ্ধি অপেক্ষাও আত্মা সূক্ষ্ম, আত্মাই সূক্ষ্মত্বের পরাকাষ্ঠা; সুতরাং অণিমা বলিতে একমাত্র পরমাত্মাই লক্ষিত হইয়া থাকে। আমিই অণিমা। পরম সূক্ষ্ম আমাতেই বিদ্যমান, নির্ব্বিশেষ সত্তামাত্র স্বরূপ আমিই পরম সূক্ষ্ম বস্তু, এইরূপ যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি, তাহারই নাম অণিমা বিভূতির প্রাদুর্ভাব। শুধু শাস্ত্র অধ্যয়ন বা উপদেশ শ্রবণ করিয়া ইহা বুঝিয়া রাখিলে তাহাকে বিভূতি বলা যায় না। পূর্ব্বে বলিয়াছি—বিভূতি শব্দে আত্মবিভূতিই বুঝায়, সেই কথাটী স্মরণ না থাকিলে এই বিভূতি-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। আত্মমহত্ত্ব দর্শনের নামই বিভূতি। অণিমাদিরূপে আত্মসত্তার অনুভব সাধকের পরম সৌভাগ্য সূচনা করে, ইহা মুক্তির অতি সন্নিহিত

অবস্থা। প্রিয়তম সাধক, কবে তুমি এখানে আসিয়া জীবন ধন্য করিবে ?

দ্বিতীয় লঘিমা। লঘু শব্দের অর্থ হাল্‌কা। পাখীর পালক বা তুলা প্রভৃতি বস্তুকে ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখান যাইতে পারে। এই লঘুত্ব—এক প্রকার বোধ মাত্র। ইহা যখন পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা আর বেশী লঘু প্রতীতির বিষয় হইতে পারেনা, তাহার নাম লঘিমা। এই লঘিমা সত্তামাত্রস্বরূপ আত্মাতেই বিদ্যমান। আমিই লঘিমা, পরম লঘুত্ব আমাতেই নিত্য বিরাজিত, এই রূপ যে প্রত্যক্ষ অনুভব, তাহাই লঘিমা বিভূতি নামে প্রসিদ্ধ।

তৃতীয় মাহিমা। মহত্বের যাহা পরাকাষ্ঠা, যাহা অপেক্ষা আর মহৎ হইতে পারে না, তাহাকে মহিমা কহে। দেশ ও কাল মহৎ বস্তু, তাহাও বুদ্ধির বা মহত্তত্ত্বের দৃশ্যরূপে গ্রাহ্যরূপে অবস্থিত, সুতরাং মহত্তত্ত্ব দেশকাল অপেক্ষাও মহত্তর। আবার এই মহত্তত্ত্ব স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মার প্রকাশেই প্রকাশিত, আত্মার সত্তায়ই সত্তাবান্; সুতরাং বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব অপেক্ষাও আত্মা মহত্তম। মহিমা পরমাত্মারই অন্য নাম। দেশ কালের যে মহত্ত্ব অর্থাৎ ব্যাপকতা তাহা বিজাতীয়ভেদরূপে পরিগৃহীত হয়। বুদ্ধির মহত্ত্ব বা মহত্তত্ত্বের ব্যাপকতা স্বগতভেদরূপে পরিগৃহীত হয়। আর নির্ব্বিশেষ সত্তামাত্রস্বরূপ আত্মার মহত্ত্ব সর্ব্বভেদাতীত রূপেই নিত্য বিদ্যমান। আত্মার সত্তা ব্যতীত মহত্তত্ত্বও সত্তালাভ করিতে পারে না ; তাই পরম মহত্ত্ব একমাত্র আত্মাতেই নিত্য বিদ্যমান। এই পরম মহত্ত্বই মহিমা, আমিই সেই মহিমা, পরম মহত্ত্ব আমাতেই নিত্য বিরাজিত, এইরূপ যে প্রত্যক্ষ অনুভব, তাহাকেই মহিমা বিভূতির আবির্ভাব বলা হয়।

চতুর্থ প্রাপ্তি। সর্ব্বথা সর্ব্ব পদার্থের প্রাপ্তিই প্রাপ্তি নাম্নী বিভূতি। আমি—সত্তাস্বরূপ বস্তু, সুতরাং যেখানে যাহা কিছু "আছে' রূপে প্রতীয়মান হয়, সে সকলই আমাকর্ত্তৃক সর্ব্বথা প্রাপ্ত, এই রূপ প্রত্যক্ষ অনুভবের নাম প্রাপ্তি। আমি যতক্ষণ সত্তাস্ফূর্ত্তি প্রদান না

করি, ততক্ষণ কোন বস্তুই সত্তালাভ করিতে পারে না, এই সত্যজ্ঞান হইতে বঞ্চিত থাকে বলিয়াই সাধারণ জনগণ সর্ব্বদা নানারূপ অভাব অভিযোগ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। কিন্তু ভূতজয়ী যোগী সর্ব্বাত্মদর্শনের ফলে এই প্রাপ্তি নামক বিভূতি লাভে ধন্য হইয়া যাবতীয় অভাব অভিযোগের উপরে চলিয়া যান।

পঞ্চম প্রাকাম্য। প্রাকাম্য শব্দের অর্থ—ইচ্ছার অনভিঘাত। ভূতজয়ী যোগী দেখিতে পান—ইচ্ছা একমাত্র পরমেশ্বরেরই, যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অধীশ্বর, যিনি আত্মা, যিনি আমিরূপে প্রকাশিত, তিনিই মহতী ইচ্ছারূপিণী মহতী শক্তি। সেই মহতী ইচ্ছার সম্যক্ অনুবর্ত্তন অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রণিধান করিবার ফলে জীবভাবীয় ইচ্ছা বলিতে আর কিছুই থাকে না। এই অবস্থায় উপনীত হইলেই যোগী দেখিতে পান—তাঁহার প্রাকাম্য বিভূতি লাভ হইয়াছে। এই অবস্থায় যোগীর চিত্তে যাহা ইচ্ছারূপে প্রকাশ পায়, তাহা মহতী ইচ্ছা হইতে ভিন্ন না হওয়ার ফলে কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইচ্ছাগুলি পর্য্যন্ত মহতী ইচ্ছায় মিলাইয়া দিতে পারিলেই সাধক এই প্রাকাম্য বা ইচ্ছার অনভিঘাতরূপা বিভূতি লাভ করিতে পারেন।

ষষ্ঠ বিভূতি বশিত্ব। ভূত-ভৌতিক-বশ্যতাই ইহার স্বরূপ। ভূত এবং ভৌতিক বস্তুরূপে যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে, সে সকলই আমার সত্তায় সত্তাবান্, আমার প্রকাশেই প্রকাশিত। আমি আশ্রয় বা আধার এবং উহারা আশ্রিত বা আধেয়, এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ হওয়াই বশিত্ব নামক বিভূতি।

সপ্তম ঈশিত্ব। স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ, গ্রাহ্য বস্তু মাত্রেরই এই ত্রিবিধ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এই ত্রিবিধ অবস্থাকে যথাযথ রূপে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার যে সামর্থ্য, তাহাকে ঈশিত্ব কহে। পূর্ব্বোক্ত বশিত্ব বিভূতি হইতেই ইহারও প্রকাশ হয়। আমিই ত যাবতীয় স্থূল সূক্ষ্মাদির নিয়ন্তা। "আমার ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়, আমারই শাসনে বায়ু প্রবাহিত হয়, আমার ভয়েই অগ্নি তাপ দেয়, আমিই

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থূলসূক্ষ্মাদি যাবতীয় বস্তুকে সুনিয়মিত করিয়া থাকি।" এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভবের নাম ঈশিত্ব লাভ। ভূতজয়ী যোগীর পক্ষে ইহা স্বতঃসিদ্ধ বিভূতি।

অষ্টম যত্র কামাবসায়িত্ব। কামনাসমূহের সম্যক্ অবসান হওয়ার নাম যত্রকামাবসায়িত্ব। এক কথায় ইহাকে পূর্ণকামত্ব বলা যায়। "পূর্ণকামোঽস্মি সংবৃত্তঃ" আমি পূর্ণকাম হইয়াছি। আর আমার চাহিবার বা পাইবার কিছুই বাকী নাই। আমি আমার স্বরূপের সন্ধান পাইয়াছি। ইহার পর আর জ্ঞাতব্য বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না। এইরূপ অনুভূতির উদয় হইলেই বুঝিতে পারা যায়—যোগী যত্রকামাবসায়িত্ব। বিভূতি লাভে ধন্য হইয়াছেন। একমাত্র আত্মজ্ঞানেই সর্ব্ববিধ কামনার অবসান হইয়া যায়। ভূতজয়ী যোগী নির্ব্বিশেষ সত্তামাত্রস্বরূপ আত্মার সন্ধান পাইয়া এইরূপে আটটী মহতী বিভূতি লাভ করিয়া থাকেন।

এই অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মধ্যে যেরূপ সুদৃঢ় সংস্কার বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে এরূপ ব্যাখ্যা অনেকেরই প্রীতিকর না হইতে পারে; কিন্তু ভরসা আছে—যিনি যোগেশ্বরী মা, তিনি নিজেই প্রত্যেকের অন্তর্য্যামি-দেবতা রূপে—গুরুরূপে তাঁহাদের যোগচক্ষুঃ উন্মীলিত করিয়া দিবেন। তখন তাহারা এই সত্যের পবিত্র স্নিগ্ধ আলোক পাইয়া সকল সংশয় সকল সংস্কারের পর পারে চলিয়া যাইবে। মাগো, সন্তানের এ আশা কখনও নিষ্ফল হইতে পারে না, তুমি নিজেই ত এ হৃদয়াকাশে আশারূপে ফুটিয়া উঠিয়া ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল আলোকের কল্পিত চিত্র সত্যরূপেই দেখাইয়া দিতেছ। মা মা মা!

रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायसम्पत् ॥४६॥

प्रागुक्तां कायसम्पदं विवृणोति रूपेति। रूपलावण्यबलवज्र-संहननत्वानि—रूपं नाम सर्व्वत्र समुद्भासितमपि दुर्निरूपणीयं किमपि मूकास्वादनवद् वस्तु चिन्मयमिति, लावण्यं श्रीः सौन्दर्य्यम्, तच्च चैतन्यं नान्यदिति भावः, बलं अनपेक्षावाधित-स्वसत्ता-प्रकाश-सामर्थ्यं, वज्रसंहननत्वं वज्रस्येव संहननं कायस्तस्य भावः अन्यानभिभाव्य-स्वरूपोऽन्येषामभिभावकश्चेत्यर्थः। श्रुतिरपि महद्-भयं वज्रमुद्यतं, भयादस्य तपति सूर्य्य इत्यादिभिरात्मनो वज्रसंहननत्वं कीर्त्तयति। एतानि रूपादीनि कायसम्पत् कायस्य चिदात्मनो मम सम्पदैश्वर्य्यमिति प्रत्यक्षानुभूतिरूपा विभूतिरित्यर्थः। न केवल-मेतावदपितु तद्धर्म्मानभिघातश्च तद्धर्म्माणां कायसम्पद्धर्म्माणामनभि-घातो नित्यत्वमित्यर्थः। धर्म्मधर्म्मिभेदरहितस्यापि पुरुषस्य रूप-लावण्यादिरूप धर्म्मकथनं वुभुत्सु प्रतिपत्तय एव॥ ४६ ॥

এই সূত্রে পূর্ব্বোক্ত কায়সম্পৎ প্রপঞ্চিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—রূপ লাবণ্য বল এবং বজ্রসংহননত্ব, ইহারাই কায় সম্পৎ। যাহা সর্ব্বত্র উদ্‌ভাসিত অথচ ভাষায় বা চিন্তায় যাহার স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না, মূকাস্বাদনবৎ অনির্ব্বচনীয় সেই বস্তুর নাম রূপ। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে রূপ বলিয়া বুঝিয়া লই, উহা রূপ নহে—আকৃতি। আকৃতি ও রূপ এক বস্তু নহে। রূপের কোন রূপ নাই, অথচ সকলেই উহা অনুভব করিতে পারে। চৈতন্য বস্তুরই অন্য নাম রূপ। চৈতন্য যখন জড়পদার্থের সহিত অন্বিত হইয়া প্রকাশ পায়, তখনই তাহার নাম হয়—রূপ।

লাবণ্য—"মুক্তাফলেষু চ্ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে"। লাবণ্যের স্বরূপ বলিতে গিয়া প্রাচীনগণ এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটির উল্লেখ করিয়া থাকেন। সাধারণ কথায়—শ্রী সৌন্দর্য্য চারুতা প্রভৃতি শব্দে আমরা যাহা বুঝিয়া লই, লাবণ্য অনেকটা সেই ধরণের বস্তু। অতি কুৎসিৎ বস্তুরও একটা শ্রী আছে। এই শ্রী যেখানে সমধিক উদ্ভাসিত, সেই খানেই লাবণ্য প্রকাশ পায়। শিশুর মুখে চন্দ্রে পদ্মে লাবণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই রূপ ও লাবণ্য জগতের সর্ব্বত্রই পূর্ণ ভাবে অবস্থিত আছে, বুদ্ধির মলিনতা বশতঃ তাহা অনুভূত হয় না। ভূতজয়ী যোগীর বুদ্ধি নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়; তাই তাহার নিকট বিশ্বময় রূপ ও লাবণ্য প্রকাশিত হইয়া উঠে। ওগো আত্মদর্শনকারীর সর্ব্বত্রই রূপ লাবণ্য—সর্ব্বত্রই মধুরিমা! "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল।" রূপ লাবণ্য আর ফুরায় না! আত্মাই রূপ, আত্মাই লাবণ্য, গুরুকৃপায় জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মেষিত হইলে উহা প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। ওগো সাধক, ওগো প্রেমিক, তুমি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাস, যাঁহার বিরহ তুমি মুহূর্ত্তের তরেও সহ্য করিতে পার না, তাঁরই নাম রূপ, তাঁরই নাম লাবণ্য। ওগো যাঁহার উদয়ে "মদন মুরছা পায়"—কামনা বাসনা চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, তিনিই রূপ তিনিই লাবণ্য।

কেবল তাহাই নহে, বল এবং বজ্রসংহননত্বও তাঁহাতেই বিদ্যমান, অথবা তিনিই বল তিনিই বজ্রসংহনন। দেখ সাধক, এ জগতে যে যাহার আশ্রিত, সে তাহাকে বলবান্ বলিয়াই জানে। কেবল শারীরিক বল নহে, ধনবল বিদ্যাবল তপোবল যোগবল প্রভৃতি যত রকমের বল আছে, সকল বলই পরমবল পরমাত্মার আশ্রিত, পরমাত্ম-সত্তায় এবং পরমাত্মপ্রকাশেই দৃশ্যপ্রপঞ্চ সত্তাবান্ ও প্রকাশময়; সুতরাং বল বলিতে একমাত্র আত্মাকেই বুঝায়। উপনিষদ্ বলেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" বলহীন ব্যক্তি আত্মলাভ করিতে পারে না

এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা ব্যতীত অন্য কেহ আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। তিনি স্বসংবেদ্য বস্তু, বেত্তা এবং বেদ্য, উভয়ই তিনি। লব্ধা এবং লভ্য উভয়ই তিনি; সুতরাং যতক্ষণ বিন্দুমাত্র অনাত্মপ্রত্যয় আছে, ততক্ষণই সাধক বলহীন। বলহীন কিরূপে বলস্বরূপ বস্তুকে লাভ করিবে? নিরপেক্ষ এবং অবাধিত-ভাবে স্বকীয়সত্তা প্রকাশের যে সামর্থ্য, তাহাই বল। নিজের অস্তিত্বকে প্রকাশ করিবার জন্য অপর কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হয় না, অথবা অপর কেহ নিজের সত্তা প্রকাশের বাধাও জন্মাইতে পারে না, ইহা যে সামর্থ্যপ্রভাবে সম্ভব হয়, তাহাই বল। ভূতজয়ী যোগী আত্মার এই বলস্বরূপত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ইহাই বিভূতি।

তারপর বজ্রসংহননত্ব—সংহনন শব্দের অর্থ—শরীর অর্থাৎ স্বরূপ। বজ্র শব্দটী ভীতিসূচক। রূপলাবণ্যাদির ন্যায় ভীষণতাও আত্মার কায়-সম্পৎ। "মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" "ভয়াদস্য তপতি সূর্য্যঃ" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি আত্মাকে ভীতিদায়ক বজ্রস্বরূপ বস্তুরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। কাহারও মস্তকোপরি যদি উদ্যত বজ্র বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ প্রতি মুহূর্ত্তেই মস্তকে বজ্রপতনের আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে, তবে সে যেরূপ সদা সঙ্কুচিত ও ভীতভাবে অবস্থান করে এবং সর্ব্বতোভাবে আজ্ঞা-নুবর্ত্তী হয়, ঠিক সেইরূপ এই বিশ্বের উপর, এই আমির উপর, এই চতুর্দ্দশ লোকাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের উপর মহদ্‌ভয় উদ্যতবজ্রস্বরূপ আত্মা বিরাজ করিতেছেন; তাই সকলেই যথা নিয়মে স্ব স্ব কর্ম্মচক্রের সর্ব্বথা অনুবর্ত্তন করিতেছে। এক তিলমাত্র অন্যথা করিবার উপায় নাই। যদি কেহ কল্পনায়ও এই উদ্যতবজ্রস্বরূপ বস্তু আত্মা হইতে নিজেকে স্বতন্ত্ররূপে স্বাধীনরূপে দর্শন করিতে প্রয়াস পায়, অমনি তাহার নিজের বিশিষ্ট সত্তাটুকু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। এমনই অব্যর্থ শাসন। তাই সত্যদর্শী ঋষিগণ উদাত্তস্বরে গাহিয়াছেন—"তাঁহারই ভয়ে সূর্য্যদেব প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে উদিত হইয়া থাকেন, তাঁহারই ভয়ে পবনদেব সতত সঞ্চরমান, তাঁহারই ভয়ে অগ্নিদেব উত্তাপ প্রদান

করেন, তাঁহারই ভয়ে মৃত্যুদেব নিয়ত জীবসংহরণ কার্য্যে নিরত রহিয়াছেন। সে যাহা হউক, আত্মার এই যে অনভিভাব্যত্ব এবং সকলের অভিভাবকত্ব, ইহাকে লক্ষ্য করিয়া যোগদর্শনের ঋষি বজ্র সংহননত্ব পদটীর প্রয়োগ করিয়াছেন। ভূতজয়ী যোগীর পক্ষেই ইহা প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া থাকে।

এই যে রূপ, লাবণ্য, বল এবং বজ্রসংহননত্ব, এই চারিটীই কায়সম্পদ্। কায়সম্পদ্ বলিতে স্বস্বরূপের ঐশ্বর্য্য বুঝায়। "চৈতন্যস্বরূপ আমিই রূপময় লাবণ্যময় বলবান্ এবং বজ্রসংহনন।" এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভের নামই কায়সম্পদ্রূপ বিভূতির আবির্ভাব। ওগো, আমি কত মহান্। এই বিশ্বভরা রূপরাশি আমার, এই বিশ্বময় লাবণ্য আমারই অঙ্গের তরল ছায়া, আমার প্রকাশ কাহাকেও অপেক্ষা করে না, আমার প্রকাশের বাধাও কেহ জন্মাইতে পারে না। আমার স্বরূপ বজ্রের মতনই ভীতিদায়ক এবং অনভিভবনীয়। এইরূপ অনুভূতি আসিতে থাকিলেই সাধক বুঝিতে পারেন, তাঁহার কায়সম্পদ্ নামক বিভূতি প্রকাশ হইতেছে।

তদ্ধর্ম্মানভিঘাত পদটী পূর্ব্বসূত্রে উল্লিখিত হইলেও এইস্থলেই তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তদ্ধর্ম্ম অর্থে রূপ লাবণ্য প্রভৃতি কায় সম্পদ্কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তদ্ধর্ম্মের অর্থাৎ রূপ লাবণ্য বল এবং বজ্রসংহননত্বরূপ ধর্ম্মের অনভিঘাত হয়। উহাদের কোন কালেই বিনাশ হয় না। আত্মা নিত্য বস্তু; সুতরাং কায়সম্পৎ সমূহও নিত্যই বিদ্যমান থাকিবে, কোন অবস্থায়ই তাহার অভিঘাত হইতে পারে না। আশঙ্কা হইবে—আত্মা ত ধর্ম্মধর্ম্মি-ভেদরহিত অদ্বিতীয় বস্তু, তাঁহার আবার ধর্ম্ম কিরূপে সম্ভব হয়? হ্যাঁ, সত্যই আত্মাতে কোনরূপ ধর্ম্মধর্ম্মি-ভেদ নাই, থাকিতেই পারে না; তথাপি আত্মস্বরূপ-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইলে ঐরূপ ভেদ-বোধক বাক্যপ্রয়োগ করিতেই হয়। বস্তুতঃ রূপ লাবণ্য বল প্রভৃতি

আত্মার ধর্ম্ম—আত্মার স্বরূপই। আত্মার রূপ, আত্মার লাবণ্য, আত্মার বল প্রভৃতি প্রয়োগ হয় বটে; কিন্তু অনুভূতি যখন হইতে থাকে, তখন "আমিই রূপ আমিই লাবণ্য আমিই বল" ইত্যাদি রূপে হইয়া থাকে। এ সকল বিভূতি অপূর্ব্ব। ও গো, এ বিভূতি আসিলে সাধকের আনন্দ এ পৃথিবীতে ধরে না, সাধকের প্রভাব এ বিশ্ব ধারণ করিতে পারে না। প্রিয়তম সাধক! এস, গুরু বলিয়া ঈশ্বর-প্রণিধানের পথে অগ্রসর হও! তুমিও ইহা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিবে।

গ্রহণ-স্বরূপাস্মিতান্বয়ার্থবত্ত্ব-সংযমাদিন্দ্রিয়-জয়ঃ ॥ ৪৩॥

অথেন্দ্রিয়জয়রূপামাহ বিভূতিং গ্রহণেতি। গ্রহণস্বরূপাস্মিতান্বয়ার্থবত্ত্ব সংযমাৎ—গ্রহণং বিষয়সংস্পর্শঃ, স্বরূপং বিষয়প্রকাশকত্বং, অস্মিতা ক্লতব্যাখ্যানা, অন্বয়ো গুণত্রয়ঃ, অর্থবত্ত্বং লীলাশক্তিরনির্ব্বচনীয়া, পঞ্চস্বেতেষু সংযমাদিন্দ্রিয়জয় ইন্দ্রিয়াণাং করণানাং জয়ঃ সত্তাহীনতানুভবরূপো ভবতীতি শেষঃ। বিভূতিরিয়মেব। চিদ্রূপস্য সত্তা যথা যথা বুদ্ধৌ সমুজ্জ্বলমুদ্ভাসতে তথা তথানাত্মপ্রতীতিবিলয়ঃ স্যাদিতি প্রথমত স্তাবদ্ভূতজয়েন গ্রাহ্যবিলয়স্ততঃ ইন্দ্রিয়জয়েন গ্রহণবিলয় ক্তঃ ॥৪৩॥

এইসূত্রে ইন্দ্রিয়জয় রূপা বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন —গ্রহণ স্বরূপ অস্মিতা অন্বয় এবং অর্থবত্ত্ব, এই পঞ্চবিধরূপে সংযম প্রয়োগ হইতে ইন্দ্রিয়জয়রূপাবিভূতি আবির্ভূত হয়। গ্রহণ—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত রূপরসাদি বিষয়ের সংস্পর্শ। স্বরূপ—ইন্দ্রিয় কর্তৃক বিষয়ের প্রকাশ, সাংখ্যের ভাষায় ইহাকে আলোচনজ্ঞান কহে।

অস্মিতা কি, তাহা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অন্বয় শব্দের অর্থ গুণত্রয় এবং অর্থবত্ত্ব শব্দের অর্থ অনির্ব্বচনীয়া লীলাশক্তি, এই দুইটীর সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে ভূতজয়সূত্রে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। এই পঞ্চবিধরূপে সংযম প্রয়োগ হইতে ইন্দ্রিয়জয় সিদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়বর্গের সর্ব্ব প্রথম যে রূপটী আমাদের অনুভবে আসে, ঋষি তাহার নাম দিলেন—গ্রহণ। বিষয়কে গ্রহণ করাই ইন্দ্রিয়ের প্রথম রূপ। অভীষ্ট-বিষয় সন্নিহিত হইলে এবং কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত না হইলে, ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া পড়ে। এই গ্রহণ ভাবটীকে অবলম্বন করিয়া ধারণা ধ্যান ও সমাধিরূপ সংযম প্রয়োগ করিলে ইন্দ্রিয়ের পর পর রূপগুলি আপনা হইতেই উপস্থিত হইতে থাকে; ইন্দ্রিয়ের দ্বিতীয় রূপ—বিষয়-প্রকাশকত্ব। যদিও নির্ম্মল বোধ-সত্ত্ব ব্যতীত বিষয়ের সর্ব্বাংশ প্রকাশিত হয় না, তথাপি ইন্দ্রিয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সম্বন্ধ হইলেই প্রমাতৃচৈতন্যের আভাস আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাদ্বারাই বিষয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এইরূপে ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়সমূহের যে আংশিকভাবে প্রকাশিত হওয়া, সূত্রে ইহাকেই ইন্দ্রিয়গণের স্বরূপ বলা হইয়াছে। সংযমের সাহায্যে যোগীকে ক্রমে গ্রহণ হইতে এই স্বরূপে উপনীত হইতে হয়।

তার পর অস্মিতা। ইন্দ্রিয়গুলি যে অস্মিতার বিভিন্ন ব্যূহমাত্র ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। "আমি রূপগ্রহণ-শক্তিময়" "আমি শব্দ গ্রহণ শক্তিময়", এইরূপ যে বোধপ্রবাহ, তাহারাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে; সুতরাং ইন্দ্রিয়ে সংযম প্রয়োগ করিলে উহার গ্রহণ ভাব ও স্বরূপ হইতে ক্রমে অস্মিতাক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হওয়া যায়। অতঃপর অন্বয়—অর্থাৎ প্রকাশ প্রবৃত্তি স্থিতিরূপ গুণত্রয়। অস্মিতায় সংযত হইলেই তৎকারণ স্বরূপ গুণত্রয়ে আসিয়া পৌঁছান যায়। অবশেষে এই অন্বয়ের বা গুণত্রয়েরও যাহা কারণ, তাহার দিকে লক্ষ্য ফিরাইতে হয়, তখন অর্থবত্ত্বকে পাওয়া যায়, অর্থাৎ

অবিদ্যাশক্তি কর্তৃক পরিকল্পিত পুরুষের ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজন-সাধনের জন্যই যে গুণত্রয় প্রকাশিত, ইহা তখন অনুভবগম্য হইতে থাকে। এইরূপ অনুভবের ফলে বুদ্ধি অতিশয় স্বচ্ছতাপ্রাপ্ত হয়, তখন যাহা প্রকৃত সত্তা, যাহার কোনরূপ অন্যথা হয় না, সেই চৈতন্য স্বরূপ বস্তুটী উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে যে ইন্দ্রিয়গুলিকে অবলম্বন করিয়া আমরা বিশেষভাবে আত্মসত্তা অনুভব করি, তাহাদের আর কোন প্রয়োজনীয়তাই পরিলক্ষিত হয় না। উহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিয়াও "আমি" বেশ থাকিতে পারে। এইরূপ অনুভূতি লাভ হওয়ার ফলে ইন্দ্রিয়গুলির পারমার্থিক সত্তা-বিষয়ক প্রতীতি চিরতরে বিলয় হইয়া যায়। ইহারই নাম ইন্দ্রিয়জয় নামক অপূর্ব্ব বিভূতি। "যে ইন্দ্রিয়গুলির উচ্ছেদ কামনায় জন্ম জন্মান্তর কাটিয়া গিয়াছে, যে ইন্দ্রিয়গুলির ভোগ-লালসা নিবৃত্তি করিবার চেষ্টায় অসংখ্যবার জন্ম মৃত্যুর যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছে, সেই ইন্দ্রিয়গুলি বাস্তবিক নাই। কি মোহে কি ধাঁধায় এতদিন বিচরণ করিতেছিলাম? ছায়াকে ভূত মনে করিয়া ভূতের ভয়ে ব্যাকুল ছিলাম। ওহো, আজ কি আনন্দ! ইন্দ্রিয় বলিতে কিছু নাই। কোন কালেই ছিল না। ওগো, আজ আমি ইন্দ্রিয়ের বন্ধন হইতে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হইতে চির মুক্ত!" এইরূপ জ্ঞানের উদয় হওয়াই ইন্দ্রিয়জয়, ইহাই বিভূতি।

প্রিয়তম সাধক, মনে রাখিও—কাহাকেও জয় করিতে হইলে তদপেক্ষা অধিক বলের প্রয়োজন হয়। যতদিন তুমি ইন্দ্রিয়রূপ বৃত্তিগুলিকে আশ্রয় করিয়া আত্মসত্তা অনুভব করিবে, ততদিন তোমাকে ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়াই থাকিতে হইবে। তার পর যেদিন গুরুকৃপায় সংযমবল পাইয়া ইন্দ্রিয়-বিরহিত আত্মসত্তাটীকে অক্ষুণ্ন ভাবেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, সেই দিন তোমার ইন্দ্রিয়জয় সিদ্ধ হইয়া যাইবে। কিরূপ প্রণালীতে ইন্দ্রিয়জয় করিতে হয়, তাহা দেখাইতে গিয়াই ঋষি গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয় এবং

অর্থবত্ত্বরূপ ক্রমের উল্লেখ করিলেন। ভূতজয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয়জয় কঠিন। ভূতজয় হইলে স্থুল-দেহাত্মবুদ্ধি বিলয় হয়, আর ইন্দ্রিয় জয় হইলে সূক্ষ্ম দেহে যে আত্মবুদ্ধি আছে, তাহাও বিলয় হইয়া যায়। স্থুল কথা এই যে—ভূতজয় বলিতে গ্রাহ্য বিলয় এবং ইন্দ্রিয়জয় বলিতে গ্রহণের বিলয় বুঝিতে হইবে। সাধনা ক্রমে ক্রমে উন্নত স্তরেই আরোহণ করে। কেহ ভূতজয় না করিয়াই ইন্দ্রিয়জয়ে সমর্থ হয় না। যাঁহারা মনে করেন—একেবারে আত্মস্বরূপ উদ্ভাসিত হইলেই ত ভূতজয় ও ইন্দ্রিয়জয় সিদ্ধ হইয়া যায়, তাঁহাদের ইহাও মনে রাখা উচিত যে, এই যোগশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পন্থায় অগ্রসর হইলেই আত্মস্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। সকল সম্প্রদায়ের সাধকই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই পথে চলিতেছেন।

ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधान-जयश्च ॥४८॥

सङ्कीर्त्तयतीन्द्रियजयफलं तत इति। ततस्तस्मादिन्द्रियजयात् मनोजवित्वं मनसोऽवाधितविचरणसामर्थ्यमिति भावः, धर्म्माधर्म्मादि-द्वन्द्वातीत सत्तालाभादेवं सम्भवति। विकरणभावः करणरहितात्म-सत्तानुभवः, प्रधानजयश्च प्रधानस्य लीलाशक्तेरिति भावः जयः त्रैकालिक सत्ताहीनतानुभव इत्यर्थः। सत्ता हि नाम सा, या खलुचैतन्यमात्रे-व्यवस्थिता, न जड़ेऽनात्मनि। एतास्तिस्रोविभूतयो मधुप्रतीकाख्यया-भिधीयन्त इति ॥ ४८ ॥

এইসূত্রে ইন্দ্রিয়জয়ের ফল সঙ্কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহা হইতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জয় হইতে মনোজবিত্ব, বিকরণ ভাব এবং

প্রধানজয় রূপা তিনটী বিভূতির প্রকাশ হয়। (১) মনোজবিত্বং—জব শব্দের অর্থ গতি। মনের যে অবাধিত গতিসামর্থ্য, তাহাকেই মনোজবিত্ব কহে। যতদিন আত্মস্বরূপের সন্ধান পাওয়া না যায়, ততদিন মন স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে পারে না। পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বগুলি উপস্থিত হইয়া মনের সে স্বাধীন উল্লাসকে বিনষ্ট করিয়া দেয়। সাধক যত বেশী মুক্তির সন্নিহিত হইতে থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়রূপ বন্ধন বিরহিত হইয়াও আত্মসত্তা অনুভবের সামর্থ্য লাভ করে, ততই সে স্বাধীনতার আস্বাদ পাইতে থাকে। পূর্ব্বে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বিধিনিষেধের অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিতে হইত, আর এখন উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে আসিয়া তত ভাবিবার তত বিচার করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। এই অবস্থায় মনকে স্বাধীনভাবে চলিতে দিতে পারা যায়। আশঙ্কা করিও না সাধক, তবে বুঝি ইন্দ্রিয়জয়ী যোগিগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বিচার না করিয়া যথেচ্ছভাবে কার্য্য করেন! না তাহা করেন না। যাঁহারা পূর্ব্বোক্তরূপ ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হন, তাঁহারা কখনও গর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করতেই পারেন না। চিত্ত সম্যক্ নির্ম্মল না হইলে এসকল ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেই পারা যায় না। যতবেশী অতীন্দ্রিয় বস্তুর সন্নিহিত হওয়া যায়, তত বেশী স্বাধীনতা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের এই যে স্বাধীনতা—এই যে স্বৈরবিচরণ-সামর্থ্য, ইহাকেই মনোজবিত্ব কহে।

বিকরণভাব শব্দের অর্থ—করণ রহিত অবস্থা। করণ চতুর্দ্দশটী। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কাররূপ চারিটী। এই চতুর্দ্দশ করণরহিত হইয়াও আত্মসত্তার অনুভব করিবার সামর্থ্যকে বিকরণভাব কহে। সাধারণ মানুষের যখন এই বিকরণ অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন সে সুষুপ্ত হইয়া পড়ে, তখন আর আত্মসত্তাই অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু ইন্দ্রিয়জয়ী যোগী বিকরণ হইয়াও ভাবময় সত্তাময় রূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হন। এইরূপ নিরালম্ব

আত্মসত্তার অনুভবসামর্থ্য উপস্থিত হইলেই বুঝিতে পারা যায়—"বিকরণভাব" নামক বিভূতির আবির্ভাব হইয়াছে।

তার পর প্রধানজয়। প্রধান শব্দের অর্থ—প্রকৃতি। প্রকৃতি কি, তাহা দ্বিতীয় পাদে বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "প্রকৃতি নামে কিছু আছে" এইরূপ যে প্রতীতি, তাহার বিলয় হওয়ার নামই প্রকৃতিজয়। সত্তা যে একমাত্র আত্মাতেই—চৈতন্যস্বরূপ বস্তুতেই বিদ্যমান, তাহা প্রত্যক্ষ হইলে আর অনিত্যবস্তু-বিষয়ক সত্তাজ্ঞান থাকিতেই পারে না; সুতরাং যাবতীয় বিশিষ্ট সত্তার মূল যে প্রকৃতির সত্তা, অর্থাৎ যাহা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপা প্রকৃতি নামে অভিহিত, তাহা বাস্তবিক নাই, বা থাকিতেই পারে না। শুন প্রিয়তম সাধক, সাধনার প্রথম অবস্থা হইতে পুরুষেরই প্রকৃতি বলিয়া বুঝিয়া লইতে হয়, অর্থাৎ পুরুষই প্রকৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, এইরূপ জ্ঞান নিয়া অগ্রসর হইতে হয়। তার পর যখন গুরু কৃপায় বহুজন্মসঞ্চিত সুকৃতিবশে পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তখনই বুঝিতে পারা যায়—পুরুষ পুরুষই, তিনি কখনও প্রকৃতি হন না, বা তাঁহার কোন রূপ প্রকৃতির আবশ্যকতাও নাই। এইরূপ পরমার্থিকী প্রজ্ঞার উদয় হইলেই প্রকৃতিজয় নামক চরম-বিভূতির সাক্ষাৎকার লাভ হয়। মনুষ্য-জীবনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অভ্যুদয় আর কিছুই নাই।

সাধক! হরগৌরী মূর্ত্তি দেখিয়াছ! বরাভয়হস্তা স্বর্ণবর্ণা গৌরী হরক্রোড়ে উপবিষ্টা! সে অপূর্ব্বমূর্ত্তি স্মরণ করিলে এই প্রধানজয়ের চিত্রটীই চিত্তপটে ফুটিয়া উঠে। জীব যতদিন শিশু থাকে, বিশুদ্ধবোধস্বরূপ পুরুষকে অনুভব করিতে না পারে, ততদিন ঐ প্রকৃতিই তাহাকে—ঐ জীবরূপী শিবকে জ্ঞানস্তন্য পান করাইয়া জন্মের পর জন্ম ধরিয়া পরিপুষ্ট করিতে থাকেন। যখন শিশুত্ব দূর হয়, শিব যখন স্বকীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন ঐ প্রকৃতিই তাঁহার বশীভূতা হয়, অর্থাৎ ক্রোড়োপরি উপবিষ্টা হইয়া অপূর্ব্ব আনন্দরসের

আস্বাদ প্রদান করে। তাই ত আমরা "শিবমাতা শিবানী চ ব্রহ্মাণী ব্রহ্মজননী বৈষ্ণবী বিষ্ণুপ্রসূতি" বলিয়া ইহাঁরই চরণে প্রাণের পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া ধন্য হই।

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বং চ ॥৪৯॥

প্রধানজয়ফলমাহ সত্ত্বেতি। সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি মাত্রস্য —সত্ত্বস্য বুদ্ধ্যুপহিতচিৎপ্রতিবিম্বস্য, পুরুষস্য চিতিমাত্রস্বরূপস্য বিম্বস্য চ, যা অন্যতা বিলক্ষণতা, একস্য ব্যবহারিকী সত্তানির্ব্বচনীয়াঽপরস্য তু পারমার্থিকীত্যেবংরূপা ; তস্যাঃ খ্যাতিমাত্রস্য তাদৃশীখ্যাতিমাত্রেঽবস্থিতস্য বুদ্ধিসত্ত্বস্য ন তু পুরুষস্যেতি ভাবঃ। সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বভাবানাং সর্ব্বরূপেণ প্রতীতি গোচরাণামনাত্মপ্রত্যয়াণামধিষ্ঠাতৃত্বমধিকরণতা তথা সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বং চ সর্ব্বেষাং জ্ঞেয়ানাং জ্ঞাতৃত্বং জ্ঞানক্রিয়া কর্তৃত্বং চৈবং সমুদেতি সুনির্ম্মলা প্রজ্ঞা ; তয়াং চ দ্রষ্টুমর্হন্তি যোগিনঃ এষা দ্বয়ী মহ্যেব পুরুষে তু পরিকল্পিতেতি ॥ ৪৯ ॥

এই সূত্রে প্রধানজয় অর্থাৎ প্রকৃতিজয়ের ফল পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—সত্ত্ব এবং পুরুষের অন্যতা খ্যাতি মাত্রের সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব হইয়া থাকে। সত্ত্ব শব্দের অর্থ— 'বুদ্ধিসত্ত্ব' অর্থাৎ বুদ্ধিতে উপহিত চিৎপ্রতিবিম্ব, পুরুষ—চিন্মাত্র স্বরূপ বিম্ব, এই উভয়ের অর্থাৎ প্রতিবিম্ব ও বিম্বের যে অন্যতা—একটী চিদাভাস স্বরূপ অন্যটী চিন্মাত্রস্বরূপ, একটীর ব্যবহারিক সত্ত্বা অন্যটীর

পারমার্থিক সত্ত্বা, এই যে বিলক্ষণতা, এই বিলক্ষণতামাত্রই যখন খ্যাতি হইতে থাকে, তখন সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বরূপ বিভূতি প্রকাশিত হয়। শুন, খুলিয়া বলিতেছি—যোগী যখন বুদ্ধি ও পুরুষের সম্পূর্ণ বিভিন্নতা অনুভব করিতে সমর্থ হন, তখন সর্ব্বভাবের অধিষ্ঠাতৃত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব তাঁহার নিজেতেই অর্থাৎ বুদ্ধিসত্ত্বেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সর্ব্বরূপে—অনাত্মপ্রত্যয়রূপে যাহা কিছু প্রতীতিগোচর হয়, তাহাকে সর্ব্বভাব কহে। এই সর্ব্বভাবের যে অধিষ্ঠাতৃত্ব অর্থাৎ অধিকরণতা, তাহাই সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব এবং সর্ব্বরূপে—জ্ঞেয়রূপে যাহা কিছু প্রতিভাত হয়, সে সকলের যে জ্ঞাতৃত্ব অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়া কর্তৃত্ব, তাহাই সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব। "এতদুভয় আমাতেই নিত্য অবস্থিত—আমাতেই সকল প্রতিষ্ঠিত,আমিই সকলের জ্ঞাতা, আমারই প্রকাশে সকল প্রকাশিত, আমারই সত্তা আশ্রয় করিয়া সকল অবস্থিত," এইরূপ সুদৃঢ় প্রজ্ঞার উদয় হওয়াকেই সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব রূপ বিভূতি বলা হয়। সর্ব্বের সহিত বিম্বস্বরূপ পুরুষের যে কোন সম্বন্ধই নাই, প্রতিবিম্বস্বরূপ বুদ্ধিসত্ত্বেই যে উহা অবস্থিত, এইরূপ জ্ঞানলাভ হইলেই বুঝিতে পারা যায়—যোগীর অন্যতাখ্যাতি হইয়াছে। যাহা বুদ্ধির অর্থাৎ প্রতিবিম্বের ধর্ম্ম, তাহা বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ পুরুষে আরোপিত করাই অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞান প্রভাবেই জীব পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুরূপ সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু যে জীব বহুজন্ম-সঞ্চিত সুকৃতিবশে শ্রীগুরুর অহৈতুকী কৃপায় এই ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হয়, যাহার বুদ্ধি ও পুরুষের অন্যতা খ্যাতিমাত্রে অবস্থানের যোগ্যতা লাভ হয়, তাহার সংসারবন্ধন চিরতরে বিদূরিত হইয়া যায়।

সূত্রকার এস্থলে 'মাত্র' শব্দের প্রয়োগ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, যতক্ষণ "অন্যতাখ্যাতি হইতে থাকে অর্থাৎ বুদ্ধি" ও পুরুষের পার্থক্য যতক্ষণ বুদ্ধিতে প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, মাত্র ততক্ষণই—মাত্র সেই সময়টুকুর জন্যই সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বরূপ বিভূতির প্রকাশ হইয়া থাকে,

যে মুহূর্ত্তে ঐরূপ খ্যাতি হইতে বুদ্ধিসত্ত্ব নিম্নে অবতরণ করে—পৌরুষীয় সত্তার অনুভব না করিয়া যখন অনাত্মবস্তুর সত্তা স্বীকার করিতে থাকে, তখন আর ঐ বিভূতির প্রকাশ থাকে না।

শুন, পূর্ব্বে যে অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহারই যথার্থ স্বরূপ এই "সত্ত্বপুরুষান্যতা খ্যাতি" শব্দটী দ্বারা পরিব্যক্ত হইয়াছে। অস্মিতা ও সত্ত্ব অভিন্ন, "এক অহং"ই যে বহুরূপে—সর্ব্বরূপে বিরাজ করিতেছে, এই বহুর সহিত—সর্ব্বের সহিত চিন্মাত্র স্বরূপ পুরুষের যে কোন সম্বন্ধই নাই, তাহার প্রত্যক্ষ অনুভব এই ক্ষেত্রে আসিলে পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্তরূপ প্রধানজয় হইলে অর্থাৎ প্রধানের স্বরূপ অবগত হইতে পারিলেই এইক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া যায়।

অজ্ঞানতাই প্রধানের স্বরূপ। স্বকীয় স্বরূপের অনুভব না করারূপ একটী অব্যক্ত অবস্থা এই সত্ত্ব ও পুরুষের মধ্যস্থলে অবস্থিত। যিনি বিশুদ্ধ বোধমাত্র স্বরূপ পরমাত্মা, তিনি যে কি করিয়া "একোঽহং বহুস্যাম" রূপে সর্ব্বভাবের অধিষ্ঠাতা ও জ্ঞাতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তাহা নিরূপণ করিতে গিয়া ঐ অহং এবং পুরুষের মধ্যবর্ত্তী অজ্ঞানরূপ অব্যক্ত সত্তাটীকেই বুঝিয়া লইতে হয়। আবার পক্ষান্তরে যাহা অহংরূপে সর্ব্বভাবের আধার রূপে প্রকাশিত,তাহা যে কিরূপে স্বকীয় অহং ভাবটীকে চিরতরে বিসর্জ্জন করিয়া নির্ব্বিশেষ সত্তামাত্রস্বরূপ পরমাত্মায় মিলাইয়া যায়, তাহার নির্ণয় করিতে হইলেও ঐ অজ্ঞানরূপ অব্যক্ত অবস্থাটীর প্রতিই লক্ষ্য নিপতিত হইয়া থাকে। মনে রাখিও সাধক, এই প্রধান বা প্রকৃতি কখনও অনুভূতির বিষয় হয় না; তাই উহার একটি নাম অব্যক্ত। একদিকে অহংএর অনুভব হয়, অন্যদিকে পরমাত্মসত্তারও আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী অবস্থাটী যে কি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, তবে উহা যে স্ব স্বরূপের অজ্ঞান রূপ একটী অব্যক্ত অবস্থা, ইহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

এস অনুভূতি সম্পন্ন সাধক, এস কৈবল্যপ্রার্থী যোগী, আমার যোগেশ্বরী মায়ের কৃপায় শ্রীগুরুর অপ্রতিহত শক্তির বলে এইখানে আসিয়া উপস্থিত হও। শুধু "আমি আছি" এই বোধটী ধরিয়া অবস্থান করিতে চেষ্টা কর। ঐরূপ চেষ্টা করিলেই "আমি" এবং "আছে" এই উভয়ের মধ্যে যে কি পার্থক্য, তাহা সম্যক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। তখন প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে—অহংরূপে যাহা প্রতীতিগোচর হইতেছে, উহা ঐ "অস্তি"রূপ বিশ্বেরই অজ্ঞান-কল্পিত এক প্রকার অবস্থা মাত্র। ওগো, এই ক্ষেত্রে উন্নীত হইলে তুমি যে কি হইয়া যাইবে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তখন তুমি "ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবিতং মম" বলিয়া নিশ্চয়ই শ্রীগুরুর চরণে সম্যক্ আত্মনিবেদন করিতে সমর্থ হইবে। ওগো সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে — সর্ব্বরূপে যাহা প্রকটিত, তাহার অধিষ্ঠাতৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্বকে পর্য্যন্ত পরিহার করিতে না পারিলে "একং" এর শরণাগত হওয়া যায় না।

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥ ৫০ ॥

অথ কৈবল্যমাহ যথাক্রমং তদিতি ॥ তদ্ বৈরাগ্যাৎ তয়োঃ সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বয়োরপি বৈরাগ্যাৎ অহমিত্যস্যাপি পারমার্থিকসত্তাভাবনিশ্চয়াদেবং সম্ভবত্যেব। দোষবীজক্ষয়ে দোষাণাং জন্মমৃত্যু-সুখদুঃখাদিরূপাণাং যদ্বীজমবিদ্যারূপং তস্য ক্ষয়ে 'পারমার্থিকসত্তানুভূতিরূপায়া বিদ্যায়া উদয়ে এবং ক্ষয়োঽবশ্যম্ভাবীতি। কৈবল্যং কেবলীভাবঃ নিরস্ত-সমস্ত-ভেদঃ পরমাত্মস্বরূপোঽয় ইতি ভাবঃ। অয়মেব হি যোগোঽসম্প্রজ্ঞাতোনাম ॥ ৫০ ॥

এই সূত্রে যথাপ্রাপ্ত কৈবল্য বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—তাহাতেও বৈরাগ্য হইলে (পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠবিভূতির প্রতিও বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে) দোষবীজ ক্ষয় হওয়াতে কৈবল্য হয়। সুকৃতিশালী সাধক শ্রীগুরুকৃপায় যেমন যেমন সত্ত্ব-পুরুষের অন্যতা প্রত্যক্ষ করিতে থাকে, তেমন তেমনই সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞত্বের প্রতিও বৈরাগ্যবান্ হইতে থাকে। এইরূপ বৈরাগ্য উদয় হওয়াই একান্ত স্বাভাবিক। যখন দেখিতে পাওয়া যায়,—"আমি" রূপে যাহা প্রকাশ পাইতেছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই সর্ব্বভাব অবস্থান করিতেছে ও প্রকাশ পাইতেছে, সেই যে "একোঽহং", তাহাও বাস্তবিক অস্তিত্বহীন কল্পিত পদার্থ মাত্র। তখন এইরূপ পুনঃ পুনঃ দর্শন অনুভব ও বিচার করিতে করিতেই "অহং"এর নাস্তিত্বনিশ্চয় সুদৃঢ় হইয়া উঠে; সুতরাং সর্ব্বভাবের প্রতি বৈরাগ্য অপ্রযত্নলভ্যরূপেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। স্মরণ কর সাধক, সেই যে অভ্যাস বৈরাগ্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই যে অভ্যাস হইতেই বৈরাগ্যের উদয় বর্ণিত হইয়াছে, এখানে আসিয়া আবার তাহা স্মরণ কর। সেই "তত্র স্থিতৌ যত্নঃ" ব্যাপারটা যে স্বরূপতঃ কি, তাহা এই সত্ত্ব-পুরুষান্যতা খ্যাতির ক্ষেত্রে আসিয়াই যথাযথরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। আর দেখিতে পাইবে—ঐ অন্যতাখ্যাতি হইতেই বৈরাগ্য আসিয়া যেন অনাহুত ভাবেই উপস্থিত হইয়াছে। মনে রাখিও সাধক, এই "অহং"ত্যাগই যথার্থ-বৈরাগ্য, অহংএর গায়ের পরিচ্ছদগুলির পরিত্যাগ তাহার পূর্ব্বায়োজন মাত্র।

সে যাহাহউক, ঋষি বলিলেন— "দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্"। দোষ শব্দের অর্থ সংসার, তাহার যে বীজ—অবিদ্যা, তাহার ক্ষয় হওয়াতে কৈবল্য উপস্থিত হয়। যাহা সত্তা—যথার্থ সত্তা, তাহার প্রত্যক্ষ হইতে থাকিলে, যাহা সত্তাভাস বা অজ্ঞানকল্পিত সত্তা, তাহার ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। সত্তা ও চৈতন্য যে অভিন্ন বস্তু, ইহা যত বেশী প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকে, ততই অজ্ঞানকল্পিত সত্তা—ব্যবহারিক

অস্তিত্ব ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়ে। এইরূপ হইলেই কৈবল্যের আবির্ভাব হয়, কৈবল্য কি তাহা পরে বিস্তৃত ভাবেই আলোচিত হইবে। এস্থলে সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতেছে যে, কেবল চৈতন্য স্বরূপে অবস্থানকেই কৈবল্য কহে। ইতিপূর্ব্বে যাহাকে দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান রূপ যোগ বলা হইয়াছে, যাহা এই শাস্ত্রে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহারই অন্য নাম কৈবল্য। মনুষ্যজীবনের ইহাই চরম চরিতার্থতা—ইহাই যথার্থ পূর্ণতা।

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে পুনরনিষ্ট-প্রসঙ্গাৎ ॥৫১॥

কৈবল্যপদবীমধিরোহতঃ পুনঃ পতনশঙ্কাং নিরাকরোতি স্থানীতি। স্থানিনো ভূতিকামা নিঃশ্রেয়সকামা বা, তেষাং যদুপনিমন্ত্রণং— "দীনানাং নঃ কল্যাণায় যোগিবর্য্যো ভবন্তৌ দয়ন্তাং, নান্তরেণ ভবদ্ভিঃ কোঽপ্যুদ্ধর্ত্তাঽস্মাকং বিদ্যতে। সাক্ষাদেব ভগবদবতারা ভবন্তো জীব-কল্যাণায়ৈব পরিগ্রহজন্মান" ইত্যেবং রূপং, তত্র সঙ্গস্ময়াকরণং সঙ্গ আসক্তিঃ স্ময়ো গর্ব্বঃ—"অহো! এবমহং মহান্ সঞ্জাত ইতি"। এতয়োরকরণং, এতৌ ন কার্য্যৌ। কুত ইত্যাহ পুনরনিষ্ট প্রসঙ্গাৎ ভূয়োঽনাত্মপ্রত্যয় প্রবাহমধ্যে পতনপ্রসক্তেঃ। যদ্যপি সত্ত্বপুরুষান্যতা খ্যাতি-মাত্রস্য প্রাকৃতজনবৎ বিষয়বিমূঢ়তা কদাপি নৈবসম্ভবেত্তথাপি জীবন্মুক্তস্য বিঘ্নিষ্টানন্দবিঘাতকং হি স্থান্যুপনিমন্ত্রণমিতি ধ্যেয়ম্ ॥ ৫১ ॥

এইসূত্রে কৈবল্য-পদারোহী যোগীর পুনরায় পতন-শঙ্কা নিরাকৃত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—স্থানিদিগের উপনিমন্ত্রণ উপস্থিত হইলে

তাহাতে সঙ্গ এবং স্ময় করা কর্ত্তব্য নহে, ঐরূপ করিলে পুনরায় অনভীষ্ট প্রাপ্তির আশঙ্কা আছে।

যাহারা শাস্ত্রীয় পন্থায় অভ্যুদয়কামী অথবা যাহারা মুমুক্ষু, তাহাদিগের পক্ষে আত্মজ্ঞ পুরুষের অর্চ্চনা আবশ্যক, ইহা উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে। ঐরূপ ব্যক্তিগণকে পাতঞ্জলের ঋষি "স্থানী" শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৈবল্যপদে আরোহণ করিবার পথে যাঁহারা আসিয়া যোগীকে উপনিমন্ত্রণ করিতে থাকেন, তাঁহারাই "স্থানী" নামে অভিহিত হয়েন। তাঁহাদের উপনিমন্ত্রণ কিরূপ তাহা বলা হইতেছে— যথা—"আমাদের মত দীন জনগণের কল্যাণের জন্য যোগিশ্রেষ্ঠ আপনি কৃপাপরবশ হউন! এজগতে একমাত্র আপনি ব্যতীত আর কেহই আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা নাই। ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার স্বরূপ আপনি জীবগণের উদ্ধারের জন্যই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন।" ইত্যাদিরূপ উপনিমন্ত্রণ অল্লাধিক যোগপথে উপস্থিত হইবেই। ইহা শাশ্বতিক নিয়ম। ঐরূপ উপনিমন্ত্রণ উপস্থিত হইলে যোগীর সঙ্গ এবং স্ময় করা কর্ত্তব্য নহে। সঙ্গ শব্দের অর্থ আসক্তি, স্ময় শব্দের অর্থ গর্ব্ব। "অহো আমি এত মহান্ হইয়াছি, শত শত লোক আমার কৃপা প্রার্থনা করিতেছে।" এইরূপ গর্ব্বানুভব এবং পূর্ব্বোক্তরূপ কৃপাপ্রার্থী জনগণের প্রতি আসক্তি, এই উভয়ই সর্ব্বথা পরিহার করা কর্ত্তব্য। অন্যথা পুনরায় অনিষ্ট প্রসঙ্গ হইতে পারে। অনিষ্ট শব্দের অর্থ—অনভীষ্ট। যোগীর পক্ষে সর্ব্বপ্রকার অনাত্মপ্রত্যয়ই অনভীষ্ট এবং একমাত্র ইষ্টদেবের— আত্মদেবের দর্শনই অভীষ্ট—বাঞ্ছনীয়। পূর্ব্বোক্তরূপ স্থানিগণের উপনিমন্ত্রণে মুগ্ধ হইলে সেই অনাত্মপ্রত্যয়রূপ অনিষ্টের প্রসঙ্গ হইবেই। কৈবল্যস্থিতির পক্ষে ইহা বিঘ্নস্বরূপ হয় এবং জীবন্মুক্তির বিশিষ্ট আনন্দ হইতেও যোগীকে বঞ্চিত করে। এইজন্য ঋষি বলিলেন—"সঙ্গস্ময়াকরণম্"।

এস্থলে একটু জ্ঞাতব্য আছে—যাহারা যথার্থই সত্ত্ব পুরুষের অন্যতাখ্যাতিমান্ যোগী তাহাদের পক্ষে পূর্ব্বোক্তরূপ সঙ্গ ও স্ময়ের

কোন আশঙ্কাই থাকিতে পারে না, কারণ তাঁহাদের অবিদ্যাবীজ একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়; তথাপি ঋষি বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিলেন। প্রারব্ধকর্ম্মের ফলে কাহারও কাহারও জীবহিতচেষ্টারূপ কর্ম্ম থাকে বটে; কিন্তু সে কর্ম্ম তাহাদিগকে বদ্ধ করিতে পারে না। তবে ঐরূপ কর্ম্মজন্য ফল যে অনিষ্ট প্রাপ্তি, তাহা অবশ্যম্ভাবী। সেই অনিষ্ট অন্য কিছু নহে—জীবন্মুক্তির বিশিষ্ট আনন্দ হইতে বঞ্চিত হওয়া। এ সকল আলোচনা শুধু জীবকোটি সাধকগণের জন্যই করা হয়, যাঁহারা ঈশ্বরকোটি সাধক, তাঁহারা শত অনিষ্ট স্বীকার করিয়াও প্রাণপণে জীবহিত সাধনেই নিরত থাকেন। পূর্ব্বোক্তরূপ বিবেকখ্যাতি হইবার পর যোগিগণ "সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ" হইয়াই দেহপাত পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। যতদিন প্রারব্ধ কর্ম্মের বেগ থাকে, ততদিন শতচেষ্টা দ্বারাও কৈবল্যস্থিতি সম্ভবপর নহে। কৈবল্য কখনও চেষ্টাদ্বারা লাভ হয় না, স্বাভাবিক নিয়মেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। জরা বার্দ্ধক্য যেরূপ উপযুক্ত সময়ে স্বয়ংই উপস্থিত হয়, বিদেহ-কৈবল্যও ঠিক সেইরূপ আপনা হইতেই উপস্থিত হয়, কোনরূপ বিশেষ-পুরুষকারের প্রতীক্ষা করে না।

ক্ষণতৎক্রমযোঃ সংযমাৎ বিবেকজজ্ঞানম্ ॥৫২॥

কালজয়ী ভবতি কৈবল্যং গত ইতি চেন্নেতি ক্ষণ ইতি। ক্ষণতৎ-ক্রমযোঃ ক্ষণঃ পরমাপকর্ষপ্রাপ্তঃ কালস্তৎক্রমস্তানন্তর্য্যময়মেকোঽয়মপর ইত্যেবং রূপ এতয়োঃ সংযমাৎ সত্ত্বপুরুষান্যতা-খ্যাতিশীলস্যৈব সম্ভবতি। বিবেকজজ্ঞানং বক্ষ্যমাণং সমুদেতীতি শেষঃ।

ইদমত্রাবগন্তব্যম্—অন্যতা-খ্যাতিশীলস্য দেশবিলয় এব কালস্তু ন বিহীনস্তত্রাপি সত্তামাত্রবিষয়ক-প্রত্যয়ধারারূপায়াঃ সূক্ষ্মতমক্রিয়ায়া বিদ্যমানত্বাৎ। কালস্য ক্রিয়ারূপত্বাৎ ক্রিয়াধারারূপত্বাদ্বা ক্ষণ-

তৎক্রমস্য় ক্ষণানুগত ক্ষণস্থানি বিদ্যন্ত এব। কৈবল্যার্থমস্তু তত্রাপি সংযমং কৃত্বা বিবেকজজ্ঞানমাসাদ্য নাস্তি কাল ইতি প্রত্যক্ষীকরোতি। ততস্থ কালজয়ী ভবতি যোগী ॥ ৫২ ॥

কৈবল্যপ্রাপ্ত যোগী যে কালজয়ী হইয়া থাকে, তাহাই এইসূত্র হইতে প্রস্তাবিত হইতেছে, পরবর্ত্তী দুইটী সূত্রেও এই প্রস্তাবই চলিবে। এ সূত্রে ঋষি বলিলেন—ক্ষণ এবং তাহার ক্রমে সংযম হইতে বিবেকজজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়। অতি সূক্ষ্ম কালকে ক্ষণ কহে। পরমাণু বলিলে যেরূপ দ্রব্যের সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য অংশ বুঝায়, ক্ষণ বলিলেও সেইরূপ পরম অপকর্ষপ্রাপ্ত কালকেই বুঝাইয়া থাকে। ক্রম শব্দের অর্থ আনন্তর্য্য—একটীর পর একটী পরস্পর বিচ্ছিন্ন অথচ ধারারূপে আবির্ভাবের নাম ক্রম। এই যে ক্ষণ এবং তাহার ক্রম, এই উভয়ে সংযমপ্রয়োগ হইতেই বিবেকজজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। বিবেকজ জ্ঞান কি, তাহা পরপর সূত্রে প্রকাশিত হইবে। যাঁহাদের পূর্ব্বোক্তরূপ সত্ত্ব এবং পুরুষের অন্যতা খ্যাতি হইয়াছে, মাত্র তাঁহারাই ঐরূপ ক্ষণে এবং তাহার ক্রমে সংযম করিতে সমর্থ।

এইসূত্রে কিছু জ্ঞাতব্য আছে। কৈবল্যপদ দেশ ও কালের অতীত। দেশ ও কালের বিলয় না হইলে কৈবল্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। পূর্ব্বোক্তরূপ অন্যতাখ্যাতি হইলে অর্থাৎ সাস্মিত সমাধিতে উপনীতি হইলে দেশপ্রতীতি সম্যক্ বিলয় প্রাপ্ত হয় বটে; কিন্তু কালপ্রতীতি তখনও বিদ্যমান থাকে। সে কাল এত সূক্ষ্ম যে সহসা তাহার অস্তিত্বই অনুভব করা যায় না; কিন্তু পুনঃ পুনঃ ঐ ক্ষেত্রে অবস্থান করিতে করিতে বিচারনিপুণ যোগী বেশ বুঝিতে পারেন—সত্তামাত্র-বিষয়ক যে প্রত্যয় প্রবাহ চলে, উহাতে ক্ষণ এবং তাহার ক্রম, অর্থাৎ কালিকধারা বিদ্যমান থাকে। পরস্পর বিচ্ছিন্ন অথচ সত্তামাত্র-বিষয়ক প্রত্যয়ধারার অন্তরালস্থিত উক্ত বিচ্ছিন্নতার

দ্বারাই উহার ক্রিয়ারূপত্ব স্পষ্ট অনুভূত হয়। ক্রিয়া এবং কাল অভিন্ন পদার্থ। ক্রিয়ার আধারকে কাল বলিলেও ক্রিয়া ব্যতীত যখন কালের প্রতীতিই হয় না, তখন ক্রিয়া থাকিলেই কালও থাকে, ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। ক্রিয়া যত সূক্ষ্ম হইতে থাকে, কালও তত সূক্ষ্মরূপেই প্রতীতির বিষয় হইতে থাকে। সত্তামাত্র-বিষয়ক প্রত্যয়ের ধারা অতি সূক্ষ্মক্রিয়া, উহা মাত্র যোগিগণ ধরিতে পারেন, অন্যের পক্ষে একান্ত দুর্জ্ঞেয়। সে যাহা হউক, ঐ সূক্ষ্মক্রিয়ার স্বরূপ যে সূক্ষ্মতম কাল বা ক্ষণ, তাহাতে আর কোন সংশয়ই নাই। কেবল একটী ক্ষণ নহে, পুনঃ পুনঃ সেই ক্ষণেরই ধারা চলিতে থাকে, ইহার নাম ক্রম। এই যে ক্ষণ এবং তাহার ক্রম, তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিলেই উহাদের স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই কালের স্বরূপ অবগত হওয়ার নামই বিবেকজজ্ঞান। বাস্তবিক যে কালনামে কোন বস্তু নাই, উহা যে বুদ্ধিনির্ম্মাণ শব্দমাত্রগম্য এক প্রকার বিকল্প জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নহে, ইহার প্রত্যক্ষ হওয়াকেই বিবেকজজ্ঞান কহে। ইহারই নাম—কালজয়। যাবতীয় জীব কালের ভয়ে ভীত, আর যোগী কালজয়ী মৃত্যুঞ্জয়। সেই কালজয় কিরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে,পতঞ্জলিদেব এস্থলে তাহাই অতি স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিলেন। বাস্তবিক কালের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলে,প্রথমতঃ ক্ষণ এবং তাহার অবিচ্ছিন্ন ধারারূপ ক্রম ব্যতীত আর কিছুই বুঝায় না। তার পর উহাতে সংযমপ্রয়োগ করিলে কেবল সত্তামাত্রই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, ঐ ক্ষণ এবং ক্রম বলিতেও আর কিছুই থাকে না। সত্তার যে প্রতীতি, তাহাই কাল। যাহা, সত্তা তাহা কাল নহে। সত্তা কালাতীত বস্তু। সত্তাবিষয়ক প্রতীতি বর্ত্তমান কালেই থাকে; অতএব কাল বলিতে কেবল বর্ত্তমান কালই বুঝায়। অতীত এবং ভবিষ্যৎ নামক কালও বাস্তবিক-বর্ত্তমানই। এসকল রহস্য ইতিপূর্ব্বেও আলোচিত হইয়াছে। যতক্ষণ কোনও না কোনরূপ প্রতীতি আছে, ততক্ষণই বুঝিতে হইবে—কাল আছে, অর্থাৎ ঐ প্রতীতিরূপেই ক্ষণ এবং তাহার ক্রম বিদ্যমান আছে।

তার পর ঐ প্রতীতিকেই ঘুরাইয়া ক্ষণের দিকে ও ক্রমের দিকে ধরিতে হয়, ইহারই নাম সংযম। এইরূপ সংযম হইতেই বিবেকজ-জ্ঞানের উদয় হয়।

জাতিলক্ষণ-দেশৈরন্যতানবচ্ছেদাত্তুলয়ো

স্ততঃ প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫২ ॥

বিবেকজং জ্ঞানং পরিচায়য়তি জাতীতি। ততস্তস্মাদ্বিবেকজজ্ঞানা-জ্জাতিলক্ষণদেশৈস্ত্রিভিরন্যতা পরস্পরভেদাবধারণকারকৈরিতি ভাবঃ। অন্যতানবচ্ছেদাদ্ভেদাগ্রহাত্তুলয়োঃ ক্ষণতৎক্রময়োঃ স্বস্থয়োর্বা প্রতিপত্তিঃ স্বরূপপরিচয়ো ভবতীতি শেষঃ। স চ পরিচয়ো বস্তুশূন্যো বিকল্প-প্রতীতিমাত্ররূপ ইতি ॥ ৫২ ॥

এই সূত্রে বিবেকজ-জ্ঞানের পরিচয় অর্থাৎ তটস্থ লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—জাতি লক্ষণ এবং দেশের দ্বারা পরস্পর বিভিন্নতা পরিগ্রহ হয় না বলিয়াই তুল্যক্ষণদ্বয়ের অথবা ক্ষণ এবং তৎক্রমের প্রতিপত্তি অর্থাৎ স্বরূপ-পরিচয়, এই বিবেকজ জ্ঞান হইতেই সম্পন্ন হয়।

কোন একটী দ্রব্য হইতে অন্য দ্রব্যের ভেদ অবধারণ, জাতি দেশ এবং লক্ষণ দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ঘট হইতে পট যে পৃথক বস্তু, তাহা অবধারণ করিবার পক্ষে ঘটত্ব ও পটত্বরূপ জাতিগত ভিন্নতা, তদ্দেশ ও এতদ্দেশরূপ দেশগত ভিন্নতা, এবং পরস্পরের লক্ষণগত আকৃতিগত ভিন্নতাই হেতুস্বরূপ হইয়া থাকে; কিন্তু যেস্থলে এরূপ সম্ভাবনা নাই অর্থাৎ জাতি দেশ ও লক্ষণের কোনরূপ বিভিন্নতা নাই, সেরূপ স্থলে বস্তুদ্বয়ের প্রতিপত্তি এই বিবেকজজ্ঞান হইতেই পরিনিষ্পন্ন

হইয়া থাকে। আমাদের প্রস্তাবিত স্থলটীও ঠিক ঐরূপই হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ক্ষণ এবং তৎক্রমে সংযমপ্রয়োগ করিবার কথা বলা হইয়াছে। একটী ক্ষণ হইতে অপর একটী ক্ষণের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নাই, অথবা একটী ক্ষণ ও তাহার আনন্তর্য্যরূপ ক্রম হইতে পরবর্ত্তী ক্ষণ ও তৎক্রমের কোনরূপ বিভিন্নতা নাই; সুতরাং দুইটী ক্ষণ বা দুইটী ক্রম সর্ব্বাংশেই তুল্য। এই সর্ব্বথা তুল্য বস্তুদ্বয়ের প্রতিপত্তি অর্থাৎ স্বরূপের পরিচয় বিবেকজজ্ঞান হইতেই নিষ্পন্ন হইতে পারে। ক্ষণদ্বয় যে কি পদার্থ—কালের স্বরূপ যে কি, তাহা এই বিবেকজজ্ঞানেই সম্যক্ উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে, অন্য কোনরূপেই ইহা সম্ভবপর হইতে পারে না। আশঙ্কা হইতে পারে—ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ক্ষণ এবং তৎক্রমে সংযমের ফলে বিবেকজজ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয়, এখন যদি আবার সেই বিবেকজ জ্ঞানদ্বারাই ক্ষণের স্বরূপপরিচয় লাভ করিতে যাওয়া যায়, তবে ইতরেতরাশ্রয় দোষ হইবে না কি? না, তাহা হইবে না। এসকল স্থলে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ স্থলে ওরূপ তর্ক সম্ভব হয় না। ক্ষণ ও তৎক্রমে সমাহিত হওয়ার ফলে যে প্রজ্ঞার সন্ধান পাওয়া যায়, সেই প্রজ্ঞার দ্বারাই আবার ক্ষণ ও তৎক্রমের স্বরূপও জানিতে পারা যায়। সাধনারাজ্যে এইরূপই হইয়া থাকে—স্থূল পদার্থে সংযম করিয়া বিজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়, তারপর ঐ বিজ্ঞানের দ্বারাই স্থূলপদার্থের নাস্তিত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে। ইহাতে ইতরেতরাশ্রয় দোষ হয় না।

এইসূত্রে "তুল্যয়োঃ" পদটীর অর্থ করিতে গিয়া যাঁহারা দুইটী আমলকী ফলের উল্লেখ করিয়া, তাহাদের অগ্রপশ্চাৎ নিরূপণ করাই বিবেকজজ্ঞানের ফলরূপে বর্ণণা করেন, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। যে যোগী কৈবল্যপদবী আরোহণ করিতে উদ্যত, তিনি যে তাঁহার বিবেকজজ্ঞানের ফলে দুইটী তুল্য আমলকীফল বা তাদৃশ বস্তুর অগ্র পশ্চাৎ নির্ণয় করিতে উদ্যত হইবেন, ইহা আমরা ভাবিতেও পারি না। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে

যে, বিবেকজজ্ঞানের দ্বারা এরূপ অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের পরিজ্ঞানও অবশ্যম্ভাবী। পরবর্ত্তিসূত্রবর্ণিত তারকজ্ঞানই যে বিবেকজজ্ঞান, এই সিদ্ধান্ত হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সে যাহা হউক, এইবার আমরা প্রস্তাবিত বিষয়টীর আর একটু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বসূত্রে যে কালজয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই বিবেকজজ্ঞান হইতেই সম্ভব হইয়া থাকে। ক্ষণের সমষ্টিই কাল। ক্ষণও কালই, ক্ষণের পরিচয় লাভ হইলে তৎক্রমেরও পরিচয় লাভ হইয়া থাকে; কারণ, ক্ষণ কখনও ক্রমকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে না। ক্ষণনামক কোন বস্তু যে পরমার্থতঃ নাই, উহা যে বস্তুশূন্য কল্পিত পদার্থ মাত্রই, ইহা প্রত্যক্ষ হয়—সুদৃঢ় প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হয়—ঐ বিবেকজ জ্ঞানের প্রভাবেই। সূত্রে যে "তুল্যয়োঃ" পদটীর প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা ঐ তুল্য ক্ষণদ্বয়কে বুঝাইবার জন্যই, অন্য কোন পদার্থ বুঝাইবার জন্য নহে। এস্থলে অন্য কোন পদার্থের প্রসঙ্গ হইতেই পারে না। কালাতীত সত্তায় উপনীত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কালের স্বরূপ জানা আবশ্যক। কালের স্বরূপজ্ঞান হইলেই কালজয় হইয়া থাকে। যাহারা সত্ত্ব পুরুষের অন্যতাখ্যাতি হইতে দূরে অবস্থিত, তাহাদের পক্ষে এসকল আলোচনাও অতি দুরূহ মনে হইবে, সন্দেহ নাই। তথাপি এ কথা অতিশয় দৃঢ়তার সহিতই বলা যাইতে পারে যে, কৈবল্য পদারোহণকারী যোগী এইরূপ সংযম প্রয়োগ করিয়াই কালকে জয় করিয়া থাকেন।

তারকং সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বথাবিষয়মক্রমঞ্চেতি

বিবেকজজ্ঞানম্ ॥৫৪॥

স্বরূপং নিরূপয়তি বিবেকজজ্ঞানস্য তারকেতি। তারকং প্রতিভাগম্যমনৌপদেশিকং, সর্ব্ববিষয়ং নাস্য কিঞ্চিদবিষয়ীভূতমিত্যর্থঃ। সর্ব্বথাবিষয়মবান্তরবিশেষসহিতং, অক্রমমেকক্ষণোপারূঢ়ং চ, এতদেব বিবেকজজ্ঞানম্ ॥ ৫৪ ॥

এইসূত্রে বিবেকজ-জ্ঞানের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—সর্ব্ববিষয়ক সর্ব্বথাবিষয়ক এবং অক্রমে প্রাদুর্ভূত যে তারকজ্ঞান, তাহাই বিবেকজজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তারকজ্ঞানেরই অন্য নাম বিবেকজজ্ঞান। তারকজ্ঞান কি, তাহা ইতি পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। প্রতিভাগম্য অনৌপদেশিক জ্ঞানই তারকজ্ঞান। পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা সর্ব্ববিষয়ক নহে, অধিকাংশ বিষয়ক মাত্র ; কিন্তু এই ক্ষেত্রে আসিয়া যে বিবেকজজ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাহা সর্ব্ববিষয়ক অর্থাৎ কোন একটী বিষয়ও সে জ্ঞানের নিকট অপ্রকাশিত থাকিতে পারে না। কেবল তাহাই নহে, সর্ব্বথা বিষয়কও বটে। যে কোন একটী বিষয় সম্বন্ধে যত প্রকারে যাহা কিছু জানিবার যোগ্য থাকে, সে সকলের সহিত অর্থাৎ অবান্তর যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয়ের সহিত সেই বিষয়ের যে পূর্ণ জ্ঞান, তাহাই সর্ব্বথাবিষয়ক। আরও একটী বিশেষণ আছে—"অক্রম"। সাধারণতঃ যে জ্ঞান প্রকাশ পায়, তাহা ক্রমে ক্রমে বস্তুর সর্ব্বথা বিষয়কে গ্রহণ করে ; কিন্তু এই তারকজ্ঞান অক্রমে অর্থাৎ যুগপৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই যে একক্ষণে উপারূঢ় জ্ঞান, তাহাকে

লক্ষ্য করিয়াই সূত্রে "অক্রম" শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে। এইরূপ—সর্ব্ববিষয়ক সর্ব্বথাবিষয়ক এবং অক্রমে প্রাদুর্ভূত যে তারকজ্ঞান, তাহাই বিবেকজজ্ঞান নামে যোগশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।

প্রিয়তম সাধক, তুমি এই যোগমার্গে অগ্রসর হইতে গিয়া তিনবার তারকজ্ঞানের সাক্ষাৎ পাইবে। প্রথমে যে তারকজ্ঞান উপস্থিত হইবে,তাহা তোমাকে মাত্র স্থূলপদার্থের প্রকাশ করিয়া দিবে। দ্বিতীয় জ্ঞান তোমাকে সূক্ষ্মপদার্থ সমূহের স্বরূপ দেখাইয়া দিবে। আর এই তৃতীয়স্তরে আসিয়া যে তারকজ্ঞান উপস্থিত হইবে, তাহা তোমাকে কারণ অর্থাৎ প্রকৃতি পর্য্যন্তের স্বরূপ উদ্ভাসিত করিয়া দিবে। অতি সূক্ষ্ম কালের স্বরূপ পর্য্যন্ত এই জ্ঞানে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এইজন্যই পতঞ্জলিদেব এইশাস্ত্রে তিনস্থানে তিন প্রকারে প্রাতিভজ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন। এই তৃতীয়স্তরের তারকজ্ঞান—এককক্ষণে উপারূঢ় সর্ব্বথা-বিষয়ক বলিয়াই ইহা কৈবল্যের একান্ত সন্নিহিত প্রজ্ঞা-স্বরূপও বটে।

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যম্ ॥ ৫৫ ॥

ইতি পতঞ্জলি-প্রণীতে যোগসূত্রে বিভূতিপাদঃ।

অথ বিদেহকৈবল্যং সূচয়তি সত্ত্বেতি। সত্ত্ব-পুরুষয়োঃ প্রতিবিম্ব বিম্বয়োরিত্যর্থঃ। শুদ্ধিসাম্যে—প্রতিবিম্বস্য সর্ব্বথা বিম্বসারূপ্যমেব শুদ্ধিঃ, তচ্চ সারূপ্যং চিদাভাসরূপস্য বুদ্ধিসত্ত্বস্যানন্তং সর্ব্বথা চিদ্রূপতা-পরিগ্রহণোত্তমঃ। স চ তত্তমঃ স্বাত্মনাশায় ভবতি। সা হি পরাকাষ্ঠা সত্ত্বশুদ্ধেরিতি। এবঞ্চ প্রতিবিম্ববিলয়ে নিত্যশুদ্ধস্যাপি পুরুষস্য কল্পিতভোগাপবর্গপ্রয়োজননিবৃত্তিরূপা শুদ্ধিরিত্যেতৎ শুদ্ধিসাম্য মুচ্যতে। তস্মিন্ সতি কৈবল্যং যোগঃ স্বরূপস্থিতিস্থিরায় চিত্তবৃত্তি নিরোধশ্চ। যদুক্তং তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যমিতি তজ্জীবন্মুক্ত বিষয়মস্যোপক্রমমাত্রম্ ॥ ৫৫ ॥

ইতি যোগরহস্যে বিভূতিপাদস্তৃতীয়ঃ।

এইটী পতঞ্জলি-প্রণীত যোগসূত্রের বিভূতিপাদের শেষ সূত্র, বিদেহ-কৈবল্যই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। ঋষি বলিলেন—সত্ত্ব এবং পুরুষের শুদ্ধি-সাম্য হইলে কৈবল্য হয়। সত্ত্ব এবং পুরুষ প্রতিবিম্ব ও বিম্বস্বরূপ বস্তু। একটী চিদাভাস'অন্যটী চিতিমাত্র। এই উভয়ের যখন শুদ্ধি-সাম্য হয়, তখন বিদেহকৈবল্য লাভ হয়। প্রথমতঃ সত্ত্বশুদ্ধির বিষয়ই বলা হইতেছে। বুদ্ধিসত্ত্ব অর্থাৎ চিদাভাস যখন অনন্ত হয়—পূর্ণভাবে চৈতন্য স্বরূপ পরিগ্রহ করিতে উদ্যত হয়, তখনই তাহার শুদ্ধির পরাকাষ্ঠা হইয়া থাকে। এই অবস্থায় বুদ্ধিসত্ত্ব চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়। পূর্ব্বে যে সত্ত্ব-পুরুষের অন্যতাখ্যাতির বিষয় বলা হইয়াছে, তাহাতে অর্থাৎ ঐরূপ অন্যতাখ্যাতি কালে বুদ্ধি কেবল সত্তার আভাস মাত্রই গ্রহণ করিতে থাকে। ঐরূপ পুনঃ পুনঃ আভাস গ্রহণ করিতে করিতে একদিন প্রেমময় আত্মা তাঁহার নিজের স্বরূপটী চকিতবৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তখন বুদ্ধিসত্তা ক্ষণকালের জন্য বিলয়প্রাপ্ত হয়, অথবা বুদ্ধি সম্যক্ ভাবে আত্মায়ই মিলাইয়া যায়। এইরূপ সংঘটন হইবার পর হইতেই সাধক যথার্থ মুক্তির আস্বাদ পায়। যতদিন প্রারব্ধকর্ম্মের বেগ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ না হয়, ততদিন ঐরূপ মিলন বা বুদ্ধিবিলয় মধ্যে মধ্যে হইতে থাকে, অবশিষ্ট সময় প্রিয়তমের বিরহজ্বালা স্বগতভেদ দর্শনে কথঞ্চিৎ শান্ত করিতে হয়। তার পর যেদিন তাঁর কৃপা পূর্ণভাবে অনুভবে আসিতে থাকে—নিঃশেষে প্রারব্ধ ক্ষয় হইয়া যায়, আত্মপ্রেম যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ বুদ্ধি ও পুরুষ,উভয়ই তুল্যভাবে শুদ্ধ হইয়া উঠে,তখন—সেই শুভদিনে বিদেহকৈবল্য লাভ হয়। বুদ্ধির সেই পরম শুদ্ধতা কিরূপ; তাহাই এস্থলে বলা হইতেছে—বুদ্ধি যখন অনন্ত হইয়া পড়ে, আত্মসত্তা ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করিতে চায় না বা পারে না, প্রেম এত ঘন হয় যে, আর আত্মাতিরিক্ত বস্তুতে ফিরিতেই পারে না, তখন সে পূর্ণভাবে চৈতন্য-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য—পূর্ণভাবে পরমপ্রেমাস্পদের অঙ্গে মিলাইয়া যাইবার জন্য শেষ উদ্যম করে, সেই উদ্যমের ফলে বুদ্ধিসত্ত্ব

চিরতরে বিনিষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ পরমাত্মসত্তায় জীবভাবটী সম্যক্ মিলাইয়া যায়। এই যে সত্ত্ববিলয়, ইহারই নাম সত্ত্বশুদ্ধির পরাকাষ্ঠা।

আর পুরুষের শুদ্ধি—সেই অবিদ্যাকল্পিত ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজনের নিবৃত্তি। নিত্যশুদ্ধ পুরুষের যে কল্পিত অশুদ্ধির বিলয়, তাহাই পুরুষের শুদ্ধি। এইরূপে প্রতিবিম্বস্বরূপ বুদ্ধিসত্ত্ব এবং বিম্বস্বরূপ পরমাত্মা, উভয়ের শুদ্ধি সমান অবস্থায় উপনীত হইলেই কৈবল্য উপস্থিত হয়। ইতিপূর্ব্বে যে কৈবল্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহা জীবন্মুক্তের কৈবল্য, আর এসূত্রে বিদেহকৈবল্যের কথাই বলা হইয়াছে। "যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"। যত দিন ব্যুত্থান হয়—বুদ্ধি আবার ফিরিয়া আসে, ততদিন বুঝিতে হইবে—শুদ্ধি ঠিক সমান হয় নাই। ওগো, বিন্দুমাত্র অশুদ্ধতা থাকিতেও সে পরমধামে চিরতরে প্রবেশ করা যায় না, বিন্দুমাত্র অনাত্মপ্রত্যয় বিদ্যমান থাকিতেও তাঁহাকে পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। তাইত অনেক সময়ে বলিয়া থাকি—"মুক্তির কোনই প্রয়োজন ছিল না, যদি অমুক্ত থাকিয়াও সেই প্রেমাস্পদকে পূর্ণভাবে ভাল বাসিতে পারিতাম"। ওগো, তাহা যে হয় না, অমুক্ত থাকিয়া যে তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারা যায় না। ওগো, সর্ব্বস্ব দিয়াও তাঁকে—শুধু তাঁকে ভোগ করিতে পারা যায় না। "আমি যদি বাস্‌তাম ভাল, আমি জান্‌তাম না আর তোমা বই।" যত দিন প্রিয়তম আত্মাব্যতীত অন্য কিছু দেখিতে হয়, ভোগ করিতে হয়, ততদিন তাঁর প্রেমের সন্ধান তাঁর স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায় না।

ওগো আমার সর্ব্বস্বধন, ওগো আমার হৃদয়রতন, তুমি আমায় সকল দিয়াছ, ঈশ্বরত্ব পর্য্যন্ত দিয়াছ; কিন্তু প্রেমধনে কৃপণতা করিয়াছ, দাও দাও নাথ, দাও দাও স্বামিন্, আমি কোথায় পাব প্রেম, হৃদয় মরুভূমি—প্রাণ শুষ্ক, সংসার—অনাত্মপ্রতীতি এখনও দেদীপ্যমান; সুতরাং প্রেমের আস্বাদ কোথা হইতে আসিবে প্রিয়! আমি ত ঠিক ঠিক তোমার বিয়োগ-বিধুরতা এখনও অনুভব করিতে পারি নাই; সুতরাং কিরূপে যোগী হইব সখা। তুমি আমাকে বিয়োগবিধুর করিয়া

যোগী কর, প্রেমিক কর। ওগো, যেমন করিয়া তুমি আমার মধ্যে তোমার আপনস্বরূপ হারাইয়া জীব সাজিয়া বসিয়া আছ, ঠিক তেমনি করিয়া আমি তোমার মধ্যে আমাকে চিরতরে হারাইয়া ফেলিব। তোমার প্রেম আমাদের বাক্যমনের অতীত। তুমি আত্মা, ইহাই তোমার প্রেম বুঝাইবার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি আত্মা, তাই তুমি আমাতে আত্মদান করিতে পার, আর আমি অনাত্মা হইয়া কিরূপে তোমায় আত্মদান করিব প্রভু! ওগো, তুমি তোমার যেটুকু দিয়া—যে সত্তা ও প্রকাশ দিয়া আমাকে "অহং" রূপে সাজাইয়া তুলিয়াছ, তোমার সেই সত্তা ও প্রকাশটুকু তুমি গ্রহণ কর। আমি কৈবল্যযোগী হই—বিদেহ কৈবল্য লাভ করিয়া নির্ব্বাণ পরমশান্তির কোলে চিরতরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাই, আমার অসম্প্রজ্ঞাত যোগ চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করুক। ওগো প্রিয় প্রিয়তম সখা সুহৃদ জীবন মধু আত্মা আমার, তুমি প্রেমসিন্ধু আমি বিন্দু হইয়া তোমাকে কিরূপে লাভ করিব। তুমি স্বয়ং আসিয়া আমাকে তোমাতে মিলাইয়া লও। তুমি না আসিলে আমি যে তোমার কাছে যাইতেই পারি না নাথ! এস এস, সাগরবঁধু আমার! প্রাণের নাগর আমার! নদী আমি, প্রকৃতি আমি, শক্তি আমি, সর্ব্বতোভাবে তোমাতে মিলিয়া যাই। "ওঁ প্রিয়ায় প্রিয়তমায় প্রাণায় পরমাত্মনে নমঃ" বলিয়া আমাকে চিরতরে তোমাতে অর্পণ করিয়া কবে বিদেহকৈবল্য লাভ করিব। ওঁ ওঁ ওঁ॥

ইতি যোগরহস্য ব্যাখ্যায়
বিভূতিপাদ নামক তৃতীয় অধ্যায়।

योगरहस्यम् ।

कैवल्यपादः ।
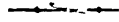
चतुर्थोऽध्यायः ।

जन्मौषधि-मन्त्र-तपः-समाधिजाः सिद्धयः ॥१॥

योगानुशासन-सूत्र-परिशिष्टरूपोऽयं पादः प्रपञ्चयति प्रोक्तार्थान् विशिनष्टि चानुक्तान् कांश्चित् । प्रथमं तावत् योगजविभूतेर्भेदं सिद्धीनां निरूपयन्ति जन्मेति । सिद्धयो लौकिकाः केवलाभ्युदयविधायिन्य इति भावः, नतु परवैराग्यद्वारेण कैवल्यविधायिन्यः प्राग्वर्णिता विभूतयः इति । पञ्चविधा उपलभ्यन्ते तदाह—जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजा इति । तत्र जन्मजा नाम सिद्धिर्यथा खगानां वैहायसो गतिर्यथा वा सन्तरणं मरालानां सलिलेषु, तथा नराणामपि केषाञ्चिद्दृश्यते सिद्धिर्जन्मत एव काचिदशिक्षित-पटुतारूपा । औषधिजा सिद्धिः श्रूयते भेषजशास्त्रेषु रसायणादि सेवनेन स्थविरोऽपि तरुणायते, नेत्राञ्जनादि प्रभावेन चादृश्यता स्थूलशरीरस्यापि । मन्त्रजा सिद्धिर्दृश्यते विषपूर्णादि समशत्वादि-मन्त्रजपादभीष्टपूर्त्तिः श्रद्दधानेषु । तपोजन्या सिद्धिः कृच्छ्रचान्द्रायणपञ्चतपप्रभृतीनामनुष्ठानाच्छीतोष्णक्षुत्पिपासादिभिरनभिघातरूपा दृश्यते । समाधिजा सिद्धिः सम्मोहनादिविद्यारूपा, नतु योगाङ्ग समाधिजन्या वर्णितरूपात्मविभूतिरिति । तथात्वे साधीयसो

সংযমজীত্বমনুম্নিঃ স্যাৎ। জন্মাদিভিঃ সমভিব্যাহৃতত্বাদেব সমাধি শব্দঃ কথঞ্চিদৈকাগ্র্যচিত্তরূপঃ, ন তু যোগাঙ্গার্থমাত্রনির্ভাসরূপ ইতি। যোগাঙ্গসমাধিবিষয়ে সিদ্ধীনামুপসর্গত্বমভ্যুক্তম্। ননু পঞ্চবিধাভির্নিতাভিঃ কৈবল্যাবরতা সূচ্যত ইতি ॥ ১ ॥

সত্ত্ব ও পুরুষের শুদ্ধি সাম্য হইলে কৈবল্য উপস্থিত হয়, ইহা বিভূতি পাদের অবসানে উক্ত হইয়াছে। সমাধিপাদের প্রথমেই চতুঃসূত্রী দ্বারা মহর্ষি পতঞ্জলিদেব সংক্ষেপে সারগর্ভবাক্যে যে যোগরহস্যের উপদেশ করিয়াছিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটী অধ্যায়ে তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যান পরিসমাপ্ত হইয়াছে, এই চতুর্থ অধ্যায়টী যোগানুশাসন শাস্ত্রের পরিশিষ্ট স্বরূপ। এই অধ্যায়ে উক্তার্থসমূহ যুক্তি ও বিচারের দ্বারা সমর্থিত ও প্রপঞ্চিত হইয়াছে এবং অনুক্ত বিষয়ও বিবৃত হইয়াছে; ক্রমে তাহা পরিব্যক্ত হইবে। প্রথমতঃ যোগাঙ্গ বিভূতি হইতে লৌকিক সিদ্ধির পার্থক্য প্রদর্শিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—জন্ম ঔষধি মন্ত্র তপস্যা ও সমাধি হইতে (লৌকিক) সিদ্ধিসমূহ আবির্ভূত হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে যে যোগজবিভূতি বর্ণিত হইয়াছে, যাহা পর বৈরাগ্যদ্বারা আসন্নকৈবল্যের সূচনা করে, সেই স্বগতভেদের অনুভূতি স্বরূপ আত্মবিভূতি হইতে এইসূত্রবর্ণিত সিদ্ধিসমূহ সম্পূর্ণ পৃথক্। দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগের সহিত এই সকল সিদ্ধির বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া আমরা ইহাদিগকে লৌকিক সিদ্ধি আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকি। এই লৌকিক বিভূতিগুলি অনেক স্থলেই কেবল অভ্যুদয় অর্থাৎ খ্যাতি বা ধন উপার্জ্জনের উপায়রূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, ঋষি বলিলেন—জন্ম ঔষধি মন্ত্র তপস্যা এবং সমাধি, এই পঞ্চবিধ হেতুকে আশ্রয় করিয়া লৌকিক সিদ্ধিসমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ক্রমে ইহাদের বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

প্রথমতঃ জন্মজা সিদ্ধি। বিহঙ্গগণ জন্মহইতেই আকাশে বিচরণ করিতে সমর্থ, হংসকুল জন্মহইতেই সলিল-সন্তরণে সমর্থ, ঠিক এইরূপ মনুষ্যজাতির মধ্যেও কাহারও কাহারও অশিক্ষিত পটুতা রূপা সিদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কাহারও সঙ্গীতবিদ্যায়, কাহারও গণিতশাস্ত্রে কাহারও শারীরিকসামর্থ্যে শৈশবকাল হইতেই অসাধারণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ সিদ্ধিসমূহকেই জন্মজা সিদ্ধি বলা হয়। দ্বিতীয় ঔষধিজা সিদ্ধি। আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—রসায়ন ঔষধ সেবনে স্থবির ব্যক্তিও তরুণত্ব প্রাপ্ত হয়। নেত্রে অঞ্জন লেপন দ্বারা স্থূল শরীরকেও অদৃশ্য করা যায়, এইরূপ আরও অনেক অসাধারণ সিদ্ধির বিষয় তন্ত্রাদি শাস্ত্রেও উল্লিখিত আছে। তৃতীয় মন্ত্রজা সিদ্ধি। বৈদিক ত্রিসুপর্ণাদি এবং পৌরাণিক সপ্তশতী প্রভৃতি মন্ত্র জপদ্বারা শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ স্ব স্ব অভীষ্ট পূরণ করিতে সমর্থ হন। চতুর্থ তপোজন্যা সিদ্ধি। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রত কিংবা পঞ্চতপ প্রভৃতির অনুষ্ঠানে শীতোষ্ণাদি এবং ক্ষুধাতৃষ্ণাদি সহ্য করিবার সামর্থ্য অর্থাৎ অসাধারণ তিতিক্ষারূপা সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। পঞ্চম সমাধিজা সিদ্ধি। সম্মোহনাদি বিদ্যাই (হিপ্নটিজম্ মেস্মেরিজম্ ক্লেয়ারভয়েন্স্ প্রভৃতি) এস্থলে সমাধিজা সিদ্ধি শব্দের অর্থ। ঐ বিদ্যাপ্রভাবে আবিষ্ট ব্যক্তিকে ইঁদুর বিড়াল প্রভৃতি জীবের স্বভাবে আনয়ন করা যায়, লবণ সেবন করাইয়া শর্করার আস্বাদ দেওয়া যায়, বৃক্ষপত্র সেবন করাইয়া ক্ষীর আস্বাদ দেওয়া যায়, কণ্টকাদি দ্বারা অঙ্গ বিদীর্ণ করিলেও যাতনার অনুভব নিরুদ্ধ রাখা যায়, রক্ত মাংসের দেহকে প্রস্তরবৎ কঠিন করা যায়, আবিষ্ট ব্যক্তিদ্বারা দূরস্থিত ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট বস্তুর বিবরণ জানা যায়, এমন কি আবিষ্ট ব্যক্তির মাতৃ-পিতৃনাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করাইয়া সাময়িক স্মৃতিভ্রংশ সম্পাদন করা যায়। এ সকলই ঐ সমাধিজা সিদ্ধি।

যোগদর্শনের ঋষি কৈবল্যপাদের প্রথমেই এই জন্ম ঔষধি প্রভৃতি পঞ্চবিধ উপায়হইতে সঞ্জাত সিদ্ধির বিষয় উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া

দিলেন যে, এই সকল লৌকিক সিদ্ধি কখনও আসন্ন কৈবল্যের সূচনা করে না। এস্থলে একটী আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে—সূত্রে যে "সমাধিজা সিদ্ধি" শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে, উহার প্রকৃত অর্থ কি? তাহার সমাধান এই যে—সমাধি শব্দে এস্থলে অর্থমাত্রনির্ভাস রূপ যোগাঙ্গ সমাধি না বুঝিয়া কথঞ্চিৎ একাগ্র-চিত্তরূপ সমাধি বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে—যোগের সহিত অর্থাৎ দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানের সহিত সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় যাহার কোনও রূপ সম্বন্ধ নাই, তাহাকে যোগাঙ্গ বলা যায় না। যদি যোগাঙ্গসমাধির বিষয় বলাই এস্থলে ঋষির অভিপ্রায় হইত, তবে তিনি "সমাধিজা" পদের প্রয়োগ না করিয়া "সংযমজা" এই রূপ পদই প্রয়োগ করিতেন। যোগাঙ্গ ধারণা ধ্যান ও সমাধি হইতে যে বিভূতি লাভ হয়, তাহাই যদি এই সূত্র বর্ণিত সিদ্ধি শব্দের প্রতিপাদ্য বিষয় হইত, তবে ঐরূপ সংযমজা পদের প্রয়োগই সমীচীন হইত। আরও একটী বিশেষ কথা এই যে, সিদ্ধিসমূহ যোগাঙ্গসমাধির পক্ষে উপসর্গ স্বরূপই হইয়া থাকে, একথাও ঋষি ইতিপূর্ব্বে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। অতএব এই সূত্রে জন্ম ঔষধি মন্ত্র প্রভৃতির সহিত সমভিব্যাহৃত আছে বলিয়াই সমাধি শব্দটী কথঞ্চিৎ একাগ্রচিত্তরূপ অর্থ বুঝাইতেই প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থমাত্রনির্ভাসরূপ যোগাঙ্গ সমাধি হইতে এই একাগ্র চিত্তরূপ সমাধি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দেখিতে পাওয়া যায়—কেহ কেহ স্বভাবতঃই একাগ্রভাবে চিন্তা করিতে সমর্থ, ঐরূপ প্রকৃতির মানুষই পূর্ব্বোক্তসম্মোহনাদি বিদ্যার অনুশীলন ও প্রয়োগ করিতে নিপুণ হইয়া থাকে, যেরূপ শৈশব কাল হইতেই ব্যক্তি বিশেষের কোনও বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়, ঠিক সেইরূপই কাহারও কাহারও একাগ্রচিত্তরূপ লৌকিকসমাধি বিষয়ে নিপুণতাও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ঐরূপ সমাধি হইতে কখনও কখনও যে অসাধারণ জ্ঞান বা সামর্থ্য প্রকাশিত হয়, তাহাই সমাধিজা সিদ্ধি নামে বর্ণিত হইয়া থাকে।

স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদপ্রতীতিকে সম্যক্ তিরস্কৃত করিয়া

ব্যষ্টি সমষ্টি ভাবে স্বগতভেদের অনুভূতিই যোগাঙ্গবিভূতি। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ উপায়ে সঞ্জাত সিদ্ধির সহিত ইহার যে কোন সম্বন্ধই নাই, তাহা ধীমান্ ব্যক্তিগণ সহজেই অবধারণ করিতে পারিবেন। অনভিজ্ঞ জনগণ কাহারও কোনরূপ অসাধারণ শক্তি দেখিতে পাইলেই তাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী বা মহাপুরুষ মনে করিয়া ঐরূপ ব্যক্তির নিকট হইতেই আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি বিধান করিতেও উদ্যত হয় এবং অনেক স্থলেই প্রতারিত ও ভগ্নমনোরথ হইয়া যোগশাস্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহার নিরাকরণ কল্পেই এই কৈবল্য পাদের প্রথমে ঋষি কৈবল্যসূচক বিভূতি হইতে অভ্যুদয়সাধক বিভূতির পার্থক্য দেখাইয়া দিলেন। সমুজ্জ্বল জ্ঞানের আলোক এবং পরাভক্তির অমৃতময় স্পর্শবিহীন সিদ্ধি মানুষকে যথার্থ শান্তি প্রদান করিতে পারেনা। পূর্ব্বোক্তরূপ লৌকিক সিদ্ধিসমূহ কেবল ত্রিবর্গলিপ্সু জনগণের পক্ষেই উপাদেয় হইয়া থাকে।

জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাত্ ॥২॥

তদুৎকটসিদ্ধিপ্রভাবং কীর্ত্তয়তি জাত্যান্তরেতি। জাত্যন্তর-পরিণামঃ অন্যা জাতির্জাত্যান্তরং তদ্রূপঃ পরিণামঃ স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরারম্ভক-সংস্কারান্যথাপরিণতিরিতি ভাবঃ। কথমিত্যাহ প্রকৃত্যাপূরাত্ কায়স্য ক্ষিত্যাদীনি করণানাঞ্চাস্মিতা প্রকৃতিস্তস্যা আপূরঃ অবয়বানুপ্রবেশস্তস্মাদিতি। প্রকৃতিঃ সর্ব্ববিধ পরিণামবীজরূপত্বাদেবং প্রারব্ধসংস্কারাদন্যথাবয়বানুপ্রবেশঃ সম্ভবতীতি ॥ ২ ॥

এই সূত্রে উৎকট সিদ্ধির প্রভাব কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—প্রকৃতির আপূরণ হইতে জাত্যন্তর পরিণাম পর্য্যন্ত হইতে

পারে। জাত্যন্তর পরিণাম অসাধারণ ব্যাপার। যে জাতীয় পিতা মাতা হইতে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, মৃত্যুপর্য্যন্ত সে ব্যক্তি সেই জাতীয়ই থাকে। যতদিন স্থূল শরীর বিদ্যমান থাকে, ততদিন স্থূল শরীর আরম্ভক সংস্কার হইতে সঞ্জাত পরিণামের অন্যথা হয় না, ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু ঋষি এখানে পূর্ব্বোক্ত নিয়মের অন্যথা প্রদর্শন করিলেন—উৎকট তপস্যা এবং পারিপার্শ্বিক অনুকূল অবস্থা পাইলে বর্ত্তমান জীবনেই অন্যজাতি পরিণাম সম্ভব হইতে পারে। পূর্ব্ব সূত্রে যে তপোজন্যা সিদ্ধির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সেই তপস্যার প্রভাব যদি উগ্র হয়, তবে সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া অসাধারণ ব্যাপারও সম্ভাবিত হইতে পারে—বর্ত্তমান জীবনেই জাত্যন্তর পরিণামরূপা মহতী সিদ্ধিও লাভ হইতে পারে। তপস্যার এমনই প্রভাব বটে! এস্থলে ঋষির অভিপ্রায় এই যে—লৌকিক সিদ্ধির প্রভাবে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে, এমন কি জাত্যন্তর পরিণাম পর্য্যন্ত হইতে পারে; কিন্তু লৌকিক সিদ্ধি কখনও সাধককে কৈবল্যের সমীপস্থ করিতে পারে না। একমাত্র স্বগ ভেদানুভূতিরূপা আত্মবিভূতিই তাহাতে সমর্থ।

সে যাহা হউক, এখন দেখিতে হইবে—এই জাত্যন্তর পরিণাম রূপ অসাধারণ ব্যাপার কিরূপে সম্ভাবিত হয়। ঋষি নিজেই ইহার উত্তর প্রদান করিলেন—"প্রকৃত্যাপূরাৎ"। প্রকৃতির আপূরণ অর্থাৎ অবয়বের অনুপ্রবেশ হইতেই ঐরূপ অসাধারণ ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে। প্রথমতঃ "আপূর" অর্থাৎ প্রকৃতির অবয়বানুপ্রবেশ কথাটী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। প্রকৃতি—অব্যক্ত কারণ, উহা সূক্ষ্মতম শক্তি বিশেষ। ঐ প্রকৃতি বা শক্তি যখন কার্য্যরূপে—স্থূলরূপে—কোনও সাবয়ব পদার্থরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহার আপূরণ হয়—অবয়বের অনুপ্রবেশ হয়। মনে কর—একটী বটবীজ, প্রকাণ্ড বট-বৃক্ষের অবয়ব সমূহ উহাতে অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিতেছে। বৃক্ষের আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইবার সময়ে সেই সূক্ষ্মশক্তি স্থূল অবয়ব রূপে অভিব্যক্তি লাভ করে—অনুপ্রবিষ্ট হয়। এইরূপ যে বীজ বা যে

প্রকৃতিহইতে যেরূপ আপূরণ হয়—যেরূপ অবয়বের অনুপ্রবেশ হয়, সেইরূপ পদার্থই স্থূলে অভিব্যক্তি লাভ করে, সাধারণতঃ এই নিয়মের অন্যথা হয় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—স্থূলশরীরাত্মক সংস্কারই জাতিরূপে অভিব্যক্ত হয়, যে জাতীয় পিতা মাতা হইতে যে ব্যক্তি উৎপন্ন হয়, সে মৃত্যুপর্য্যন্ত সেই জাতীয়ই থাকে; কারণ, প্রকৃতিহইতে তাহার সেই রূপই অবয়বানুপ্রবেশ হইতে থাকে। যখন কোনরূপ উৎকট তপস্যার প্রভাবে এই নিয়মের অন্যথা পরিলক্ষিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্বশক্তিময়ী সর্ব্ববীজাধাররূপিণী প্রকৃতিহইতেই প্রারব্ধসংস্কারের অন্যরূপ আপূরণ অর্থাৎ অবয়বানুপ্রবেশ হইয়াছে। কি প্রকারে ইহা সম্ভব হইতে পারে, কেন যে প্রারব্ধসংস্কারের অন্যথা পরিণাম হয়, তাহার যুক্তিপূর্ণ মীমাংসা পরবর্ত্তিসূত্রে ঋষি স্বয়ংই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

জাত্যন্তর পরিণাম সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে, রাজা নহুষ মনুষ্যজাতি হইয়াও নিন্দিত কর্ম্মপ্রভাবে সেই জীবনেই অজগরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুমার নন্দীশ্বর মনুষ্যদেহধারী হইয়াও সেই জীবনেই উৎকট তপস্যা প্রভাবে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল প্রবাদ বাক্যহইতে বুঝিতে পারা যায়—উৎকট তপস্যাপ্রভাবে যেরূপ উন্নত জাতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঠিক সেইরূপই অতি গর্হিত কর্ম্মের পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠান হইলে নিম্নজাতি প্রাপ্ত হওয়াও একান্ত সম্ভব। বর্ত্তমান কালেও দেখিতে পাওয়া যায়—কোনও আর্য্যজাতীয় ব্যক্তি যদি বেদাদিশাস্ত্রবিহিত আচরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যবনাদি জাতির আচার ব্যবহারে দীর্ঘকাল নিরত থাকে, তবে তাহার সেই জীবনেই যবনাদি জাতিরূপ পরিণাম অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। আবার পক্ষান্তরে কোনও যবনাদি জাতীয় ব্যক্তি যদি আর্য্যোচিত আচার ও কর্ম্মপরায়ণ হয়, তবে সেই জীবনেই তাহার আর্য্যজাতিরূপ পরিণাম হইতে পারে। যদি ব্যক্তি বিশেষের সেইরূপ উৎকট তপস্যা থাকে এবং পারিপার্শ্বিক অনুকূল অবস্থা পাওয়া যায়, তবে জীবিত-সমাজে ঐরূপ ব্যক্তির জাত্যন্তর

পরিণাম প্রাপ্তি স্বীকার করা একান্ত কর্ত্তব্য। ঐরূপ কার্য্যের দ্বারা সমাজের উদারতাই প্রকাশ পায় এবং দিন দিন সমাজদেহ পরিপুষ্টই হইয়া উঠে। সে যাহা হউক, পূর্ব্ব সূত্রে যে পঞ্চবিধ উপায় হইতে সিদ্ধ সমূহ সঞ্জাত হওয়ার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই জাত্যন্তর পরিণামরূপা সিদ্ধি এক মাত্র তপস্যা হইতেই সঞ্জাত হইতে পারে।

निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरण-भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् ॥३॥

कथं प्रकृतेरपि प्रारब्धादन्यथा परिणाम इत्याह निमित्तमिति। निमित्तं धर्म्माधर्म्मादिरूपं प्रारब्धं, प्रकृतीनां प्रतिजातिविलक्षणानां, अप्रयोजकं अनियन्तृ भवति, नहि कार्य्येन कारणं प्रवर्त्तते। तु किन्तु ततस्तस्मात् धर्म्माधर्म्मादिरूपान्निमित्तात्, वरणभेदः वरणस्य प्रतिबन्धकस्य भेदोऽपसारणम्। प्रतिबन्धापसारणेन हि सर्व्वपरिणामवीजरूपायाः प्रकृतेः प्रारब्धपरिणामादन्यथापि भवितुमर्हति। एतमेवार्थं द्रढ़यति दृष्टान्तेन क्षेत्रिकवदिति। यथा क्षेत्रिकः कृषीवलः क्षेत्रगतानां कण्टकादितृणानामपसारणेन व्रीहियवादिरूपशस्य परिणामकारकं रसमवाधितमलं सञ्चारयति तेषु तेष्वोषधिमूलेषु तथा जात्यन्तरपरिणामस्य प्रतिबन्धकीभूत प्रवलप्रारब्ध निमित्तापसारणेन स्वत एव भवति प्रकृतेरन्यजातिविकाय इति ॥ ३ ॥

প্রকৃতি হইতে প্রারব্ধ সংস্কাররূপ বীজের অন্যথা আপূরণ কি রূপে হইয়া থাকে, এ সূত্রে তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন —নিমিত্ত কখনও প্রকৃতি সমূহের প্রযোজক হইতে পারেনা, কিন্তু

তাহা হইতে (নিমিত্ত হইতে) বরণ ভেদ হয় অর্থাৎ প্রতিবন্ধক অপসৃত হয় মাত্র। যে রূপ কৃষকগণ করিয়া থাকে।

সহৃদয় পাঠক! ধীরে ধীরে ঋষির বাক্যগুলি বেশ পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। নিমিত্ত শব্দের অর্থ এস্থলে ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ প্রারব্ধ সংস্কার। যদিও প্রারব্ধ সংস্কারানুযায়ী প্রকৃতির পরিণাম হওয়াই সাধারণ নিয়ম, তথাপি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, পরিণাম কখনও প্রকৃতির নিয়ামক হইতে পারেনা; যে হেতু প্রকৃতি—কারণ এবং সংস্কারানুরূপ পরিণাম তাহার কার্য্য। কার্য্য দ্বারা কারণ কখনও নিয়ন্ত্রিত হয় না, সর্ব্বত্র কারণের দ্বারাই কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। তাই ঋষি বলিলেন—"নিমিত্তং অপ্রযোজকং প্রকৃতীনাং" পরিণাম কখনও প্রকৃতির প্রযোজক হয় না, বরং প্রকৃতি কর্ত্তৃকই পরিণাম সাধিত হইয়া থাকে। অনাদিজন্ম-সঞ্চিত অসংখ্য সংস্কার প্রকৃতির অন্তরে নিহিত রহিয়াছে; সুতরাং সর্ব্ববিধ পরিণামই প্রকৃতিহইতে পরিনিষ্পন্ন হইতে পারে। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থাগুলি যদি অপসারিত হয় অর্থাৎ প্রবল প্রতিবন্ধক গুলি যদি দূর করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রকৃতিহইতে যেরূপ পরিণাম আরম্ভ হইয়াছে, তাহাহইতে অন্যপ্রকার পরিণামও হইতে পারে। তাই ঋষি বলিলেন—"বরণভেদস্তু"। বরণের ভেদ হয় অর্থাৎ প্রতিবন্ধকসমূহের অপসারণ হয় এবং এইরূপ হইলেই প্রকৃতির অন্যরূপ পরিণাম হইতে পারে। মনে কর—কোনও ব্যক্তি প্রবল প্রারব্ধের বশে যবন বা ম্লেচ্ছ জাতীয় পিতামাতাহইতে জন্মগ্রহণ করিয়া তজ্জাতীয় ভাবেই পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির প্রকৃতিহইতে যবনাদি জাতীয় অবয়বানুপ্রবেশই হইতে লাগিল। তারপর কোনও কারণে যদি তাহার আর্য্যজাতীয় আচার ব্যবহার গ্রহণ করিবার সুযোগ উপস্থিত হয় এবং পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থাগুলি দূরীভূত হইয়া যায়, অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যদি যবনাদি জাতীয় আচার ব্যবহারাদির সংস্রব হইতে দূরে থাকিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা ও অধ্যবসায়

সহকারে আর্য্যজাতীয় সংস্কার গুলির পরিপোষণ করিতে থাকে, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যেই ঐ ব্যক্তির প্রারব্ধসংস্কার ক্ষীণ হইয়া যায় এবং আর্য্যোচিত সংস্কার সমূহের পরিণাম প্রকাশ পাইতে থাকে। এইরূপেই একজন অসাধুচরিত্র সাধুসঙ্গে পড়িয়া সাধু হইয়া উঠে। একজন গবাশী অহিন্দু ব্যক্তিও হিন্দুজাতীয় স্থূলশরীর লাভ করিতে পারে। যদিও নিষ্ঠাবান বর্ণাশ্রমী সম্প্রদায়ের সহিত ঐরূপ জাত্যন্তর প্রাপ্ত ব্যক্তি গণের সর্ব্বথা সামাজিক সংশ্রবের সম্ভাবনা নাই, তথাপি তাহারা যে বর্ত্তমান জীবনেই তপস্যাপ্রভাবে হিন্দুজাতীয় শরীর লাভ করিতে পারেন, এ বিষয়ে কোনওরূপ সংশয়ের অবকাশ নাই। পূর্ব্বোক্ত ঋষি বাক্যহইতে ইহা স্পষ্ট রূপেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। আবার পক্ষান্তরে ইহার বিপরীতও দেখিতে পাওয়া যায়—কোনও বর্ণাশ্রমী সম্প্রদায়স্থিত পিতামাতার সন্তান আর্য্যোচিত প্রতিভা সম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও দুর্দ্দৈববশতঃ যদি যবনাদিজাতীয় সংস্কার পরিপুষ্ট করিতে থাকে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ব্যবহারিক জীবন আচার ব্যবহার প্রভৃতি ঐরূপ সংস্কারপুষ্টির অনুকূলেই চলিতে থাকে, তবে বর্ত্তমান জীবনেই ঐ ব্যক্তি যবন বা ম্লেচ্ছজাতীয় পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রকৃতির আপূরণ হইতে জাত্যন্তর পরিণামের ইহাই রহস্য। যেরূপ ভাবে প্রকৃতির অবয়বানুপ্রবেশ হয়, জাতিপরিণামও সেইরূপ ভাবেই প্রকাশ পায়। একমাত্র "বরণভেদ" অর্থাৎ প্রতিবন্ধক দূরীভূত হওয়াই এইরূপ অন্যথাপরিণামের হেতু।

এই বরণভেদ কথাটী সহজবোধ্য করিবার জন্য সূত্রকার ঋষি স্বয়ং একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন—"ক্ষেত্রিকবৎ"। ক্ষেত্রিক শব্দের অর্থ কৃষক। কৃষক স্ব স্ব ক্ষেত্রস্থিত নিষ্প্রয়োজনীয় লতাগুল্মগুলিকে অর্থাৎ আগাছাগুলিকে দূরীভূত করিয়া দেয়, তাহার ফলে ক্ষেত্রগত শস্য পরিপোষক রস অবাধিতভাবে পর্য্যাপ্তপরিমাণে ওষধিমূলে সঞ্চারিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। কণ্টকাদি অকর্ম্মণ্য তৃণগুলি দূরীভূত হওয়ার ফলেই ব্রীহি যবাদি শস্যসমূহ সম্যক্ পরিপুষ্ট হইয়া

উঠে। ঠিক এইরূপই যদি কোনও প্রকারে প্রারব্ধ-সংস্কারের অনুরূপ পরিণামকে প্রতিহত করা যায়, তবে অনন্ত বীজের আধার মহাশক্তিরূপিণী প্রকৃতি আপনা হইতেই অন্যপ্রকার পরিণাম সৃষ্টি করিয়া থাকে। প্রকৃতিহইতে সর্ব্বপ্রকার পরিণামই সম্ভব; যেহেতু, সর্ব্ববিধ পরিণামের বীজই প্রকৃতির গর্ভে নিহিত আছে। তন্মধ্যে প্রারব্ধসংস্কারই অন্যান্য সংস্কারানুরূপ পরিণাম-প্রাপ্তির পক্ষে "বরণ" অর্থাৎ প্রতিবন্ধকরূপে অবস্থান করে। যদি বিধিবশে গুরুকৃপায় প্রবল-তপস্যাপ্রভাবে এমন কোন সুযোগ উপস্থিত হয় যে ঐ "বরণ" ভেদ হইয়া যায়—প্রারব্ধ-সংস্কাররূপ প্রতিবন্ধক অপসৃত হইয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই প্রকৃতি হইতে অন্যথা পরিণাম প্রকাশ পাইবে। পরিণাম কখনও প্রকৃতির প্রযোজক হইতে পারে না, বরং প্রকৃতিই পরিণামের একমাত্র নিয়ন্ত্রী, এই সর্ব্ববাদিসিদ্ধ সিদ্ধান্তই ঋষি এই সূত্রে ক্ষেত্রিকের দৃষ্টান্তদ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন।

निर्म्माणचित्तान्यस्मितामात्रात् ॥४॥

स्यादेतदभ्युदयकामिनां त्रैवर्गिकानाम्, ये तु प्रकृतेरपि पारंगमा योगिनस्तेऽपि परिणामशीलाभिश्चित्तवृत्तिभिरुपलक्ष्यन्ते, तत्कथमित्याह निर्म्माणेति। निर्म्माण-चित्तानि अभिनव-संगठितचित्तानि—वास्तवसत्तारहितान्यपि स्वप्नदृश्यानीव स्वगतभेदमात्रावलम्बनान्यात्मविलासमयानीति भावः। अस्मितामात्रात् केवलाया अस्मिताया ऐश्वरचित्तरूपाया, न तु धर्म्माधर्म्मादिनिमित्तवशादित्यर्थः। प्रागेवाविद्याविलयेन तद्विलयादिति ध्येयम् ॥ ४ ॥

যাহারা অভ্যুদয়কামী, যাহারা ত্রৈবর্গিক, প্রবল অধ্যবসায় ও উগ্র-তপস্যা প্রভাবে বর্ত্তমান জীবনেই তাহাদের জাত্যন্তরপরিণাম পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে; তাহা হউক। যাঁহারা প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত কৈবল্যপদের সন্ধান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও পরিণামশীলা চিত্তবৃত্তি-সম্পন্ন হইয়া অবস্থান করেন। দেখিতে পাওয়া যায়—জীবন্মুক্ত যোগিগণেরও চিত্তবৃত্তি বিদ্যমান থাকে; ইহা কি প্রকারে সম্ভাবিত হয়? আশঙ্কার বিষয় এই যে—অবিদ্যার সম্যক্ বিলয় হইলেই দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগ লাভ হয়। অবিদ্যা-বিলয় হইলে তৎকার্য্যস্বরূপ চিত্তবৃত্তি সমুহেরও বিলয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং যদি কেহ অসম্প্রজ্ঞাত যোগে উপনীত হয়, তবে তাহার চিত্তবিলয় হইবেই, কোনও প্রকারে তাহার অন্যথা হইতে পারে না। ইহাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তবে যোগহইতে ব্যুত্থিত হওয়া অর্থাৎ পুনরায় চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট হওয়া কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? ঋষি এই সূত্রে এ আশঙ্কার নিরাকরণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন—মাত্র অস্মিতা হইতেই নির্ম্মাণচিত্ত সমূহ প্রকাশ পায়।

অস্মিতা ঈশ্বরক্ষেত্র। এইস্থান হইতেই স্বরূপে আরোহণ করিতে হয়। যাঁহারা বলেন—"ঈশ্বর-দর্শন না করিয়াও অদ্বয় সত্তায় অবস্থান করা যায়", তাঁহাদের সহিত আমরা কিছুতেই একমত হইতে পারি না। অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ না হইলে, কেহ কখনও অসম্প্রজ্ঞাত যোগে আরোহণ করিতে পারে না, কেহ পারে নাই, ভবিষ্যতেও পারিবে না। ঈশ্বর-দর্শন এবং ঐ অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ একই কথা। ঐ ঈশ্বরক্ষেত্র অর্থাৎ অস্মিতা হইতেই পুনঃ পুনঃ অধ্যবসায়-প্রয়োগে—তীব্র অভ্যাস ও বৈরাগ্যপ্রভাবে অদ্বয়স্বরূপে উপনীত হওয়া যায়। সুতরাং অস্মিতাই যোগের বা স্বরূপের অতি সন্নিহিত ক্ষেত্র। যদিও অস্মিতার পরও প্রকৃতিক্ষেত্র আছে, তাহা সর্ব্বথা অব্যক্ত বলিয়াই এস্থলে তাহার উল্লেখ করা হইল না। যতদিন স্বরূপস্থিতি অনিয়ত থাকে, ততদিন স্বরূপ হইতে অস্মিতায়, এবং

অস্মিতা হইতে স্বরূপে পুনঃ পুনঃ ব্যুত্থান ও সমাধি হইবেই। যদিও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে অস্মিতাকেও চিত্ত বলা যায়; তথাপি এস্থলে ঋষি চিত্তহইতে অস্মিতাকে ভিন্নরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। স্থূল কথায় ঈশ্বরচিত্তকে অস্মিতা এবং জীবভাবাপন্ন বৃত্তিগুলিকে চিত্ত বলা যায়। অসম্প্রজ্ঞাত-যোগে উপনীত হইবার সময়ে ঐ জীবভাবাপন্ন চিত্তই বিলয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ঈশ্বরচিত্ত অর্থাৎ অস্মিতা সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। যখন সত্ত্ব ও পুরুষের শুদ্ধিসাম্য হয়, যখন সর্ব্বথা কৈবল্যপদ লাভ হয়, তখন আর ঐ ঈশ্বরচিত্তও থাকে না, ঐ সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত অস্মিতাও চিরতরে বিলয় হইয়া যায়। যতদিন যোগীর সে অবস্থা না আসে,ততদিন যোগহইতে ব্যুত্থিত হইলেই যোগী অস্মিতাক্ষেত্রে অবতরণ করিতে বাধ্য হন। এই অস্মিতা জীবচিত্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। জীবচিত্তে প্রতিনিয়ত সজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদপ্রতীতিরই উদয় হইতে থাকে, আর এই অস্মিতাক্ষেত্রে—"একোঽহং" রূপ নিরবচ্ছিন্ন প্রত্যয়ধারা উদিত হইতে থাকে। এই একোঽহং হইতেই "বহুস্যাম্" রূপ প্রত্যয় প্রকাশিত হয় অর্থাৎ মাত্র স্বগতভেদ প্রতীতিই প্রকাশ পায়। এই যে "এক আমি বহুরূপে বিরাজিত" রূপ প্রত্যয় বা প্রত্যক্ষ অনুভব, ইহারই নাম অস্মিতা হইতে নির্ম্মাণচিত্তের প্রাদুর্ভাব।

নির্ম্মাণচিত্ত শব্দের অর্থ অভিনব সংগঠিত চিত্ত। যে চিত্ত কেবল সজাতীয় বিজাতীয় ভেদজ্ঞান লইয়াই প্রকাশ পায়, সেই জীবচিত্তহইতে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহা মাত্র অস্মিতার বৃহদ্রূপে আত্মপ্রকাশ করে। "যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা ইষ্টস্ফুরে"। যেদিকে দৃষ্টি নিপতিত হয়, যে ভাবেই বৃত্তিস্পন্দন উত্থিত হয়, সে সকল "আত্মময়" হইয়াই প্রকাশ পায়। ইহাই নির্ম্মাণচিত্তের স্বরূপ। এইরূপ চিত্তকে অভিনব সংগঠিত চিত্ত বলা যায়। যদিও স্বরূপে আরোহণ করিবার পূর্ব্বেও ঐরূপ প্রতীতিই হইতে থাকে বটে, তথাপি সে প্রতীতি ঠিক আত্মময় নহে। যতদিন আত্মসাক্ষাৎকার লাভ না হয়, ততদিন

যথার্থ আত্মরসের আস্বাদ পাওয়া যায় না। বিভূতি ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে যে আত্মদৃষ্টির বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহা সম্প্রজ্ঞাতযোগলব্ধ আত্মাভাসমাত্র। যদি কেহ একবারও আত্মস্বরূপে—অসম্প্রজ্ঞাত যোগে উপনীত হইতে পারেন, তবে তিনি তথা হইতে অস্মিতাক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া যেরূপ প্রত্যয়সমূহ প্রত্যক্ষ করেন, তাহাই নির্ম্মাণ-চিত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মাত্র অস্মিতাহইতে—শুদ্ধ অস্মিতাহইতে অর্থাৎ ঐশচিত্ত হইতেই ঐরূপ নির্ম্মাণচিত্ত সমূহ প্রকাশ পায়। সাধারণ চিত্ত —জীবভাবাপন্নচিত্ত কর্ম্মাশয়হইতে অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্ত বশেই প্রাদুর্ভূত হয়; সুতরাং তাহাতে রাগ দ্বেষ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে; কিন্তু নির্ম্মাণচিত্ত সেরূপ নহে। ইহা কোনরূপ নিমিত্তের বশীভূত নহে, ইহা ঈশ্বরচিত্ত, স্বাধীন—স্বতন্ত্র। এ চিত্তে সর্ব্বত্র স্বগত ভেদ অর্থাৎ আত্মসত্তারই বহুত্ববিলাস পরিলক্ষিত হয়। পরমার্থ-সত্তারহিত অথচ স্বপ্নদৃশ্যবৎ—দর্পণ-দৃশ্যমান নগরীর ন্যায় অপূর্ব্ব আত্মবিলাস দর্শনের সৌভাগ্য এই নির্ম্মাণচিত্তহইতেই লাভ করা যায়। রাগদ্বেষশূন্য হইয়া জগতে বিচরণ করিবার সামর্থ্যও এই নির্ম্মাণচিত্ত হইতেই আবির্ভূত হয়। মাত্র বিচার বা যুক্তিদ্বারা কেহ কখনও রাগদ্বেষ-বিমুক্ত পুরুষ হইতে পারে না। নির্ম্মাণচিত্তহইতেই জীবন্মুক্তির বিশিষ্ট আনন্দ লাভ হইয়া থাকে।

অসম্প্রজ্ঞাত-যোগহইতে ব্যুত্থিত যোগীরই এইরূপ নির্ম্মাণচিত্ত সমূহ প্রাদুর্ভূত হয়। পরমর্ষি কপিল এই নির্ম্মাণচিত্ত আশ্রয় করিয়াই আসুরি প্রভৃতি মুনিকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এ যুগেও যে সকল সাধক এই নির্ম্মাণচিত্ত লাভ করিয়াছেন, মাত্র তাহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষাই জগতের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम् ॥५॥

कथं नाम बहुत्वं चित्तानामुच्यते प्रवृत्तिभेद इति। एकं चित्तं "एकोऽहं" मित्येवं रूपम्, अनेकेषां चित्तानां प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं भवतीति शेषः। प्रवृत्तिः प्रागुक्ता विषयवती, स्वरूपाद् व्युत्थितस्य योगिनः प्रवृत्तिरेवोदेति, न तु प्राकृतजनलभ्यं वृत्तिमात्रमिति। प्रवृत्ति-भेदे "अहमेव सर्व्वं मयि भाति सर्व्वम्" इत्येवंरूपे विलक्षणतां गते एकं चित्तमैश्वरं चित्तं प्रयोजकं नियन्तृ भवति। अत्रेयमनुभूतिविशेषः —विभूतिषु स्वगतभेदस्य पारमार्थिकत्वप्रतीतिः, असम्प्रज्ञाताद् व्युत्थाने तु बहुत्वस्य सर्व्वथाऽपारमार्थिकत्वप्रतीतिरिति सुधीभि-रनुभाव्यम् ॥ ५ ॥

পূর্ব্বসূত্রে "চিত্তানি" পদের প্রয়োগ থাকায়, চিত্তগত বহুত্বের আশঙ্কা হইতে পারে, এইসূত্রে ঋষি তাহার নিরাকরণ করিতেছেন। তিনি বলিলেন—একচিত্তই অনেকচিত্তের প্রবৃত্তিভেদে প্রযোজক হইয়া থাকে। একচিত্ত শব্দে এস্থলে "একোঽহং" রূপ ঐশ্বর চিত্তই বুঝিতে হইবে। মহাপ্রলয়ের অবসানে—সৃষ্টির উন্মুখ অবস্থায় সর্ব্বভেদাতীত পরমাত্মা "একোঽহং" রূপে ঈশ্বররূপে একচিত্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেন—পরিকল্পিত হয়েন। ঠিক এইরূপই সর্ব্বভাব প্রলয়কারী অসম্প্রজ্ঞাত যোগের অবসানে—ব্যুত্থিত অবস্থায়ও যোগী শুদ্ধ-অস্মিতারূপে আত্মস্বরূপকে অবলোকন করেন। ইহাই একচিত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই একচিত্তই অর্থাৎ অস্মিতাই যুগপৎ বহুচিত্তের প্রবৃত্তিভেদের প্রতি প্রযোজক হয়। তাৎপর্য্য এই যে, চিত্ত বাস্তবিক বহু নহে, প্রবৃত্তিভেদে বহুচিত্ত

কল্পিত হয় মাত্র। আর সেই বহুচিত্তের যে প্রবৃত্তি ভেদ, তাহারও প্রযোজক অর্থাৎ নিয়ন্তৃ ঐ একচিত্তই—ঐ অস্মিতাই।

প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ—পূর্ব্বোক্ত বিষয়বতী প্রবৃত্তি। চিত্তের সাধারণতঃ বৃত্তিসমূহই প্রকাশ পায়, অথবা বৃত্তিসমূহই চিত্ত নামে অভিহিত হয়। এ ক্ষেত্রে সেরূপ নহে—এ ক্ষেত্রে বৃত্তি প্রকাশ পায় না, প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়। বৃত্তি ও প্রবৃত্তির ভেদ ইতিপূর্ব্বে অতি স্পষ্ট ভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যোগহইতে ব্যুত্থিত যোগীর প্রবৃত্তিই প্রকাশ পায়, একেবারে বৃত্তিপর্য্যন্ত অবতরণ করিতে হয় না। "অহমেব সর্ব্বং ময়ি ভাতি সর্ব্বম্" আমিই সকল এবং আমাতেই সকল অবস্থিত, এইরূপ যে স্বগত-ভেদাবগাহিনী চিত্তবৃত্তি সমূহ, তাহাই এস্থলে প্রবৃত্তিভেদ শব্দের তাৎপর্য্য। অস্মিতা হইতে অর্থাৎ একচিত্তহইতে নির্ম্মাণচিত্ত-সমূহ অর্থাৎ বহুচিত্তের বিভিন্ন প্রবৃত্তিসমূহ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। যেরূপ বৃত্তি ও চিত্ত অভিন্ন, সেইরূপ প্রবৃত্তিভেদ ও বহু নির্ম্মাণচিত্ত অভিন্ন বস্তু। শুধু বলিবার এবং বুঝিবার পক্ষে সহজ হয় বলিয়াই চিত্তবৃত্তি ও নির্ম্মাণ চিত্তসমূহের প্রবৃত্তিভেদ, এইরূপ বলা হইয়া থাকে।

সে যাহা হউক, এইবার আমরা এই অস্মিতাহইতে সঞ্জাত প্রবৃত্তিসমূহের স্বরূপ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। যোগী যতদিন অসম্প্রজ্ঞাতস্বরূপে একবার ক্ষণকালের তরেও উপনীত হইতে না পারেন, ততদিন এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চকে সত্যরূই বহুত্ব-বিলাসরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। আর ঐ স্বরূপহইতে ব্যুত্থিত হইলে যোগী এই দৃশ্য-প্রপঞ্চকে পারমার্থিক সত্তাহীন অথচ কল্পিত বহুত্ববিলাসরূপেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সম্প্রজ্ঞাত যোগেও অস্মিতার বহুত্ববিলাস প্রত্যক্ষ হয়, তাহা তখন পর্য্যন্ত পরমার্থরূপেই পরিগৃহীত হইয়া থাকে। আর অসম্প্রজ্ঞাত হইতে ব্যুত্থিত যোগীর নিকট ঐ বহুত্ববিলাস সত্তাহীন অতি অকিঞ্চিৎকর, অথচ যেন সত্তাবিশিষ্ট পদার্থের ন্যায়ই পরিলক্ষিত হইতে থাকে।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি—বিভূতিপাদে যে স্বগতভেদ বর্ণিত হইয়াছে, উহা সত্য সত্যই স্বগতভেদরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে আর এ ক্ষেত্রে—এই নির্ম্মাণচিত্তক্ষেত্রে স্বগতভেদও যে একান্তই কল্পিত, ইহা প্রত্যক্ষ হয়। এই সূক্ষ্মতম অনুভবের কথা যাহারা যথার্থদর্শী পুরুষ, মাত্র তাহারাই বুঝিতে পারিবেন। যোগদর্শনপ্রোক্ত প্রত্যেক বাক্যটীই সত্যের উপরে—প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত।

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥ ৬ ॥

যদি নাম চিত্তমস্তি তদাকর্ম্মাশয়োঽপ্যস্তীতি শঙ্কাং পরিহরতি তত্রেতি। তত্র প্রবৃত্তিভেদবিষয়ে যত্ চিত্তং প্রযোজকং তদ্ধ্যানজং সমাধিজন্য-মস্মিতামাত্ররূপং, অতএবানাশয়ং কর্ম্মাশয়বিরহিতং, ন তু কাম-কর্ম্মাদিদূষিতং ঈশ্বরপ্রতীতি বিলয়াদিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

যদি চিত্তই থাকিয়া যায়, তবে কর্ম্মাশয়ও থাকিবে, আবার কর্ম্মাশয় থাকিলে জাত্যায়ুর্ভোগরূপ সংসার নিবৃত্তিও হয় না। এইরূপ আশঙ্কায় পরিহারার্থই এই সূত্রের অবতারণা। ঋষি বলিলেন—তদ্‌বিষয়ে অর্থাৎ প্রবৃত্তিভেদবিষয়ে প্রযোজক যে চিত্তের কথা বলা হইয়াছে, সে চিত্ত ধ্যানজ ; সুতরাং তাহা কর্ম্মাশয় শূন্যই হইবে।

কাম-কর্ম্মাদি-দূষিত চিত্ত হইতে ধ্যানজ চিত্ত সম্পূর্ণ পৃথক্। ধ্যান শব্দের অর্থ এস্থলে সমাধি অর্থাৎ স্বরূপ-স্থিতিরূপ যোগ। তাহা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া যে একচিত্ত পাওয়া যায়, সেই অস্মিতামাত্র-স্বরূপ চিত্তকেই ধ্যানজ চিত্ত কহে। সাধারণ চিত্ত কর্ম্মাশয়-জাত, আর এই শুদ্ধ অস্মিতাস্বরূপ যে ঐশ্বরচিত্ত, তাহা ধ্যানলব্ধ। এই চিত্ত অনাশয় অর্থাৎ কর্ম্মাশয়রহিত হইবেই। তাৎপর্য্য এইযে, শুদ্ধ অস্মিতাস্বরূপ চিত্তে দেশ প্রতীতি থাকে না। দেশপ্রতীতি না থাকায়

বহুত্বপ্রত্যয় অর্থাৎ সজাতীয় বিজাতীয় ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং কাম-কর্ম্মাদির বিদ্যমানতা একেবারেই অসম্ভব।

শুন, খুলিয়া বলিতেছি—জিঘৃক্ষা-গ্রহণেচ্ছা এবং জিহাসা—ত্যাগেচ্ছা, ইহাকেই স্থূলকথায় কর্ম্মাশয় বলা যায়। "আমা হইতে অন্য কিছু আছে" এইরূপ প্রত্যয় হইতেই ঐরূপ হেয়োপাদেয় বুদ্ধি বা কর্ম্মাশয় উপস্থিত হইতে থাকে। কিন্তু যে চিত্তে অন্য বলিতে কিছুই নাই, কেবল আমিময় সত্তাই প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, সে স্থলে জিঘৃক্ষা বা জিহাসা কোন রূপেই থাকিতে পারে না। তাই ঋষি বলিলেন—ধ্যানজ চিত্ত অনাশয়ই হয়; সুতরাং উহা কখনও সংসারবন্ধনের হেতু স্বরূপ হইতে পারে না। ঐরূপ চিত্ত কৈবল্যস্থিতির পক্ষেই সহায়স্বরূপ হইয়া থাকে।

কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্ ॥ ৭ ॥

ন তাবৎ কর্ম্মতশ্চিত্তং ভিদ্যতে, সতি কর্ম্মণি কর্ম্মাশয়ো নাস্তীতি বচো বিরুদ্ধমিতি নিরাকরোতি কর্ম্মেতি। যোগিনঃ কৃতসাক্ষাৎকার-স্বরূপস্য, কর্ম্ম চিত্তস্পন্দনরূপং, অশুক্লাকৃষ্ণং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সংস্কার-বিহীনমিত্যর্থঃ, দ্বৈতসত্তাবিষয়ক-প্রত্যয়াভাবাৎ। ইতরেষাং দ্বৈতদর্শিনা-মযোগিনাং কর্ম্ম তু ত্রিবিধং, তথাহি—শুক্লং কৃষ্ণমুভয়াত্মকঞ্চ। ফলাসক্তিরেব কর্ম্মাশয়প্রচয়ে হেতুস্তচ্চ ফলং পুণ্যময়ং পাপময়মুভয়াত্মকং বা ভবতি, তেন চ শুক্লাদিরূপং ত্রিবিধমুচ্যতে কর্ম্ম। অত্রেদমুচ্যতে—

> যথাহের্গরলং ঘোরং নাপকারায় তস্য বৈ।
> তথেদং বিম্বিতং বিশ্বং ব্রহ্মণি বন্ধনং নহি ॥
> জীবন্মুক্তস্য স্বস্থস্য ব্যবহারো যথা তথা।
> ন তেনাসৌ বিবদ্ধঃ স্যাদ্ যথা প্রাকৃত-মানবঃ ॥
> প্রারব্ধবৈচিত্র্যবশাৎ কদাপি রাগী বিরাগী পরিলক্ষ্যতে বা।
> ন চানুরক্তো নহি বা বিরক্তো ব্রহ্মাত্মদৃষ্ট্যৈব বসন্ সলীলঃ ॥ ৭ ॥

চিত্ত এবং কর্ম্ম অভিন্ন, কর্ম্ম বিদ্যমান, অথচ কর্ম্মাশয় নাই, ইহা বিরুদ্ধ বাক্যরূপেই প্রতিপন্ন হইতে পারে; এসূত্রে তাহা মীমাংসিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—যোগীর কর্ম্ম অশুক্ল অকৃষ্ণ, কিন্তু অপর জনগণের কর্ম্ম ত্রিবিধ অর্থাৎ শুক্ল কৃষ্ণ এবং উভয়াত্মক। এস্থলে শুক্ল শব্দের অর্থ পুণ্যময়, কৃষ্ণশব্দের অর্থ পাপময়। কর্ম্মাশয় হইতে যে কর্ম্মসমূহ প্রকাশ পায় অর্থাৎ কামনা পূর্ব্বক যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহা হয় পুণ্য ফল জনক, না হয় পাপ জনক, নচেৎ পাপ পুণ্য উভয় ফল জনক হইয়া থাকে, তাই জীব সাধারণের কর্ম্ম ত্রিবিধই হইয়া থাকে। এই কর্ম্মপ্রবাহ মধ্যে নিপতিত হইয়াই জীবগণ পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে পরিভ্রামিত হইয়া থাকে। কিন্তু যোগীর সেরূপ হয় না—যোগীর নির্ম্মাণচিত্ত সর্ব্বথা স্বগত-ভেদাবগাহী। তাহাহইতে যে কর্ম্ম সকল প্রকাশ পায়, তাহা ধর্ম্ম কিংবা অধর্ম্ম, অথবা তদুভয়াত্মক সংস্কারশূন্য এক প্রকার চিত্তস্পন্দন মাত্র। ঐরূপ কর্ম্ম কখনও কর্ম্মাশয় প্রচয়ের হেতু হইতে পারে না; তাই ঋষি বলিলেন—যোগীর কর্ম্ম শুক্লও নয়, কৃষ্ণও নয়। নির্ম্মাণচিত্ত যোগিগণ পরমার্থসত্তাবিহীন অস্মিতার বিভিন্ন ব্যূহ মাত্রই দর্শন করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহাদের হেয়োপাদেয়বুদ্ধি থাকে না। আর সাধারণ জনগণ আসক্তি পূর্ব্বক—হেয়োপাদেয়বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করে; তাই তাহাদের কর্ম্মাশয় পরিপুষ্ট হইতে থাকে। ধ্যানজচিত্ত হইতে সাধারণ চিত্তের ইহাই প্রভেদ। অতএব ধ্যানজচিত্ত অর্থাৎ অভিমান শূন্যকর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও কর্ম্মাশয় উপচিত হয় না। এবিষয়ে একটী আত্মসম্বেদনও আছে—সর্পের বিষ যেরূপ সর্পের অনিষ্ট করে না, ঠিক সেইরূপ ব্রহ্মে প্রতিবিম্বিত এই বিশ্ব কখনও ব্রহ্মের বন্ধন জন্মাইতে পারে না। যে ব্যক্তি যোগী অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্, সে ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যায়; সুতরাং জীবন্মুক্ত ঐরূপ স্বস্থব্যক্তির ব্যবহার যেরূপই হউক না কেন, তাহাদ্বারা তিনি কখনও প্রাকৃত জনের ন্যায় বদ্ধ হন না। প্রারব্ধবৈচিত্র্য বশতঃ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কখনও অনুরাগবান্ কখনও বা বৈরাগ্যবান্‌রূপে পরিলক্ষিত হইতে

পারেন, বাস্তবিক পক্ষে তিনি কখনও অনুরক্ত বা বিরক্ত নহেন। যিনি ব্রহ্মাত্মদর্শী যোগী, তাঁহার সর্ব্ববিধ ব্যবহার লীলা মাত্রই।

ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्ति वासनानाम् ॥ ८ ॥

एवमनाशयं चित्तं निरूप्याशयवच्चित्तस्वरूपं दर्शयति तत इति ततस्तस्मात्त्रिविधात् कर्म्मणस्तद्विपाकानुगुणानां—यादृशस्य कर्म्मणो यथा विपाकः परिणामस्तादृशोविपाकस्तद्विपाकस्तस्यानुगुणा या वासनास्तादृशानामेव वासनानामभिव्यक्तिः प्रकटभावो भवतीतिशेषः। एवकारेण नियामकतोऽन्यथाभावः। तथाहि सता शुक्लेन कर्म्मणा विपच्यमानेनाभिव्यज्यते वासना दैवी पुण्यमयी, कृष्णेनासुरी पापमयी सङ्कीर्णेन च सङ्कीर्णेति।

অনাশয়চিত্তের স্বরূপ নিরূপণ পূর্ব্বক এক্ষণে আশয়বিশিষ্ট চিত্তের স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—তাহাহইতে সেই ত্রিবিধ কর্ম্মহইতে তদ্‌বিপাকানুগুণ বাসনাসমূহের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। "তদ্‌বিপাকানুগুণ" কথাটীর অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক—যেরূপ কর্ম্মের যাহা বিপাক অর্থাৎ পরিণাম, সেইরূপ পরিণামকে "তদ্‌বিপাক" বলা হয়। তাহার অনুগুণ—অনুকূল যে বাসনাসমূহ, তাহাই তদ্‌বিপাকানুগুণ বাসনা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সূত্রে একটী "এব" শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহাদ্বারা বুঝা যায়—কর্ম্ম-বিপাক অনুসারেই বাসনাসমূহের অভিব্যক্তি হয়, তাহার অন্যথা কখনও হয় না। আর একটু পরিষ্কারভাবে বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা

করা যাইতেছে। যদি শুক্লকর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, তবে তাহার পরিণাম রূপে দৈবী বাসনা সমূহই অভিব্যক্ত হয়। ঠিক এই রূপই কৃষ্ণকর্ম্মের পরিণামে আসুরী বাসনা এবং উভয়াত্মক কর্ম্মের পরিণামে উভয়াত্মক বাসনাসমূহই প্রকাশ. পাইয়া থাকে। তদ্‌বিপাকানুগুণ বাসনীর অভিব্যক্তি শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য।

ভগবান্ বলিয়াছেন—কর্ম্মের গতি অতি গহন, কোন্ কর্ম্ম কিরূপ বিপাক প্রকাশ করিবে, তাহা সাধারণভাবে নিরূপণ করা দুরূহ। কোনও কর্ম্মের বাহ্যরূপ হয়ত শুক্ল; কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে উহা হইতে কৃষ্ণফল সূচনাই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার পক্ষান্তরে কোনও কর্ম্মের বাহ্যরূপ হয়ত কৃষ্ণ, কিন্তু তাহা হইতেই শুক্লপরিণাম হইতে পারে। কর্ম্মগত শুক্লত্ব কৃষ্ণত্ব বা উভয়াত্মকত্বই পরিণামগত শুক্লত্ব প্রভৃতির প্রতি হেতু হইয়া থাকে। এজগতে কত লোক দৈবী বাসনা লইয়া, কত লোক আসুরী বাসনা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের সেই বাসনাগত বৈচিত্র্যের প্রতি একমাত্র হেতু ঐ কর্ম্মগত শুক্লত্ব বা কৃষ্ণত্ব। হ্যাঁ, আর একটা কথা স্মরণ করিবার যোগ্য এই যে, যত দিন মানুষ স্বরূপস্থিতিরূপ যোগে আরোহণ করিতে না পারে, ততদিন তাহাদের কর্ম্ম শুক্ল কৃষ্ণ ও উভয়াত্মক থাকিবেই। কেবল শুক্ল কর্ম্মী কিংবা কেবল কৃষ্ণকর্ম্মী মানুষ সুদুর্ল্লভ। এমন পুণ্যবান্ নাই, যাহাতে বিন্দুমাত্র পাপস্পর্শ নাই। আবার এমন পাপীও নাই, যাহাতে বিন্দুমাত্র পুণ্যস্পর্শ নাই। যাহা আত্মকল্যাণজনক কর্ম্ম, তাহাই শুক্ল কর্ম্ম। যাহা পরপীড়ন জনক কর্ম্ম, তাহা কৃষ্ণ কর্ম্ম,। আর যাহা পরপীড়ন পূর্ব্বক আত্মকল্যাণকর কর্ম্ম, তাহাই উভয়াত্মক কর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে ত্রিবিধ বাসনার অভিব্যক্তি হয়, ইহাই কর্ম্মাশয়। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বাসনা সমন্বিত চিত্তকেই আশয়-বিশিষ্ট চিত্ত বলা হয়। যোগীদিগের কর্ম্ম অশুক্লাকৃষ্ণ; সুতরাং তাহাদের চিত্ত কর্ম্মাশয়-বিহীন—বাসনা-বিহীন।

जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य्यं
स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्॥९॥

भाष्य। कर्म्मविपाकानुगुणवासनाभिव्यक्तिस्तत्र कार्य्यकारणयो रव्यवहितत्वरूप-नियमभङ्गाशङ्कां निराकरोति जातीति। जाति-र्मनुष्यत्वादिरूपा, देशः पूर्व्वोत्तरादिरूपः, कालो युगकल्पादिरूपः, एतैर्व्यवहितानामपि वासनानामानन्तर्य्यमव्यवहितत्वमभिव्यक्तौ भवतीति शेषः। एवञ्च जन्मशतेन कोशशतेन युगशतेन वा व्यवहिता-नामपि वासनानामव्यवहितत्वं संघटतेऽभिव्यक्तौ। कुत एवमित्याह स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्। स्मृतिरनुभूयमान-संस्कारः, संस्कारो बीजभूता वासना, एतयोरभिन्नत्वात्। यदि नामाभविष्यज्जात्यादिभि-र्व्यवहितत्वादभिव्यक्तौ किञ्चिन्मात्रमपि वैरूप्यं, तदैवाभविष्यत् कारणस्या व्यवहितत्व-नियमभङ्गप्रसक्तिर्न च तथा दृश्यते।

अत्रायं निष्कर्षः—या हि नाम वासना स एव संस्कारः, या च तदुद्बोधविषयतारूपाभिव्यक्तिः सा एव स्मृतिः। शतजन्मादिभिः कृत सम्प्रमोषा अप्यसम्प्रमोषरूपायाः स्मृतेरभ्युदयोऽव्यवहित इव वासनात इति॥९॥

কর্ম্মবিপাকানুসারেই বাসনা সমূহের অভিব্যক্তি হয়, পূর্ব্ব সূত্রে ইহা বলা হইয়াছে; এই অভিব্যক্তি বিষয়ে কার্য্য কারণের অব্যবহিতত্বরূপ নিয়মভঙ্গের আশঙ্কা হইতে পারে, এইসূত্রে সেই আশঙ্কা নিরাকৃত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—জাতি দেশ এবং কালদ্বারা ব্যবহিত হইলেও বাসনা সমূহের অভিব্যক্তি বিষয়ে আনন্তর্য্যই থাকে; যেহেতু স্মৃতি এবং সংস্কারের একরূপত্বই সর্ব্বথা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

জাতি—মনুষ্যত্বাদিরূপ, দেশ—পূর্ব্বদেশ উত্তরদেশ ইত্যাদিরূপ, কাল—যুগ কল্পাদিরূপ। এই সকলের দ্বারা ব্যবহিত হইলেও বাসনা এবং তাহার অভিব্যক্তি, এই উভয়ের মধ্যে অব্যবধানই থাকে। শত জন্মদ্বারা ব্যবধান প্রাপ্ত হইলে, কিংবা শতক্রোশ দ্বারা ব্যবহিত হইলে, অথবা যুগ কল্প প্রভৃতি সুদীর্ঘ কালদ্বারা ব্যবহিত হইলেও বাসনারূপ কারণ এবং অভিব্যক্তিরূপ কার্য্য, এই উভয়ের মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান থাকে না, অর্থাৎ কার্য্যকারণের অব্যবহিতত্বরূপ নিয়ম ভঙ্গ হয় না। মনে কর—কাহারও সম্রাট্ হইবার বাসনা আছে, যে জীবনে, যে দেশে, যে কালে এরূপ সংস্কার উপচিত হইল, সেই জন্ম সেই দেশ এবং সেই কালহইতে অনেক জন্ম ব্যবধানে, ভিন্ন দেশে অনেক পরবর্ত্তিকালে যখন সেই ব্যক্তির উক্ত সম্রাট্‌বাসনার অভিব্যক্তি হইল, অর্থাৎ সে সম্রাট হইল, তখন ঐ জন্মগত দেশগত ও কালগত যে সুদীর্ঘ ব্যবধান, তাহার কোন স্মৃতিই থাকিল না। বাসনা এবং তদনুরূপ অভিব্যক্তি যেন অব্যবহিতভাবেই সংঘটিত হইল। যাগাদি বৈধকর্ম্মের দৃষ্টান্তদ্বারাও ইহা বেশ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। স্বর্গকামনায় কেহ অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিল, সেই যজ্ঞের অবসানক্ষণেই তাহার স্বর্গ লাভ হয় না। সে স্থলে কার্য্য-কারণের অব্যবহিতত্ব নিয়ম রক্ষার জন্য একটী "অপূর্ব্ব" স্বীকার করিতে হয়। অশ্বমেধযজ্ঞাবসানে ঐ যজ্ঞজন্য একটী অপূর্ব্ব বা অদৃষ্ট সঞ্চিত হয়। দেহাবসানে ঐ অপূর্ব্বই অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে থাকিয়া স্বর্গ প্রাপ্তির হেতু স্বরূপ হয়, এইরূপে সেস্থলেও কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কারণের অক্ষুণ্ণতাই থাকে। ঠিক এইরূপই আমাদের প্রস্তাবিত স্থলে শতজন্মাদিরূপ ব্যবধানেও যদি বাসনার অভিব্যক্তি হয়, তবে সেই অভিব্যক্তি কালে এই ব্যবধানের দ্বারা বাসনাগত কোনরূপ বৈরূপ্য সাধিত হয় না, যেরূপ বাসনা ঠিক সেই রূপই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।

কেন এইরূপ হয় তাহার উত্তর দিতে গিয়া ঋষি বলিলেন—স্মৃতি

এবং সংস্কারের একরূপত্বই ইহার হেতু। স্মৃতি—অনুভূয়মান সংস্কার, অর্থাৎ সংস্কার যখন অনুভূতিযোগ্য হয়, তখনই তাহাকে স্মৃতি বলে। সংস্কার—বীজভাবাপন্ন বাসনা, বাসনা যতক্ষণ অনুভূতির বিষয় না হয়—অব্যক্তভাবে অবস্থান করে, ততক্ষণ তাহার নাম সংস্কার, এই যে স্মৃতি এবং সংস্কার, ইহারা সর্ব্বাংশে একরূপই হইয়া থাকে। যদি কখনও সংস্কার অপেক্ষা স্মৃতির বিন্দুমাত্র বৈরূপ্য পরিলক্ষিত হইত, তবে বুঝিতে পারা যাইত যে, জন্ম, দেশ ও কালের ব্যবধানে অভিব্যক্তিরও বিলক্ষণতা সংঘটিত হয়; ফলতঃ তাহা কখনও পরিলক্ষিত হয় না। যেরূপ সংস্কার ঠিক সেইরূপ স্মৃতিরই উদয় হয়, সংস্কারের সহিত অব্যবহিত ভাবেই স্মৃতির উদয় হয়। ইহাদ্বারা বেশ স্পষ্ট ভাবেই বুঝিতে পারা যায়—বাসনা অর্থাৎ সংস্কার এবং তাহার অভিব্যক্তি অর্থাৎ স্মৃতি, এই উভয়ের মধ্যে নিয়ত অব্যবহিতত্বই থাকে। ইহার অন্যথা কখনও হয় না। শত জন্মাদি দ্বারা ব্যবহিত হইলেও শত জন্মাদি দ্বারা কৃতসম্প্রমোষ হইলেও, অনুভূত-বিষয়াসম্প্রমোষরূপা স্মৃতির অভ্যুদয় ঠিক সংস্কারের অনুরূপই এবং অব্যবহিত ভাবেই হইয়া থাকে।

तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् ॥१०॥

न च कार्य्यः पर्य्यनुयोगः कुत आदिमा समायाता वासनेत्याह तासामिति। तासां वासनानां, अनादित्वं न विद्यत आदिरस्येति तस्य भावः। कुत इत्याह आशिषो नित्यत्वात्। "मा नभुवं हि भूयासम्" इत्येवं रूपाया आत्माशिषः, नित्यत्वात् स्वाभाविकत्वात् सर्व्वजीवप्रसिद्धत्वात्। न च स्वाभाविकं वस्तु निमित्तं किञ्चिदुपादत्ते; तस्मादनादित्वं वासनानामिति। न चात्र ध्वंसप्रागभावाप्रतियोगि वचनोऽयं नित्यशब्दः, अनादित्वेऽपि सान्तरूपत्वात्। तथाहि ज्ञातात्मसाक्षात्कारस्याशीर्निवर्त्ततेऽहं प्रत्ययस्य सर्व्वथा विनिवृत्तत्वादिति ॥१०॥

সর্ব্বপ্রথম বাসনা কোথা হইতে আসিল, এরূপ প্রশ্ন করা সঙ্গত নহে, যেহেতু ঋষি বলিলেন—আশীর নিত্যত্ব বশতঃ বাসনা সমূহের অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়। আশীর নিত্যত্ব কি, "আমি যে কখনও ছিলাম না, তাহা নহে, এবং আমি যেন চিরকালই থাকি" এইরূপ যে আত্মাশী; তাহার নিত্যত্ব আছে অর্থাৎ সর্ব্বজীবে স্বাভাবিক ভাবেই এই আত্মাশীঃ প্রসিদ্ধ আছে। কোনও জীবে ইহার অন্যথা পরিলক্ষিত হয় না। জীবমাত্রেরই মরণত্রাস দেখিয়াও ইহা সর্ব্বথা সত্যরূপেই অনুমিত হইয়া থাকে। এই যে স্বাভাবিক সর্ব্বজীবপ্রসিদ্ধ আত্মাশীঃ, ইহা জন্মগ্রহণের পর কোনও নিমিত্তবশে প্রকাশ পায় না। ইহা পূর্ব্বলব্ধ সংস্কার। এই সংস্কার কবে যে প্রথম আরম্ভ হইয়াছে, তাহা অনির্ণেয়। সৃষ্টি যেরূপ প্রবাহরূপে নিত্য, এই আত্মাশীঃও ঠিক সেইরূপ নিত্যপ্রসিদ্ধই রহিয়াছে। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয়—বাসনা সমূহ অনাদি; সুতরাং আদি সংস্কার সর্ব্বথা নিরূপণের অযোগ্য।

এই সূত্রে যে নিত্য শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা ধ্বংস এবং প্রাগ্‌ভাবের অপ্রতিযোগী যে নিত্য, সেরূপ নিত্য বুঝাইবার জন্য নহে; কারণ, বাসনাসমূহ অনাদি হইলেও, উহারা সান্তই। প্রাগ্‌ভাবের অপ্রতিযোগী হইলেও উহারা ধ্বংসের অপ্রতিযোগী নহে। দেখিতে পাওয়া যায়—আত্মসাক্ষাৎকারী যোগিগণের পূর্ব্বোক্তরূপ আত্মাশীঃ সম্যক্ নিবৃত্ত হইয়া যায়। "অহং প্রত্যয়" যতদিন বিদ্যমান থাকে, ততদিন উক্তরূপ আত্মাশীঃ নিবর্ত্তিত হয় না বটে, কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত যোগসিদ্ধ পুরুষের পারমার্থিক সত্তা সাক্ষাৎকার হওয়ার ফলে অতীত ভবিষ্যৎরূপ কালের প্রত্যয় তিরোহিত হইয়া যায় বলিয়াই অহং প্রত্যয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট আত্মাশীঃ চিরতরেই নিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादेषामभावे तदभावः ॥११॥

ननु विरुद्धमुच्यते—सान्तत्वमनादित्वेऽपि वासनानाम्, उत्तरयति हेत्विति। हेतुरविद्या, फलं स्मृतिरनात्मप्रत्ययरूपिणी, आश्रयश्चित्तं, आलम्बनं शब्दस्पर्शादि, एभिर्हेतुफलाश्रयालम्बनैः। सङ्गृहीतत्वात् सम्यक् सम्बन्धवत्त्वात्, वासनानां विद्यमानता अनादिता च प्रतीयत इव। परमार्थतस्तु एषां हेतुफलादीनामभावे सत्ताभावे तदभाव स्तासां वासनानामभाव एकान्तेनैवास्तेति।

अत्रेदमवधेयम्—वासना नाम जात्यायुर्भोगानुभवजन्य-संस्काररूपा, सा हि हेतुफलादिभिरुपनिबद्धा सत्तावतीव प्रतीयत आपुरुषख्यातेः। सत्ताचैतन्ययोरभिन्नत्वान्नासदुत्पद्यते न च सद्विनश्यतीति श्रुतेश्च सर्व्वथैवाभाव एतासामिति ॥ ११ ॥

বাসনা সমূহ অনাদি হইলেও সান্ত, ইহা কি বিরুদ্ধ বাক্য নহে? যাহা অনাদি তাহা অনন্তই হইয়া থাকে, এস্থলে তাহার অন্যথা কি প্রকারে হইবে; এইরূপ সংশয় নিরাস করিবার জন্যই এই সূত্রটীর অবতারণা। ঋষি বলিলেন—হেতু ফল আশ্রয় এবং আলম্বনের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হয় বলিয়াই, এই সকলের অভাবে তাহাদের অভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে। সূত্রার্থ পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। হেতু শব্দের অর্থ অবিদ্যা, পূর্ব্বে ঋষি নিজেই "তস্য হেতুরবিদ্যা" এই সূত্রে ইহা প্রতিপাদিত করিয়াছেন। ফল শব্দের অর্থ অনাত্মপ্রত্যয়রূপা স্মৃতি। অবিদ্যারূপ হেতু হইতে অনাত্মপ্রত্যয়রূপ ফলই প্রসূত হইয়া থাকে, আশ্রয় শব্দের অর্থ চিত্ত। চিত্তকে আশ্রয় করিয়াই স্মৃতির

উদয় হয়। আলম্বন শব্দের অর্থ—শব্দ স্পর্শাদি। স্মৃতির আলম্বন সচরাচর ঐ সকল বিষয়ই হইয়া থাকে। এই যে, হেতু ফল আশ্রয় এবং আলম্বন, এই গুলির দ্বারা সংগৃহীতত্ব অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিষ্ট হয় বলিয়াই ইহাদের অভাবে বাসনার অভাব স্বতঃসিদ্ধ হয়। ইহাদের অর্থাৎ হেতুফলাদির পারমার্থিক সত্তা নাই। চৈতন্য ব্যতীত—একমাত্র আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত অন্য কোনও কিছুর সত্তাই হইতে পারে না। সত্তা ও চৈতন্য অভিন্ন বস্তু। অবিদ্যা স্মৃতি চিত্ত শব্দ স্পর্শাদি বিষয়, এসকল চৈতন্যস্বরূপ বস্তু নহে; সুতরাং ইহাদের কোন সত্তা নাই, থাকিতে পারে না। এই গুলির অর্থাৎ হেতু ফল প্রভৃতির সত্তাভাব যখন নিত্যসিদ্ধ, তখন এগুলির অভাবে বাসনাসমূহের অভাবও অবশ্যম্ভাবী। বাসনার যাহা হেতু, যাহা ফল, যাহা আশ্রয়, যাহা অবলম্বন, সেগুলিই যদি না থাকে, তবে বাসনা যে নাই, ইহা আর বলিয়া দিতে হয় না। জাতি আয়ু এবং ভোগের অনুভবজন্য সংস্কারের অন্য নাম বাসনা, এই বাসনাই হেতু ফল প্রভৃতির সহিত উপনিবদ্ধ হইয়া সত্তাবিশিষ্ট বস্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। যতদিন পুরুষ-খ্যাতি না হয়—যতদিন যথার্থ পরমার্থ-সত্তার সাক্ষাৎকার লাভ না হয়, ততদিন বাসনাগুলি এবং হেতু ফল ইত্যাদিরও অস্তিত্ব প্রতীতি হইতে থাকে। বাস্তবিক উহারা তিনকালেই নাই। শ্রুতিও বলেন—যাহা অসৎ তাহা কখনও উৎপন্ন হয় না, আর যাহা সৎ, তাহার বিনাশও কোন কালেই হয়না। সত্তা এবং চৈতন্য অভিন্ন বস্তুই। অতএব অবিদ্যা প্রভৃতি হেতুফলাদির অভাবের ন্যায় বাসনারও একান্ত অভাবই সিদ্ধ হইয়া থাকে। তবে যে বাসনার অনাদিত্ব বলা হইয়াছে, তাহা অবিদ্যাবস্থায়ই। পরমার্থতঃ বাসনার অনাদি সত্তাই স্বীকৃত হয়না হইতে পারেনা; সুতরাং অনাদি হইয়াও সংস্কার সমূহ কিরূপে সান্ত হইতে পারে, এরূপ প্রশ্নই তত্ত্বদৃষ্টিতে হইতে পারে না। যতদিন অবিদ্যা প্রতীতি-গোচরা, ততদিন এরূপ সংশয় বিচার বিতর্ক থাকিবেই; তাই কেবল তর্কবিচারের দিকে না গিয়া যাহাতে অবিদ্যার উচ্ছেদ হয়, তাহার জন্যই প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য।

অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্ম্মাণাম্ ॥১২॥

যদি বাসনানামভাব এব সিদ্ধ স্তদাতীতাদি-ব্যবহারঃ কথং নিষ্পদ্যেত ইতি নিরূপয়ত্যতীতেতি। অতীতানাগতং প্রাগ্‌ব্যাখ্যাতমপি কথ্যতে বিশেষঃ—অনুভূতব্যক্তিকমতীতং স্মৃতিরূপম্, অনুভাব্যব্যক্তিকমনাগতমাশারূপমিতি যদ্ ব্যবহার বিষয়তা মায়াতি তত্ স্বরূপতঃ পরমার্থতঃ অস্তি—নিত্যবর্ত্তমান-সত্তামাত্রম্। কিন্তু ধর্ম্মাণাং জ্ঞানক্রিয়ারূপাণাং বুদ্ধিধর্ম্মাণাম্, অধ্বভেদাত্ অধ্বা পন্থাঃ—জ্ঞানক্রিয়াপ্রকাশকেন্দ্রিয়প্রণালীরূপঃ, তদ্‌গতবিলক্ষণত্বাদেবাতীতানাগতমিতি ব্যবহারো বিকল্পবৃত্তিরূপো ভবতীতি শেষঃ ॥ ১২ ॥

যদি পরমার্থতঃ বাসনাসমূহের অভাবই সিদ্ধ হয়, তবে অতীত ভবিষ্যৎ ইত্যাদিরূপ ব্যবহার কিরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহাই এই সূত্রে নিরূপিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—অতীত এবং অনাগত স্বরূপতঃ নিত্যবর্ত্তমান সত্তামাত্রই, কেবল ধর্ম্মসমূহের অধ্বভেদ বশতঃই ঐরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। অতীতানাগত কি, তাহা ইতিপূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইলেও পুনরায় বিশেষরূপ স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহা একবার অনুভবের বিষয় হইয়াছিল, সেই স্মৃতিরূপ পদার্থই অতীত এবং যাহা পরবর্ত্তিকালে অনুভবের বিষয় হইবে, সেই আশারূপ পদার্থই অনাগত নামে ব্যবহারের বিষয় হইয়া থাকে। এই যে অতীত এবং অনাগত, ইহাও স্বরূপতঃ —পরমার্থতঃ "অস্তি"মাত্রই—নিত্যবর্ত্তমান সত্তামাত্রই। ভূত এবং ভবিষ্যৎরূপে যাহা প্রতিনিয়ত আমাদের অনুভবের মধ্যে উপস্থিত হইয়া এই ব্যবহারিক জীবনকে পরিচালিত করে, তাহা নিত্যবর্ত্তমান সত্তাব্যতীত অন্য কিছু নহে। "অস্তি"—নিত্য-

বিদ্যমান-সত্তা, তাহা সত্যস্বরূপ পরমাত্মাই। যিনি নিত্য-সত্য, যিনি প্রিয়তম পরমাত্মা, তিনিই অবিদ্যাচ্ছন্নদৃষ্টি আমাদের নিকট কখনও স্মৃতির আকারে, কখনও বা আশার আকারে প্রকাশিত হন। তাই আমরা—যাহা নিত্যই "আছে", তাহাকে কখনও "ছিল"রূপে কখনও বা "হইবে"রূপে ব্যবহারযোগ্য করিয়া লই।

কি প্রকারে ইহা সংঘটিত হয়, তাহার উত্তর দিতে গিয়া ঋষি বলিলেন —"অধ্বভেদাদ্ধর্ম্মাণাম্" ধর্ম্মের অধ্বভেদ বশতঃই এইরূপ হইয়া থাকে। ধর্ম্মশব্দের অর্থ এস্থলে বুদ্ধিধর্ম্ম, তাহা জ্ঞানক্রিয়া ব্যতাত অন্য কিছু নহে। স্থূল কথায় যাহাকে "জানা" বলে, তাহাই ধর্ম্ম। ঐ জানারূপ ব্যাপারটী অর্থাৎ অনুভবরূপ জ্ঞানক্রিয়াটীই ধর্ম্ম অধর্ম্ম জ্ঞান অজ্ঞান প্রভৃতি অষ্টবিধ ভেদপ্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মের স্বরূপ পরসূত্রে বর্ণিত হইবে।

এইবার "অধ্বভেদ" কথাটীর অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। অধ্বশব্দের অর্থ পন্থা, পন্থার বিভিন্নতাই অধ্বভেদ। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানক্রিয়ারূপ ধর্ম্ম চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়প্রণালীরূপ ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় আত্মপ্রকাশ করে, ইহাকেই ধর্ম্মের অধ্বভেদ বলে। খুলিয়া বলিতেছি—"অস্তি" ও বোধ, অভিন্নতত্ত্ব। বোধব্যতীত সত্তা থাকে না, আবার সত্তাব্যতীতও বোধ নাই। ঐ যে বোধ অর্থাৎ যাহা স্বরূপতঃ অস্তিমাত্রই, তাহা চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পথে যখন প্রকাশ পায়, তখনই উহাকে "ধর্ম্মের অধ্বভেদ" বলা হয়। এই রূপ বিভিন্ন পন্থায় প্রকাশ হইতে গিয়াই যাহা স্বরূপতঃ অস্তি, তাহা অতীত এবং অনাগতরূপে ব্যবহারের বিষয় হইয়া থাকে। মনে কর, তুমি প্রথমক্ষণে একটী পুষ্প দর্শন করিলে। তখন কি হইল—যিনি অস্তি, যিনি তোমার অন্তরে বোধরূপে নিত্যবর্ত্তমান সত্তারূপে বিরাজিত, তিনি (তাঁহার আভাস) চক্ষুর্দ্বারদিয়া তোমার পুষ্পবিষয়ক অনুভবকে জাগ্রত করিয়া দিলেন। আবার পরক্ষণেই একটী সঙ্গীত শ্রবণ করিলে অর্থাৎ তোমার অন্তরন্থিত বোধসত্তার সঙ্গীত আকারীয় একটী অনুভবের প্রকাশ

হইল। এইরূপ হওয়াকেই ধর্ম্মের অধ্বভেদ কহে। এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা কর—অতীতানাগত-ব্যবহার কিরূপে নিষ্পন্ন হয়। সঙ্গীত শ্রবণকালে পুষ্পদর্শন অতীত-পদবাচ্য হয়, আবার পুষ্পদর্শন কালে সঙ্গীতশ্রাবণ অনাগত-পদবাচ্য হইয়া থাকে। একটী স্মৃতিরূপে, অন্যটী আশারূপে প্রকাশ পায়। সর্ব্বত্র এইরূপেই অতীতানাগতরূপ ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব বাসনা সমূহের পরমার্থতঃ অভাব সিদ্ধ হইলেও, একমাত্র নিত্য বর্ত্তমান সত্তাস্বরূপ বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই ভূত ভবিষ্যতাদি ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে।

তে ব্যক্তসূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ ॥১২॥

ধর্ম্মান্ পরিচায়য়তি ত ইতি। তে ধর্ম্মা গুণাত্মানঃ গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ আত্মানঃ স্বরূপা যেষাং তে তথোক্তাঃ। অতএব ব্যক্তসূক্ষ্মাঃ কদাচিৎ কার্য্যরূপেণাভিব্যক্তস্বরূপা ব্যক্তাঃ, কদাচিদ্ বা কারণরূপেণাপ্রকটিত-স্বরূপাঃ সূক্ষ্মা ইতি।

ইদমত্রাবধেয়ম্—গুণা হি নাম যদাঽব্যক্তরূপাং সাম্যাবস্থাং বিহায় দ্বিমামভিব্যক্তিং লভন্তে তদা মহত্তত্ত্বমিতি সংজ্ঞামধিগচ্ছন্তি। তস্য চাষ্টৌ ধর্ম্মাঃ—ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানাজ্ঞানবৈরাগ্যাবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্যরূপাঃ। এতে সর্ব্বে জ্ঞানক্রিয়া এব প্রখ্যা-প্রবৃত্তি-স্থিতিশীলা ইতি গুণাত্মানো ধর্ম্মাঃ॥ ১২ ॥

এইসূত্রে ধর্ম্মের স্বরূপ-পরিচয় দেওয়া হইতেছে, ঋষি বলিলেন—তাহারা (ধর্ম্মসমূহ) ব্যক্তসূক্ষ্ম গুণাত্মা। ধর্ম্মসমূহ গুণাত্মা বলিয়াই ব্যক্ত ও সূক্ষ্মরূপ দ্বিবিধ ভেদ প্রাপ্ত হয়। গুণাত্মা কি? গুণ—সত্ত্ব রজঃ তমঃ, আত্মা—স্বরূপ। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ই যাহাদের

স্বরূপ, তাহারা গুণাত্মা। প্রখ্যা প্রবৃত্তি ও স্থিতিশীল গুণত্রয় যাবতীয় ব্যক্তভাব সমূহের সূক্ষ্মবীজ, ইহা পূর্ব্বে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গুণত্রয় যতক্ষণ সাম্যাবস্থায় থাকে, ততক্ষণ উহারা অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম। তারপর ঐ অব্যক্ত অবস্থাহইতে যখন সর্ব্বপ্রথম অভিব্যক্তি লাভ করে—ব্যক্ত হয়, তখন উহাদের নাম হয়—মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব। এই বুদ্ধিতত্ত্বের অষ্টবিধ প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়, উহাদের সাধারণ নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য, মহত্তত্ত্বের এই যে অষ্টবিধ প্রকাশ, ইহারাই ধর্ম্মনামে পরিচিত হয়। প্রকৃতি, স্বভাব, ধর্ম্ম, ইহারা একার্থ বাচকশব্দ। যেরূপ অগ্নির স্বভাব বা ধর্ম্ম উষ্ণতা, জলের স্বভাব বা ধর্ম্ম শীতলতা, ঠিক সেইরূপই কেবল-বোধস্বরূপ পুরুষের প্রকৃতি বা ধর্ম্ম পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ। যিনি স্বরূপতঃ জ্ঞ, তিনি যখন "জানা"রূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই তাহাতে পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ ভেদ পরিলক্ষিত হয়।

দেখ সাধক! তোমার অন্তরে যে "জানা"রূপ বস্তুটী আছে, উহারই নাম ধর্ম্ম, উহাই তোমার প্রকৃতি। উহা প্রখ্যা প্রবৃত্তি ও স্থিতিশীল গুণত্রয় ব্যতীত অন্য কিছু নহে। পুণ্য পাপ, জ্ঞান অজ্ঞান, ত্যাগ গ্রহণ, এবং সামর্থ্য অসামর্থ্য, এই আট প্রকারেই তোমার "জানা" বা জ্ঞানক্রিয়া প্রকাশিত হয়। আমরা যাহা কিছু জানি—অনুভব করি—বোধ করি, তাহা পূর্ব্বোক্ত আটটীর মধ্যেই পড়িবে। এই আটটী ব্যতীত ধর্ম্ম বলিতে আর কিছুই বুঝায় না। অষ্টসংখ্যক বলিয়াই যোগসূত্রকার ঋষি "ধর্ম্মাণাম্" এইরূপ বহুবচনান্ত পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। যতক্ষণ উহারা কারণরূপে অবস্থান করে, ততক্ষণ উহাদের নাম হয় সূক্ষ্ম। আর যখন কার্য্যরূপে প্রকাশিত হয়, তখন উহারা ব্যক্ত নামে অভিহিত হয়। এইরূপে ব্যক্ত অব্যক্ত ভেদে ধর্ম্মের দ্বিবিধ ভেদ স্বতঃসিদ্ধরূপেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

परिणामैकत्वाद् वस्तुतत्त्वम् ॥१४॥

ननु परस्पराभिभवशीलानां व्यापारमात्ररूपाणां सत्त्वादिगुणानां कथमेकवस्तुत्वेन प्रतीतिरित्याह परिणामेति। परिणामैकत्वात् अङ्गाङ्गीभावेन परिणाम-निष्ठैकत्वात् एकरूपेणैव परिणम्यमानत्वादिति भावः। वस्तुतत्त्वं इदमेकं वस्तु इत्येवं प्रतीतिरित्यर्थः। यथा चालातदण्डानल-भ्रमीणां त्रयाणां परिणाम एकं वह्निचक्रमिति यथा वाऽविच्छिन्नसलिलप्रवाहानां परिणाम एका नदीति प्रतीतिस्तथा त्रिमय-स्पन्दनशीलानां सत्त्वादीनां त्रयाणां परिणामगतैकत्वादिदं व्यष्टि समष्टि जगत् स्थिरमेकं वस्त्विति प्रतीतिः ॥ १४ ॥

পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করা রূপ ব্যাপারমাত্রস্বরূপ গুণত্রয় স্বরূপতঃ কোনও বস্তু নহে, ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়ামাত্রই উহাদের স্বরূপ; অথচ ত্রিগুণ-নির্ম্মিত এই জগৎপ্রপঞ্চ একটী স্থির বস্তুরূপে প্রতীয়মান হয়। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, এই সূত্রে তাহাই নির্ণীত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—পরিণামৈকত্ব হেতু বস্তুতত্ত্ব হয়।

গুণত্রয় প্রখ্যা প্রবৃত্তি এবং স্থিতিরূপ ত্রিবিধ ব্যাপার হইলেও উহাদের পরিণামগত একত্ব আছে। সাম্যাবস্থা হইতে যখন গুণ-ক্ষোভ উপস্থিত হয়, তখন উহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাব হয়। কোন একটী গুণ প্রধান ভাবে থাকে, অপর দুইটী ঐ প্রধান গুণের অঙ্গরূপে তাহার সহায়তাই করে। এইরূপে সত্ত্বাদিরূপ তিনটী ক্রিয়ার পরিণাম একরূপেই হইয়া থাকে। এবং এইরূপ হয় বলিয়াই উহাদের বস্তুতত্ত্ব হয় অর্থাৎ ত্রিবিধ ক্রিয়াস্বরূপ গুণত্রয় একটী স্থির বস্তুরূপে প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে। অলাতদণ্ড অনল এবং ভ্রমণবেগ, এই তিনটীর পরিণাম স্বরূপ একটি স্থির বহ্নিচক্র প্রতীতিগোচর হয়। দণ্ডের অগ্রভাগস্থিত বিন্দুমাত্র বহ্নিই একটী স্থির বহ্নিচক্ররূপে প্রতীয়মান হয়। যদিও এ দৃষ্টান্তটী প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিত সর্ব্বাংশে তুল্য হয় না। তথাপি পাঠকগণের বুঝিবার পক্ষে ইহা অনেকটা সাহায্য করিবে। আমাদের বুদ্ধিরূপ অলাতদণ্ডস্থিত বিন্দুমাত্র জ্ঞান বা জ্ঞানাভাসই সত্ত্বাদিগুণের সংক্ষোভ বা অতিশয় স্পন্দন বশতঃ এই ব্যষ্টি সমষ্টি জগৎরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। যেরূপ অতিশয় বেগের সহিত ভ্রাম্যমান লৌহচক্র একটী স্থির বস্তুরূপেই দেখা যায়, ঠিক সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান স্থিরবস্তু-নিচয় অতিশয় স্পন্দনশীল গুণত্রয়ের একপ্রকার পরিণাম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। স্থূল কথা, এই যে, যাহাকে আমরা বস্তু বলিয়া মনে করি, তাহা স্বরূপতঃ বস্তু নহে—ক্রিয়ামাত্রই। নদীর দৃষ্টান্তে ইহা আরও স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। আমরা যাহাকে একটী নদীরূপে বুঝিয়া লই, তাহা স্বরূপতঃ নদী নামক কোনও একটী বস্তু নহে, অবিচ্ছিন্ন জলপ্রবাহমাত্রই। প্রথম দৃষ্টিতে যে জলরাশিকে আমরা নদীরূপে মনে করিয়া লই, দ্বিতীয়ক্ষণে সে জলরাশি আর সেখানে নাই, বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, অন্য জলরাশি আসিয়া সেস্থান পূর্ণ করিয়াছে। তৃতীয়ক্ষণে আবার অন্য জলরাশি সে স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, এইরূপ অবিচ্ছিন্ন একটী প্রবাহরূপ ক্রিয়াকেই আমরা নদী বলিয়া স্থির করিয়া লই। এই জগৎ এই বহু বস্তুনিচয়ও ঠিক এইরূপই। ইহাদের কোন বস্তুত্ব নাই। কতকগুলি ক্রিয়াই বস্তুর আকারে প্রতীয়মান হয়। সাধক, ঐ যে ক্রিয়া বা শক্তি, উনিই প্রকৃতি, উনিই মা, উনিই আত্মার স্বগতভেদকারিণী বৃত্তিসারূপ্যকারিণী অঘটনঘটনপটীয়সী জননী মহাশক্তি। উহার শরণাগত হইলে—উহারই চরণে সম্যক আত্মনিবেদন করিতে পারিলে সকল রহস্য সহজেই উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়।

তখন আর এই পার্থিব ধন জনাদি বিষয় সমূহের সংযোগ বিয়োগে সুখ বা দুঃখ আসিয়া মানুষকে উদ্‌বেলিত করিতে পারে না। বস্তু-গুলি বস্তু নহে, উহা ক্রিয়ামাত্রই—তিনটি ক্রিয়ার পরিণাম মাত্রই, ইহা যদি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয়, তবে কি মানুষ আর কখনও জগতের কোনও বস্তুতে অনুরাগবান্ বা বিদ্বেষবান্ হইতে পারে? ওগো, ত্রিগুণ মানেই সৃষ্টি স্থিতি ও লয়রূপ ত্রিবিধ ক্রিয়া। ঐ ক্রিয়াই এই বিচিত্র জগৎরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। ইহা দেখ—অনুভব কর, ঋষির অমূল্য উপদেশ সার্থক হউক!

বস্তু-সাম্যে চিত্তভেদাত্তয়োর্বিভক্তঃ পন্থাঃ ॥১৫॥

অস্তুনাম, অথেয়ং জিজ্ঞাসা—গুণত্রয়পরিণামরূপং বস্তু সাধারণমসাধারণং বা, যদি সাধারণং তর্হি প্রতীতৌ কথং পরস্পর-বিলক্ষণতা, আহোস্বিদসাধারণমুচ্যতে তদাতুল্যপ্রত্যয়স্থলে কা মীমাংসেত্যাহ বস্ত্বিতি। বস্তুসাম্যে বস্তূনাং সাধারণ্যে চিত্তভেদা-চ্চিত্তগত পরস্পর বিলক্ষণত্বাত্তয়োশ্চিত্তবস্তুনোর্বিভক্তঃ পন্থাঃ পরস্পর বিলক্ষণঃ প্রকারক্রমঃ, ন পুনরনয়োঃ সাঙ্কর্য্যমিতিভাবঃ। অতএব জীবভেদে ভোগ্যং জগদ্ ভিন্নমীশ্বরকল্পিতং তু সাধারণমিতি সিদ্ধান্তঃ ॥ ১৫ ॥

যাহা স্বরূপতঃ ব্যাপার মাত্রই, তাহা একটী স্থির বস্তুরূপে প্রতীতি-গোচর হইতে পারে, তাহা হউক; এ বিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই যে—গুণত্রয়-পরিণামরূপ বস্তু সাধারণ, না অসাধারণ? যদি বলা যায়—সাধারণ, তাহা হইলে প্রতীতিবিষয়ে পরস্পর বিলক্ষণতা দৃষ্ট হয় কেন? একই নারী মূর্ত্তি পুত্রের জননী, ভর্ত্তার ভার্য্যা, সপত্নীর বিদ্বেষ পাত্রীরূপে বিভিন্ন প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। আর যদি বলা

যায়—বস্তুই অসাধারণ, তবে তুল্যপ্রত্যয় স্থলে মীমাংসা হয় না। সূর্য্য চন্দ্র বৃক্ষ পর্ব্বত নদী প্রভৃতি বস্তু, সকলমনুষ্যেরই তুল্যপ্রত্যয়ের বিষয় হইয়া থাকে। এইরূপ সংশয় অপনোদন করিবার জন্যই এই পঞ্চদশ সূত্রের অবতারণা। ঋষি বলিলেন—বস্তুগত সাম্য থাকিলেও চিত্তভেদ বশতঃ এতদুভয়ের বিভিন্ন পথ। বেশ ধীরভাবে ঋষির অভিপ্রায় বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। তিনি প্রথমেই "বস্তুসাম্য" পদের প্রয়োগ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন—বস্তু সমানই—সাধারণই। গুণত্রয়-পরিণামরূপ যে মৌলিক বস্তু, তাহা সকলের পক্ষেই সমান, অর্থাৎ ঈশ্বরকল্পিত বস্তু সর্ব্বজীবসাধারণ। ইহার অন্যথা কোন প্রকারেই সম্ভব হয় না।

তারপর ঋষি বলিলেন—চিত্তভেদ বশতঃ উহাদের পন্থা বিভক্ত। ঈশপরিকল্পিত বস্তু সাধারণ হইলেও সেই বস্তুর গ্রাহক যে চিত্তসমূহ, তাহাদের পরস্পর বিলক্ষণতা আছে। সেই বিলক্ষণতা বশতঃ উভয়ের অর্থাৎ চিত্ত এবং বস্তু, এতদুভয়ের পন্থা বিভক্তভাবেই অবস্থিত আছে। বস্তু তাহার স্বাধীন ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, আর চিত্তসমূহও নিজ নিজ সংস্কার ও সামর্থ্যানুরূপ স্বাধীন ভাবেই তাহা গ্রহণ করিতেছে; সুতরাং বস্তু এবং চিত্তের কোন কালেই সাঙ্কর্য্য হয় না। পরসূত্রে ইহা আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে।

যাহারা বলেন—চিত্তভেদে বস্তু বিভিন্ন; তাহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। ঋষিবাক্য হইতে তাহা কিছুতেই প্রকাশ পায় না। পূর্ব্বে যে নারীমূর্ত্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, সে স্থলে পরস্পর বিলক্ষণ প্রতীতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও অসাধারণ প্রতীতিরও অস্বীকার করা যায় না। পুত্র ভর্ত্তা এবং সপত্নী তিনেরই নারীমূর্ত্তিরূপে তুল্য প্রত্যয় আছে; সেই তুল্যপ্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়াই পুত্র জননীরূপে, ভর্ত্তা ভার্য্যারূপে এবং সপত্নী বিদ্বেষপাত্রীরূপে অনুভব করিল। সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে সূর্য্য চন্দ্রাদির বিষয় বলা হইয়াছে, সে সকল স্থলেও একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে বেশ দেখিতে পাওয়া যায় যে,সকল

মনুষ্যই এক সূর্য্য, এক চন্দ্র প্রভৃতি তুল্যপ্রত্যয়গ্রাহী হইলেও পরস্পর বিলক্ষণ প্রতীতির অভাব সে স্থলেও হয় না। যে চিত্তের যেরূপ সংস্কার, যেরূপ বিকাশসামর্থ্য, সে চিত্ত সেইরূপ ভাবেই উক্ত সূর্য্য চন্দ্রাদির প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। সকলে একই সূর্য্য দেখিয়াও পরস্পর বিভিন্নরূপেই উহার অনুভব করিয়া থাকে। সকল চিত্তের প্রতীতি ঠিক তুল্য হয় না। এই জন্যই ঋষি বলিলেন—বস্তু সমান থাকিলেও গ্রহীতৃচিত্তের বিলক্ষণতা বশতঃ প্রতীতিবিষয়ে পরস্পর বিলক্ষণতা থাকে। বস্তু স্বতন্ত্র, উহা ঈশ পরিকল্পিত, আবার চিত্তও স্বতন্ত্র; সুতরাং "বিভক্তঃ পন্থাঃ"।

এ পর্য্যন্ত আলোচনা দ্বারা বুঝিতে পারা গেল—বস্তু মাত্রেরই প্রতীতিবিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে তুল্যতা এবং অবশিষ্ট অংশে বিলক্ষণতা থাকে। যেস্থলে এরূপ তুল্যতা পরিলক্ষিত হয়, সেরূপ স্থলে বুঝিতে হইবে—চিত্তগত পরস্পর সাদৃশ্য আছে। যে সকল চিত্তের সংস্কার ও বিকাশসামর্থ্য অধিকাংশ তুল্য, সেই সকল চিত্তেরই তুল্যদেশে অবস্থান হইয়া থাকে। চিত্তের এই সাদৃশ্য ও বৈষম্য নিয়াই স্থূলতঃ মনুষ্যত্ব পশুত্ব প্রভৃতি জাতিভেদ হইয়া থাকে। সকল মনুষ্যেরই চিত্তগত একটা সাদৃশ্য আছে; তাই তাহারা সূর্য্যকে একটী গোলাকার জ্যোতির্ম্ময় পদার্থরূপেই প্রথম পরিগ্রহ করে। তারপর নিজ নিজ সংস্কারগত বৈচিত্র্য বশতঃ অনুভবগত বিলক্ষণতা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং জীবভেদে ভোগ্য জগৎ ভিন্ন হইলেও ঈশ্বর পরিকল্পিত জগৎ সকলের পক্ষে সমানই। ঈশ্বর কল্পিত জগতের সাধারণ নাম পদ আর জীব সেই জগৎকে যেরূপ ভাবে গ্রহণ করে, তাহার নাম পদার্থ। এই পদ ও পদার্থ সম্পূর্ণ পৃথক্। জীব কখনও পদকে গ্রহণ করিতে পারে না, সে সর্ব্বদা পদের অর্থ মাত্রকেই গ্রহণ করে। সাধক যতদিন ঐ বিষ্ণুর পরম পদে অবস্থানের সামর্থ্য না পায়, ততদিন এই "বিভক্তঃ পন্থাঃ" কথাটীর রহস্য যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा
किं स्यात् ॥ १६ ॥

जीवकल्पितमेव वस्तु स्यात् किमीश्वरचित्तकल्पितेनेत्याह न चेति। वस्तु एकचित्ततन्त्रं केनचित् जीवचित्तेन परिकल्पितं न च। कुत इत्याह तदिति। तदा तत् जीवचित्तं अप्रमाणकं व्यग्रं निरुद्धं मूर्च्छितं वा स्यादित्यर्थः। तदा किं स्यात्, तदाऽगृहीत स्वभावत्त्वाच्चित्तस्य वस्तूनामभावे अन्येषामपि प्रत्ययाभावो भवेत्। न चैवं सम्भवतीति भावः। अतएव सर्व्वचित्त-प्रयोजकं यदेकमीशचित्तं तत्तन्त्रं वस्तु। महाप्रलये तस्यापि अप्रमाणकत्वात् सर्व्व-वस्तुविलय इति ॥ १६ ॥

বস্তুসমূহ জীবচিত্ত কল্পিতই স্বীকার করা যাউক, ঈশ্বরচিত্ত কর্ত্তৃক বস্তু কল্পিত হয়, ইহা অস্বীকার করায় কি হানি আছে, এইরূপ সংশয়ের নিরাস করিবার জন্য এই সূত্রের অবতারণা। প্রাচীন বৃত্তিকার ভোজদেব ভাষ্যের অংশ বলিয়া ইহাকে সূত্ররূপে গ্রহণ করেন নাই। যোগসূত্রের প্রচলিত ভাষ্য অনুসারে আমরা ইহাকে সূত্ররূপেই গ্রহণ করিয়াছি। ঋষি বলিলেন—বস্তু একচিত্ত তন্ত্র নহে, (সেরূপ হইলে) যখন তাহা (চিত্ত) অপ্রমাণক হইবে, তখন কি হইবে?

বস্তু কখনও একচিত্ততন্ত্র হইতে পারে না অর্থাৎ কোনও জীবচিত্তকর্ত্তৃক বস্তু পরিকল্পিত হইতে পারে না। তন্ত্র শব্দের অর্থ অধীন। বস্তু যদি কোনও চিত্তকর্ত্তৃক কল্পিত হয়, তবেই তাহা চিত্ততন্ত্র হইতে পারে, ফলতঃ তাহা একেবারেই অসম্ভব।

কেন অসম্ভব, তাহার উত্তর দিতে গিয়া ঋষি বলিলেন—“তদপ্রমাণকং তদা কিং স্যাৎ”। এই সূত্রাংশের তাৎপর্য্য এই যে, যখন তাহা অপ্রমাণক হইবে, তখন কি হইবে? অর্থাৎ চিত্ত যখন ব্যগ্র নিরুদ্ধ বা মূর্চ্ছিত থাকিবে, তখন কি হইবে? চিত্তের যখন বিষয়গ্রহণসামর্থ্য রুদ্ধ থাকে, তখনই উহা অপ্রমাণক হয়। চিত্তের সেই অপ্রমাণক অবস্থা হইলে তখন কি হইবে? অভিপ্রায় এই যে—যদি কোনও জীবচিত্তকে বস্তুর স্রষ্টা স্বীকার করা যায়, তবে সেই চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থায় সর্ব্ববস্তুরই বিলয় হওয়া উচিত, কার্য্যতঃ তাহা হয় না। দেখিতে পাওয়া যায়—কোনও চিত্ত নিরুদ্ধ থাকিলেও অন্যান্যচিত্ত যথাপূর্ব্বরূপেই বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং বস্তু কোন এক চিত্তুতন্ত্র, ইহা কোনরূপেই বলা যায় না।

ইতিপূর্ব্বে সর্ব্বচিত্ত প্রযোজক যে একচিত্তের কথা বলা হইয়াছে, যাহা ঈশ্বরচিত্ত নামে অভিহিত হয়, যিনি “একোঽহং বহু স্যাম্” রূপে আত্মপ্রকাশ করেন, বস্তুসমূহ তাঁহাদ্বারাই পরিকল্পিত; সুতরাং বস্তু সর্ব্বচিত্তের পক্ষেই সমান। তবে চিত্তগত ভেদবশতঃ ঐ সমান বস্তুও পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্নরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। যখন ঐ ঈশ্বর চিত্তও আর বহুভাবে আত্মপ্রকাশ করিবেন না, অর্থাৎ যখন উহাও অপ্রমাণক হইবে, তখন নিশ্চয়ই সর্ব্ববস্তুর বিলয় হইয়া যাইবে। সেই অবস্থাই মহাপ্রলয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम् ॥१७॥

परमेश्वरपरिकल्पित-वस्तुसामान्ये युगपत् सर्व्ववस्तु-ग्रहणप्रसङ्गः स्यात् तत् परिहरति तदिति। चित्तस्य तदुपरागापेक्षित्वात्, तस्य वस्तुनः उपराग आकार-समर्पणम् तदपेक्षित्वात्, अयस्कान्तमणि-कल्पै

र्विषयैरुपरञ्जनभावापेक्षित्वादिति भावः। वस्तु ज्ञाताज्ञातम्, तथाहि— यत्र चित्तमुपरक्तं तज्ज्ञातं यत्र तु नोपरक्तं तदज्ञातं तिष्ठति। अतश्च न युगपदेव सर्व्ववस्तुज्ञातृत्वं चित्तस्येति ॥ १७ ॥

পরমেশ পরিকল্পিত বস্তুসাম্য স্বীকার করিলে যুগপৎ সর্ব্ববস্তুর জ্ঞাতৃত্বাশঙ্কা হইতে পারে, এই সূত্রে তাহা পরিহার করা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহার (বস্তুর) উপরাগকে অপেক্ষা করে বলিয়াই বস্তু চিত্তের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত থাকে। উপরাগ শব্দের অর্থ—আকারসমর্পণ। অয়স্কান্ত মণির ন্যায় বিষয়দ্বারা অর্থাৎ বস্তুসমূহের দ্বারা উপরঞ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্তের বস্তুগ্রাহকতা হয় না; সুতরাং চিত্তের যে বস্তুজ্ঞাতৃত্ব, তাহা বাহ্যবস্তুর উপরাগকে অপেক্ষা করে। ঐরূপ উপরাগকে অপেক্ষা করে বলিয়াই চিত্ত সর্ব্বথা বাহ্যবস্তুর উপরাগাপেক্ষী। চিত্তের এই উপরঞ্জন-ভাবাপেক্ষিত্ব নিবন্ধনই বস্তু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হয়। চিত্ত যখন যে বস্তুতে উপরক্ত হয়, তখন সেই বস্তুটী মাত্র জ্ঞাত হয়, অপর বস্তুগুলি অজ্ঞাতই থাকে। এইরূপে বস্তুসমূহের জ্ঞাতাজ্ঞাতভাব সিদ্ধ হয়। সুতরাং যুগপৎ সর্ব্ববস্তুর জ্ঞাতৃত্বাশঙ্কা জীবচিত্তের পক্ষে একান্ত অমূলক ঈশ্বরচিত্তের কিন্তু যুগপৎ সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধই আছে; যেহেতু, সেস্থলে বাহ্যবস্তুর উপরঞ্জন ভাবকে অপেক্ষা করেনা। সকল বাহ্যবস্তুই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক পরিকল্পিত; সুতরাং সর্ব্ববস্তুরই যুগপদ্ জ্ঞাতৃত্ব তাহাতে অবস্থিত। ইহার অন্যথা হইতে পারে না। স্ব স্ব চিত্তের দৃষ্টান্ত-দ্বারাও ইহার সত্যতা অনুভব করিতে পারি। আমরা যখন কোনও একটী বস্তুর কল্পনা করিতে থাকি, তখন ঐ বস্তুটী আমাদের জ্ঞাত-রূপেই বিদ্যমান থাকে। কল্পনা ছাড়িয়া দিলে আর বস্তুই থাকে না। ঠিক এইরূপই যতক্ষণ পরমেশ্বরের কল্পনা আছে, ততক্ষণই এই বাহ্যবস্তু,—এই জগৎ বিদ্যমান্ আছে। ঈশ্বরকল্পনা তিরোহিত হইলে জগতের ব্যবহারিক অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত

এই বাহ্যবস্তু সমূহ পরমেশ্বরের সদাজ্ঞাতই। তিনি যুগপৎ সর্ব্ব বস্তুর জ্ঞাতা বলিয়াই তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ বলা হয়। কিন্তু জীবচিত্ত কখনও এরূপ হইতে পারে না। তাহার কারণ ঐ "তদুপরাগাপেক্ষিত্ব।" চিত্ত যতক্ষণ ঈশ্বরসৃষ্ট কোনও বস্তুর উপরাগ প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সে বস্তু অজ্ঞাতই থাকিয়া যায় আর যেখানে চিত্ত উপরক্ত হয়, তাহা জ্ঞাতরূপে প্রকাশ পায়। এইরূপে জীবচিত্তের পক্ষে বস্তু জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত উভয়ই।

যোগীদিগের যে সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব লাভ হয়, তাহার তাৎপর্য্য—ঐ ঈশ্বরচিত্ত লাভ হওয়া। জীবভাবীয় চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া যখন পরমেশ্বরভাবীয় চিত্তের প্রকাশ পায়, তখনই যোগী সর্ব্বজ্ঞত্বাদির আস্বাদ পাইয়া ঈশ্বরধর্ম্ম লাভে কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"জীব কভু নাহি হয় ঈশ্বর সমান"। কথাটা খুবই সত্য। জীবচিত্তের পক্ষে বস্তু সর্ব্বদাই জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত; কিন্তু ঈশ্বরচিত্তে সর্ব্বদাই সর্ব্ববস্তুর জ্ঞাতৃত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই জীব চিরদিন জীবই থাকে। যখন দেখা যায়—কোনও জীব সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়াছে, তখন বুঝিতে হয়—তাহার জীবভাব অপসৃত হইয়া গিয়াছে, ঈশ্বর ভাবেরই আবির্ভাব হইয়াছে। প্রিয়তম সাধক! যোগ-দর্শনের এ সকল অবিসংবাদী মীমাংসা বিশেষ অবধানের সহিত ধারণা করিতে চেষ্টা করিও, সকল সংশয় দূর হইয়া যাইবে।

সদাজ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যা পরিণামিত্বাৎ ॥১৮॥

চিত্ত-বস্তু-সম্বন্ধবিচারে জ্ঞাতাজ্ঞাতমিত্যুক্তং চিত্ত-পুরুষ-সম্বন্ধ-বিচারে নৈবমিত্যাহ সদেতি। চিত্তবৃত্তয়স্তু তৎপ্রভোর্নিয়ামকস্য

सत्ताप्रकाश-प्रदातुः पुरुषस्य सदाज्ञाताः सततं प्रकाश्याः। कुत इत्याह —अपरिणामित्वात्। अपरिणामिनो हि चितिशक्तेस्तत एव च चित्त-वृत्तीनां सदाज्ञातत्वमिति ॥ १८ ॥

চিত্ত এবং বস্তুর সহিত সম্বন্ধ বিচার করিতে গিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ জ্ঞাতাজ্ঞাত ভাব লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু চিত্ত এবং পুরুষের সম্বন্ধ বিচারে সেরূপ হয় না। তাই ঋষি বলিলেন—চিত্তবৃত্তি সমূহ তাহাদের প্রভু পুরুষের পক্ষে সদা জ্ঞাতই; যেহেতু তিনি অপরিণামী। চিত্তবৃত্তি সমূহের প্রভু পুরুষ। প্রভু শব্দের অর্থ নিয়ামক —সত্তা ও প্রকাশ দাতা। যাহার সত্তা ও প্রকাশ পাইয়া চিত্তবৃত্তি সমূহ প্রকাশ পায়, তিনিই চিত্তবৃত্তি সমূহের প্রভু। তিনি পুরুষ, তিনি অপরিণামী। এই অপরিণামিত্ব আছে বলিয়াই পুরুষের পক্ষে চিত্তবৃত্তি সমূহ সদাজ্ঞাত। যাহা প্রতিনিয়ত পরিণামশীল, তাহার নিকট তদ্‌গ্রাহ্য বস্তুসমূহ কখনও জ্ঞাত কখনও বা অজ্ঞাত থাকিতে পারে; কিন্তু যাহা নিত্যস্থির যাহা অপরিণামী, যাহাতে কোনরূপ উপরঞ্জন ভাবের অপেক্ষা নাই, অথবা উপরঞ্জন ভাব অভাব কিছুই নাই, যাহা সদা একরূপ—স্বপ্রকাশ বস্তু, তাহার নিকট—সেই অপরিণামী পুরুষের নিকট চিত্তবৃত্তিসমূহ সদা জ্ঞাতই। অর্থাৎ যতদিন চিত্তবৃত্তি নামে কিছু প্রকাশ পাইবে, ততদিন তাহা পুরুষের নিকট সতত প্রকাশ্যই। পৌরুষীয় সত্তার এবং প্রকাশের কখনও কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা ন্যূনাধিকতা না থাকায় চিত্তবৃত্তিসমূহ সর্ব্বদাই তাহার প্রকাশ্যরূপে অবস্থান করে। তাই ঋষি বলিলেন— "সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ", চিত্তবৃত্তিসমূহ তাহাদের প্রভুর নিকট সদাই জ্ঞাত। কখনও জ্ঞাতাজ্ঞাত ভাব সেস্থলে সম্ভব হয় না।

न तत् स्वाभासं दृश्यत्वात् ॥१९ ॥

अस्तु तर्हि विषयाभासं चित्तं स्वाभासमप्यनलवदिति याशङ्का मपनयति नेति। तत् चित्तं न स्वाभासं स्वप्रकाशं, कुत इत्याह दृश्यत्वात्। यद्धि नाम परकीयसत्तया सत्तावद्भवति परप्रकाशेन चात्मानं प्रकाशयति, न च तत्र स्वप्रकाशत्वं सम्भवतीति ॥ १९ ॥

আচ্ছা, অগ্নি যেরূপ সমীপস্থ পদার্থকে প্রকাশ করে এবং নিজেকেও প্রকাশ করে, ঠিক সেইরূপ চিত্তও বিষয় সমূহকে প্রকাশ করে এবং নিজেকেও প্রকাশ করে, এইরূপ স্বীকার করিলে কি দোষ হয়? এই সূত্রে তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—চিত্ত স্বপ্রকাশ বস্তু নহে, যেহেতু উহা দৃশ্য। চিত্ত বিষয়ের প্রকাশক বটে, কিন্তু স্বপ্রকাশ নহে—নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতে পারে না। কেন পারে না—যেহেতু চিত্ত দৃশ্য। যাহা দৃশ্য, তাহা কখনও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না। যাহা অপরের সত্তায় সত্তা-বিশিষ্ট হয়, যাহা অপরের প্রকাশে আত্মপ্রকাশ করে, তাহা কখনও স্বাভাস অর্থাৎ স্বপ্রকাশ বস্তু হইতে পারে না। চিত্তের যে বিষয়-প্রকাশকত্ব পরিলক্ষিত হয়, যাহা দেখিয়া উহার স্বপ্রকাশত্বের শঙ্কা উদয় হয়, ঐ বিষয়প্রকাশকত্বও চিত্তের নিজস্ব নহে। চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের প্রকাশ ও অস্তিত্বটা লইয়াই চিত্ত আত্মলাভ করে এবং ঈশ্বরসৃষ্ট বস্তু সমূহকে স্ব স্ব রুচি অনুসারে গ্রহণ করে। চন্দ্র যেরূপ সূর্য্যকিরণদ্বারা রঞ্জিত হইয়া জ্যোৎস্না বিতরণ করে, চিত্তও সেইরূপ পুরুষচৈতন্যে উজ্জ্বলিত হইয়াই বিষয় প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া চিত্তের স্বপ্রকাশত্ব কোন প্রকারেই

থাকিতে পারে না। যেহেতু উহা দৃশ্য—প্রকাশ্য। আত্মার প্রকাশেই চিত্ত প্রকাশিত। অগ্নির দৃষ্টান্ত, যাহা আশঙ্কা-স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও স্বারসিক নহে; কারণ, প্রকৃতপক্ষে অগ্নি স্বপ্রকাশও নহে, পরপ্রকাশকও নহে। কোনও চেতন পুরুষকর্ত্তৃকই অগ্নি প্রকাশিত হয় এবং তৎসমীপস্থ বস্তুও প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। জড়পদার্থে কখনও প্রকাশধর্ম্ম থাকিতে পারে না। চিত্ত আত্মার প্রকাশে প্রকাশিত, উহা জড়; সুতরাং তাহা স্বাভাস নহে।

মনে রাখিও সাধক, ঋষি বলিলেন—যাহা দৃশ্য, তাহা কখনও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না, অর্থাৎ তাহার পারমার্থিক অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। যাহা স্বপ্রকাশ নয়, তাহার সত্তাই নাই। অতএব চিত্ত পারমার্থিক সত্তাহীন এক প্রকার বৈকল্পিক পদার্থ মাত্র।

एकसमये चोभयानवधारणम् ॥ २० ॥

चित्तस्य स्वाभासाभावे हेत्वन्तरमाचष्ट एकेति। एकसमये एकस्मिन् क्षणे, उभयानवधारणं च उभयस्य स्वपरयोः परयोर्वा अनवधारणमवधारणासामर्थ्यमिति भावः। तथाहि ज्ञातृत्वप्रत्ययक्षणे ज्ञेयप्रत्ययासामर्थ्यं ज्ञेयप्रत्ययक्षणे स्वावधारणासामर्थ्यं, द्वयोर्वार्थयो रेकस्मिन् क्षणे प्रत्ययाभावश्च। अतएव चित्तं न स्वाभासं न च कालातीतं वस्तु; किन्तु विषयाभाससमानं क्षणिकञ्चेति ॥ २० ॥

চিত্ত যে স্বপ্রকাশ নহে, এবিষয়ে অন্য একটী হেতু প্রদর্শিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—একসময়ে উভয়ানবধারণ হয়। একসময়ে শব্দের অর্থ—ঠিক একই ক্ষণে। উভয়ানবধারণ শব্দের

অর্থ—উভয়ের অবধারণ করিবার সামর্থ্য না থাকা। উভয়—স্ব এবং পর, অথবা দুইটী জ্ঞেয় বস্তু। চিত্ত যে ক্ষণে কোন বিষয়কে প্রকাশ করে, ঠিক সেইক্ষণে সে নিজেকে অবধারণ করিতে পারে না। অথবা ঠিক একই ক্ষণে দুইটী জ্ঞেয় বস্তুরও প্রকাশ করিতে পারে না। ন্যায়ের ভাষায় ইহাকেই জ্ঞানের অযৌগপদ্য বলা হয়। যুগপৎ দুইটী জ্ঞানকে ধারণ করিবার সামর্থ্য না থাকা বশতঃই বুঝিতে পারা যায়—চিত্ত কখনও স্বাভাস নহে। যাহা স্বপ্রকাশস্বরূপ বস্তু, তাহা কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় না, পরন্তু তাহা কালাতীতই। চিত্ত সেরূপ বস্তু নহে, উহা ক্ষণাবচ্ছিন্ন জ্ঞানাভাস মাত্র। একই ক্ষণে দুইটী জ্ঞেয়বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারে না বলিয়াই চিত্ত ক্ষণিক। যাহা ক্ষণিক, তাহা কখনও স্বাভাস হইতে পারে না। উভয়ানবধারণ শব্দে স্বপরপ্রত্যয়াভাবও বুঝায়। চিত্ত অচেতন জড় দৃশ্য; তাই তাহাতে স্ববিষয়ক প্রত্যয় এবং জ্ঞেয়বিষয়ক প্রত্যয় যুগপৎ অসম্ভব। যাহা নিজেকে জানে এবং তৎসমকালে অন্য বস্তুকেও প্রকাশ করিতে পারে, তাহাকেই চেতন বলে। চিত্ত এরূপ বস্তু নহে। চিত্ত যে সময়ে নিজেকে অবধারণ করিতে চেষ্টা করে, ঠিক সে সময়ে কোনও জ্ঞেয় বস্তুকেই প্রকাশ করিতে পারে না। এই যে উভয় অবধারণের অক্ষমতা, ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয়—চিত্ত কখনও স্বপ্রকাশ নহে।

শুন, খুলিয়া বলিতেছি—"আমি আমাকে জানি এবং বিষয়কেও সমকালেই জানি" অথবা সমকালে "দুইটী বিষয়কে জানি" এরূপ প্রতীতি কখনও হয় না। ইহারই নাম উভয়ানবধারণ। চিত্তের স্বপ্রকাশত্ব না থাকার প্রতি উহাও একটী হেতু। ঐ যে "আমি" উহার নাম চিত্ত। বিচার করিয়া দেখ—ঐ আমি, চেতন কি, অচেতন। "আমি" ইহা একটী প্রতীতিমাত্র, জ্ঞানক্রিয়া মাত্র। যাহা জ্ঞানক্রিয়া, তাহা কোনও "জ্ঞ" কে অপেক্ষা করে। কোন স্বপ্রকাশস্বরূপ বস্তুর প্রকাশকে অবলম্বন করিয়াই অহংপ্রত্যয় প্রকাশ পায়। যাহার প্রকাশ অন্যসাপেক্ষ তাহার অস্তিত্বও সুতরাং অন্যাপেক্ষী

হইবে। এইরূপে অন্যের সত্তায় এবং প্রকাশে প্রকাশিত হয় বলিয়াই "আমি" অচেতন। যাহা অচেতন, তাহা কখনও স্বাভাস হইতে পারে না।

।चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गः स्मृतिसङ्करश्च ॥२१॥

अथ चित्तं चित्तान्तरदृश्यं ग्राह्यते तत्रोच्यते चित्तेति। चित्तान्तरदृश्ये—चेदेकं चित्तमपरेण गृह्यते इत्येवमाक्षेपः क्रियत इत्यर्थः। तर्हि बुद्धिबुद्धेः—चित्तं चित्तान्तरेण प्रकाश्यं तत् पुनरन्येन तत् पुनरन्येनेत्येव मतिप्रसङ्गः अनवस्थादोष आपतति। अपिच स्मृतिसङ्करः यावन्तो बुद्धिबुद्धीनामनुभवा स्तावन्तः स्मृतयः समुपतिष्ठन्ते, तत् सङ्कराच्चैकस्मृत्यनवधारणञ्च स्यादिति।२१॥

যদি বল—চিত্ত ব্যতীত আর একটী স্বপ্রকাশ আত্মা নামক বস্তু স্বীকারের প্রয়োজন কি? একটী চিত্ত অপর এক চিত্তের দৃশ্য বলিলেই ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে—অচেতন চিত্তকে সক্রিয় করিবার জন্য অর্থাৎ বিষয়কে প্রকাশ করিবার সামর্থ্য প্রদান করিবার জন্য আত্মানামক একটী স্বপ্রকাশ বস্তুর স্বীকার না করিয়া আর একটী চিত্ত স্বীকার করিলেই ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কার পরিহার করিবার জন্যই এই সূত্রের অবতারণা। ঋষি বলিলেন—চিত্ত যদি চিত্তান্তরের দৃশ্য হয়, তবে বুদ্ধি বুদ্ধির অতি প্রসঙ্গ হয় এবং স্মৃতিসঙ্করও হয়। চিত্ত এবং বুদ্ধি একই অর্থবাচক। একটী চিত্তকে সক্রিয় করিবার জন্য অপর একটী চিত্ত স্বীকার করিয়া লইলে অতিপ্রসঙ্গ হয়। অতিপ্রসঙ্গ শব্দের অর্থ—অনবস্থা-দোষ। একটী বুদ্ধির অর্থাৎ চিত্তের প্রকাশক অপর একটী চিত্ত, আবার সেই চিত্তের

প্রকাশক অন্য একটী, আবার তাহারও প্রকাশক অপর একটী চিত্ত, এইরূপ অসংখ্য চিত্তের ধারা কল্পনা করিতে হয়। ইহাকেই অনবস্থা-দোষ কহে। কোনও একটী স্থিরবস্তুকে না পাওয়া পর্য্যন্ত বুদ্ধির স্থিরতা হয় না; সুতরাং সংশয়ও তিরোহিত হয় না। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ কোনও সংশয়ের মীমাংসা করিবার সময়ে অনবস্থাদোষকে প্রাণপণে পরিহার করিয়া থাকেন। আত্মানামক একটী বস্তু স্বীকার না করিয়া চিত্তের প্রকাশক চিত্ত বলিলে, এই অনবস্থা দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

কেবল তাহাই নহে, "স্মৃতিসঙ্করশ্চ" স্মৃতিসঙ্করও হয়। এক চিত্তের প্রকাশক অন্যচিত্ত, তাহার প্রকাশক অন্যচিত্ত, এইরূপ অগণিত চিত্তধারার যদি অনুভব হইতে থাকে, তবে স্মৃতিও সেইরূপ অসংখ্য চিত্তবিষয়ক হইবে; তাহাতে কোন্ চিত্তটী কোন্ চিত্তের প্রকাশক তাহা আর বিশেষভাবে ধরিবার উপায় থাকিবে না। অথচ স্মৃতির নিয়ম এই যে—তাহা পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুরূপই উদয় হইয়া থাকে। প্রস্তাবিতস্থলে তাহার অন্যথা হইয়া পড়িবে। খুলিয়া বলিতেছি—চিত্ত বা বুদ্ধি বলিতে বুঝিয়া লও "আমি"। পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে—আমি জড় পদার্থ। ঐ আমিকে সক্রিয় করিবার জন্য—নানারূপ ক্রিয়াময় করিবার জন্য একজন চেতন প্রেরয়িতার প্রয়োজন, সেই প্রেরয়িতা আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধির প্রতিসম্বেদী পুরুষ। এই পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া যদি বলা যায় যে এক আমিকে প্রকাশ করিবার জন্য আর একটী আমি, আবার সেই আমিকে প্রকাশ করিবার জন্য আর একটী আমি আছে; এইরূপ অগণিত আমির ধারা স্বীকার করিলেই ত পুরুষ স্বীকার না করিয়া পারা যায়। ঋষি বলিলেন—না, তাহা পারা যায় না, এক ত কোনও একটী স্থির আমি ধরিতে না পারায় অনবস্থা দোষ হয়, তাছাড়া স্মৃতিসঙ্করও হয়। যে আমি পূর্ব্বক্ষণে রাগ অনুভব করিয়াছিলাম, সেই আমি পরক্ষণে না থাকায়, পূর্ব্বক্ষণস্থিত রাগানুভবকর্ত্তা আমির স্মরণ হইতে পারে না।

ইহা যেরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ, তেমনি অনুভববিরুদ্ধও বটে, সকল মনুষ্যই 'আমিকে' একটী স্থিরবস্তুরূপেই অনুভব করে এবং স্মরণ করিয়া থাকে। অতএব চিত্তের দ্রষ্টা কখনও অন্য একটী চিত্ত হইতেই পারে না। সুতরাং চিত্তের দ্রষ্টা—উহার প্রতিসম্বেদী পুরুষ বা আত্মাই।

चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि-संवेदनम् ॥ २२ ॥

अस्त्वेवमचेतनं चित्तं कथं स्वमपि जानातीत्याह चितेरिति। अप्रतिसंक्रमाया अन्यत्रासञ्चाररहितायाः शुद्धायाश्चितेस्तदाकारापत्तौ अविद्याप्रभावेन बुद्धिरूपताप्राप्तौ स्वबुद्धिसंवेदनं "अहं ज्ञाता भोक्ता" इत्येवमनुभवो भवेत्। इदमत्राकूतं—स्वप्रकाशरूपस्यात्मनो बुद्धिरूपताप्राप्तौ बुद्धेरपि स्वसंवेदनत्वम्। एतेनात्मनो वृत्तिसारूप्यभावो दर्शित इति ॥ २२ ॥

আচ্ছা, অচেতন চিত্ত কিরূপে তাহার নিজেকে নিজে অনুভব করিতে পারে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য এই সূত্রটীর উল্লেখ হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—অপ্রতিসংক্রমা চিতিশক্তির বুদ্ধিরূপতা প্রাপ্তি হয় বলিয়াই স্ববুদ্ধি সংবেদন সম্ভব হয়। চিতিশক্তি অপরিণামিনী এবং অপ্রতিসংক্রমা—অন্যত্র সঞ্চাররহিতা হইয়াও অনাদি অবিদ্যাপ্রভাবে যেন পরিণামিনী যেন প্রতিসংক্রান্তার ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন। যখন ঐরূপ হয়—নির্ব্বিকার চৈতন্যমাত্রস্বরূপ আত্মা লীলাবশে যখন প্রতিসংক্রান্তবৎ হন, তখন ব্যাপার কি হয়? তদাকারাপত্তি হয়—তাহার অর্থাৎ বুদ্ধির আকারের ন্যায় আকার প্রাপ্তি হয়। আত্মা যেন বুদ্ধিরূপতা প্রাপ্ত হন। অঘটনঘটনপটীয়সী

লীলাময়ী মহতী অবিদ্যা শক্তিপ্রভাবে আত্মা তখন বুদ্ধিরূপেই প্রকাশিত হইতে থাকেন। এইরূপ হয় বলিয়াই স্ববুদ্ধিসংবেদন হইয়া থাকে অর্থাৎ বুদ্ধি তাহার নিজেকে নিজে অনুভব করিতে পারে। আত্মা স্বপ্রকাশস্বরূপ—তিনি প্রতিনিয়ত স্বয়ং স্বকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই স্বয়ং প্রকাশত্বই আত্মত্ব। আত্মা যখন বুদ্ধিরূপতা প্রাপ্ত হন, তখন তাহাতেও সেই স্বয়ংপ্রকাশত্ব ধর্ম্ম প্রকাশ পাইবেই; সুতরাং স্ববুদ্ধিসংবেদন অবশ্যম্ভাবী। আত্মা যেহেতু নিজেকে নিজে সর্ব্বদাই অবগত আছেন, বুদ্ধিও সেই হেতুই নিজেকে নিজে অবধারণ করিতে সমর্থ হয়। ইহাকেই স্ববুদ্ধি সংবেদন কহে। বুদ্ধি স্বরূপতঃ অচেতন হইয়াও এইরূপে জ্ঞাতৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ সংবেদন লইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে অগ্নিময় লৌহপিণ্ডের দৃষ্টান্তপ্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে—ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। যদি চৈতন্যময় হইত, তবে লৌহপিণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুই যেমন আপনাকে অগ্নিরূপে অনুভব করিত, অচেতনা বুদ্ধিও ঠিক সেইরূপই নিজেকে আত্মারূপে কর্ত্তারূপে ভোক্তারূপে অনুভব করিয়া থাকে অর্থাৎ চেতনবৎ হইয়া উঠে। পূর্ব্বে যে বৃত্তিসারূপ্য কথাটী বলা হইয়াছে, তাহা কিরূপে সংঘটিত হয়, তাহাই এসূত্রে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। বুদ্ধি একটী বৃত্তিস্বরূপ বস্তু, আত্মার এই বুদ্ধিরূপতাপ্রাপ্তিই বৃত্তিসারূপ্য হওয়া। এসকল বিষয় ইতিপূর্ব্বেও বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

———

द्रष्टृदृश्योपरक्तं चित्तं सर्व्वार्थम् ॥ २३ ॥

अतएव चित्तस्वरूपमेव मभ्युपगम्यते द्रष्टृिति। द्रष्टृ-दृश्योपरक्तं द्रष्ट्रा पुरुषेण उपरक्तं सन्निहितत्वात्तद्रूपतामिव प्राप्तं, दृश्येन

বিষয়েণ চোপরক্তং গৃহীতবিষয়াকার-পরিণামমিতিভাবঃ। যদৈবং ভবতি চিত্তং তদা সর্ব্বার্থং সর্ব্বং চেতনাচেতনং অর্থো বিষয়ো যস্য তৎ তাদৃশং ভবতি ॥ ২৩ ॥

এ পর্য্যন্ত আলোচনা দ্বারা চিত্তের স্বরূপ যাহা নির্ণীত হইল, তাহা এই সূত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—চিত্ত যখন দ্রষ্টা এবং দৃশ্য উভয়দ্বারা উপরক্ত হয়, তখনই উহা সর্ব্বার্থ হইয়া থাকে অর্থাৎ চেতন অচেতন সকল বিষয়কেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। দ্রষ্টার দ্বারা উপরক্ত হওয়ার বিষয় পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে—অপ্রতিসংক্রমা চিতিশক্তির লীলাবশে বুদ্ধিরূপতা প্রাপ্তি হওয়া। আত্মার এই যে বুদ্ধিরূপতা প্রাপ্তি,তাহাকেই দ্রষ্টাদ্বারা উপরক্ত হওয়া বলে। আর দৃশ্যোপরক্ত বলিতে বুঝায়—দৃশ্যপদার্থ সমূহ দ্বারা উপরক্ত হওয়া, অর্থাৎ বুদ্ধির দৃশ্য-আকারীয় পরিণাম প্রাপ্ত হওয়া। বুদ্ধি একদিকে পুরুষকর্ত্তৃক উপদৃষ্ট, অন্যদিকে রূপরসাদি বিষয়ের দ্বারা উপরঞ্জিত। একদিকে যেন চৈতন্যস্বরূপতা প্রাপ্তি, অন্যদিকে জড়াকারীয় পরিণাম, এই উভয়ভাবাপন্ন হইলেই চিত্ত সর্ব্বার্থ হয়। সর্ব্বশব্দের অর্থ—চেতন অচেতন সকল, এই সকলই হইতেছে অর্থ অর্থাৎ বিষয় যাহার, তাহার নাম সর্ব্বার্থ। এইরূপ দ্রষ্টৃ-দৃশ্যোপরক্ত হইলে তবে চিত্ত সর্ব্বার্থ হয়—চেতন অচেতন সকল বিষয়কেই অবধারণ করিতে সমর্থ হয়। “বুদ্ধিপর্য্যবসানা হি বিষয়াঃ”—বিষয়সমূহ বুদ্ধিপর্য্যন্ত গিয়াই পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধি একদিকে যেমন অচেতন বিষয়ের প্রকাশ করে, অন্যদিকে তেমনই আবার চেতন পুরুষেরও অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে। “মম যোনি র্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্, সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।” গীতার এই বাক্যটীর যাহা তাৎপর্য্য, তাহা এই সূত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সর্ব্বার্থ-চিত্তের যথার্থ

স্বরূপ অবগত হইতে না পারিয়া কেহ চেতন কেহ অচেতন কেহ ক্ষণিক বিজ্ঞান মাত্র, কেহ আত্মা, কেহ মায়া ইত্যাদি নানারূপে ইহাকে অভিহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

প্রিয়তম সাধক! তোমরা প্রতিদিন গায়ত্রীমন্ত্রে" ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ" বলিয়া যাঁহার উপাসনা করিয়া থাক, তাহা এই দ্রষ্টা এবং দৃশ্য, উভয়ের দ্বারা উপরক্ত সর্ব্বার্থ চিত্ত ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যিনি চিতিমাত্রস্বরূপ, তাঁহার উপাসনা হয় না। তিনি সর্ব্বোপাধি বর্জ্জিত সর্ব্বভাবাতীত আত্মা। তিনি—সেই চিতিশক্তি যখন চিত্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, যখন তিনি একদিকে আত্মার মতনই চেতন হইয়া উঠেন, অন্যদিকে সর্ব্ববিষয়ের গ্রহণে সমর্থ হয়েন, তখনই তিনি সর্ব্বার্থচিত্ত নামে অভিহিত হন। এই চিত্তই তোমার উপাসনার আলম্বন। উনিই ধী, উনিই জননী, উনিই ঈশ্বরী, উহাঁরই চরণে কাতর প্রাণে প্রার্থনা কর। ঐ মহতী ধীশক্তি যখন নগ্না বেশে তাঁহার যথার্থ স্বরূপটী উদ্‌ভাসিত করিবেন, তখনই তুমি দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্যটি প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। এবং ঐরূপ প্রত্যক্ষ করিবার ফলেই তাঁহার কৃপায় দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগেও উপনীত হইয়া জন্ম জীবন সার্থক করিতে পারিবে। পৃথিবীতে যত রকম সাধনপ্রণালী বিদ্যমান আছে, সে সকলেরই লক্ষ্য ঐ দ্রষ্টৃ-দৃশ্যোপরক্ত চিত্তে—বুদ্ধিতত্ত্বে বা অস্মিতায় উপনীত হওয়া। ঐখানে উপনীত হইতে পারিলেই সাধনার যাহা উদ্দেশ্য, যাহা লক্ষ্য, তাহা লাভ করিতে পারা যায়। অর্দ্ধনারীশ্বর, হরগৌরী, রাধাকৃষ্ণ, বিষ্ণুলক্ষ্মী প্রভৃতি শব্দে এই তত্ত্বই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হয়। যিনি যে পথেই অগ্রসর হউন, এই যোগপথ সকলের পক্ষেই সাধারণ। তাই বলি—তোমরা চিত্তকে একটী তত্ত্বমাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিও না। উনি একজন—উনি ঈশ্বরী—উনি জননী।

তদসংখ্যেয় বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং
সংহত্যকারিত্বাৎ ॥ ২৪ ॥

অথোপসংহরতি চিতিচিত্তয়োঃ স্বরূপনির্ণয়প্রসঙ্গং তদিতি। তৎ চিত্তং অসংখ্যেয়বাসনাভিরনাদিজন্মসঞ্চিতাভির্বাসনাভিশ্চিত্রমপি চিত্রীকৃতমপি—সর্ব্বাধারং সর্ব্বপ্রকাশকমপি পরার্থং পরস্য পুরুষস্য কল্পিতভোগাপবর্গরূপপ্রয়োজনসিদ্ধয়ে ভবতীতিভাবঃ। অত্র হেতুমাহ সংহত্যকারিত্বাৎ—প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিশীলগুণত্রয়াত্মকত্বাচ্চিত্তস্য সংহত্যকারিত্বম্। যদ্ধি বস্তু সংহত্য মিলিত্বা কার্য্যকারি ভবতি, তৎ পরার্থমেব, যথা গৃহং। চিতিমাত্ররূপঃ পুরুষস্তু ন তথা। স্বতন্ত্র এব স ইতি।

চিতি এবং চিত্ত, এতদুভয়ের স্বরূপনির্ণয়-বিষয়ক প্রসঙ্গ এই সূত্রে উপসংহৃত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহা (চিত্ত) অসংখ্যেয় বাসনা দ্বারা চিত্রীকৃত হইলেও পরার্থ, যেহেতু উহা সংহত্যকারী। অনাদিজন্মসঞ্চিত বাসনারাশির আধার সর্ব্বভাবের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা হইলেও—বহু বৈচিত্র্যময় হইলেও চিত্ত পরার্থ। পরের অর্থাৎ পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ সিদ্ধির জন্যই চিত্ত পরিকল্পিত হইয়া থাকে। কি যুক্তিতে এরূপ বলা যায়—সংহত্যকারিত্ব হেতু। যাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য করে, তাহাদিগকে সংহত্যকারী বলে, চিত্ত ঐরূপ সংহত্যকারী। প্রখ্যা প্রবৃত্তি এবং স্থিতিশীল গুণত্রয় সংহত হইয়াই চিত্তরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, এবং অনাদি বাসনারাশিদ্বারা চিত্রিত হয়। যাহা সংহত বস্তু, তাহা চিরকালই পরার্থ হইয়া থাকে, যথা গৃহ। গৃহস্বামীর বাসের জন্যই সংহতবস্তু গৃহ রচিত হইয়া থাকে।

চিত্ত ঠিক সেইরূপ গৃহাদির ন্যায় সংহতবস্তুই; সুতরাং ইহাও নিত্য-শুদ্ধ নিত্যমুক্ত পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গরূপ লীলা, নিষ্পন্ন করিবার জন্যই পরিকল্পিত হইয়া থাকে, অন্যথা চিত্তের স্বতন্ত্র কোন সত্তা বা প্রকাশ নাই। পক্ষান্তরে পুরুষ সেরূপ নহে, পুরুষ পরার্থ নহে, স্বার্থ বা স্বতন্ত্র। তিনি স্বপ্রকাশ স্বরাট্; যেহেতু তিনি সংহত বস্তু নহেন। যাহাতে কোনও না কোনরূপ পরিণাম পরিলক্ষিত হয়, তাহা সংহতবস্তুই হয়। পুরুষ অপরিণামী; সুতরাং তিনি অসংহত—স্বতন্ত্র। ইনিই গম্য, ইনিই লক্ষ্য। ইঁহাকে পাইবার জন্যই চিত্তস্বরূপ অবগত হওয়া আবশ্যক।

সাধক! যতদিন তোমার আমিকে ঠিক ঠিক ধরিতে না পারিবে, ততদিন ঐ আমির যিনি প্রকাশক, তাঁহাকে বুঝিতেই পারিবে না। "অহং"কে পাইলে তবে "সঃ"এর সন্ধান হয়, তখন অহংটা সঃস্বরূপে মিলাইয়া যায়। ওগো অহং এর নাম চিত্ত, সঃ এর নাম চিতি। বুঝিতে পারিলে এইবার—চিতি ও চিত্তের স্বরূপ কি!

বিশেষদর্শিন আত্মভাবভাবনা বিনিবৃত্তিঃ ॥২৫॥

উভয়োঃ স্বরূপং পশ্যতোঽবস্থাং নির্দ্দিশতি বিশেষেতি। বিশেষ দর্শিন ক্ষিতিচিত্তয়োঃ স্বরূপং পশ্যতো যোগিন আত্মভাবভাবনা-বিনিবৃত্তিঃ অনাত্মনি চিত্তে যা আত্মভাবভাবনা "অহমিদং মমেদ" মিত্যাদিরূপা, তস্যা বিনিবৃত্তি বিশেষেণ নিবৃত্তি ন পুনস্তাদৃশী ভাবনা সম্ভবতীতি ॥ ২৫ ॥

এক্ষণে পূর্ব্বোক্তরূপ চিতি এবং চিত্তের স্বরূপদর্শী যোগীর অবস্থা নির্দ্দেশ করা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—বিশেষদর্শীর আত্মভাব

ভাবনা বিনিবৃত্ত হইয়া যায়। তিনি বিশেষদর্শী, যিনি চিতিশক্তি এবং চিত্ত, এতদুভয়ের বিশেষত্ব সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্থূল কথায়—যে যোগীর বিবেকখ্যাতি হইয়াছে, এইরূপ বিশেষদর্শী যোগীরই আত্মভাব-ভাবনার বিনিবৃত্তি হয়। অনাত্মা—চিত্ত, তাহাতে যে আত্মভাব-ভাবনা—"আমি এইরূপ, আমার ইহা আছে" ইত্যাদিরূপ যে প্রত্যয়, তাহার বিশেষরূপে নিবৃত্তি হইয়া যায়। পুনরায় আর সেইরূপ অনাত্মবস্তুতে আত্মখ্যাতিরূপ অবিদ্যার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। তখন কি হয়—"আমি আছি" বলিতে সত্তামাত্রস্বরূপ একমাত্র পুরুষই প্রতিভাত হইতে থাকেন। ঐ যে "আছি' বা অস্তি, উহাই নিত্যসত্য আত্মস্বরূপে প্রতিভাসিত হইতে থাকে। "আমি" নামে অর্থাৎ চিত্তনামে কখনও কিছু ছিল বা থাকিবে অথবা থাকিতে পারে, এরূপ প্রত্যয়ও চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই যে আত্মভাব-ভাবনা-নিবৃত্তি অর্থাৎ অহংত্যাগ, ইহারই নাম যথার্থ বৈরাগ্য। যতদিন অহংএর সত্তা বিলুপ্ত না হয়, ততদিন সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়াও বৈরাগ্যলাভ হয় না। মনে রাখিও সাধক, বিশেষদর্শী যোগীর "অহং"ত্যাগ হইবেই। যখন অস্তিমাত্রস্বরূপ—নির্ব্বিশেষ-সত্তাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের উদয় হয়, তখন অহংরূপিণী রাধিকা—চিৎপ্রতিবিম্বরূপী চিত্ত চিরতরে তাহাতেই মিলাইয়া যায়। পূর্ণজ্ঞান পরবৈরাগ্য এবং পরাভক্তি বলিতে এই তত্ত্বই বুঝায়। যে পর্য্যন্ত এই বিশেষ দর্শন না হয়, আত্মভাব-ভাবনার নিবৃত্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত জ্ঞান অজ্ঞানমাত্র, বৈরাগ্য গ্রহণমাত্র এবং ভক্তি অনুশীলনমাত্রই হইয়া থাকে।

तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम् ॥२६॥

तदानीं कीदृग्भावमुपगच्छति चित्तमित्याह तदेति। चित्तं यत् पूर्व्वं मज्ञाननिम्नं विषयप्राग्भार मासीत् तत् चित्तमिति भावः।

তদা আত্মভাবভাবনা-নিবৃত্তৌ বিবেকনিম্নং বিবেকঃ আত্মানাত্মস্বরূপ-বিজ্ঞানং নিম্নং আলম্বনভূমি যস্য তাদৃশং নিম্নম্ পুনঃ কৈবল্যপ্রাগ্ভারং কৈবল্যং ব্যুত্থানরহিতা স্বরূপস্থিতিঃ, প্রাগ্ভারঃ অবধি বিলয়স্থানং যস্য তথাভূতং স্যাদিতি শেষঃ। যথা কাচিত্ জলধারা ক্রমনিম্ন-স্থানবাহিনী সমুন্নতস্থানং সিকতাময়মবাপ্য বিলীয়তে, তথা চিত্ত-নাম নদী তদানীং বিবেকনিম্নগামিনী সতী কৈবল্যপদবীমদ্বিতীয়াং প্রাপ্য চিরবিলীনা ভবতীতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

তখন চিত্তের অবস্থা কিরূপ হয়, এই সূত্রে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তখন চিত্ত বিবেকনিম্ন এবং কৈবল্যপ্রাগ্ভার হয়। যে চিত্ত পূর্ব্বে অজ্ঞাননিম্ন এবং বিষয়প্রাগ্ভার ছিল, আত্মভাব-ভাবনা-নিবৃত্তি হইলে সেই চিত্তই বিবেকনিম্ন এবং কৈবল্যপ্রাগ্ভার হয়। নিম্ন শব্দের অর্থ আলম্বনভূমি, প্রাগ্ভার শব্দের অর্থ অবধি—বিলয়স্থান। আত্মভাবভাবনানিবৃত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চিত্তের আলম্বন থাকে অজ্ঞান, এবং রূপরসাদি বিষয় হয় অবধি বা সীমা; তাই সাধারণ-চিত্তকে অজ্ঞাননিম্ন এবং বিষয়প্রাগ্ভার বলা হয়। আর বিশেষ দর্শন হইলে অর্থাৎ আত্মানাত্মস্বরূপ প্রত্যক্ষ হইলে চিত্তের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়—তখন উহা বিবেকনিম্ন এবং কৈবল্য-প্রাগ্ভার হইয়া পড়ে। সে অবস্থায় বিবেকই হয় চিত্তের আলম্বন আর কৈবল্যই হয় উহার অবধি বা সমাপ্তিস্থান। কৈবল্য শব্দের অর্থ ব্যুত্থানরহিত স্বরূপস্থিতি, তাহাই প্রাগ্ভার অর্থাৎ উচ্চ স্থানতুল্য হইয়া থাকে। যেরূপ কোনও জলধারা নিম্নাভিমুখী খাতে প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে কোনও সিকতাময় সমুচ্চস্থান প্রাপ্ত হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়, ঠিক সেই রূপই বিশেষদর্শী যোগীর চিত্ত বিবেকরূপ নিম্নখাতেই প্রবাহিত হইতে থাকে, পরে কৈবল্যরূপ অদ্বিতীয় সত্তায় উপনীত হইয়া চিরতরে বিলীন হইয়া যায়।

এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ চিত্তকে উভয়তোবাহিনী নদীর সহিত তুলনা করিয়া থাকেন—একদিকে অজ্ঞান নিম্ন এবং রূপরসাদি বিষয় প্রাগ্‌ভার। অন্যদিকে বিবেক নিম্ন এবং কৈবল্য প্রাগভার। একদিকে ভোগ বা বন্ধ, অন্যদিকে মোক্ষ বা পরম কল্যাণ। যতদিন চিত্তনদীর প্রবাহ অপবর্গমুখী না হয়, ততদিন উহাকে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের সাহায্যে তন্মুখী করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। কোনরূপে যদি একবার বিশেষদর্শী হওয়া যায়—পরম প্রিয়তম পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তবে বিষয়মুখী গতি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চিত্ত স্বভাবতঃই মোক্ষাভিমুখী হইয়া থাকে। সাধক, তুমি চিত্তকে চিতিশক্তি স্বরূপিণী জননী বলিয়াই বুঝিও—অনুভব করিও, দেখিবে অচিরকাল মধ্যেই চিত্তনদীর প্রবাহ ফিরিয়া গিয়াছে।

তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥২৭॥

যাবন্নোপনিষ্ঠতে কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারং তাবচ্চিত্তং সততমেব ন বিবেক-নিম্নং কিন্ত্বন্যদপীত্যাহ তদিতি। তচ্ছিদ্রেষু তদন্তরালেষু বিবেক-খ্যাতিব্যুত্থানেচিত্তস্যেত্যর্থঃ। প্রত্যয়ান্তরাণি অহমিদং মমেদমিত্যেবং রূপাণি, পুনরাবির্ভবন্তীতি শেষঃ। কুতঃ—সংস্কারেভ্যঃ পূর্ব্বাভ্যস্ত দীর্ঘকালস্থায়ি-সংস্কারপ্রভাবাৎ। অতএব জীবন্মুক্তস্য ব্যবহারঃ সিদ্ধ্যতীতি ॥ ২৭ ॥

যে পর্য্যন্ত কৈবল্যরূপ প্রাগ্‌ভারে উপনীত না হয়, সে পর্য্যন্ত চিত্ত সর্ব্বদাই বিবেকনিম্ন থাকে না, পরন্তু অন্যরূপ প্রত্যয়ও উদিত হয়। এই সূত্রে ঋষি তাহাই বলিতেছেন—পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ তাহার অন্তরালে অন্যরূপ প্রত্যয়সমূহ উদিত হইয়া থাকে। চিত্তনদী যখন বিবেকনিম্না হয়—বিবেকরূপ নিম্নখাতে প্রবাহিত হয়, তখন

যে নিরবচ্ছিন্নভাবেই সে প্রবাহ চলে, তাহা নহে; মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বাভ্যস্ত দীর্ঘকালস্থায়ী সংস্কারপ্রভাবে "আমি এইরূপ" "আমার ইহা" ইত্যাদিরূপ অজ্ঞানমূলক সংস্কারও উদিত হইতে থাকে। বিবেকখ্যাতি দ্বারা অবিদ্যারূপ কারণ নষ্ট হইয়া গেলেও যে পর্য্যন্ত কৈবল্যোদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত অবিদ্যার কার্য্য কিঞ্চিদ্ বিদ্যমান থাকে, ইহা ইতিপূর্ব্বেও নানাবিধ যুক্তিদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে ঋষিবাক্য দ্বারাও তাহা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপাদিত হইল। এই সূত্রে ঋষি জীবন্মুক্তের ব্যবহার নির্দ্দেশ করিলেন। আত্মানাত্মবিবেক প্রত্যুদিত হইলেও তাহার ছিদ্রে অর্থাৎ অন্তরালে অজ্ঞানমূলক সংস্কারসমূহ প্রকাশ পায়। পূর্ব্বাভ্যস্ত দীর্ঘকালস্থায়ী সংস্কার সমূহই তাহার হেতু। এই সংস্কার প্রত্যেক মানবের বিভিন্ন; সুতরাং জীবন্মুক্তের ব্যবহারও পরস্পর বিভিন্ন হইয়া থাকে। সকলেই ত্যাগী বা সকলেই সংসারী হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। সে যাহা হউক, যোগী যত বেশী কৈবল্যের সন্নিহিত হইতে থাকেন, অজ্ঞানমূলক প্রত্যয়ের উদয়ও তত কম হইতে থাকে। সাধারণ লোকের যে অজ্ঞানমূলক সংস্কার, তাহা হইতে যোগীর তাদৃশ সংস্কার যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা বলাই বাহুল্য। সাধারণ লোকের আবরণ ও বিক্ষেপ উভয়ই থাকে। যোগীর আবরণ থাকে না, পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ সাধারণ বিক্ষেপমাত্রই থাকে।

হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্ ॥ ২৮ ॥

কথমেষামপি হানমিত্যাহ হানমিতি। এষাং তচ্ছিদ্রগতানাং প্রত্যয়ান্তরাণাং হানং ক্লেশবদুক্তম্। যথা ক্লেশা অবিদ্যাদয়ঃ দগ্ধবীজ-কল্পা ন প্ররোহন্তি তথা বিবেকান্তরালবর্ত্তিনোঽবিবেকপ্রত্যয়া নালং-পুনর্বন্ধায়েতি মা ভৈষীঃ ॥ ২৮ ॥

ইহাদের হান কি প্রকারে হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্যই এ সূত্রের অবতারণা। ঋষি বলিলেন—ক্লেশের ন্যায় ইহাদের হান উক্ত হইয়াছে। বিবেকখ্যাতির অন্তরালে যে সকল অজ্ঞান-মূলক প্রত্যয় প্রকাশ পায়, তাহাদের হান ক্লেশের ন্যায়ই হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে হেয়, হেয়হেতু, হান এবং হানোপায়রূপ চতুর্ব্যূহ যোগশাস্ত্র সবিস্তার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ যেরূপ দগ্ধবীজকল্প হইয়া পুনরায় ক্লেশ জন্মাইতে পারে না, ঠিক সেইরূপই এই বিবেকের অন্তরালস্থিত অবিবেকপ্রত্যয়গুলিও জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ হওয়ায় পুনরায় বন্ধন জন্মাইতে পারে না। অতএব ভয়ের কোন কারণ নাই। যে সকল যোগীর বিবেকখ্যাতি হইয়াছে, তাঁহাদেরও ঐ খ্যাতির অন্তরালে অহংমমাকারা বৃত্তির উদয় হয়। ঐরূপ বৃত্তি দেখিয়া তাঁহারা হতাশ হইয়া পড়িতে পারেন—"হায়, এতদূরে আসিয়াও সেই অজ্ঞান! সেই "অহং মম! সুতরাং আর মুক্তির সম্ভাবনা নাই।" এইরূপ হতাশের কোনও কারণ নাই; যেহেতু, উহারা দগ্ধবীজের ন্যায় পুনরায় আর অঙ্কুরোৎপাদনে সমর্থ হইতে পারে না। যতদিন অনাত্মবস্তুর সত্তাবিষয়ক নিশ্চয়জ্ঞান দূরীভূত না হয়, ততদিন বন্ধন ছিন্ন হইতেই পারে না; কিন্তু একবার বিবেকখ্যাতি হইলে আত্মা ব্যতীত অপর কোন বস্তুর সত্তাবিষয়ক প্রতীতি একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং সহস্রবারও যদি "অহং মম" প্রভৃতি অজ্ঞানমূলক প্রত্যয় প্রকাশ পায়, তথাপি তাহারা বিষদন্তহীন সর্পের ন্যায় আর কখনও দংশন করিতে পারে না। যোগদর্শনের প্রাচীন ভাষ্যকারও "ন চিন্ত্যন্তে" বলিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ অভয়ই সূচনা করিয়াছেন। জীবন্মুক্তের ব্যবহার প্রায় নিন্দনীয় হয় না, যদিই বা কদাচিৎ হয়, তথাপি তজ্জন্য তাঁহাকে পুনরায় বন্ধনগ্রস্ত হইতে হয় না।

প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতে

ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ ॥ ২৯ ॥

বিবেকান্তরালবর্ত্তি-প্রত্যয়ান্তরানুৎপাদনোপায়মাহ প্রসংখ্যান ইতি। প্রসংখ্যানেঽপি ভূতজয়েন্দ্রিয়জয়াদিজন্যং সর্ব্বতত্ত্বানাং সম্যগ্‌-দর্শনং প্রসংখ্যানং নাম, তস্মিন্ সত্যপি অকুসীদস্য সর্ব্বতত্ত্বানাং সম্যগ্‌দর্শনরূপমৈশ্বর্য্যমপ্যকাময়তো বিরক্তস্য যোগিন ইতি ভাবঃ। সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতে নিরন্তরবিবেকখ্যাতেঃ পরমপ্রমোদয়াদিতিভাবঃ। ধর্ম্মমেঘঃ ধর্ম্মমবিরোলমসত্তানুভবরূপং মেহতি সিঞ্চতীতি ধর্ম্মমেঘো নাম সমাধিরাবির্ভবতীতি শেষঃ। এবঞ্চ সংস্কারক্ষয়ঃ কৈবল্যাসন্নতা চ সূচ্যেতে ॥ ২৯ ॥

বিবেকখ্যাতির অন্তরালে যে অন্য প্রত্যয় উদিত হয়, উহা নিরুদ্ধ হইবার উপায় এই সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—প্রসংখ্যানেও অকুসীদব্যক্তির সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতি হইয়া থাকে, উহারই নাম ধর্ম্মমেঘ সমাধি। ভূতজয় ইন্দ্রিয়জয় প্রভৃতি হইতে যোগীর যে সর্ব্বতত্ত্বের সম্যক্-দর্শন-সামর্থ্য উপস্থিত হয়, তাহাকেই প্রসংখ্যান বলা হয়। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের যে প্রকৃষ্টরূপে খ্যাতি হওয়া, তাহাই যোগশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ প্রসংখ্যান। এইরূপ প্রসংখ্যানেও যে ব্যক্তি অকুসীদ অর্থাৎ আসক্তিবিহীন—প্রসংখ্যানরূপ অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য-ভোগেও যাহার স্পৃহা নাই, এইরূপ পরবৈরাগ্যবান্ যোগীকেই প্রসংখ্যানে অকুসীদ বলা হয়। ইতিপূর্ব্বে বিভূতি বর্ণন প্রসঙ্গেও পুনঃ-পুনঃ বলা হইয়াছে যে—যাবতীয় তত্ত্বকে আত্মবিভূতিরূপে দর্শন করিতে করিতেই যথার্থ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। ঈশ্বরত্ব পর্য্যন্ত যখন

অতিশয় অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতে থাকে, তখনই এই অকুসীদ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কুসীদ শব্দের অর্থ সুদ—বৃদ্ধি। আত্মমহত্ব দর্শনের ইচ্ছাও নিরুদ্ধ হইলে যোগী অকুসীদ হইতে পারেন। এইরূপ যোগীরই সর্ব্বথা-বিবেক-খ্যাতি হইতে থাকে। নিরন্তর আত্ম-সত্তানুভব হওয়ার নামই সর্ব্বথা-বিবেক-খ্যাতি। পরম প্রিয়তম পরমাত্মপ্রেম উপস্থিত হইলেই ইহা সম্ভব হয়। শুধু আত্মপ্রেমের অভাব বশতঃই আত্মসত্তাতিরিক্ত সত্তা দর্শনে স্পৃহা থাকে। যখন শ্রীগুরুকৃপায় এই পূর্ণ প্রেমের উদয় হয়, তখন আর নিমেষমাত্র সময়ের জন্যও আত্মসত্তা ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। ইহাই সর্ব্বথাবিবেক-খ্যাতি। বহু সৌভাগ্যের ফলে ও অপার করুণাপ্রভাবেই ইহা সম্ভব হইয়া থাকে। এই অবস্থার যোগশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ নাম—ধর্ম্মমেঘ-সমাধি। পূর্ব্বে যে সমাধির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহাহইতে ইহা অত্যন্ত বিলক্ষণ—সে সমাধিহইতে ব্যুত্থান হয়; কিন্তু ইহাহইতে—এই ধর্ম্ম-মেঘসমাধি হইতে ব্যুত্থান হয় না। ইহা উপস্থিত হইলেই বুঝিতে পারা যায়—যাবতীয় অনাত্মসংস্কার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং কৈবল্য প্রাপ্তি একান্ত সন্নিহিত হইয়া আসিয়াছে। যোগবাশিষ্ঠের ভাষায় ইহাকে জ্ঞানের ষষ্ঠ ভূমিকা—পদার্থাভাবিনী বলা যায়। একমাত্র সেই পরম পদ ব্যতীত পদার্থ নামক আর যে কিছু আছে বা থাকিতে পারে, এরূপ স্মৃতি পর্য্যন্ত উদিত হয় না। এই সময়ে দিবারাত্রি নিরন্তর একতানভাবে বুদ্ধি কেবল আত্মসত্তাই অনুভব করিতে থাকে। স্বইচ্ছায় আহার নিদ্রা প্রভৃতি পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়। যদি কেহ কোনরূপ তরলদ্রব্য মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়, তবে কখনও কখনও গলাধঃকরণ হইতে পারে। তাহাও প্রায় অজ্ঞাত-সারেই হইয়া থাকে। অপূর্ব্ব এ অবস্থা! সাধারণ মানুষ ইহা কল্পনাও করিতে পারে না। কিন্তু এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে এরূপ উন্নত যোগী সকল কালেই ছিল এবং বর্ত্তমানেও আছে, তবে উহাদের সংখ্যা এত অল্প যে, তাহাকে সুদুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইরূপ অবস্থা

হইতে কৈবল্যপদ বা সপ্তমভূমিকা তূর্য্যগাপ্রাপ্তি অতি অল্পদিনেই পরিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে। স্থূল সূক্ষ্মাদি ত্রিবিধ দেহের ভান চিরতরে বিলয় প্রাপ্ত হওয়াই কৈবল্য। কেহ কেহ ইহাকে মহানির্ব্বাণও বলিয়া থাকেন। হাঁ, আর একটা কথা—এই সর্ব্বথাবিবেকখ্যাতিরূপ অবস্থাকে যোগসূত্রকার ধর্ম্মমেঘ-সমাধি নাম দিলেন ; কেবল ধর্ম্মকেই মেহন অর্থাৎ সিঞ্চন করে বলিয়া এই সমাধির নাম ধর্ম্মমেঘ। যাহা সকলকে অর্থাৎ যাবতীয় দ্বৈতপ্রতীতিকে ধারণ করিতে সমর্থ, তাহারই নাম ধর্ম্ম। একমাত্র আত্মসত্তাই যাবতীয় বিশিষ্ট সত্তার ধারক বা প্রকাশক ; সুতরাং ধর্ম্ম বলিতে সেই নির্ব্বিশেষ সত্তামাত্র-স্বরূপ বস্তুকেই বুঝায়। সমাধি যখন প্রতিনিয়ত সেই ধর্ম্মকেই বর্ষণ করিতে থাকে, কখনও সে বর্ষণ নিরুদ্ধ হইয়া অন্য প্রতীতির উদয় হয় না, তখন সেই সমাধি ধর্ম্মমেঘ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ততঃ ক্লেশকর্ম্ম-নিবৃত্তিঃ ॥৩০॥

ततः क्लेशकर्म्म-निवृत्तिः ॥३०॥

तत्फलमाह तत इति। ततस्तस्माद्धर्म्ममेघसमाधितः क्लेशकर्म्म निवृत्तिः—क्लेशा अविद्यादयः. कर्म्मशब्दः पारिशेष्यादशुक्लाकृष्णवचन स्तेषां निवृत्तिः सम्यग् विलय इति ॥ ३० ॥

এইসূত্রে ধর্ম্মমেঘ সমাধির ফল বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহাহইতে (ধর্ম্মমেঘ সমাধি হইতে) ক্লেশকর্ম্ম নিবৃত্তি হয়। ক্লেশ অবিদ্যাদি পঞ্চ, কর্ম্ম শব্দটী এস্থলে অবশিষ্ট অশুক্লাকৃষ্ণ কর্ম্মমাত্রের বোধক ; যেহেতু, যোগীদিগের সম্বন্ধে অপর ত্রিবিধ কর্ম্মের কথাই থাকিতে পারে না। যতদিন সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইতে হয়, ততদিন

বুত্থান কালে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অশুক্লাকৃষ্ণই। ধর্ম্মমেঘ সমাধি ব্যুত্থান রহিত, সুতরাং তাহাতে সেরূপ কর্ম্মও থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—অবিদ্যা বিনষ্ট হইলেও তৎকার্য্য কিছুকাল বিদ্যমান থাকে; প্রারব্ধ সংস্কার ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্তই ঐ বিনষ্ট অবিদ্যার কার্য্য প্রকাশ পায়। ক্রমে যখন কৈবল্য অতি সন্নিহিত হয়, তখনই ধর্ম্মমেঘ সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং এখানে আসিয়া যোগীবর অবিদ্যাদি ক্লেশ এবং তৎকার্য্যরূপ অশুক্লাকৃষ্ণ কর্ম্ম, উভয়েরই চিরনিবৃত্তি দেখিয়া সম্যক্ কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।

तदा सर्व्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्यात् ज्ञेयमल्पम् ॥३१॥

क्लेशकर्म्मनिवृत्ति गुणपरिणाम-निवृत्तिमपेक्षते तन्मूलत्वात्तस्येति तदपि निरूपयति द्वाभ्याम्। तत्रादौ परमविशुद्धितां सत्त्वस्य दर्शयति कैवल्योपयोगित्वात्तदेति। तदा धर्म्ममेघसमाधौ, तत्रापि सूक्ष्मतम कालिकधारायां विद्यमानत्वात् कालवाचकोऽयं प्रयोगः। सर्व्वावरण-मलापेतस्य सर्व्वरूपं यदावरणं मलञ्च रजस्तमोव्यापाररूपं, तदपेतस्य तद्रहितस्य ज्ञानस्य विशुद्धसत्त्वस्येतिभावः, आनन्त्यान्निरवच्छिन्नात्म-सत्तानुभवरूपात्, ईयं सर्व्वं, अल्पमकिञ्चित्करमतिमयप्रायं भवतीतिशेषः। नहि समुपजायते पूर्णस्य सिन्धोर्विन्दुभावेच्छा कदापि अतएव क्लेशकर्म्मनिवृत्तिरिति ॥ ३१ ॥

ক্লেশকর্ম্মের মূল গুণপরিণাম; সুতরাং ক্লেশকর্ম্ম-নিবৃত্তি গুণপরিণাম নিবৃত্তিকে অপেক্ষা করে। এক্ষণে দুইটী সূত্রে সেই গুণপরিণাম-নিবৃত্তি নিরূপিত হইবে। তন্মধ্যে এই সূত্রে সত্ত্বগুণের পরম

বিশুদ্ধতা প্রকাশিত হইতেছে। কৈবল্যের পক্ষে উহাই একান্ত উপযোগী। ঋষি বলিলেন—তখন সর্ব্বাবরণ মলের অপগম হওয়াতে জ্ঞানের আনন্ত্য হয়, সুতরাং জ্ঞেয় অল্প হইয়া পড়ে। বেশ ধীরভাবে ঋষির অভিপ্রায় অবধারণ করিতে চেষ্টা করা যাউক। তিনি প্রথমেই "তদা" এই কালবাচক পদের প্রয়োগ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, ধর্ম্মমেঘ সমাধিতেও কালিক ধারা বিদ্যমান থাকে। "বিশুদ্ধ-বোধমাত্র-স্বরূপ পুরুষ আছেন" এইরূপ অস্তিত্ববিষয়ক প্রতীতির ধারাই সমাধি: সাধারণ সমাধিতে এইরূপ ধারার অন্তরালে অন্য প্রত্যয় উদিত হয়; কিন্তু ধর্ম্মমেঘ সমাধিতে ঐরূপ সত্তাবিষয়ক প্রত্যয়ধারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই চলিতে থাকে। ঐ ধারা সূক্ষ্মতম ব্যাপার বিশেষ। যদিও উহাকে ধারারূপে—ব্যাপাররূপে পরিগ্রহ করা সহজ নহে, তথাপি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সত্তানুভব করাও যে ধারামাত্রই—জ্ঞানক্রিয়ামাত্রই তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। যাহা ক্রিয়াস্বরূপ, তাহা কালাবচ্ছিন্ন বা কালস্বরূপ পদার্থ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অতএব মনে রাখিও সাধক। ধর্ম্মমেঘ-সমাধিতেও কালপ্রতীতি বিদ্যমান থাকে। দেশপ্রতীতি বিলয় সাধারণ সমাধিতেই হয়, ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

এইবার সর্ব্বাবরণ-মলাপেত জ্ঞান কি, তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। সর্ব্বরূপ আবরণ এবং মল যখন অপেত হয়—তিরোহিত হয়, তখনই জ্ঞান অনন্ত হয়। জ্ঞান শব্দের অর্থ বুদ্ধিসত্ত্ব বা সত্ত্বগুণ। জ্ঞমাত্র-স্বরূপ পুরুষ কখনও সমাধি অথবা বিক্ষেপের বিষয়ীভূত বস্তু নহেন! জ্ঞান যখন জ্ঞএর—অস্তিত্বমাত্রের অনুভব করিতে সমর্থ হয়, তখন সেই অবস্থার নাম হয় সমাধি। ঐরূপ অস্তিত্বের অনুভব করিতে করিতে যখন জ্ঞ অংশ অর্থাৎ চিদংশও অনুভবের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন আর জ্ঞান বলিতে কিছু থাকে না; স্বয়ং জ্ঞ-স্বরূপ পুরুষই প্রকাশ পাইতে থাকেন। এই অবস্থার নাম যোগ বা দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান। সমাধি হইতে যোগের এই

বিজ্ঞানভিক্ষু পূর্ব্বেও বহুস্থলে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যোগ ও সমাধি যে অভিন্ন নহে, তাহা এই সকল সূত্র হইতেও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। সে যাহা হউক, আমরা বুঝিতেছিলাম—জ্ঞানের আনন্ত্য। সত্ত্বগুণ যখন সর্ব্বথা শুদ্ধ হয়—সর্ব্বরূপ আবরণ ও মলশূন্য হয়, অর্থাৎ রজোস্তমোগুণের অভিভব করা রূপ ব্যাপার যখন তিরোহিত হইয়া যায়, তখন উহা অনন্ত হইয়া পড়ে। নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্ম-সত্তার অনুভব করাই জ্ঞানের অনন্তত্ব। যে স্থলে দ্বৈত-প্রতীতি হয়—কোনরূপ অবচ্ছিন্ন বস্তুর প্রতীতি হইতে থাকে, সেই স্থলে জ্ঞান সান্ত বা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। যে স্থলে সেরূপ কিছু থাকে না, কেবল নিরবচ্ছিন্ন আত্মসত্তামাত্রেরই অনুভব হইতে থাকে, সে স্থলে জ্ঞান সুতরাং অনন্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে জ্ঞানের অর্থাৎ সত্ত্বগুণের অনন্তত্ব হইলে জ্ঞেয় অল্প হইয়া যায়। জ্ঞেয়—সর্ব্ব, অর্থাৎ রজোস্তমোগুণের ব্যাপার। সত্ত্বগুণের প্রকাশশীলতা পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাইলেই অপরগুণদ্বয় অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়ে। একেবারে বিলুপ্ত হয় না; কারণ, উহাদের সহকারিতা না থাকিলে সত্ত্বগুণেরও বিদ্যমানতা থাকে না। মাত্র যতটুকু সহায়তার দ্বারা সত্ত্বগুণ স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে; ততটুকু মাত্রই রজস্তমোগুণের বিদ্যমানতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ইহারই নাম জ্ঞেয় অল্প হওয়া। ধর্ম্মমেঘ সমাধিতে অপর কোনও জ্ঞেয়বস্তুর স্মৃতিপর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং এরূপ স্থলে রূপরসাদি জ্ঞেয়বস্তুর অল্পত্ব বর্ণনা করা ঋষির অভিপ্রায় নহে। সত্ত্বগুণের পূর্ণবিকাশ হওয়াই জ্ঞানের আনন্ত্য এবং রজোস্তমোগুণের অতিশয় ক্ষীণতাই জ্ঞেয়ের অল্পতা।

বিভূতিপাদের শেষ সূত্রে উক্ত হইয়াছে—সত্ত্ব এবং পুরুষের শুদ্ধি সাম্য হইলে কৈবল্য হয়। পুরুষের সর্ব্বথা বিশুদ্ধিতা নিত্য সিদ্ধই। এই সূত্রে সত্ত্বের সম্যক্ বিশুদ্ধিতা প্রদর্শিত হইল। সত্ত্বগুণ কিরূপ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইলে পুরুষের সমান হইতে পারে, তাহাই সর্ব্বাবরণ-মলাপেত এবং অনন্ত এই দুইটী পদের দ্বারা

ঋষি বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। পুরুষ সর্ব্বাবরণশূন্য নির্ম্মল অনন্ত, সত্বও যখন ঠিক সেইরূপ হয়, তখনই উভয়ের বিশুদ্ধিতা তুল্য হইয়া থাকে এবং তখনই যোগী কৈবল্যপদে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। আপত্তি হইতে পারে—পুরুষ কালাতীত অনন্ত, আর সত্ব কালিকধারাবচ্ছিন্ন অনন্ত, সুতরাং সর্ব্বথা উভয়ের তুল্যতা হয় না। হাঁ। সত্যই, সর্ব্বাংশে তুল্য হইতেই পারে না। সর্ব্বাংশে তুল্যবস্তু কখনও দুইটা থাকিতে পারে না, উহাদের একত্ব হইয়া যায়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—সত্ব এবং পুরুষের অন্যতা খ্যাতির নামই বিবেক। পুরুষ হইতে সত্ব সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিয়া যতদূর পুরুষের সাম্য লাভ করিতে পারে, ততদূর সাম্য হইলেই কৈবল্য হয়। সত্বগুণের চরম বিশুদ্ধিতাই সেই সাম্য। এই সর্ব্বাবরণমলশূন্য হইয়া অনন্ত হওয়াই সেই বিশুদ্ধিতা।

শুন—প্রখ্যা বা সত্বগুণের চরম পরিণাম এই নিরবচ্ছিন্ন আত্মসত্তানুভূতি, জ্ঞানের অর্থাৎ প্রকাশশক্তির ইহাই পরম উৎকর্ষতা। তারপর প্রবৃত্তি বা রজোগুণের চরম পরিণতি—অহঙ্কারপর্য্যন্ত পরিত্যাগ পরবৈরাগ্য। বিক্ষেপশক্তির ইহাই পরম উৎকর্ষতা। আর স্থিতি বা তমোগুণের চরম পরিণাম নিরোধ অর্থাৎ দ্বৈতপ্রতীতিকে নিরুদ্ধ রাখা। স্থিতিশক্তির ইহাই পরম উৎকর্ষতা। এই তিনের সম্মিলনই ধর্ম্মমেঘ-সমাধি। মুমুক্ষু হইলেই গুণত্রয়ের ভোগাভিমুখী অনুলোম-পরিণাম পরিবর্ত্তিত হইয়া অপবর্গমুখী পরিণাম আরম্ভ হয়। তাহারও পরিসমাপ্তি হয় এইখানে—এই ধর্ম্মমেঘসমাধিতে। ইহা আসন্নতম কৈবল্যের অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থা। গুণত্রয়ের এইরূপ ত্রিবিধ চরম পরিণাম সংঘটিত হইলেই উহাদের পরিসমাপ্তি হইয়া যায়। পরসূত্রে তাহাই বর্ণিত হইবে।

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্ ॥৩২॥

অথ প্রাপ্তাবসরাং গুণপরিণামনিবৃত্তিং নিরূপয়তি তত ইতি। তত স্তস্মাৎ জ্ঞানস্যানন্ত্যাৎ কৃতার্থানাং কৃতৌ নিষ্পাদিতৌঽর্থৌ ভোগাপবর্গলক্ষণৌ যৈ স্তথোক্তানাং গুণানাং সত্ত্বাদীনাং পরিণামক্রম-সমাপ্তিঃ পরিণামস্তু ভোগ আনুলোম্যেনাপবর্গঃ প্রাতিলোম্যেন, তস্য যঃ ক্রমো বক্ষ্যমাণরূপ স্তস্য পরিসমাপ্তি র্ন পুনরুদ্ভব ইতি ভাবঃ। ব্যাপারমাত্ররূপত্বাৎ পরমার্থসত্তাহীনতয়া ন পুনর্গুণক্ষোভশঙ্কা কার্য্যা। স্থির এব নাস্তি কৃতো ব্যথা শীর্ষস্যেতি ॥ ৩২ ॥

এই সূত্রে পূর্ব্বপ্রস্তাবিত গুণপরিণাম-নিবৃত্তি নিরূপিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—তাহা হইতে—জ্ঞানের অনন্তত্বহইতে কৃতার্থ গুণত্রয়ের পরিণামক্রম পরিসমাপ্ত হইয়া যায়। ধর্ম্মমেঘ সমাধিতে জ্ঞান অর্থাৎ সত্ত্বগুণ অনন্ত হইয়া পড়ে। সত্ত্বগুণের এই অনন্তত্ব হইলেই গুণত্রয় কৃতার্থ হয়। যে উদ্দেশ্যে—যে প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য গুণত্রয় পরিকল্পিত, তাহা সিদ্ধ হইলেই গুণত্রয়ের কৃতার্থতা উপস্থিত হয়। একদিকে ভোগ অন্যদিকে অপবর্গ, এই উভয় প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই উহারা কল্পিত হয়। অনন্তত্ব অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্মসত্তানুভবই গুণত্রয়ের কৃতার্থতা সূচনা করে। যত দিন উহারা এইরূপ কৃতার্থ না হয়, ততদিন উহাদের ভোগাভিমুখী প্রতিলোম পরিণাম এবং অপবর্গাভিমুখী অনুলোম পরিণাম চলিতে থাকে। এই উভয়তোমুখী ক্রিয়াশীলতা অর্থাৎ পরিণামক্রম ততদিনই চলিতে থাকে, যতদিন উহারা কৃতার্থ না হয়। রজস্তমোগুণের চরম পরিণামও এই সত্ত্বগুণের আনন্ত্যরূপ অন্তিম পরিণামের অপেক্ষা করিতে

থাকে। যখন প্রখ্যা অনন্ত হয়, তখন প্রবৃত্তি এবং স্থিতিও পরবৈরাগ্য এবং নিরোধরূপ চরম পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এই তিনটাই গুণত্রয়ের পূর্ণ কৃতার্থতা। এইরূপ কৃতার্থ গুণত্রয়ের যে পরিণামক্রম, তাহা সুতরাং পরিসমাপ্ত হইয়া যায়। ক্রম কি, তাহা পরসূত্রে বর্ণিত হইবে।

মহর্ষি এ স্থলে সমাপ্তি পদটীর প্রয়োগ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন—প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিশীলগুণত্রয় ব্যাপারমাত্রই; উহাদের কোনরূপ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যতক্ষণ ব্যাপার চলিতে থাকে, ততক্ষণই উহাদের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয় মাত্র। যে উদ্দেশ্যে ঐরূপ ব্যাপারের প্রবর্ত্তন, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই উক্ত ব্যাপারের সর্ব্বথা পরিসমাপ্তি হইয়া যায়। মনে কর—কোনও ব্যক্তি মাহেশ্বতী নগরী হইতে উজ্জয়িনী নগরে উপস্থিত হইবার জন্য গমন অর্থাৎ পাদ-বিহরণরূপ একটা ব্যাপার স্বীকার করিল। যতক্ষণ সে ব্যক্তি অভীষ্টদেশে উপনীত হইতে না পারে, ততক্ষণই ঐ গমনরূপ ব্যাপার চলিতে থাকে এবং উক্ত ব্যাপারের একটা অস্তিত্বও প্রতীতি গোচর হইতে থাকে; কিন্তু অভীষ্টস্থানে উপনীত হইলেই উক্ত গমন ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হইয়া যায়। ঠিক সেইরূপই পুরুষের ভোগাপবর্গরূপ কল্পিত প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য গুণত্রয়রূপ ব্যাপার স্বীকৃত হয়। যখন সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া যায়, তখন ব্যাপারেরও সুতরাং পরিসমাপ্তি ঘটে। এই যে পরিসমাপ্তি, ইহা চিরতরেই পরিসমাপ্তি, পুনরায় আর উক্তরূপ ব্যাপার অর্থাৎ গুণক্ষোভ সংঘটিত হইবার কোন আশঙ্কাই থাকে না। মস্তকবিহীনের শিরঃপীড়ার আশঙ্কা নাই।

যদি উহাদের স্বতন্ত্র সত্তা থাকিত, তবেই ঐরূপ আশঙ্কার অবসর ছিল। অবিদ্যা প্রভাবেই ঐরূপ একটী ব্যাপার কল্পিত হয় মাত্র। যখন বিদ্যালাভ হয়—জ্ঞানের উদয় হয়, তখন অজ্ঞান এবং অজ্ঞান কল্পিত গুণত্রয় চিরতরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। ধর্ম্মমেঘ-সমাধি ও জ্ঞানের উদয় হওয়া, একই কথা। সত্তামাত্রস্বরূপ বস্তুর প্রত্যয় যদি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে উদিত হইতে থাকে, তবে তদতিরিক্ত কোন কল্পিত

গুণের সত্তা-স্মৃতি পর্য্যন্ত থাকে না; সুতরাং কৈবল্যপ্রাপ্ত যোগীর পুনরুদ্ভব একেবারেই অসম্ভব্। এইরূপে গুণত্রয়ের চির পরিসমাপ্তি হয় বলিয়াই ক্লেশকর্ম্মের নিবৃত্তিও চিরন্তরেই হইয়া থাকে। যদি কোনওরূপে গুণের পারমার্থিক সত্তা থাকিত, তবে ক্লেশকর্ম্মের নিবৃত্তি বা মুক্তি কেবল বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত হইত; কিন্তু ঋষি জীবের সে আশঙ্কা সম্যক্ বিদূরিত করিবার জন্য বলিলেন—গুণানাং পরিণাম-ক্রম-সমাপ্তিঃ। সমাপ্তি—চির অবসান॥

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্ত-নির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ॥ ৩৩॥

ক্রমং পরিচায়য়তি ক্ষণেতি। ক্ষণপ্রতিযোগী ক্ষণৌ প্রতিযোগিনৌ নিরূপকৌ যস্য স ইতি স্বরূপনির্দ্দেশঃ। ক্রমঃ ক্ষণয়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যম্। অত্র হেতুগর্ভমাহ বিশেষণং—পরিণামান্তর-নির্গ্রাহ্য ইতি। পরিণামস্য অপরান্তেন অবসানেন নিঃসংশয়িতং গৃহ্যতে ইতি ভাবঃ।

ইদমবধেয়ম্—যথা সমাধিচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি, তথা ধর্ম্মমেঘ-সমাধিচ্ছিদ্রেষু পরিণামাবসানানি দৃশ্যন্তে, স্বপ্রকাশস্বরূপোদয়াত্। তথাহি কিয়ত্কালং সত্তানুভবো জাতস্ততো নির্ব্বিশেষস্বরূপোদয়ঃ পুনঃ পুনরেবং ভবতীত্যনেনৈব ক্ষণপ্রতিযোগী ক্রমোঽস্তীতি নিঃসংশয়িতং সূচ্যতে। এবঞ্চ তদা জ্ঞানস্যা-ন্তত্বেঽপি কালাবচ্ছিন্নত্বং সর্ব্বথা পরিণামাপরান্তেন তু কালবিলয় ইতি। অতএবোক্তং কালজয়ী ভবতি যোগী॥ ৩৪॥

এই সূত্রে ক্রমের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—ক্ষণপ্রতিযোগী ক্রম, পরিণামের অপরান্তদ্বারাই নিঃসংশয়রূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে বিবেকজজ্ঞানের স্বরূপ

ব্যাখ্যানাবসরে ক্রমের পরিচয় বিশেষভাবেই দেওয়া হইয়াছে। তাহা সাধারণ সমাধি সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে ধর্ম্মমেঘ সমাধি সম্বন্ধেও ক্রমের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। ক্রম কি—ক্ষণ-প্রতিযোগী। ক্ষণদ্বয়ই যাহার প্রতিযোগী অর্থাৎ নিরূপক। দুইটী ক্ষণের যে পৌর্ব্বাপর্য্য, তাহারই নাম ক্রম। এই একটী ক্ষণ, এই আর একটী ক্ষণ, এইরূপ ক্ষণের ধারাকেই যোগশাস্ত্রে ক্রম কহে। এই ক্ষণপ্রতিযোগী শব্দটী দ্বারা ক্রমের স্বরূপ বর্ণিত হইল। তারপর ঋষি একটী হেতুগর্ভ বিশেষণ পদের প্রয়োগদ্বারা ক্রমের বিদ্যমানতা বিষয়ে সংশয় দূর করিয়া দিলেন। "পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ"। পরিণামের যে অপরান্ত অর্থাৎ অবসান, তাহাদ্বারাই ক্রম নির্গ্রাহ্য হয়, নিঃসংশয়রূপে পরিগৃহীত হয়। কথাটা একটু পরিষ্কার ভাবে বুঝা আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—সমাধির অন্তরালে প্রত্যয়ান্তর অর্থাৎ অনাত্মপ্রত্যয় উৎপন্ন হয়; সুতরাং সমাধির যে একটা অন্তরাল আছে—মধ্যে মধ্যে ছিদ্র অর্থাৎ ফাঁক আছে, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। সাধারণ সমাধিতেই এইরূপ হয়। ধর্ম্মমেঘ-সমাধিতেও ঐরূপ অন্তরাল বিদ্যমান আছে; তবে বিশেষত্ব এই যে—এই সমাধির ছিদ্রপথে প্রত্যয়ান্তরের উদ্ভব না হইয়া পরিণামাপরান্ত হয়—পরিণামের অবসান হয়, অর্থাৎ পরিণাম মধ্যে মধ্যে অবসান প্রাপ্ত হয়। স্বপ্রকাশ স্বরূপের উদয় হওয়াতেই ঐরূপ অবসান হইয়া থাকে। আত্মসত্তাবিষয়ক নিরবচ্ছিন্ন প্রত্যয়ধারার মধ্যে মধ্যে সেই ধারা একেবারেই নিরুদ্ধ হইয়া যায় এবং পরমাত্মসত্তার প্রকাশ হয়। এই যে মধ্যে মধ্যে পরিণামের অবসান, ইহা দ্বারাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়—ধর্ম্মমেঘ সমাধিতেও ক্ষণপ্রতিযোগী ক্রম বিদ্যমান থাকে। অতএব ধর্ম্মমেঘ সমাধিতে জ্ঞানের অনন্তত্ব হইলেও উহা ক্ষণাবলম্বী অর্থাৎ কালাবচ্ছিন্ন। ঐ অনন্তজ্ঞানও কালাতীত জ্ঞস্বরূপ বস্তু নহে। মধ্যে মধ্যে প্রত্যয়ধারার অর্থাৎ পরিণামের যে অবসান ঘটে, তাহাদ্বারাই ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং ধর্ম্মমেঘসমাধিতেও ক্ষণদ্বয়ের অন্তরালরূপ

পরিণামক্রম বিদ্যমান থাকে। যখন ঐরূপ পরিণামেরও সর্ব্বথা অবসান হইয়া যায়, তখনই যোগী বিদেহকৈবল্য লাভ করে—কালজয়ী হইয়া চিরতরে কালাতীত ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। শাস্ত্রে যে পরান্ত অপরান্ত প্রলয় ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা এই পরিণামক্রমের সমাপ্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

মনে রাখিও সাধক, যতক্ষণ সমাধি আছে, সাধারণ সমাধিই হউক, অথবা ধর্ম্মমেঘ সমাধিই হউক, যতক্ষণ সমাধি আছে, ততক্ষণ যোগীকে কালের মধ্যেই অবস্থান করিতে হয়। যিনি বিক্ষেপ এবং সমাধি উভয়েরই অতীত, তিনি—সেই স্বপ্রকাশ আত্মা প্রকাশিত হইলেই কালাতীত ক্ষেত্র লাভ হয়। সমাধিকে অবলম্বন করিয়াই এই সমাধির অতীত কালের অতীত ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হয়। অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বা আত্মস্বরূপে স্থিতি একবার মাত্র লাভ হইলেই যোগী এই কালাতীত ক্ষেত্রের সন্ধান পায় এবং কালজয়ী হয়। তারপর ব্যুত্থানাবস্থায় কালের মধ্যে অবস্থান করিলেও যোগী আর কালের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করিতে পারে না। ইহাই জীবন্মুক্তের কালজয়। তারপর যখন সৌভাগ্যবশে প্রারব্ধক্ষয়ে গুরুকৃপায় ধর্ম্মমেঘ সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আর সাধারণ কালজ্ঞান থাকে না। অতিসূক্ষ্ম ক্ষণিকধারারূপ পরিণাম-ক্রমমাত্র বিদ্যমান থাকে। ঐরূপ সূক্ষ্মকালও ধর্ম্মমেঘ সমাধির অন্তরালে মধ্যে মধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। কয়েকদিন মাত্র এই অবস্থায় অবস্থান করিলেই চিরতরে কালবিলয় হইয়া যায়, পরিণামক্রমের সর্ব্বথা অবসান হইয়া যায়, ক্লেশকর্ম্মের নিবৃত্তিও চিরতরেই হইয়া যায়। অহো! সেই যে আমার বিদেহ কৈবল্য! কবে, কবে, কতদিনে, গুরো! মা! আত্মা! কতদিনে সে দিন আসিবে?

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप-प्रतिष्ठा चितिशक्तिरिति ॥ ३४ ॥

इति पातञ्जल-योगसूत्रे कैवल्यपादश्चतुर्थः ॥

—०—

अथोपसंहरति शास्त्रं योगानुशासनं कैवल्यस्वरूपवर्णनेन पुरुषार्थेति । पुरुषार्थशून्यानां निष्प्रयोजनभोगापवर्गसाधनानां, गुणानां परिकल्पितानामेव प्रख्यादिव्यापारमात्ररूपाणां, प्रतिप्रसवः—यत एषां प्रसवस्तत्रैव पुनर्विलयः, पारमार्थिकसत्तायां सत्ताभासस्य सम्यङ्मिलनमिति भावः । एवञ्च द्रष्टुर्वृत्तिसारूप्यनिवृत्तिः । अतएव कैवल्यं पुनरुत्थानरहितं विदेहकैवल्यमित्यर्थः । तदा स्वरूपस्थिति स्थिराय । स्वरूपमवाङ्मनोगम्यमपि समुपदिशति—चितिशक्तिरसंहता न तु संहतेव पुनः पुनः कार्य्यजननीति भावः । अतएवापरिणामिन्य-प्रतिसंक्रमा केवलाऽद्वितीया सा मात्रसन्ततिभेदविरहिता । नासी-दस्याः कदापि बन्धो नवेदानीं मोक्षाभिभवः । इति ग्रन्थः परिसमाप्ति-सूचकः सुतरामपुनरावृत्तिरपुनरावृत्तिरिति सत्यम् ॥ ३४ ॥

इति योगरहस्ये कैवल्यपादोनाम चतुर्थोऽध्यायः ॥

এই সূত্রে কৈবল্যস্বরূপ বর্ণন পূর্ব্বক যোগশাস্ত্রের উপসংহার করা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—পুরুষার্থশূন্য গুণসমূহের প্রতিপ্রসব হয়, তখন স্বরূপস্থিতরূপ কৈবল্য হয়, চিতিশক্তিই স্বরূপ ; ইতি।

পুরুষের ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজন না থাকায় গুণত্রয় পুরুষার্থশূন্য হইয়া পড়ে। পূর্ব্বোক্তরূপ ধর্ম্মমেঘসমাধিতে অবস্থানের প্রভাবে পরিণামক্রম সমাপ্ত হইলে উহারা পুরুষার্থ শূন্য হইয়া পড়ে। যোগবাশিষ্ঠে জ্ঞানের যে ৭ষ্ঠভূমিকার উল্লেখ আছে। সেই পদার্থা

ভাবিনী নাম্নী ষষ্ঠভূমিকা যখন পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন তুর্য্যগা নাম্নী সপ্তম ভূমিকা আসিয়া উপস্থিত হয়। যোগশাস্ত্রবর্ণিত কৈবল্য এবং যোগবাশিষ্ঠপ্রোক্ত তুর্য্যগা অভিন্ন। জ্ঞান অর্থাৎ সত্ত্বগুণ যখন অনন্ত হইয়া পড়ে, নিরবচ্ছিন্নভাবে কেবল আত্মসত্তারই অনুভব হইতে থাকে, তখন অন্য পদার্থের ভান না হওয়ায় উহা পদার্থাভাবিনী নামে অভিহিত হয়। কিছুদিন এরূপ অবস্থায় অবস্থান করিলেই এই সত্ত্বগুণের যে আত্মসত্তানুভবরূপ সূক্ষ্ম ক্রিয়াশীলতা, তাহাও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তখন পুরুষের ভোগাপবর্গ সাধনের জন্য পরিকল্পিত গুণত্রয়ের আর কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকে না। যেহেতু, এই অবস্থায় স্বপ্রকাশ পুরুষ প্রকাশিত হইয়া পড়েন। যাহার প্রকাশের জন্য গুণত্রয়ের অনাদি ক্রিয়াশীলতা, এখানে আসিয়া দেখিতে পাওয়া যায়—সে নিত্যই প্রকাশিত, তাহার প্রকাশের জন্য অপর কোন প্রকাশকের অপেক্ষা নাই; কাজেই গুণত্রয় নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তখন উহাদের প্রতিপ্রসব হয়। যাহাহইতে উহাদের প্রসব—আবির্ভাব, পুনরায় তাহাতে মিলাইয়া যাওয়াই প্রতিপ্রসব। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—গুণত্রয় প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিরূপ ব্যাপার ব্যতীত অন্য কিছু নয়। এই সংহত ব্যাপার যাঁহা হইতে প্রসূত হয়, যাঁহার আশ্রয়ে সত্তাবানের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, এখানে আসিয়া আবার তাহাতেই সম্যক্ মিলাইয়া যায়। পুরুষার্থশূন্য গুণত্রয়ের প্রতিপ্রসব কথাটার ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য। ব্যাপারের যিনি আশ্রয় তিনি পারমার্থিক সত্তাস্বরূপ বস্তু, আর ব্যাপার একটী কল্পিত সত্তাভাসের আশ্রয়। ব্যাপারের অবসান হইলে সুতরাং ঐ কল্পিত সত্তাভাস পরমার্থ সত্তায় মিলাইয়া যায়। যেমন অতিশয় অল্প আলোক অর্থাৎ অন্ধকার সমুজ্জ্বল আলোকে মিলাইয়া যায়, ঠিক তেমনি গুণত্রয়রূপ সত্তাভাস পরমার্থসত্তাস্বরূপ বস্তুতে—পুরুষে চিরতরে মিলাইয়া যায়। ইহারই যোগশাস্ত্র প্রসিদ্ধ নাম দ্রষ্টার বৃত্তি সারূপ্যানিবৃত্তি বা কৈবল্য।

এস্থলে কৈবল্য শব্দে পুনরুত্থান-রহিত অর্থাৎ বিদেহ-কৈবল্যই বুঝিতে হইবে। জীবন্মুক্তিরূপ কৈবল্যের বিষয় ইতিপূর্ব্বে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। কৈবল্য কি—চিরতরে স্বরূপস্থিতি, দ্রষ্টার স্বরূপে চিরতরে অবস্থান, ইহারই নাম অসম্প্রজ্ঞাত যোগ। দ্রষ্টার স্বরূপ বাক্যমনের অতীত হইলেও ঋষি আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য বলিলেন—চিতিশক্তি। চিতিশক্তি অসংহতা। সংহতা শক্তি যেরূপ পুনঃ পুনঃ কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে, এই চৈতন্যমাত্র স্বরূপিণী অসংহতা শক্তিহইতে সেইরূপ কার্য্য কখনও উৎপন্ন হয় না, হইতে পারে না। চিতিশক্তি অসংহতা বলিয়াই অপ্রতিসংক্রমা এবং অপরিণামিনী। ইনি কেবলা—অদ্বিতীয়া। এখানে কার্য্যকারণরূপ ভেদ নাই। এখানে মাতাপুত্ররূপ কোনও ভেদ নাই। ইহাঁর কোনকালেও বদ্ধভাব ছিল না, অথবা সমাধির সাহায্যে ইহার মোক্ষও কোনকালে আবির্ভূত হয় না। ইনি বন্ধন বা মুক্তি, এ- উভয়েরই অতীত। সূত্রের শেষভাগে ঋষি একটী "ইতি" শব্দের প্রয়োগ করিয়া পরিসমাপ্তির সূচনা করিলেন। যোগশাস্ত্রের পরিসমাপ্তি ত বটেই, তদ্ভিন্ন—এইরূপ কৈবল্যপদ লাভ হইলে এই ভুবনের সংসারাবর্ত্তনেরও পরিসমাপ্তি হইয়া যায়। পুনরায় আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। পুনরায় আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। ইহা সত্য।

এস যোগী, এস প্রিয়তম সাধক, এস মাতৃহারা সন্তান, এস—এই চিতিশক্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কেবল মা মা বলিয়া ডাক। মায়ের কোলে উঠিবার জন্য আকুল আগ্রহে মা মা বলিয়া দিনের পর দিন অগ্রসর হইতে থাক। জ্ঞানে অজ্ঞানে যোগে বিয়োগে সুখে দুঃখে ঐ উনিই—ঐ চিতিশক্তিরূপিণী জননীই যে আমাদের একান্ত আশ্রয়, ইহা বুঝিয়া উহারই চরণে আত্মসমর্পণ কর। সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বহুত্বদৃষ্টি অপসারিত করিয়া একের শরণাগত হও—একত্বদর্শনের চেষ্টা কর। সজাতীয় বিজাতীয় ভেদদৃষ্টি হইতে দূরে সরিয়া যাও,

স্বগত-ভেদমাত্র দেখিতে অভ্যাস কর, ইহারই নাম দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্য দর্শন। উপনিষদের ভাষায় উহাকে সত্যপ্রতিষ্ঠা বা প্রাণপ্রতিষ্ঠা বলে। নাম যাহাই হউক, ক্ষতি নাই; একত্বকে আশ্রয় করিতেই হইবে—একেরই শরণাগত হইতে হইবে। ঐ যে ঋষি বলিলেন—চিতিশক্তি, উনিই সেই এক বস্তু। উঁহার শরণাগত হইলে—সর্ব্বভাব যে উঁহাতেই অবস্থিত, ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে, দেখিতে পাইবে—কি অজ্ঞাত কি অভূতপূর্ব্ব উপায়ে তোমার মধ্য দিয়া যম নিয়মাদি অষ্টবিধ যোগাঙ্গ স্বতঃই প্রকাশ পাইবে। ক্রমে চরম যোগাঙ্গ সমাধিতে উপনীত হইয়া চিতিশক্তির আভাস গ্রহণ করিতে থাকিবে। তার পর তাঁহারই কৃপায় ঐ সমাধিই ধর্ম্মমেঘ সমাধিতে পরিণত হইবে—তোমার জ্ঞান অনন্ত এবং জ্ঞেয় অল্প হইয়া পড়িবে। তার পর ব্যুত্থানরহিত কৈবল্যপদে আরোহণ করিয়া বন্ধনমুক্তির পরপারে চিরতরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। আর তোমাকে এ জন্মমৃত্যু-পূর্ণ সংসারে প্রত্যাগমন করিতে হইবে না। আর তোমাকে সংসারে প্রত্যাগমন করিতে হইবে না।

এইবার আমরা যোগশাস্ত্র ব্যাখ্যাতা প্রাচীন আচার্য্যগণকে প্রণাম করিয়া সূত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি দেবের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করি। তাঁহারা সকলেই আমাদের পরমারাধ্য গুরুরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। যাঁহার অহৈতুক কৃপায় এই অপূর্ব্ব যোগরহস্য আমাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া উঠিতেছে, তাঁহার শ্রীচরণে সম্যক্ প্রণত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য, এস—সকলে মিলিয়া কায়মনোবাক্যে প্রণাম করি :—

সর্ব্বশ্রুতিশিরোরত্ন বিরাজিত পদাম্বুজম্।
বেদান্তাম্বুজ-সূর্য্যায় তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

ইতি যোগরহস্য ব্যাখ্যায় চতুর্থ-অধ্যায় সমাপ্ত॥

সাধন-সমর আশ্রম হইতে প্রকাশিত
পুস্তকাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১। সাধন সমর বা শ্রীশ্রীচণ্ডীর অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা
প্রথম খণ্ড—ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ, দ্বিতীয় খণ্ড—বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ,
তৃতীয় খণ্ড—রুদ্রগ্রন্থি ভেদ। মূল্য প্রতি খণ্ড দুই টাকা

২। সত্যপ্রতিষ্ঠা। সাধনার ভিত্তি। মূল্য আট আনা।
ঐ হিন্দী ও ইংরেজী অনুবাদ। মূল্য চারি আনা।

৩। প্রাণপ্রতিষ্ঠা। সাধনার আলম্বন। মূল্য আট আনা।

৪। সত্যালোকম্। সাধনার সংক্ষিপ্ত সার। মূল্য চারি আনা।

৫। শোক-শান্তি। শোকার্ত্ত-ব্যক্তির অপূর্ব্ব সান্ত্বনা। হিন্দী অনুবাদ।
মূল্য চারি আনা।

৬। পূজাতত্ত্ব। পূজা ও মূর্ত্তিরহস্য উদ্‌ঘাটিত। মূল্য এক টাকা।

৭। সত্যকথা। মনুষ্যত্ব লাভের প্রধান উপায়। মূল্য এক পয়সা।

৮। উপাসনা। বিশেষ প্রয়োজনীয় স্তোত্রমন্ত্রাদি সংগ্রহ ও তাহার অনুবাদ। মূল্য ছয় আনা। ঐ হিন্দী সংস্করণ। মূল্য আট আনা।

৯। অমর-প্রয়াণ। যুবক সাধকের সংক্ষিপ্ত জীবনী। মূল্য দুই আনা।

১০। আদর্শ বা দেব ব্রাহ্মণ। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণকে বিনা মূল্যে বিতরিত।

১১। দেশাত্মবোধ ও শ্রীশ্রীদেশ মাতৃকা পূজা। মূল্য চারিআনা।
ঐ হিন্দী অনুবাদ। মূল্য চারি আনা।

শ্রীযুত বিশ্বরঞ্জন ব্রহ্মচারি কর্ত্তৃক লিখিত :

১২। জীবন লক্ষ্য। মানুষের লক্ষ্য স্থির। মূল্য এক টাকা।

১৩। দৈববাণী। সার উপদেশ সংগ্রহ। মূল্য দশ আনা।

শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারি-কর্ত্তৃক লিখিত।

১৪। সাধনার গৃহে। সাত্বিক জীবনের মর্ম্ম কথা। মূল্য আট আনা।

১৫। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিচিত্র। ছোট মূল্য আট আনা। বড় ১৲।

১৬। শ্রীশ্রীদেশমাতৃকা দেবীর প্রতিচিত্র। মূল্য আট আনা।